গোরা

গোরা প্রবাসী পত্রিকায় ১৩১৪ ভাদ্র হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে সমাপ্ত এবং ঐ বৎসরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে-প্রকাশিত পাঠের বহুলাংশ মুদ্রিত গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়। ১৩৩৪ সালে গোরার বিশ্বভারতী-সংস্করণে অনেক অংশ পুনরায় গৃহীত হয়। ১৩৪৭ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণে প্রবাসী হইতে আরও কিছু অংশ সংকলিত হইয়াছে; বর্তমান গ্রন্থ উহারই পুনর্মুদ্রণ।

গোরা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশ। ভাদ্র ১৩১৪ - ফাল্গুন ১৩১৬
প্রথম সংস্করণ : ১৩১৬
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৯২০
পরিবর্ধিত সংস্করণ : ১৩৩৪
পুনর্মুদ্রণ : ভাদ্র ১৩৪০
রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৪৭
পুনর্মুদ্রণ : বৈশাখ ১৩৪৯, চৈত্র ১৩৫৩, শ্রাবণ ১৩৫৮, বৈশাখ ১৩৬৩, আশ্বিন ১৩৬৬
আষাঢ় ১৩৬৮ : ১৮৮৩ শক

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

৪'১

শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কল্যাণীয়েষু

১৪ মাঘ
১৩১৬

শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কালেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁয়া উঠিয়াছে— কিন্তু তবু এত বড়ো এই-যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।

এমন দিনে বিনা কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তাহার বাসার দোতলার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া রাস্তায় জনতার চলাচল দেখিতেছিল। কালেজের পড়াও অনেক দিন চুকিয়া গেছে, অথচ সংসারের মধ্যেও প্রবেশ করে নাই, বিনয়ের অবস্থাটা এইরূপ; সভাসমিতি চালানো এবং খবরের কাগজ লেখায় মন দিয়াছে— কিন্তু তাহাতে সব মনটা ভরিয়া উঠে নাই। অন্তত আজ সকালবেলায় কী করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। পাশের বাড়ির ছাতের উপরে গোটা-তিনেক কাক কী লইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল এবং চড়ুই-দম্পতি তাহার বারান্দার এক কোণে বাসা-নির্মাণ-ব্যাপারে পরস্পরকে কিচিমিচি শব্দে উৎসাহ দিতেছিল— সেই সমস্ত অব্যক্ত কাকলি বিনয়ের মনের মধ্যে একটা কোন্ অস্পষ্ট ভাবাবেগকে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

আলখাল্লা-পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

> "খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখি কমনে আসে যায়,
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।"

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন পাখির

গানটা লিখিয়া লয়। কিন্তু ভোর-রাত্রে যেমন শীত শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ওই অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করিতে লাগিল।

এমন সময় ঠিক তাহার বাসার সামনেই একটা ঠিকাগাড়ির উপরে একটা মস্ত জুড়িগাড়ি আসিয়া পড়িল এবং ঠিকাগাড়ির একটা চাকা ভাঙিয়া দিয়া দৃকপাত না করিয়া বেগে চলিয়া গেল। ঠিকাগাড়িটা সম্পূর্ণ উল্‌টাইয়া না পড়িয়া এক পাশে কাত হইয়া পড়িল।

বিনয় তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল, গাড়ি হইতে একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে নামিয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক নামিবার উপক্রম করিতেছেন।

বিনয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া দিল, এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার লাগে নি তো?"

তিনি "না, কিছু হয় নি" বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন; সে হাসি তখনই মিলাইয়া গেল এবং তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। বিনয় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল ও উৎকণ্ঠিত মেয়েটিকে কহিল, "এই সামনেই আমার বাড়ি; ভিতরে চলুন।"

বৃদ্ধকে বিছানায় শোয়ানো হইলে মেয়েটি চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল, ঘরের কোণে একটি জলের কুঁজা আছে। তখনি সেই কুঁজার জল গেলাসে করিয়া লইয়া বৃদ্ধের মুখে ছিটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং বিনয়কে কহিল, "একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

বাড়ির কাছেই ডাক্তার ছিল। বিনয় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বেহারা পাঠাইয়া দিল।

ঘরের এক পাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, তেলের শিশি ও চুল আঁচড়াইবার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই মেয়েটির পিছনে দাঁড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিনয় ছেলেবেলা হইতেই কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। সংসারের সঙ্গে তাহার যাহা-কিছু পরিচয় সে-সমস্তই বইয়ের ভিতর দিয়া। নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার কোনো দিন কোনো পরিচয় হয় নাই।

আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মুখের ছায়া পড়িয়াছে সে কী সুন্দর মুখ! মুখের প্রত্যেক রেখা আলাদা করিয়া দেখিবার মতো তাহার চোখের অভিজ্ঞতা ছিল না। কেবল সেই উদ্‌বিগ্ন স্নেহে আনত তরুণ মুখের কোমলতা-মণ্ডিত উজ্জ্বলতা বিনয়ের চোখে সৃষ্টির সদ্যঃপ্রকাশিত একটি নূতন বিস্ময়ের মতো ঠেকিল।

একটু পরেই বৃদ্ধ অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিয়া "মা" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েটি তখন দুই চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া বৃদ্ধের মুখের কাছে মুখ নিচু করিয়া আর্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার কোথায় লেগেছে?"

"এ আমি কোথায় এসেছি" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই বিনয় সম্মুখে আসিয়া কহিল, "উঠবেন না— একটু বিশ্রাম করুন, ডাক্তার আসছে।"

তখন তাঁহার সব কথা মনে পড়িল ও তিনি কহিলেন, "মাথার এই-খানটায় একটু বেদনা বোধ হচ্ছে, কিন্তু গুরুতর কিছুই নয়।"

সেই মুহূর্তেই ডাক্তার জুতা মচ্‌মচ্‌ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনিও বলিলেন, "বিশেষ কিছুই নয়।" একটু গরম দুধ দিয়া অল্প ব্রাণ্ডি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া যাইতেই বৃদ্ধ অত্যন্ত সংকুচিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেয়ে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল, "বাবা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধের দাম বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেব।" —বলিয়া সে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল।

সে কী আশ্চর্য চক্ষু! সে চক্ষু বড়ো কি ছোটো, কালো কি কটা, সে তর্ক মনেই আসে না— প্রথম নজরেই মনে হয়, এই দৃষ্টির একটা অসন্দিগ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই, তা একটা স্থির শক্তিতে পূর্ণ।

বিনয় বলিতে চেষ্টা করিল, “ভিজিট অতি সামান্য, সেজন্যে— সে আপনারা— সে আমি—”

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকাতে কথাটা ঠিকমত শেষ করিতেই পারিল না। কিন্তু ভিজিটের টাকাটা যে তাহাকে লইতেই হইবে, সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় রহিল না।

বৃদ্ধ কহিলেন, “দেখুন, আমার জন্যে ব্রাণ্ডির দরকার নেই—”

কন্যা তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, “কেন বাবা, ডাক্তারবাবু যে ব'লে গেলেন।”

বৃদ্ধ কহিলেন, “ডাক্তাররা অমন বলে থাকে, ওটা ওদের একটা কুসংস্কার। আমার যেটুকু দুর্বলতা আছে একটু গরম দুধ খেলেই যাবে।”

দুধ খাইয়া বল পাইলে বৃদ্ধ বিনয়কে কহিলেন, “এবারে আমরা যাই। আপনাকে বড়ো কষ্ট দিলুম।”

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “একটা গাড়ি—”

বৃদ্ধ সংকুচিত হইয়া কহিলেন, “আবার কেন ওঁকে ব্যস্ত করা? আমাদের বাসা তো কাছেই, এটুকু হেঁটেই যাব।”

মেয়েটি বলিল, “না বাবা, সে হতে পারে না।”

বৃদ্ধ ইহার উপর কোনো কথা কহিলেন না এবং বিনয় নিজে গিয়া গাড়ি ডাকিয়া আনিল। গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নামটি কী?”

বিনয়। আমার নাম বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ কহিলেন, “আমার নাম পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। নিকটেই ৭৮ নম্বর বাড়িতে থাকি। কখনো অবকাশমত যদি আমাদের ওখানে যান তো বড়ো খুশি হব।”

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে দুই চোখ তুলিয়া নীরবে এই অনুরোধের সমর্থন করিল। বিনয় তখনই সেই গাড়িতে উঠিয়া তাঁদের বাড়িতে যাইতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেটা ঠিক শিষ্টাচার হইবে কি না ভাবিয়া না পাইয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় মেয়েটি বিনয়কে ছোটো একটি নমস্কার করিল। এই নমস্কারের জন্য বিনয় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, এইজন্য হতবুদ্ধি হইয়া সে প্রতিনমস্কার করিতে পারিল না। এইটুকু ত্রুটি লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। ইহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিদায় হওয়া পর্যন্ত বিনয় নিজের আচরণ সমস্তটা আলোচনা করিয়া দেখিল— মনে হইল, আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারেই অসভ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। কোন্ কোন্ সময়ে কী করা উচিত ছিল, কী বলা উচিত ছিল, তাহা লইয়া মনে মনে কেবলই বৃথা আন্দোলন করিতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, যে রুমাল দিয়া মেয়েটি তাহার বাপের মুখ মুছাইয়া দিয়াছিল সেই রুমালটি বিছানার উপর পড়িয়া আছে। সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। তাহার মনের মধ্যে বাউলের সুরে ওই গানটা বাজিতে লাগিল—

'খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখি কম্‌নে আসে যায়।'

বেলা বাড়িয়া চলিল, বর্ষার রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, গাড়ির স্রোত আপিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় তাহার দিনের কোনো কাজেই মন দিতে পারিল না। এমন অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং চারি দিকের কুৎসিত কলিকাতা মায়াপুরীর মতো হইয়া উঠিল— যে রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হয়, অসাধ্য সিদ্ধ হয়, এবং অপরূপ রূপ লইয়া দেখা দেয়, বিনয় যেন সেই নিয়ম-ছাড়া রাজ্যে ফিরিতেছে। এই বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ময় যবনিকার মতো পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের পরিপূর্ণতাকে আশ্চর্যরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার কোনো উপায় না পাইয়া তাহার চিত্ত পীড়িত হইতে লাগিল। অত্যন্ত সামান্য লোকের মতোই সে আপনার পরিচয়

দিয়াছে— তাহার বাসাটা অত্যন্ত তুচ্ছ, জিনিসপত্র নিতান্ত এলোমেলো, বিছানাটা পরিষ্কার নয়, কোনো-কোনো দিন তাহার ঘরে সে ফুলের তোড়া সাজাইয়া রাখে কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য সেদিন তাহার ঘরে একটা ফুলের পাপড়িও ছিল না। সকলেই বলে, বিনয় সভাস্থলে মুখে মুখে যেরূপ সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারে কালে সে একজন মস্ত বক্তা হইয়া উঠিবে, কিন্তু সেদিন সে এমন একটা কথাও বলে নাই যাহাতে তাহার বুদ্ধির কিছুমাত্র প্রমাণ হয়। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'যদি এমন হইতে পারিত যে সেই বড়ো গাড়িটা যখন তাঁহাদের গাড়ির উপর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে আমি বিদ্যুদ্‌বেগে রাস্তার মাঝখানে আসিয়া অতি অনায়াসে সেই উদ্দাম জুড়িঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইয়া দিতাম।' নিজের সেই কাল্পনিক বিক্রমের ছবি যখন তাহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল তখন একবার আয়নায় নিজের চেহারা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না।

এমন সময় দেখিল একটি সাত-আট বছরের ছেলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহার বাড়ির নম্বর দেখিতেছে। বিনয় উপর হইতে বলিল, "এই-যে, এই বাড়িই বটে।" ছেলেটি যে তাহারই বাড়ির নম্বর খুঁজিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহমাত্র হয় নাই। তাড়াতাড়ি বিনয় সিঁড়ির উপর চটি-জুতা চট্‌ চট্‌ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল; অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে কহিল, "দিদি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।" এই বলিয়া বিনয়ভূষণের হাতে এক পত্র দিল।

বিনয় চিঠিখানি লইয়া প্রথমে লেফাফার উপরটাতে দেখিল, পরিষ্কার মেয়েলি ছাঁদের ইংরেজি অক্ষরে তাহার নাম লেখা। ভিতরে চিঠিপত্র কিছুই নাই, কেবল কয়েকটি টাকা আছে।

ছেলেটি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিনয় তাহাকে কোনোমতেই ছাড়িয়া দিল না। তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে দোতলার ঘরে লইয়া গেল।

ছেলেটির রঙ তাহার দিদির চেয়ে কালো, কিন্তু মুখের ছাঁদে কতকটা

সাদৃশ্য আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনয়ের মনে ভারী একটা স্নেহ এবং আনন্দ জন্মিল।

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। সে ঘরে ঢুকিয়া দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার ছবি?"

বিনয় কহিল, "এ আমার একজন বন্ধুর ছবি।"

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধুর ছবি? আপনার বন্ধু কে?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "তুমি তাঁকে চিনবে না। আমার বন্ধু গৌরমোহন, তাঁকে গোরা বলি। আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছি।"

"এখনো পড়েন?"

"না, এখন আর পড়ি নে।"

"আপনার স-ব পড়া হয়ে গেছে?"

বিনয় এই ছোটো ছেলেটির কাছেও গর্ব করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিল, "হাঁ, সব পড়া হয়ে গেছে।"

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া একটু নিশ্বাস ফেলিল। সে বোধ হয় ভাবিল, এত বিদ্যা সেও কত দিনে শেষ করিতে পারিবে।

বিনয়। তোমার নাম কী?

"আমার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "মুখোপাধ্যায়?"

তাহার পরে একটু একটু করিয়া পরিচয় পাওয়া গেল। পরেশবাবু ইহাদের পিতা নহেন— তিনি ইহাদের দুই ভাইবোনকে ছেলেবেলা হইতে পালন করিয়াছেন। ইহার দিদির নাম আগে ছিল 'রাধারানী'— পরেশবাবুর স্ত্রী তাহা পরিবর্তন করিয়া 'সুচরিতা' নাম রাখিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের সঙ্গে সতীশের খুব ভাব হইয়া গেল। সতীশ যখন বাড়ি যাইতে উদ্যত হইল বিনয় কহিল, "তুমি একলা যেতে পারবে?"

সে গর্ব করিয়া কহিল, "আমি তো একলা যাই।"

বিনয় কহিল, "আমি তোমাকে পৌঁছে দিই গে।"

তাহার শক্তির প্রতি বিনয়ের এই সন্দেহ দেখিয়া সতীশ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "কেন, আমি তো একলা যেতে পারি।" এই বলিয়া তাহার একলা যাতায়াতের অনেকগুলি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের সে উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে বিনয় কেন তাহার বাড়ির দ্বার পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল তাহার ঠিক কারণটি বালক বুঝিতে পারিল না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ভিতরে আসবেন না?"

বিনয় সমস্ত মনকে দমন করিয়া কহিল, "আর-একদিন আসব।"

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিনয় সেই শিরোনামা-লেখা লেফাফা পকেট হইতে বাহির করিয়া অনেক ক্ষণ দেখিল— প্রত্যেক অক্ষরের টান ও ছাঁদ এক-রকম মুখস্থ হইয়া গেল; তার পরে টাকা-সমেত সেই লেফাফা বাক্সের মধ্যে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল। এ কয়টা টাকা যে কোনো দুঃসময়ে খরচ করিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না।

২

বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা শহর একটা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মতো লেজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যা হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া কেবলই বর্ষণ হইয়াছে; সে বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার মতো বল প্রকাশ করে নাই। আজ বেলা চারটে হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে, কিন্তু মেঘের গতিক ভালো নয়। এইরূপ আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ঘরের মধ্যে যখন মন টেঁকে না এবং বাহিরেও যখন আরাম পাওয়া যায় না সেই সময়টাতে দুটি লোক একটি তেতলা বাড়ির স্যাঁৎসেঁতে ছাতে দুটি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছে।

এই দুই বন্ধু যখন ছোটো ছিল তখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই ছাতে ছুটাছুটি খেলা করিয়াছে ; পরীক্ষার পূর্বে উভয়ে চিৎকার করিয়া পড়া আবৃত্তি করিতে করিতে এই ছাতে দ্রুতপদে পাগলের মতো পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে ; গ্রীষ্মকালে কালেজ হইতে ফিরিয়া রাত্রে এই ছাতের উপরেই আহার করিয়াছে, তার পরে তর্ক করিতে করিতে কতদিন রাত্রি দুইটা হইয়া গেছে এবং সকালে রৌদ্র আসিয়া যখন তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে তখন চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিয়াছে, সেইখানেই মাদুরের উপরে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কালেজে পাস করা যখন একটাও আর বাকি রহিল না, তখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি এবং আর-একজন তাহার সেক্রেটরি।

যে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন ; তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারি দিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডিতমহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রঙটা কিছু উগ্ররকমের সাদা, হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো ; গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত ; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো ; চোখের উপর ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাৎলা এবং চাপা ; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে, অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা

যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই— সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।

আর, তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো নম্র, অথচ উজ্জ্বল ; স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে। কালেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে ; গোরা কোনোমতেই তাহার সঙ্গে সমান চলিতে পারিত না। পাঠ্যবিষয়ে গোরার তেমন আসক্তিই ছিল না ; বিনয়ের মতো সে দ্রুত বুঝিতে এবং মনে রাখিতে পারিত না। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেজের পরীক্ষা-কয়টার ভিতর দিয়া নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া আনিয়াছে।—

গোরা বলিতেছিল, "শোনো বলি। অবিনাশ যে ব্রাহ্মদের নিন্দে করছিল তাতে এই বোঝা যায় যে, লোকটা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এতে তুমি হঠাৎ অমন ক্ষাপা হয়ে উঠলে কেন ?"

বিনয়। কী আশ্চর্য! এ সম্বন্ধে যে কোনো প্রশ্ন চলতে পারে তাও আমি মনে করতে পারতুম না।

গোরা। তা যদি হয় তবে তোমার মনে দোষ ঘটেছে। এক দল লোক সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে সব বিষয়ে উল্‌টোরকম করে চলবে আর সমাজের লোক অবিচলিতভাবে তাদের সুবিচার করবে, এ স্বভাবের নিয়ম নয়। সমাজের লোক তাদের ভুল বুঝবেই, তারা সোজা ভাবে যেটা করবে এদের চোখে সেটা বাঁকা ভাবে পড়বেই, তাদের ভালো এদের কাছে মন্দ হয়ে দাঁড়াবেই, এইটেই হওয়া উচিত। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শাস্তি আছে এও তার মধ্যে একটা।

বিনয়। যেটা স্বাভাবিক সেইটেই যে ভালো, তা আমি বলতে পারি নে।

গোরা একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমার ভালোয় কাজ নেই। পৃথিবীতে ভালো দু-চারজন যদি থাকে তো থাক্‌, কিন্তু বাকি সবাই যেন

স্বাভাবিক হয়। নইলে কাজও চলে না, প্রাণও বাঁচে না। ব্রাহ্ম হয়ে বাহাদুরি করবার শখ যাদের আছে অব্রাহ্মরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে, এটুকু দুঃখ তাদের সহ্য করতেই হবে। তারাও বুক ফুলিয়ে বেড়াবে আর তাদের বিরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন বাহবা দিয়ে চলবে, জগতে এটা ঘটে না, ঘটলেও জগতের সুবিধে হত না।"

বিনয়। আমি দলের নিন্দের কথা বলছি নে— ব্যক্তিগত—

গোরা। দলের নিন্দে আবার নিন্দে কিসের! সে তো মতামত-বিচার। ব্যক্তিগত নিন্দেই তো চাই। আচ্ছা, সাধুপুরুষ, তুমি নিন্দে করতে না?

বিনয়। করতুম। খুবই করতুম, কিন্তু সেজন্যে আমি লজ্জিত আছি।

গোরা তাহার ডান হাতের মুঠা শক্ত করিয়া কহিল, "না, বিনয়, এ চলবে না, কিছুতেই না।"

বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তার পরে কহিল, "কেন, কী হয়েছে। তোমার ভয় কিসের।"

গোরা। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি নিজেকে দুর্বল করে ফেলছ।

বিনয় ঈষৎ একটুখানি উত্তেজিত হইয়া কহিল, "দুর্বল! তুমি জান, আমি ইচ্ছে করলে এখনই তাঁদের বাড়ি যেতে পারি— তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণও করেছিলেন— কিন্তু আমি যাই নি।"

গোরা। কিন্তু এই-যে যাও নি, সেই কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছ না। দিনরাত্রি কেবল ভাবছ, 'যাই নি, যাই নি, আমি তাঁদের বাড়ি যাই নি'— এর চেয়ে যে যাওয়াই ভালো।

বিনয়। তবে কি যেতেই বল।

গোরা নিজের জানু চাপড়াইয়া কহিল, "না, আমি যেতে বলি নে। আমি তোমাকে লিখে পড়ে দিচ্ছি, যেদিন তুমি যাবে সেদিন একেবারে পুরোপুরিই যাবে। তার পরদিন থেকেই তাদের বাড়ি খানা খেতে শুরু করবে এবং ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে একেবারে দিগ্‌বিজয়ী প্রচারক হয়ে উঠবে।

বিনয়। বল কী। তার পরে ?

গোরা। আর তার পরে ! মরার বাড়া তো গাল নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো-ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, তোমার আচার বিচার কিছুই থাকবে না, কম্পাস-ভাঙা কাণ্ডারীর মতো তোমার পূর্ব-পশ্চিমের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে— তখন মনে হবে, জাহাজ বন্দরে উত্তীর্ণ করাই কুসংস্কার, সংকীর্ণতা— কেবল না-হক ভেসে চলে যাওয়াই যথার্থ জাহাজ চালানো। কিন্তু এ-সব কথা নিয়ে বকাবকি করতে আমার ধৈর্য থাকে না— আমি বলি, তুমি যাও। অধঃপাতের মুখের সামনে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের সুদ্ধ কেন ভয়ে ভয়ে রেখে দিয়েছ।

বিনয় হাসিয়া উঠিল; কহিল, "ডাক্তার আশা ছেড়ে দিলেই যে রোগী সব সময়ে মরে তা নয়। আমি তো নিদেন-কালের কোনো লক্ষণ বুঝতে পারছি নে।"

গোরা। পারছ না ?

বিনয়। না।

গোরা। নাড়ী ছাড়ে ছাড়ে করছে না ?

বিনয়। না, দিব্যি জোর আছে।

গোরা। মনে হচ্ছে না যে, শ্রীহস্তে যদি পরিবেষণ করে তবে ম্লেচ্ছের অন্নই দেবতার ভোগ ?

বিনয় অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিল; কহিল, "গোরা, বস্, এইবার থামো।"

গোরা। কেন, এর মধ্যে তো আব্রুর কোনো কথা নেই। শ্রীহস্ত তো অসূর্যম্পশ্য নয়। পুরুষমানুষের সঙ্গে যার শেক্‌হ্যাণ্ড চলে সেই পবিত্র করপল্লবের উল্লেখটি পর্যন্ত যখন তোমার সহ্য হল না, তদা নাশংসে মরণায় সঞ্জয় !

বিনয়। দেখো গোরা, আমি স্ত্রীজাতিকে ভক্তি করে থাকি— আমাদের শাস্ত্রেও—

গোরা। স্ত্রীজাতিকে যে ভাবে ভক্তি করছ তার জন্যে শাস্ত্রের দোহাই পেড়ো না। ওকে ভক্তি বলে না, যা বলে তা যদি মুখে আনি তো মারতে আসবে।

বিনয়। এ তুমি গায়ের জোরে বলছ।

গোরা। শাস্ত্রে মেয়েদের বলেন, পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। তাঁরা পূজার্হা কেননা গৃহকে দীপ্তি দেন, পুরুষমানুষের হৃদয়কে দীপ্ত করে তোলেন ব'লে বিলিতি বিধানে তাঁদের যে মান দেওয়া হয় তাকে পূজা না বললেই ভালো হয়।

বিনয়। কোনো কোনো স্থলে বিকৃতি দেখা যায় বলে কি একটা বড়ো ভাবের উপর ওরকম কটাক্ষপাত করা উচিত।

গোরা অধীর হইয়া কহিল, "বিনু, এখন যখন তোমার বিচার করবার বুদ্ধি গেছে তখন আমার কথাটা মেনেই নাও— আমি বলছি, বিলিতি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে-সমস্ত অত্যুক্তি আছে তার ভিতরকার কথাটা হচ্ছে বাসনা। স্ত্রীজাতিকে পুজো করবার জায়গা হল মার ঘর, সতীলক্ষ্মী গৃহিণীর আসন— সেখান থেকে সরিয়ে এনে তাঁদের যে স্তব করা হয় তার মধ্যে অপমান লুকিয়ে আছে। পতঙ্গের মতো তোমার মনটা যে কারণে পরেশবাবুর বাড়ির চারি দিকে ঘুরছে, ইংরিজিতে তাকে বলে থাকে 'লাভ্'— কিন্তু ইংরেজের নকল ক'রে ওই লাভ্ ব্যাপারটাকেই সংসারের মধ্যে একটা চরম পুরুষার্থ বলে উপাসনা করতে হবে, এমন বাঁদরামি যেন তোমাকে না পেয়ে বসে!"

বিনয় কষাহত তাজা ঘোড়ার মতো লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "আঃ গোরা, থাক্, যথেষ্ট হয়েছে।"

গোরা। কোথায় যথেষ্ট হয়েছে। কিছুই হয় নি। স্ত্রী আর পুরুষকে তাদের স্বস্থানে বেশ সহজ করে দেখতে শিখি নি বলেই আমরা কতকগুলো কবিত্ব জমা করে তুলেছি।

বিনয় কহিল, "আচ্ছা, মানছি, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ ঠিক যে জায়গাটাতে

থাকলে সহজ হতে পারত আমরা প্রবৃত্তির ঝোঁকে সেটা লঙ্ঘন করি এবং সেটাকে মিথ্যে করে তুলি, কিন্তু এই অপরাধটা কি কেবল বিদেশেরই। এ সম্বন্ধে ইংরেজের কবিত্ব যদি মিথ্যে হয় তো আমরা ওই-যে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ নিয়ে সর্বদা বাড়াবাড়ি করে থাকি সেটাও তো মিথ্যে। মানুষের প্রকৃতি যা নিয়ে সহজে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে তার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যে কেউ-বা প্রেমের সৌন্দর্য-অংশকেই কবিত্বের দ্বারা উজ্জ্বল করে তুলে তার মন্দটাকে লজ্জা দেয়, আর কেউ-বা ওর মন্দটাকেই বড়ো করে তুলে কামিনীকাঞ্চনত্যাগের বিধান দিয়ে থাকে ; ও দুটো কেবল দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের ভিন্নরকম প্রণালী। একটাকেই যদি নিন্দে কর তবে অন্যটাকেও রেয়াত করলে চলবে না।"

গোরা। নাঃ, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম। তোমার অবস্থা তেমন খারাপ হয় নি। এখনো যখন ফিলজফি তোমার মাথায় খেলছে তখন নির্ভয়ে তুমি লাভ্ করতে পার, কিন্তু সময় থাকতে নিজেকে সামলে নিয়ো— হিতৈষী বন্ধুদের এই অনুরোধ।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আঃ, তুমি কি পাগল হয়েছ। আমার আবার লাভ্। তবে এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, পরেশবাবুদের আমি যেটুকু দেখেছি এবং ওঁদের সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে ওঁদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হয়েছে। বোধ করি তাই ওঁদের ঘরের ভিতরকার জীবনযাত্রাটা কিরকম সেটা জানবার জন্যে আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল।"

গোরা। উত্তম কথা, সেই আকর্ষণটাই সামলে চলতে হবে। ওঁদের সম্বন্ধে প্রাণীবৃত্তান্তের অধ্যায়টা নাহয় অনাবিষ্কৃতই রইল। বিশেষত, ওঁরা হলেন শিকারি প্রাণী, ওঁদের ভিতরকার ব্যাপার জানতে গিয়ে শেষকালে এতদূর পর্যন্ত ভিতরে যেতে পার যে তোমার টিকিটি পর্যন্ত দেখবার জো থাকবে না।

বিনয়। দেখো, তোমার একটা দোষ আছে। তুমি মনে কর, যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল একলা তোমাকেই দিয়েছেন, আর আমরা সবাই দুর্বল প্রাণী।

কথাটা গোরাকে হঠাৎ যেন নূতন করিয়া ঠেকিল; সে উৎসাহবেগে বিনয়ের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল, "ঠিক বলেছ— ওইটে আমার দোষ— আমার মস্ত দোষ।"

বিনয়। উঃ, ওর চেয়েও তোমার আর-একটা মস্ত দোষ আছে। অন্য লোকের শিরদাঁড়ার উপরে কতটা আঘাত সয় তার ওজনবোধ তোমার একেবারেই নেই।

এমন সময়ে গোরার বড়ো বৈমাত্র ভাই মহিম তাহার পরিপুষ্ট শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে আসিয়া কহিলেন, "গোরা!"

গোরা তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ্ঞে।"

মহিম। দেখতে এলেম, বর্ষার জলধরপটল আমাদের ছাতের উপরে গর্জন করতে নেমেছে কি না। আজ ব্যাপারখানা কী। ইংরেজকে বুঝি এতক্ষণে ভারতসমুদ্রের অর্ধেকটা পথ পার করে দিয়েছ? ইংরেজের বিশেষ কোনো লোকসান দেখছি নে, কিন্তু নীচের ঘরে মাথা ধ'রে বড়োবউ পড়ে আছে, সিংহনাদে তারই যা অসুবিধে হচ্ছে।

এই বলিয়া মহিম নীচে চলিয়া গেলেন।

গোরা লজ্জা পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— লজ্জার সঙ্গে ভিতরে একটু রাগও জ্বলিতে লাগিল, তাহা নিজের বা অন্যের 'পরে ঠিক বলা যায় না। একটু পরে সে ধীরে ধীরে যেন আপন-মনে কহিল, 'সব বিষয়েই, যতটা দরকার আমি তার চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়ে ফেলি, সেটা যে অন্যের পক্ষে কতটা অসহ্য তা আমার ঠিক মনে থাকে না।'

বিনয় গোরের কাছে আসিয়া সস্নেহে তার হাত ধরিল।

৩

গোরা ও বিনয় ছাত হইতে নামিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় গোরার মা উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় তাঁহার পায়ের ধুলা

লইয়া প্রণাম করিল।

গোরার মা আনন্দময়ীকে দেখিলে গোরার মা বলিয়া মনে হয় না। তিনি ছিপ্‌ছিপে পাতলা, আঁটসাঁট শক্ত; চুল যদি বা কিছু কিছু পাকিয়া থাকে বাহির হইতে দেখা যায় না; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার বয়স চল্লিশেরও কম। মুখের বেড় অত্যন্ত সুকুমার, নাকের ঠোঁটের চিবুকের ললাটের রেখা কে যেন যত্নে কুঁদিয়া কাটিয়াছে; শরীরের সমস্তই বাহুল্যবর্জিত— মুখে একটি পরিষ্কার ও সতেজ বুদ্ধির ভাব সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। রঙ শ্যামবর্ণ, গোরার রঙের সঙ্গে তাহার কোনোই তুলনা হয় না। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই একটা জিনিস সকলের চোখে পড়ে— তিনি শাড়ির সঙ্গে শেমিজ পরিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার দিনে মেয়েদের জামা বা শেমিজ পরা যদিও নব্যদলে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তবু প্রবীণা গৃহিণীরা তাহাকে নিতান্তই খৃস্টানি বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন। আনন্দময়ীর স্বামী কৃষ্ণদয়ালবাবু কমিসেরিয়েটে কাজ করিতেন, আনন্দময়ী তাঁহার সঙ্গে ছেলেবেলা হইতে পশ্চিমে কাটাইয়াছেন, তাই ভালো করিয়া গা ঢাকিয়া গায়ে কাপড় দেওয়া যে লজ্জা বা পরিহাসের বিষয়, এ সংস্কার তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ঘরদুয়ার মাজিয়া ঘসিয়া ধুইয়া মুছিয়া, রাঁধিয়া বাড়িয়া সেলাই করিয়া, গুনতি করিয়া, হিসাব করিয়া, ঝাড়িয়া, রৌদ্রে দিয়া, আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীর খবর লইয়া তবু তাঁহার সময় যেন ফুরাইতে চাহে না। শরীরে অসুখ করিলে. তিনি কোনোমতেই তাহাকে আমল দিতে চান না; বলেন, "অসুখে তো আমার কিছু হবে না, কাজ না করতে পেলে বাঁচব কী করে।"

গোরার মা উপরে আসিয়া কহিলেন, "গোরার গলা যখনই নীচে থেকে শোনা যায় তখনই বুঝতে পারি, বিনু নিশ্চয়ই এসেছে। ক'দিন বাড়ি একেবারে চুপচাপ ছিল— কী হয়েছে বল্ তো বাছা। আসিস নি কেন। অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

বিনয় কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "না মা, অসুখ— যে বৃষ্টিবাদল!"

গোরা কহিল, "তাই বই-কি। এর পরে বৃষ্টিবাদল যখন ধরে যাবে

তখন বিনয় বলবেন, যে রোদ পড়েছে! দেবতার উপর দোষ দিলে দেবতা তো কোনো জবাব করেন না— আসল মনের কথা অন্তর্যামীই জানেন।"

বিনয় কহিল, "গোরা, তুমি কী বাজে বকছ।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা সত্যি বাছা, অমন করে বলতে নেই। মানুষের মন কখনো ভালো থাকে, কখনো মন্দ থাকে, সব সময় কি সমান যায়। তা নিয়ে কথা পাড়তে গেলে উৎপাত করা হয়। তা আয় বিনু, আমার ঘরে আয়, তোর জন্যে খাবার ঠিক করেছি।"

গোরা জোর করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "না মা, সে হচ্ছে না। তোমার ঘরে আমি বিনয়কে খেতে দেব না।"

আনন্দময়ী। ইস, তাই তো! কেন বাপু, তোকে তো আমি কোনো দিন খেতে বলি নে— এ দিকে তোর বাপ তো ভয়ংকর শুদ্ধাচারী হয়ে উঠেছেন, স্বপাক না হলে খান না। বিনু আমার লক্ষ্মী ছেলে, তোর মতো ওর গোঁড়ামি নেই, তুই কেবল ওকে জোর করে ঠেকিয়ে রাখতে চাস।

গোরা। সে কথা ঠিক, আমি জোর করেই ওকে ঠেকিয়ে রাখব। তোমার ওই খৃস্টান দাসী লছমিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চলবে না।

আনন্দময়ী। ওরে গোরা, অমন কথা তুই মুখে আনিস নে। চিরদিন ওর হাতে তুই খেয়েছিস, ও তোকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। এই সেদিন পর্যন্ত ওর হাতের তৈরি চাটনি না হলে তোর যে খাওয়া রুচত না। ছোটোবেলায় তোর যখন বসন্ত হয়েছিল লছমিয়া যে করে তোকে সেবা করে বাঁচিয়েছে সে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

গোরা। ওকে পেনশন দাও, জমি কিনে দাও, ঘর করে দাও, যা খুশি করো, কিন্তু ওকে রাখা চলবে না মা।

আনন্দময়ী। গোরা, তুই মনে করিস, টাকা দিলেই সব ঋণ শোধ হয়ে যায়! ও জমিও চায় না, বাড়িও চায় না, তোকে না দেখতে পেলে ও

মরে যাবে।

গোরা। তবে তোমার খুশি ওকে রাখো। কিন্তু বিনু তোমার ঘরে খেতে পাবে না। যা নিয়ম তা মানতেই হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না। মা, তুমি এতবড়ো অধ্যাপকের বংশের মেয়ে, তুমি যে আচার পালন করে চল না এ কিন্তু—

আনন্দময়ী। ওগো, তোমার মা আগে আচার পালন করেই চলত; তাই নিয়ে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে— তখন তুমি ছিলে কোথায়। রোজ শিব গড়ে পুজো করতে বসতুম আর তোমার বাবা এসে টান মেরে ফেলে ফেলে দিতেন। তখন অপরিচিত বামুনের হাতেও ভাত খেতে আমার ঘেন্না করত। সেকালে রেলগাড়ি বেশি দূর ছিল না— গোরুর গাড়িতে, ডাকগাড়িতে, পালকিতে, উটের উপর চড়ে কত দিন ধরে কত উপোস করে কাটিয়েছি। তোমার বাবা কি সহজে আমার আচার ভাঙতে পেরেছিলেন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন বলে তাঁর সাহেব-মনিবরা তাঁকে বাহবা দিত, তাঁর মাইনেই বেড়ে গেল— ওই জন্যেই তাঁকে এক জায়গায় অনেক দিন রেখে দিত, প্রায় নড়াতে চাইত না। এখন তো বুড়ো-বয়সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাশ রাশ টাকা নিয়ে তিনি হঠাৎ উলটে খুব শুচি হয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু আমি তা পারব না। আমার সাত পুরুষের সংস্কার একটা একটা করে নির্মূল করা হয়েছে— সে কি এখন আর বললেই ফেরে।

গোরা। আচ্ছা, তোমার পূর্বপুরুষদের কথা ছেড়ে দাও— তাঁরা তো কোনো আপত্তি করতে আসছেন না। কিন্তু আমাদের খাতিরে তোমাকে কতকগুলো জিনিস মেনে চলতেই হবে। নাহয় শাস্ত্রের মান নাই রাখলে, স্নেহের মান রাখতে হবে তো।

আনন্দময়ী। ওরে, অত করে আমাকে কী বোঝাচ্ছিস। আমার মনে কী হয় সে আমিই জানি। আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমাকে নিয়ে তাদের যদি পদে পদে কেবল বাধতে লাগল তবে আমার আর সুখ কী নিয়ে। কিন্তু তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা

জানিস? ছোটো ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে, জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। সে কথা যেদিন বুঝেছি সেদিন থেকে এ কথা নিশ্চয় জেনেছি যে, আমি যদি খৃস্টান ব'লে, ছোটো জাত ব'লে কাউকে ঘৃণা করি তবে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। তুই আমার কোল ভরে আমার ঘর আলো করে থাক্, আমি পৃথিবীর সকল জাতের হাতেই জল খাব।

আজ আনন্দময়ীর কথা শুনিয়া বিনয়ের মনে হঠাৎ কী একটা অস্পষ্ট সংশয়ের আভাস দেখা দিল। সে একবার আনন্দময়ীর ও একবার গোরার মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু তখনই মন হইতে সকল তর্কের উপক্রম দূর করিয়া দিল।

গোরা কহিল, "মা, তোমার যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না। যারা বিচার ক'রে শাস্ত্র মেনে চলে তাদের ঘরেও তো ছেলে বেঁচে থাকে, আর ঈশ্বর তোমার সম্বন্ধেই বিশেষ আইন খাটাবেন এ বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে।"

আনন্দময়ী। যিনি তোকে দিয়েছেন বুদ্ধিও তিনি দিয়েছেন। তা, আমি কী করব বল্! আমার এতে কোনো হাত নেই। কিন্তু, ওরে পাগল, তোর পাগলামি দেখে আমি হাসব কি কাঁদব তা ভেবে পাই নে। যাক, সে-সব কথা যাক। তবে বিনয় আমার ঘরে খাবে না?

গোরা। ও তো এখনই সুযোগ পেলেই ছোটে, লোভটি ওর ষোলো আনা। কিন্তু মা, আমি যেতে দেব না। ও যে বামুনের ছেলে, দুটো মিষ্টি দিয়ে সে কথা ওকে ভোলালে চলবে না। ওকে অনেক ত্যাগ করতে হবে, প্রবৃত্তি সামলাতে হবে, তবে ও জন্মের গৌরব রাখতে পারবে। মা, তুমি কিন্তু রাগ কোরো না। আমি তোমার পায়ের ধুলো নিচ্ছি।

আনন্দময়ী। আমি রাগ করব! তুই বলিস কী। তুই যা করছিস এ তুই জ্ঞানে করছিস নে, তা আমি তোকে বলে দিলুম। আমার মনে এই কষ্ট রইল যে, তোকে মানুষ করলুম বটে কিন্তু— যাই হোক গে, তুই যাকে ধর্ম বলে বেড়াস সে আমার মানা চলবে না— নাহয়, তুই আমার ঘরে আমার

হাতে নাই খেলি— কিন্তু তোকে তো দু সন্ধে দেখতে পাব, সেই আমার ঢের। বিনয়, তুমি মুখটি অমন মলিন কোরো না বাপ। তোমার মনটি নরম, তুমি ভাবছ আমি দুঃখ পেলুম— কিছু না বাপ। আর-একদিন নিমন্ত্রণ করে খুব ভালো বামুনের হাতেই তোমাকে খাইয়ে দেব— তার ভাবনা কী। আমি কিন্তু বাছা, লছমিয়ার হাতের জল খাব, সে আমি সবাইকে বলে রাখছি।

গোরার মা নীচে চলিয়া গেলেন। বিনয় চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "গোরা, এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

গোরা। কার বাড়াবাড়ি।

বিনয়। তোমার।

গোরা। এক চুল বাড়াবাড়ি নয়। যেখানে যার সীমা আমি সেইটে ঠিক রক্ষে করে চলতে চাই। কোনো ছুতোয় সূচ্যগ্রভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষকালে কিছুই বাকি থাকে না।

বিনয়। কিন্তু, মা যে!

গোরা। মা কাকে বলে সে আমি জানি। আমাকে কি সে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে। আমার মার মতো মা ক'জনের আছে। কিন্তু আচার যদি না মানতে শুরু করি তবে একদিন হয়তো মাকেও মানব না। দেখো বিনয়, তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো, হৃদয় জিনিসটা অতি উত্তম কিন্তু সকলের চেয়ে উত্তম নয়।

বিনয় কিছুক্ষণ পরে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "দেখো গোরা, আজ মার কথা শুনে আমার মনের ভিতরে কিরকম একটা নাড়াচাড়া হচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে, যেন মার মনে কী একটা কথা আছে, সেইটে তিনি আমাদের বোঝাতে পারছেন না, তাই কষ্ট পাচ্ছেন।"

গোরা অধীর হইয়া কহিল, "আঃ বিনয়, অত কল্পনা নিয়ে খেলিয়ো না— ওতে কেবলই সময় নষ্ট হয়, আর কোনো ফল হয় না।"

বিনয়। তুমি পৃথিবীর কোনো জিনিসের দিকে কখনো ভালো করে

তাকাও না, তাই যেটা তোমার নজরে পড়ে না সেটাকেই তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, আমি কতবার দেখেছি, মা যেন কিসের জন্যে একটা ভাবনা পুষে রেখেছেন— কী যেন একটা ঠিকমত মিলিয়ে দিতে পারছেন না— সেই জন্যে ওঁর ঘর-করনার ভিতরে একটা দুঃখ আছে। গোরা, তুমি ওঁর কথাগুলো একটু কান পেতে শুনো।

গোরা। কান পেতে যতটা শোনা যায় তা আমি শুনে থাকি— তার চেয়ে বেশি শোনবার চেষ্টা করলে ভুল শোনবার সম্ভাবনা আছে বলে সে চেষ্টাই করি নে।

৪

মত হিসাবে একটা কথা যেমনতরো শুনিতে হয়, মানুষের উপর প্রয়োগ করিবার বেলায় সকল সময় তাহার সেই একান্ত নিশ্চিত ভাবটা থাকে না— অন্তত বিনয়ের কাছে থাকে না— বিনয়ের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তাই তর্কের সময় সে একটা মতকে খুব উচ্চস্বরে মানিয়া থাকে, কিন্তু ব্যবহারের বেলা মানুষকে তাহার চেয়ে বেশি না মানিয়া থাকিতে পারে না। এমন-কি গোরার প্রচারিত মতগুলি বিনয় যে গ্রহণ করিয়াছে তাহা কতটা মতের খাতিরে আর কতটা গোরার প্রতি তাহার একান্ত ভালোবাসার টানে তাহা বলা শক্ত।

গোরাদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বাসায় ফিরিবার সময় বর্ষার সন্ধ্যায় যখন সে কাদা বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে রাস্তায় চলিতেছিল তখন মত এবং মানুষে তাহার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়াছিল।

এখনকার কালের নানাপ্রকার প্রকাশ্য এবং গোপন আঘাত হইতে সমাজ যদি আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে চায় তবে খাওয়া-ছোঁওয়া প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাহাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক হইতে হইবে, এই মতটি বিনয় গোরার

মুখ হইতে অতি সহজেই গ্রহণ করিয়াছে, এ লইয়া বিরুদ্ধ লোকদের সঙ্গে সে তীক্ষ্ণভাবে তর্ক করিয়াছে; বলিয়াছে, শত্রু যখন কেল্লাকে চারি দিকে আক্রমণ করিয়াছে তখন এই কেল্লার প্রত্যেক পথ-গলি, দরজা-জানলা, প্রত্যেক ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া প্রাণ দিয়া যদি রক্ষা করিতে থাকি তবে তাহাকে উদারতার অভাব বলে না।

কিন্তু আজ ওই-যে আনন্দময়ীর ঘরে গোরা তাহার খাওয়া নিষেধ করিয়া দিল, ইহার আঘাত ভিতরে ভিতরে তাহাকে কেবলই বেদনা দিতে লাগিল।

বিনয়ের বাপ ছিল না, মাকেও সে অল্পবয়সে হারাইয়াছে; খুড়া থাকেন দেশে, এবং ছেলেবেলা হইতেই পড়াশুনা লইয়া বিনয় কলিকাতার বাসায় একলা মানুষ হইয়াছে। গোরার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে বিনয় যেদিন হইতে আনন্দময়ীকে জানিয়াছে সেই দিন হইতে তাঁহাকে মা বলিয়াই জানিয়াছে। কতদিন তাঁহার ঘরে গিয়া সে কাড়াকাড়ি করিয়া উৎপাত করিয়া খাইয়াছে; আহার্যের অংশবিভাগ লইয়া আনন্দময়ী গোরার প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাকেন, এই অপবাদ দিয়া কতদিন সে তাহার প্রতি কৃত্রিম ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছে। দুই-চারি দিন বিনয় কাছে না আসিলেই আনন্দময়ী যে কতটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন, বিনয়কে কাছে বসাইয়া খাওয়াইবেন এই প্রত্যাশায় কতদিন তিনি তাহাদের সভাভঙ্গের জন্য উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন, তাহা বিনয় সমস্তই জানিত। সেই বিনয় আজ সামাজিক ঘৃণায় আনন্দময়ীর ঘরে গিয়া খাইবে না, ইহা কি আনন্দময়ী সহিতে পারেন, না বিনয় সহিবে?

'ইহার পর হইতে ভালো বামুনের হাতে মা আমাকে খাওয়াইবেন, নিজের হাতে আর কখনো খাওয়াইবেন না— এ কথা মা হাসিমুখ করিয়া বলিলেন, কিন্তু এ যে মর্মান্তিক কথা।' এই কথাটাই বিনয় বার বার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছিল।

শূন্য ঘর অন্ধকার হইয়া আছে। চারি দিকে কাগজপত্র বই এলোমেলো

ছড়ানো। দেয়াশালাই ধরাইয়া বিনয় তেলের শেজ জ্বালাইল— শেজের উপর বেহারার করকোষ্ঠী নানা চিহ্নে অঙ্কিত। লিখিবার টেবিলের উপর যে একটা সাদা কাপড়ের আবরণ আছে তাহার নানান জায়গায় কালী এবং তেলের দাগ। এই ঘরে তাহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিল। মানুষের সঙ্গ এবং স্নেহের অভাব আজ তাহার বুক যেন চাপিয়া ধরিল। দেশকে উদ্ধার, সমাজকে রক্ষা, এই-সমস্ত কর্তব্যকে সে কোনোমতেই স্পষ্ট এবং সত্য করিয়া তুলিতে পারিল না— ইহার চেয়ে ঢের সত্য সেই অচিন পাখি যে একদিন শ্রাবণের উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে খাঁচার কাছে আসিয়া আবার খাঁচার কাছ হইতে চলিয়া গেছে। কিন্তু সেই অচিন পাখির কথা বিনয় কোনোমতেই মনে আমল দিবে না, কোনোমতেই না। সেইজন্য মনকে আশ্রয় দিবার জন্য, যে আনন্দময়ীর ঘর হইতে গোরা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে সেই ঘরটির ছবি মনে আঁকিতে লাগিল।

পঙ্খের-কাজ-করা উজ্জ্বল মেজে পরিষ্কার তক্ তক্ করিতেছে; এক ধারে তক্তপোশের উপর সাদা রাজহাঁসের পাখার মতো কোমল নির্মল বিছানা পাতা রহিয়াছে; বিছানার পাশেই একটা ছোটো টুলের উপর রেড়ির তেলের বাতি এতক্ষণে জ্বালানো হইয়াছে; মা নিশ্চয়ই নানা রঙের সুতা লইয়া সেই বাতির কাছে ঝুঁকিয়া কাঁথার উপর শিল্পকাজ করিতেছেন, লছমিয়া নীচে মেজের উপর বসিয়া তাহার বাঁকা উচ্চারণের বাংলায় অনর্গল বকিয়া যাইতেছে, মা তাহার অধিকাংশই কানে আনিতেছেন না। মা যখন মনে কোনো কষ্ট পান তখন শিল্পকাজ লইয়া পড়েন— তাঁহার সেই কর্মনিবিষ্ট স্তব্ধ মুখের ছবির প্রতি বিনয় তাহার মনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল; সে মনে মনে কহিল, 'এই মুখের স্নেহদীপ্তি আমাকে আমার সমস্ত মনের বিক্ষেপ হইতে রক্ষা করুক। এই মুখই আমার মাতৃভূমির প্রতিমাস্বরূপ হউক, আমাকে কর্তব্যে প্রেরণ করুক এবং কর্তব্যে দৃঢ় রাখুক।' তাঁহাকে মনে মনে একবার 'মা' বলিয়া ডাকিল এবং কহিল, 'তোমার অন্ন যে আমার অমৃত নয়, এ কথা কোনো শাস্ত্রের প্রমাণেই স্বীকার করিব না।'

নিস্তব্ধ ঘরে বড়ো ঘড়িটা টিক্ টিক্ করিয়া চলিতে লাগিল ; ঘরের মধ্যে বিনয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। আলোর কাছে দেওয়ালের গায়ে একটা টিক্‌টিকি পোকা ধরিতেছে— তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বিনয় উঠিয়া পড়িল এবং একটা ছাতা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

কী করিবে সেটা মনের মধ্যে স্পষ্ট ছিল না। বোধ হয় আনন্দময়ীর কাছে ফিরিয়া যাইবে, এইমতোই তাহার মনের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু কখন এক সময় তাহার মনে উঠিল, 'আজ রবিবার, আজ ব্রাহ্মসভায় কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাই।' এ কথা যেমন মনে ওঠা অমনি সমস্ত দ্বিধা দূর করিয়া বিনয় জোরে চলিতে আরম্ভ করিল। বক্তৃতা শুনিবার সময় যে বড়ো বেশি নাই তাহা সে জানিত, তবু তাহার সংকল্প বিচলিত হইল না।

যথাস্থানে পৌঁছিয়া দেখিল, উপাসকেরা বাহির হইয়া আসিতেছে। ছাতা-মাথায় রাস্তার ধারে এক কোণে সে দাঁড়াইল— মন্দির হইতে সেই মুহূর্তেই পরেশবাবু শান্তপ্রসন্নমুখে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিজন চার-পাঁচটি ছিল— বিনয় তাহাদের মধ্যে কেবল একজনের তরুণ মুখ রাস্তার গ্যাসের আলোকে ক্ষণকালের জন্য দেখিল— তাহার পরে গাড়ির চাকার শব্দ হইল এবং এই দৃশ্যটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি বুদ্‌বুদের মতো মিলাইয়া গেল।

বিনয় ইংরেজি নভেল যথেষ্ট পড়িয়াছে, কিন্তু বাঙালি ভদ্রঘরের সংস্কার তাহার যাইবে কোথায়। এমন করিয়া মনের মধ্যে আগ্রহ লইয়া কোনো স্ত্রীলোককে দেখিতে চেষ্টা করা যে সেই স্ত্রীলোকের পক্ষে অসম্মানকর এবং নিজের পক্ষে গর্হিত, এ কথা সে কোনো তর্কের দ্বারা মন হইতে তাড়াইতে পারে না। তাই বিনয়ের মনের মধ্যে হর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত একটা গ্লানি জন্মিতে লাগিল। মনে হইল, 'আমার একটা যেন পতন হইতেছে।' গোরার সঙ্গে যদিচ সে তর্ক করিয়া আসিয়াছে তবু, যেখানে সামাজিক অধিকার নাই সেখানে কোনো স্ত্রীলোককে প্রেমের চক্ষে দেখা তাহার চিরজীবনের সংস্কারে বাধিতে লাগিল।

বিনয়ের আর গোরার বাড়ি যাওয়া হইল না। মনের মধ্যে নানা কথা তোলপাড় করিতে করিতে বিনয় বাসায় ফিরিল। পরদিন অপরাহ্ণে বাসা হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে যখন গোরার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বর্ষার দীর্ঘ দিন শেষ হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিয়াছে। গোরা সেই সময় আলোটি জ্বালাইয়া লিখিতে বসিয়াছে।

গোরা কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল, "কী গো বিনয়, হাওয়া কোন্ দিক থেকে বইছে।"

বিনয় সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "গোরা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— ভারতবর্ষ তোমার কাছে খুব সত্য? খুব স্পষ্ট? তুমি তো দিনরাত্রি তাকে মনে রাখ, কিন্তু কিরকম করে মনে রাখ।"

গোরা লেখা ছাড়িয়া কিছুক্ষণ তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল— তাহার পরে কলমটা রাখিয়া চৌকির পিঠের দিকে ঠেস দিয়া কহিল, "জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে-বিহারে কাজে-বিশ্রামে সমুদ্রপারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমনি করে মনে রেখেছি।"

বিনয়। কোথায় তোমার সেই ভারতবর্ষ।

গোরা বুকে হাত দিয়া কহিল, "আমার এইখানকার কম্পাসটা দিনরাত যেখানে কাঁটা ফিরিয়ে আছে সেইখানে, তোমার মার্শ্‌ম্যান সাহেবের 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'র মধ্যে নয়।

বিনয়। তোমার কাঁটা যে দিকে সে দিকে, কিছু-একটা আছে কি।

গোরা উত্তেজিত হইয়া কহিল, "আছে না তো কী। আমি পথ ভুলতে পারি, ডুবে মরতে পারি, কিন্তু আমার সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে। সেই আমার পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষ— ধনে পূর্ণ, জ্ঞানে পূর্ণ, ধর্মে পূর্ণ— সে ভারতবর্ষ কোথাও নেই! আছে কেবল চারি দিকের এই মিথ্যেটা! এই তোমার কলকাতা শহর, এই আপিস, এই আদালত, এই গোটাকতক ইঁটকাঠের

বুদ্‌বুদ! ছোঃ!"

বলিয়া গোরা বিনয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; বিনয় কোনো উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল। গোরা কহিল, "এই যেখানে আমরা পড়ছি শুনছি, চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি, দশটা-পাঁচটায় ভূতের খাটুনি খেটে কী যে করছি তার কিছুই ঠিকানা নেই, এই জাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য বলে ঠাউরেছি বলেই পঁচিশ কোটি লোক মিথ্যে মানকে মান ব'লে, মিথ্যে কর্মকে কর্ম ব'লে দিনরাত বিভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছি— এই মরীচিকার ভিতর থেকে কি আমরা কোনোরকম চেষ্টায় প্রাণ পাব! আমরা তাই প্রতিদিন শুকিয়ে মরছি। একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে— পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ, সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কী বুদ্ধিতে কী হৃদয়ে যথার্থ প্রাণ-রসটা টেনে নিতে পারব না। তাই বলছি, আর সমস্ত ভুলে, কেতাবের বিদ্যে, খেতাবের মায়া, উঞ্ছবৃত্তির প্রলোভন সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে— ডুবি তো ডুবব, মরি তো মরব। সাধে আমি ভারতবর্ষের সত্য মূর্তি, পূর্ণ মূর্তি, কোনোদিন ভুলতে পারি নে!"

বিনয়। এ-সব কেবল উত্তেজনার কথা নয়? এ তুমি সত্য বলছ?

গোরা মেঘের মতো গর্জিয়া কহিল, "সত্যই বলছি।"

বিনয়। যারা তোমার মতো দেখতে পাচ্ছে না?

গোরা মুঠা বাঁধিয়া কহিল, "তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। এই তো আমাদের কাজ। সত্যের ছবি স্পষ্ট না দেখতে পেলে লোকে আত্মসমর্পণ করবে কোন্‌ উপছায়ার কাছে। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মূর্তিটা সবার কাছে তুলে ধরো— লোকে তা হলে পাগল হয়ে যাবে। তখন কি দ্বারে দ্বারে চাঁদা সেধে বেড়াতে হবে। প্রাণ দেবার জন্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।"

বিনয়। হয় আমাকে সংসারের দশ জনের মতো ভেসে চলে যেতে দাও, নইলে আমাকে সেই মূর্তি দেখাও।

গোরা। সাধনা করো। যদি বিশ্বাস মনে থাকে তা হলে কঠোর সাধনাতেই সুখ পাবে। আমাদের শৌখিন পেট্রিয়ট্‌দের সত্যকার বিশ্বাস

কিছুই নেই, তাই তাঁরা নিজের এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না। স্বয়ং কুবের যদি তাঁদের সেধে বর দিতে আসেন তা হলে তাঁরা বোধ হয় লাটসাহেবের চাপ্‌রাশির গিল্‌টি-করা তক্‌মাটার চেয়ে বেশি আর কিছু সাহস করে চাইতেই পারেন না। তাঁদের বিশ্বাস নেই, তাই ভরসা নেই।

বিনয়। গোরা, সকলের প্রকৃতি সমান নয়। তুমি নিজের বিশ্বাস নিজের ভিতরেই পেয়েছ, এবং নিজের আশ্রয় নিজের জোরেই খাড়া করে রাখতে পার, তাই অন্যের অবস্থা ঠিক বুঝতে পার না। আমি বলছি, তুমি আমাকে যা হয় একটা কাজে লাগিয়ে দাও, দিনরাত আমাকে খাটিয়ে নাও— নইলে তোমার কাছে যতক্ষণ থাকি মনে হয় যেন একটা কী পেলুম, তার পরে দূরে গেলে এমন কিছু হাতের কাছে পাই নে যেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি।

গোরা। কাজের কথা বলছ? এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে, যা-কিছু স্বদেশের তারই প্রতি সংকোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্বল করে ফেলেছি; আমাদের প্রত্যেকে নিজের দৃষ্টান্তে তার প্রতিকার করলে তার পর আমরা কাজ করবার ক্ষেত্রটি পাব। এখন যে-কোনো কাজ করতে চাই সে কেবল ইতিহাসের ইস্কুল-বইটি ধরে পরের কাজের নকল হয়ে ওঠে। সেই ঝুঁটো কাজে কি আমরা কখনো সত্যভাবে আমাদের সমস্ত প্রাণমন দিতে পারব। তাতে কেবল নিজেদের হীন করেই তুলব।

এমন সময় হাতে একটা হুঁকা লইয়া মৃদুমন্দ অলস ভাবে মহিম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আপিস হইতে ফিরিয়া জলযোগ সারিয়া, একটা পান মুখে দিয়া এবং গোটাছয়েক পান বাটায় লইয়া, রাস্তার ধারে বসিয়া মহিমের এই তামাক টানিবার সময়। আর-কিছুক্ষণ পরেই একটি একটি করিয়া পাড়ার বন্ধুরা জুটিবে, তখন সদর দরজার পাশের ঘরটাতে প্রমারা

খেলিবার সভা বসিবে।

মহিম ঘরে ঢুকিতেই গোরা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিম হুঁকায় টান দিতে দিতে কহিল, "ভারত-উদ্ধারে ব্যস্ত আছ, আপাতত ভাইকে উদ্ধার করো তো।"

গোরা মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিম কহিলেন, "আমাদের আপিসের নতুন যে বড়োসাহেব হয়েছে তার ডালকুত্তার মতো চেহারা— সে বেটা ভারি পাজি। সে বাবুদের বলে বেবুন; কারও মা মরে গেলে ছুটি দিতে চায় না, বলে 'মিথ্যে কথা'; কোনো মাসেই কোনো বাঙালি আমলার গোটা মাইনে পাবার জো নেই, জরিমানায় জরিমানায় একেবারে শতছিদ্র করে ফেলে। কাগজে তার নামে একটা চিঠি বেরিয়েছিল; সে বেটা ঠাউরেছে আমারই কর্ম। নেহাত মিথ্যে ঠাওরায় নি। কাজেই এখন আবার স্বনামে তার একটা কড়া প্রতিবাদ না লিখলে টিঁকতে দেবে না। তোমরা তো য়ুনিভরসিটির জলধি মন্থন করে দুই রত্ন উঠেছ; এই চিঠিখানা একটু ভালো করে লিখে দিতে হবে। ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে even-handed justice, never-failing generosity, kind courteousness ইত্যাদি ইত্যাদি।"

গোরা চুপ করিয়া রহিল। বিনয় হাসিয়া কহিল, "দাদা, অতগুলো মিথ্যা কথা এক নিশ্বাসে চালাবেন?"

মহিম। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। অনেক দিন ওদের সংসর্গ করেছি, আমার কাছে কিছুই অবিদিত নেই। ওরা যা মিথ্যা কথা জমাতে পারে সে তারিফ করতে হয়। দরকার হলে ওদের কিছু বাধে না। একজন যদি মিছে বলে তো শেয়ালের মতো আর সব-কটাই সেই এক সুরে হুক্কাহুয়া করে ওঠে; আমাদের মতো একজন আর-একজনকে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিতে চায় না। এটা নিশ্চয় জেনো ওদের ঠকালে পাপ নেই, যদি না পড়ি ধরা।

বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া মহিম টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন;

বিনয়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

মহিম কহিলেন, "তোমরা ওদের মুখের উপর সত্যি কথা বলে ওদের অপ্রতিভ করতে চাও! এমনি বুদ্ধি যদি ভগবান তোমাদের না দেবেন তবে দেশের এমন দশা হবে কেন। এটা তো বুঝতে হবে, যার গায়ের জোর আছে বাহাদুরি করে তার চুরি ধরিয়ে দিতে গেলে সে লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে না। সে উল্‌টে তার সিঁধকাটিটা তুলে পরম সাধুর মতোই হুংকার দিয়ে মারতে আসে। সত্যি কি না বলো।"

বিনয়। সত্যি বই-কি।

মহিম। তার চেয়ে মিছে কথার ঘানি থেকে বিনি পয়সায় যে তেলটুকু বেরোয় তারই এক-আধ ছটাক তার পায়ে মালিশ করে যদি বলি, 'সাধুজি, বাবা পরমহংস, দয়া করে ঝুলিটা একটু ঝাড়ো, ওর ধুলো পেলেও বেঁচে যাব', তা হলে তোমারই ঘরের মালের অন্তত একটা অংশ হয়তো তোমারই ঘরে ফিরে আসতে পারে, অথচ শান্তিভঙ্গেরও আশঙ্কা থাকে না। যদি বুঝে দেখ তো একেই বলে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌। কিন্তু, আমার ভায়া চটছে। ও হিঁদু হয়ে অবধি আমাকে দাদা বলে খুব মানে, ওর সামনে আজ আমার কথাগুলো ঠিক বড়ো ভায়ের মতো হল না। কিন্তু কী করব ভাই, মিছে কথা সম্বন্ধেও তো সত্যি কথাটা বলতে হবে। বিনয়, সেই লেখাটা কিন্তু চাই। রোসো, আমার নোট লেখা আছে, সেটা নিয়ে আসি।

বলিয়া মহিম তামাক টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গোরা বিনয়কে কহিল, "বিনু, তুমি দাদার ঘরে গিয়ে ওঁকে ঠেকাও গে। আমি লেখাটা শেষ করে ফেলি।"

৫

"ওগো শুনছ? আমি তোমার পুজোর ঘরে ঢুকছি নে, ভয় নেই। আহ্নিক শেষ হলে একবার ও ঘরে যেয়ো; তোমার সঙ্গে কথা আছে। দুজন

নূতন সন্ন্যাসী যখন এসেছে তখন কিছুকাল তোমার আর দেখা পাব না জানি, সেইজন্যে বলতে এলুম। ভুলো না, একবার যেয়ো।"

এই বলিয়া আনন্দময়ী ঘর-করনার কাজে ফিরিয়া গেলেন।

কৃষ্ণদয়ালবাবু শ্যামবর্ণ দোহারা গোছের মানুষ, মাথায় বেশি লম্বা নহেন। মুখের মধ্যে বড়ো বড়ো দুইটা চোখ সব চেয়ে চোখে পড়ে, বাকি প্রায় সমস্তই কাঁচাপাকা গোঁফে দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। ইনি সর্বদাই গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত্র পরিয়া আছেন, হাতের কাছে পিতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম। মাথার সামনের দিকে টাক পড়িয়া আসিতেছে, বাকি বড়ো বড়ো চুল গ্রন্থি দিয়া মাথার উপরে একটা চূড়া করিয়া বাঁধা।

একদিন পশ্চিমে থাকিতে ইনি পল্‌টনের গোরাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ-মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। তখন দেশের পূজারী পুরোহিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এখন না-মানেন এমন জিনিস নাই। নূতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার কাছে নূতন সাধনার পন্থা শিখিতে বসিয়া যান। মুক্তির নিগূঢ় পথ এবং যোগের নিগূঢ় প্রণালীর জন্য ইঁহার লুব্ধতার অবধি নাই। তান্ত্রিক সাধনা অভ্যাস করিবেন বলিয়া কৃষ্ণদয়াল কিছুদিন উপদেশ লইতেছিলেন, এমন সময় একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের সন্ধান পাইয়া সম্প্রতি তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ইঁহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া যখন মারা যান তখন ইঁহার বয়স তেইশ বছর। মাতার মৃত্যুর কারণ বলিয়া, রাগ করিয়া ছেলেটিকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া কৃষ্ণদয়াল প্রবল বৈরাগ্যের ঝোঁকে একেবারে পশ্চিমে চলিয়া যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই কাশীবাসী সার্বভৌম মহাশয়ের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন।

পশ্চিমে কৃষ্ণদয়াল চাকরির জোগাড় করিলেন এবং মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে সার্বভৌমের মৃত্যু হইল; অন্য কোনো অভিভাবক না থাকাতে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়াই রাখিতে হইল।

ইতিমধ্যে যখন সিপাহিদের ম্যুটিনি বাধিল সেই সময় কৌশলে দুই-একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিয়া ইনি যশ এবং জায়গির লাভ করেন। ম্যুটিনির কিছুকাল পরেই কাজ ছাড়িয়া দিলেন এবং নবজাত গোরাকে লইয়া কিছুদিন কাশীতে কাটাইলেন। গোরার বয়স যখন বছর পাঁচেক হইল তখন কৃষ্ণদয়াল কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বড়ো ছেলে মহিমকে তাহার মামার বাড়ি হইতে নিজের কাছে আনাইয়া মানুষ করিলেন। *এখন মহিম পিতার মুরুব্বিদের অনুগ্রহে সরকারি খাতাঞ্জিখানায় খুব তেজের সঙ্গে কাজ চালাইতেছে।*

গোরা শিশুকাল হইতেই তাহার পাড়ার এবং ইস্কুলের ছেলেদের সর্দারি করিত। মাস্টার-পণ্ডিতের জীবন অসহ্য করিয়া তোলাই তাহার প্রধান কাজ এবং আমোদ ছিল। একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' আওড়াইয়া, ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করিয়া, ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন এক সময় ছাত্রসভার ডিম্ব ভেদ করিয়া গোরা বয়স্কসভায় কাকলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল তখন কৃষ্ণদয়ালবাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইল।

বাহিরের লোকের কাছে গোরার প্রতিপত্তি দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল; কিন্তু ঘরে কাহারও কাছে সে বড়ো আমল পাইল না। মহিম তখন চাকরি করে— সে গোরাকে কখনো বা 'পেট্রিয়ট-জেঠা' কখনো বা 'হরিশ মুখুজ্জে দি সেকেণ্ড্' বলিয়া নানাপ্রকারে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তখন দাদার সঙ্গে গোরার প্রায় মাঝে মাঝে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত। আনন্দময়ী গোরার ইংরেজ-বিদ্বেষে মনে মনে অত্যন্ত উদ্‌বেগ অনুভব করিতেন; তাহাকে নানাপ্রকারে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোনো ফলই হইত না। গোরা রাস্তায় ঘাটে কোনো সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।

এ দিকে কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি

বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ; আবার এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এমন-কি, গোরা তাঁহার ঘরে গেলেও তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। গুটি দুই-তিন ঘর লইয়া তিনি নিজের মহল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। ঘটা করিয়া সেই মহলের দ্বারের কাছে 'সাধনাশ্রম' নাম লিখিয়া কাষ্ঠফলক লট্‌কাইয়া দিলেন।

বাপের এই কাণ্ডকারখানায় গোরার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'আমি এ-সমস্ত মূঢ়তা সহ্য করিতে পারি না— এ আমার চক্ষুশূল।' এই উপলক্ষে গোরা তাহার বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, আনন্দময়ী তাহাকে কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বাপের কাছে যে-সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমাগম হইতে লাগিল গোরা জো পাইলেই তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বাধাইয়া দিত। সে তো তর্ক নয়, প্রায় ঘুষি বলিলেই হয়। তাঁহাদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য অতি যৎসামান্য এবং অর্থলোভ অপরিমিত ছিল ; গোরাকে তাঁহারা পারিয়া উঠিতেন না, তাহাকে বাঘের মতো ভয় করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি গোরার শ্রদ্ধা জন্মিল।

বেদান্তচর্চা করিবার জন্য বিদ্যাবাগীশকে কৃষ্ণদয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোরা প্রথমেই ইঁহার সঙ্গে উদ্ধতভাবে লড়াই করিতে গিয়া দেখিল, লড়াই চলে না। লোকটি যে কেবল পণ্ডিত তাহা নয়, তাঁহার মতের ঔদার্য অতি আশ্চর্য। কেবল সংস্কৃত পড়িয়া এমন তীক্ষ্ণ অথচ প্রশস্ত বুদ্ধি যে হইতে পারে, গোরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না। বিদ্যাবাগীশের চরিত্রে ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ এমন একটি অবিচলিত ধৈর্য ও গভীরতা ছিল যে, তাঁহার কাছে নিজেকে সংযত না করা গোরার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরচন্দ্রের কাছে গোরা বেদান্তদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। গোরা কোনো কাজ আধাআধি রকম করিতে পারে না, সুতরাং দর্শন-আলোচনার মধ্যে সে একেবারে তলাইয়া গেল।

ঘটনাক্রমে এই সময়ে একজন ইংরেজ মিশনারি কোনো সংবাদপত্রে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজকে আক্রমণ করিয়া দেশের লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। গোরা তো একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। যদিচ সে নিজে অবকাশ পাইলেই শাস্ত্র ও লোকাচারের নিন্দা করিয়া বিরুদ্ধ মতের লোককে যত রকম করিয়া পারে পীড়া দিত, তবু হিন্দুসমাজের প্রতি বিদেশী লোকের অবজ্ঞা তাহাকে যেন অঙ্কুশে আহত করিয়া তুলিল।

সংবাদপত্রে গোরা লড়াই শুরু করিল। অপর পক্ষে হিন্দুসমাজকে যতগুলি দোষ দিয়াছিল গোরা তাহার একটাও এবং একটুও স্বীকার করিল না। দুই পক্ষে অনেক উত্তর চালাচালি হইলে পর সম্পাদক বলিলেন, 'আমরা আর বেশি চিঠিপত্র ছাপিব না।'

কিন্তু, গোরার তখন রোখ চড়িয়া গেছে। সে 'হিণ্ডুয়িজ্‌ম্‌' নাম দিয়া ইংরেজিতে এক বই লিখিতে লাগিল; তাহাতে তাহার সাধ্যমত সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্র ঘাঁটিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বসিয়া গেল।

এমনি করিয়া মিশনারির সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া গোরা আস্তে আস্তে নিজের ওকালতির কাছে নিজে হার মানিল। গোরা বলিল, 'আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামির মতো খাড়া করিয়া বিদেশীর আইনমতে তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না। বিলাতের আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না। যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার বিশ্বাস শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।'

এই বলিয়া গোরা গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিল, টিকি রাখিল, খাওয়া-ছোঁওয়া সম্বন্ধে বিচার করিয়া চলিল। এখন হইতে প্রত্যহ সকাল-বেলায় সে বাপ-মায়ের পায়ের ধুলা লয়; যে মহিমকে সে কথায় কথায়

ইংরেজি ভাষায় 'ক্যাড' ও 'স্নব' বলিয়া অভিহিত করিতে ছাড়িত না তাহাকে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রণাম করে— মহিম এই হঠাৎ-ভক্তি লইয়া তাহাকে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, কিন্তু গোরা তাহার কোনো জবাব করে না।

গোরা তাহার উপদেশে ও আচরণে দেশের একদল লোককে যেন জাগাইয়া দিল। তাহারা যেন একটা টানাটানির হাত হইতে বাঁচিয়া গেল ; হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, 'আমরা ভালো কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য, তাহা লইয়া জবাবদিহি কারও কাছে করিতে চাই না— কেবল আমরা ষোলো আনা অনুভব করিতে চাই যে আমরা আমরাই।'

কিন্তু, কৃষ্ণদয়াল গোরার এই নূতন পরিবর্তনে যে খুশি হইলেন তাহা মনে হইল না। এমন-কি, তিনি একদিন গোরাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখো বাবা, হিন্দুশাস্ত্র বড়ো গভীর জিনিস। ঋষিরা যে ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তা তলিয়ে বোঝা যে-সে লোকের কর্ম নয়। আমার বিবেচনায়, না বুঝে এ নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভালো। তুমি ছেলেমানুষ, বরাবর ইংরেজি পড়ে মানুষ হয়েছ, তুমি যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকেছিলে সেটা তোমার ঠিক অধিকারের মতোই কাজ করেছিলে। সেইজন্যেই আমি তাতে কিছুই রাগ করি নি, বরঞ্চ খুশিই ছিলুম। কিন্তু, এখন তুমি যে পথে চলেছ এটা ঠিক ভালো ঠেকছে না। এ তোমার পথই নয়।"

গোরা কহিল, "বলেন কী বাবা! আমি যে হিন্দু। হিন্দুধর্মের গূঢ় মর্ম আজ না বুঝি তো কাল বুঝব ; কোনোকালে যদি না বুঝি তবু এই পথে চলতেই হবে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে পূর্বজন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারি নি বলেই তো এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, এমনি করেই জন্মে জন্মে এই হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের ভিতর দিয়েই অবশেষে এর চরমে উত্তীর্ণ হব। যদি কখনো ভুলে অন্য পথের দিকে একটু হেলি আবার দ্বিগুণ জোরে ফিরতেই হবে।"

কৃষ্ণদয়াল কেবলই মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "কিন্তু, বাবা, হিন্দু বললেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খৃস্টান যে-সে হতে পারে— কিন্তু হিন্দু!— বাস্ রে! ও বড়ো শক্ত কথা।"

গোরা। সে তো ঠিক। কিন্তু, আমি যখন হিন্দু হয়ে জন্মেছি তখন তো সিংহদ্বার পার হয়ে এসেছি। এখন ঠিকমত সাধন করে গেলেই অল্পে অল্পে এগোতে পারব।

কৃষ্ণদয়াল। বাবা, তর্কে তোমাকে ঠিকটি বোঝাতে পারব না, তবে তুমি যা বলছ সেও সত্য। যার যেটা কর্মফল, নির্দিষ্ট ধর্ম, তাকে একদিন ঘুরে ফিরে সেই ধর্মের পথেই আসতে হবে— কেউ আটকাতে পারবে না। ভগবানের ইচ্ছে। আমরা কী করতে পারি। আমরা তো উপলক্ষ।

কর্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোঽহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব, সমস্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান ভাবে গ্রহণ করেন; পরস্পরের মধ্যে যে কোনো-প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে তাহা অনুভবমাত্র করেন না।

৬

আজ আহ্নিক ও স্নানাহার সারিয়া কৃষ্ণদয়াল অনেক দিন পরে আনন্দময়ীর ঘরের মেজের উপর নিজের কম্বলের আসনটি পাতিয়া সাবধানে চারি দিকের সমস্ত সংস্রব হইতে যেন বিবিক্ত হইয়া খাড়া হইয়া বসিলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন, "ওগো, তুমি তো তপস্যা করছ, ঘরের কথা কিছু ভাব না, কিন্তু আমি যে গোরার জন্যে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে গেলুম।"

কৃষ্ণদয়াল। কেন, ভয় কিসের।

আনন্দময়ী। তা আমি ঠিক বলতে পারি নে। কিন্তু, আমার যেন মনে হচ্ছে, গোরা আজকাল এই-যে হিঁদুয়ানি আরম্ভ করেছে এ ওকে কখনোই সইবে না, এ ভাবে চলতে গেলে শেষকালে একটা কী বিপদ ঘটবে। আমি তো তোমাকে তখনই বলেছিলুম, ওর পইতে দিয়ো না। তখন যে তুমি কিছুই মানতে না; বললে, গলায় একগাছা সুতো পরিয়ে দিলে তাতে কারও কিছু আসে যায় না। কিন্তু, শুধু তো সুতো নয়, এখন ওকে ঠেকাবে কোথায়।

কৃষ্ণদয়াল। বেশ! সব দোষ বুঝি আমার! গোড়ায় তুমি যে ভুল করলে। তুমি যে ওকে কোনোমতেই ছাড়তে চাইলে না। তখন আমিও গোঁয়ারগোছের ছিলুম, ধর্মকর্ম কোনো কিছুর তো জ্ঞান ছিল না। এখন হলে কি এমন কাজ করতে পারতুম।

আনন্দময়ী। কিন্তু যাই বল, আমি যে কিছু অধর্ম করেছি সে আমি কোনোমতে মানতে পারব না। তোমার তো মনে আছে, ছেলে হবার জন্যে আমি কী না করেছি— যে যা বলেছে তাই শুনেছি— কত মাদুলি, কত মন্তর নিয়েছি সে তো তুমি জানই। একদিন স্বপ্নে দেখলুম, যেন সাজি ভরে টগর ফুল নিয়ে এসে ঠাকুরের পুজো করতে বসেছি— এক সময় চেয়ে দেখি সাজিতে ফুল নেই, ফুলের মতো ধব্‌ধবে একটি ছোট্ট ছেলে! আহা, সে কী দেখেছিলুম, সে কী বলব। আমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল ; তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিতে যাব আর ঘুম ভেঙে গেল। তার দশ দিন না যেতেই তো গোরাকে পেলুম— সে আমার ঠাকুরের দান— সে কি আর কারও যে আমি কাউকে ফিরিয়ে দেব। আর-জন্মে তাকে গর্ভে ধারণ করে বোধ হয় অনেক কষ্ট পেয়েছিলুম তাই আজ সে আমাকে 'মা' বলতে এসেছে। কেমন করে কোথা থেকে সে এল ভেবে দেখো দেখি। চারি দিকে তখন মারামারি কাটাকাটি, নিজের প্রাণের ভয়েই মরি, সেই সময় রাত-দুপুরে সেই মেম যখন আমাদের বাড়িতে এসে লুকোল তুমি তো তাকে ভয়ে বাড়িতে রাখতেই চাও না— আমি তোমাকে ভাঁড়িয়ে তাকে গোয়ালঘরে লুকিয়ে রাখলুম। সেই রাত্রেই ছেলেটি প্রসব করে সে তো মারা গেল। সেই বাপ-মা-মরা ছেলেকে আমি যদি না বাঁচাতুম তো সে কি বাঁচত। তোমার কী। তুমি তো পাদ্রির হাতে ওকে দিতে চেয়েছিলে। কেন, পাদ্রিকে দিতে যাব কেন। পাদ্রি কি ওর মা বাপ, না ওর প্রাণরক্ষা করেছে? এমন করে যে ছেলে পেয়েছি সে কি গর্ভে পাওয়ার চেয়ে কম। তুমি যাই বল, এ ছেলে যিনি আমাকে দিয়েছেন তিনি স্বয়ং যদি না নেন তবে প্রাণ গেলেও আর-কাউকে নিতে দিচ্ছি নে।

কৃষ্ণদয়াল। সে তো জানি। তা, তোমার গোরাকে নিয়ে তুমি থাকো, আমি তো কখনো তাতে কোনো বাধা দিই নি। কিন্তু, ওকে ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে তার পরে ওর পইতে না দিলে তো সমাজে মানবে না। তাই পইতে কাজেই দিতে হল। এখন কেবল দুটি কথা ভাববার আছে। ন্যায়ত আমার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত মহিমেরই প্রাপ্য— তাই—

আনন্দময়ী। কে তোমার বিষয়সম্পত্তির অংশ নিতে চায়। তুমি যত টাকা করেছ সব তুমি মহিমকে দিয়ে যেয়ো, গোরা তার এক পয়সাও নেবে না। ও পুরুষমানুষ, লেখাপড়া শিখেছে, নিজে খেটে উপার্জন করে খাবে; ও পরের ধনে ভাগ বসাতে যাবে কেন। ও বেঁচে থাক্, সেই আমার ঢের; আমার আর কোনো সম্পত্তির দরকার নেই।

কৃষ্ণদয়াল। না, ওকে একেবারে বঞ্চিত করব না, জায়গিরটা ওকেই দিয়ে দেব; কালে তার মুনফা বছরে হাজার টাকা হতে পারবে। এখন ভাবনার কথা হচ্ছে ওর বিবাহ দেওয়া নিয়ে। পূর্বে যা করেছি তা করেছি, কিন্তু এখন তো হিন্দুমতে ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়ে দিতে পারব না— তা, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর।

আনন্দময়ী। হায় হায়, তুমি মনে কর, তোমার মতো পৃথিবীময় গঙ্গাজল আর গোবর ছিটিয়ে বেড়াই নে বলে আমার ধর্মজ্ঞান নেই! ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়েই বা দেব কেন, আর রাগ করবই বা কী জন্যে।

কৃষ্ণদয়াল। বল কী! তুমি যে বামুনের মেয়ে।

আনন্দময়ী। তা হই-না বামুনের মেয়ে। বামনাই করা তো আমি ছেড়েই দিয়েছি। ওই তো মহিমের বিয়ের সময় আমার খৃস্টানি চাল ব'লে কুটুম্বরা গোল করতে চেয়েছিল; আমি তাই ইচ্ছে করেই তফাত হয়ে ছিলুম, কথাটি কই নি। পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাকে খৃস্টান বলে, আরও কত কী কথা কয়— আমি সমস্ত মেনে নিয়েই বলি, 'তা খৃস্টান কি মানুষ নয়। তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের এত আদরের, তবে তিনি একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খৃস্টানের পায়ে এমন

করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছেন কেন।'

কৃষ্ণদয়াল। ও-সব অনেক কথা, তুমি মেয়েমানুষ সে-সব বুঝবে না। কিন্তু, সমাজ একটা আছে সেটা তো বোঝ, সেটা তোমার মেনে চলাই উচিত।

আনন্দময়ী। আমার বুঝে কাজ নেই। আমি এই বুঝি যে, গোরাকে আমি যখন ছেলে বলে মানুষ করেছি তখন আচারবিচারের ভড়ং করতে গেলে সমাজ থাক্ আর না থাক্ ধর্ম থাকবে না। আমি কেবল সেই ধর্মের ভয়েই কোনোদিন কিছু লুকোই নে— আমি যে কিছু মানছি নে, সে সকলকেই জানতে দিই আর সকলেরই ঘৃণা কুড়িয়ে চুপ করে পড়ে থাকি। কেবল একটি কথাই লুকিয়েছি তারই জন্যে ভয়ে ভয়ে সারা হয়ে গেলুম ঠাকুর কখন কী করেন। দেখো, আমার মনে হয়, গোরাকে সকল কথা বলে ফেলি, তার পরে অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।

কৃষ্ণদয়াল ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, আমি বেঁচে থাকতে কোনোমতেই সে হতে পারবে না। গোরাকে তো জানই। এ কথা শুনলে সে কী যে করে বসবে, তা কিছুই বলা যায় না। তার পরে সমাজে একটা হুলস্থূল পড়ে যাবে। শুধু তাই? এ দিকে গবর্মেণ্ট্ কী করে তাও বলা যায় না। যদিও গোরার বাপ লড়াইয়ে মারা গেছে, ওর মাও তো মরেছে জানি, কিন্তু সব হাঙ্গামা চুকে গেলে ম্যাজেস্টরিতে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এখন এই নিয়ে যদি একটা গোলমাল উঠে পড়ে তা হলে আমার সাধন-ভজন সমস্ত মাটি হবে, আরও কী বিপদ ঘটে বলা যায় না।

আনন্দময়ী নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণদয়াল কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "গোরার বিবাহ সম্বন্ধে আমি একটা পরামর্শ মনে মনে করেছি। পরেশ ভট্চাজ আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত। সে স্কুল ইন্স্পেক্টরি কাজে পেনশন নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে। সে ঘোর ব্রাহ্ম। শুনেছি, তার ঘরে অনেকগুলি মেয়েও আছে। গোরাকে তার বাড়িতে যদি ভিড়িয়ে দেওয়া যায় তবে যাতায়াত করতে করতে পরেশের কোনো মেয়েকে তার

পছন্দ হয়ে যেতেও পারে। তার পরে প্রজাপতির নির্বন্ধ।"

আনন্দময়ী। বল কী! গোরা ব্রাহ্মর বাড়ি যাতায়াত করবে! সেদিন ওর আর নেই।

বলিতে বলিতে স্বয়ং গোরা তাহার মেঘমন্দ্র স্বরে 'মা' বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণদয়ালকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গোরার কাছে গিয়া দুই চক্ষে স্নেহ বিকীর্ণ করিতে করিতে কহিলেন, "কী বাবা, কি চাই।"

"না বিশেষ কিছু না, এখন থাক্" বলিয়া গোরা ফিরিবার উপক্রম করিল।

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "একটু বোসো, একটা কথা আছে। আমার একটি ব্রাহ্মবন্ধু সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন; তিনি হেদোতলায় থাকেন।"

গোরা। পরেশবাবু নাকি।

কৃষ্ণদয়াল। তুমি তাঁকে জানলে কী করে।

গোরা। বিনয় তাঁর বাড়ির কাছেই থাকে, তার কাছে তাঁদের গল্প শুনেছি।

কৃষ্ণদয়াল। আমি ইচ্ছা করি, তুমি তাঁদের খবর নিয়ে এসো।

গোরা আপন মনে একটু চিন্তা করিল, তার পরে হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা, আমি কালই যাব।"

আনন্দময়ী কিছু আশ্চর্য হইলেন।

গোরা একটু ভাবিয়া আবার কহিল, "না, কাল তো আমার যাওয়া হবে না।"

কৃষ্ণদয়াল। কেন।

গোরা। কাল আমাকে ত্রিবেণী যেতে হবে।

কৃষ্ণদয়াল আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "ত্রিবেণী!"

গোরা। কাল সূর্যগ্রহণের স্নান।

আনন্দময়ী। তুই অবাক করলি গোরা। স্নান করতে চাস কলকাতার গঙ্গা আছে। ত্রিবেণী না হলে তোর স্নান হবে না— তুই যে দেশসুদ্ধ সকল

লোককে ছাড়িয়ে উঠলি।

গোরা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সংকল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত সংকোচ, সমস্ত পূর্বসংস্কার, সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার।'

৭

ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল, রাত্রির মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে। সকালবেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মতো নির্মল হইয়া ফুটিয়াছে। দুই-একটা সাদা মেঘ নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া আর-একটি নির্মল প্রভাতের স্মৃতিতে যখন সে পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল এমন সময় দেখিল, পরেশ এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে সতীশের হাত ধরিয়া রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। সতীশ বিনয়কে বারান্দায় দেখিতে পাইয়াই হাততালি দিয়া 'বিনয়বাবু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরেশও মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিনয়কে দেখিতে পাইলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি নীচে যেমন নামিয়া আসিল সতীশকে লইয়া পরেশও তাহার বাসার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সতীশ বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "বিনয়বাবু, আপনি যে সেদিন বললেন, আমাদের বাড়িতে যাবেন, কই, গেলেন না তো?"

বিনয় সস্নেহে সতীশের পিঠে হাত দিয়া হাসিতে লাগিল। পরেশ সাবধানে তাঁহার লাঠিগাছটি টেবিলের গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া চৌকিতে বসিলেন ও কহিলেন, "সেদিন আপনি না থাকলে আমাদের ভারি মুশকিল হত। বড়ো উপকার করেছেন।"

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কী বলেন, কীই-বা করেছি।"

সতীশ হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বিনয়বাবু, আপনার কুকুর নেই?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "কুকুর? না, কুকুর নেই।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কুকুর রাখেন নি কেন।"

বিনয় কহিল, "কুকুরের কথাটা কখনো মনে হয় নি।"

পরেশ কহিলেন, "শুনলুম, সেদিন সতীশ আপনার এখানে এসেছিল, খুব বোধ হয় বিরক্ত করে গেছে। ও এত বকে যে, ওর দিদি ওকে বক্তিয়ার খিলিজি নাম দিয়েছে।"

বিনয় কহিল, "আমিও খুব বকতে পারি, তাই আমাদের দুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে। কী বল, সতীশবাবু!"

সতীশ এ কথার কোনো উত্তর দিল না; কিন্তু পাছে তাহার নূতন নামকরণ লইয়া বিনয়ের কাছে তাহার গৌরবহানি হয় সেইজন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এবং কহিল, "বেশ তো, ভালোই তো। বক্তিয়ার খিলিজি ভালোই তো। আচ্ছা, বিনয়বাবু, বক্তিয়ার খিলিজি তো লড়াই করেছিল? সে তো বাংলাদেশ জিতে নিয়েছিল?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "আগে সে লড়াই করত, এখন আর লড়াইয়ের দরকার হয় না, এখন সে শুধু বক্তৃতা করে। আর বাংলাদেশ জিতেও নেয়।"

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। পরেশ সকলের চেয়ে কম কথা কহিয়াছিলেন; তিনি কেবল প্রসন্ন শান্ত মুখে মাঝে মাঝে হাসিয়াছেন এবং দুটো-একটা কথায় যোগ দিয়াছেন। বিদায় লইবার সময় চৌকি হইতে

উঠিয়া বলিলেন, “আমাদের আটাত্তর নম্বরের বাড়িটা এখান থেকে বরাবর ডান-হাতি গিয়ে—”

সতীশ কহিল, “উনি আমাদের বাড়ি জানেন। উনি যে সেদিন আমার সঙ্গে বরাবর আমাদের দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলেন।”

এ কথায় লজ্জা পাইবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু বিনয় মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিল। যেন কী-একটা তাহার ধরা পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ কহিলেন, “তবে তো আপনি আমাদের বাড়ি জানেন। তা হলে যদি কখনো আপনার—”

বিনয়। সে আর বলতে হবে না— যখনই—

পরেশ। আমাদের এ তো একই পাড়া, কেবল কলকাতা বলেই এতদিন চেনাশোনা হয় নি।

বিনয় রাস্তা পর্যন্ত পরেশকে পৌঁছাইয়া দিল। দ্বারের কাছে কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন, আর সতীশ ক্রমাগত বকিতে বকিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল, ‘পরেশবাবুর মতো এমন বৃদ্ধ দেখি নাই, পায়ের ধুলা লইতে ইচ্ছা করে। আর, সতীশ ছেলেটি কী চমৎকার। বাঁচিয়া থাকিলে এ একজন মানুষ হইবে— যেমন বুদ্ধি, তেমনি সরলতা।’

এই বৃদ্ধ এবং বালকটি যতই ভালো হোক, এত অল্পক্ষণের পরিচয়ে তাহাদের সম্বন্ধে এতটা পরিমাণে ভক্তি ও স্নেহের উচ্ছ্বাস সাধারণত সম্ভবপর হইতে পারিত না। কিন্তু, বিনয়ের মনটা এমন অবস্থায় ছিল যে, সে অধিক পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে নাই।

তাহার পরে বিনয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘পরেশবাবুর বাড়িতে যাইতেই হইবে, নহিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে না।’

কিন্তু, গোরার মুখ দিয়া তাহাদের দলের ভারতবর্ষ তাহাকে বলিতে লাগিল, ‘ওখানে তোমার যাতায়াত চলিবে না। খবরদার!’

বিনয় পদে পদে তাহাদের দলের ভারতবর্ষের অনেক নিষেধ মানিয়াছে।

অনেক সময় দ্বিধা বোধ করিয়াছে, তবু মানিয়াছে। আজ তাহার মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ভারতবর্ষ যেন কেবল নিষেধেরই মূর্তি।

চাকর আসিয়া খবর দিল, আহার প্রস্তুত— কিন্তু এখনো বিনয়ের স্নানও হয় নাই। বারোটা বাজিয়া গেছে। হঠাৎ এক সময়ে বিনয় সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া কহিল, "আমি খাব না, তোরা যা।" বলিয়া ছাতা ঘাড়ে করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল ; একটা চাদরও কাঁধে লইল না।

বরাবর গোরাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিনয় জানিত, আমহার্স্ট্ স্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া হিন্দুহিতৈষীর আপিস বসিয়াছে। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গোরা আপিসে গিয়া সমস্ত বাংলাদেশে তাহার দলের লোক যেখানে যে আছে সবাইকে পত্র লিখিয়া জাগ্রত করিয়া রাখে। এই-খানেই তাহার ভক্তরা তাহার মুখে উপদেশ শুনিতে আসে এবং তাহার সহকারিতা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে।

সেদিনও গোরা সেই আপিসের কাজে গিয়াছিল। বিনয় একেবারে যেন দৌড়িয়া অন্তঃপুরে আনন্দময়ীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দময়ী তখন ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন এবং লছমিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহাকে পাখা করিতেছিল।

আনন্দময়ী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "কী রে বিনয়, কী হয়েছে তোর।"

বিনয় তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "মা, বড়ো খিদে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও।"

আনন্দময়ী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তবেই তো মুশকিলে ফেললি। বামুন ঠাকুর চলে গেছে— তোরা যে আবার—"

বিনয় কহিল, "আমি কি বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে এলুম। তা হলে আমার বাসার বামুন কী দোষ করলে। আমি তোমার পাতের প্রসাদ খাব মা। লছমিয়া, দে তো আমাকে এক গ্লাস জল এনে।"

লছমিয়া জল আনিয়া দিতেই বিনয় ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল।

তখন আনন্দময়ী আর-একটা থালা আনাইয়া নিজের পাতের ভাত সস্নেহে সযত্নে মাখিয়া সেই থালে তুলিয়া দিতে থাকিলেন এবং বিনয় বহুদিনের বুভুক্ষুর মতো তাহাই খাইতে লাগিল।

আনন্দময়ীর মনের একটা বেদনা আজ দূর হইল। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া বিনয়েরও বুকের একটা বোঝা যেন নামিয়া গেল। আনন্দময়ী বালিশের খোল সেলাই করিতে বসিয়া গেলেন; কেয়াখয়ের তৈরি করিবার জন্য পাশের ঘরে কেয়াফুল জড়ো হইয়াছিল তাহারই গন্ধ আসিতে লাগিল; বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের কাছে ঊর্ধ্বোত্থিত একটা হাতে মাথা রাখিয়া আধশোওয়া রকমে পড়িয়া রহিল এবং পৃথিবীর আর সমস্ত ভুলিয়া ঠিক সেই আগেকার দিনের মতো আনন্দে বকিয়া যাইতে লাগিল।

৮

এই একটা বাঁধ ভাঙিয়া যাইতেই বিনয়ের হৃদয়ের নূতন বন্যা আরও যেন উদ্দাম হইয়া উঠিল। আনন্দময়ীর ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া সে যেন একেবারে উড়িয়া চলিল; মাটির স্পর্শ তাহার যেন পায়ে ঠেকিল না; তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, মনের যে কথাটা লইয়া সে এ কয়দিন সংকোচে পীড়িত হইয়াছে তাহাই আজ মুখ তুলিয়া সকলের কাছে ঘোষণা করিয়া দেয়।

বিনয় যে মুহূর্তে ৭৮ নম্বরের দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল ঠিক সেই সময়েই পরেশও বিপরীত দিক দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"আসুন আসুন, বিনয়বাবু, বড়ো খুশি হলুম।" এই বলিয়া পরেশ বিনয়কে তাঁহার রাস্তার ধারের বসিবার ঘরটাতে লইয়া গিয়া বসাইলেন। একটি ছোটো টেবিল, তাহার এক ধারে পিঠওয়ালা বেঞ্চি, অন্য ধারে একটা কাঠের ও বেতের চৌকি; দেয়ালে এক দিকে যিশুখৃস্টের একটি রঙকরা ছবি এবং অন্য দিকে কেশববাবুর ফোটোগ্রাফ। টেবিলের উপরে দুই-চারি দিনের খবরের কাগজ ভাঁজ করা, তাহার উপরে সীসার কাগজ-চাপা। কোণে একটি ছোটো

আল্‌মারি, তাহার উপরের থাকে থিয়োডোর পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। আল্‌মারির মাথার উপরে একটি গ্লোব কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে।

বিনয় বসিল। তাহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ; মনে হইতে লাগিল, তাহার পিঠের দিকের খোলা দরজা দিয়া যদি কেহ ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে।

পরেশ কহিলেন, "সোমবারে সুচরিতা আমার একটি বন্ধুর মেয়েকে পড়াতে যায় ; সেখানে সতীশের একটি সমবয়সি ছেলে আছে, তাই সতীশও তার সঙ্গে গেছে। আমি তাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি। আর একটু দেরি হলেই তো আপনার সঙ্গে দেখা হত না।"

খবরটা শুনিয়া বিনয় একই কালে একটা আশাভঙ্গের খোঁচা এবং আরাম মনের মধ্যে অনুভব করিল। পরেশের সঙ্গে তাহার কথাবার্তা দিব্য সহজ হইয়া আসিল।

গল্প করিতে করিতে একে একে পরেশ আজ বিনয়ের সমস্ত খবর জানিতে পারিলেন। বিনয়ের বাপ-মা নাই ; খুড়িমাকে লইয়া খুড়া দেশে থাকিয়া বিষয়কর্ম দেখেন। তাহার খুড়তুতো দুই ভাই তাহার সঙ্গে এক বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত ; বড়োটি উকিল হইয়া তাহাদের জেলা কোর্টে ব্যবসায় চালাইতেছে, ছোটোটি কলিকাতায় থাকিতেই ওলাউঠা হইয়া মারা গিয়াছে। খুড়ার ইচ্ছা, বিনয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটির চেষ্টা করে, কিন্তু বিনয় কোনো চেষ্টাই না করিয়া নানা বাজে কাজে নিযুক্ত আছে।

এমনি করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বিনা প্রয়োজনে আর বেশিক্ষণ থাকিলে অভদ্রতা হয়, তাই বিনয় উঠিয়া পড়িল ; কহিল, "বন্ধু সতীশের সঙ্গে আমার দেখা হল না, দুঃখ রইল ; তাকে খবর দেবেন, আমি এসেছিলুম।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আর-একটু বসলেই তাদের সঙ্গে দেখা হত। তাদের ফেরবার আর বড়ো দেরি নেই।"

এই কথাটুকুর উপরে নির্ভর করিয়া আবার বসিয়া পড়িতে বিনয়ের লজ্জা বোধ হইল। আর-একটু পীড়াপীড়ি করিলে সে বসিতে পারিত ; কিন্তু পরেশ অধিক কথা বলিবার বা পীড়াপীড়ি করিবার লোক নহেন, সুতরাং বিদায় লইতে হইল। পরেশ বলিলেন, "আপনি মাঝে মাঝে এলে খুশি হব।"

রাস্তায় বাহির হইয়া বিনয় বাড়ির দিকে ফিরিবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করিল না। সেখানে কোনো কাজ নাই। বিনয় কাগজে লিখিয়া থাকে ; তাহার ইংরেজি লেখার সকলে খুব তারিফ করে। কিন্তু গত কয়দিন হইতে, লিখিতে বসিলে লেখা মাথায় আসে না। টেবিলের সামনে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাই দায় ; মন ছট্‌ফট করিয়া উঠে। বিনয় তাই আজ বিনা কারণেই উলটা দিকে চলিল।

দু পা যাইতেই একটি বালককণ্ঠের চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইল, "বিনয়-বাবু, বিনয়বাবু।"

মুখ তুলিয়া দেখিল, একটি ভাড়াটে গাড়ির দরজার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সতীশ তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছে। গাড়ির ভিতরের আসনে খানিকটা শাড়ি, খানিকটা সাদা জামার আস্তিন, যেটুকু দেখা গেল তাহাতে আরোহীটি যে কে তাহা বুঝিতে কোনো সন্দেহ রহিল না।

বাঙালি ভদ্রতার সংস্কার অনুসারে গাড়ির দিকে দৃষ্টি রক্ষা করা বিনয়ের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সেইখানেই গাড়ি হইতে নামিয়া সতীশ আসিয়া তাহার হাত ধরিল ; কহিল, "চলুন, আমাদের বাড়ি।".

বিনয় কহিল, "আমি যে তোমাদের বাড়ি থেকে এখনি আসছি।"

সতীশ। বা, আমরা যে ছিলুম না, আবার চলুন।

সতীশের পীড়াপীড়ি বিনয় অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। বন্দীকে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সতীশ উচ্চস্বরে কহিল, "বাবা, বিনয়বাবুকে এনেছি।"

বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "শক্ত হাতে ধরা পড়েছেন, শীঘ্র ছাড়া পাবেন না। সতীশ তোর দিদিকে ডেকে দে।"

বিনয় ঘরে আসিয়া বসিল, তাহার হৃৎপিণ্ড বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। পরেশ কহিলেন, "হাঁপিয়ে পড়েছেন বুঝি! সতীশ ভারি দুরন্ত ছেলে।"

ঘরে যখন সতীশ তাহার দিদিকে লইয়া প্রবেশ করিল তখন বিনয় প্রথমে একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল; তাহার পরে শুনিল পরেশবাবু বলিতেছেন, "রাধে, বিনয়বাবু এসেছেন। এঁকে তো তুমি জানই।"

বিনয় চকিতের মতো মুখ তুলিয়া দেখিল, সুচরিতা তাহাকে নমস্কার করিয়া সামনের চৌকিতে বসিল। এবার বিনয় প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিল না।

সুচরিতা কহিল, "উনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁকে দেখবা মাত্র সতীশকে আর ধরে রাখা গেল না, সে গাড়ি থেকে নেমেই ওঁকে টেনে নিয়ে এল। আপনি হয়তো কোনো কাজে যাচ্ছিলেন— আপনার তো কোনো অসুবিধে হয় নি?"

সুচরিতা বিনয়কে সম্বোধন করিয়া কোনো কথা কহিবে বিনয় তাহা প্রত্যাশাই করে নাই। সে কুণ্ঠিত হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, আমার কোনো কাজ ছিল না, অসুবিধে কিছুই হয় নি।"

সতীশ সুচরিতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া কহিল, "দিদি, চাবিটা দাও না। আমাদের সেই আর্গিনটা এনে বিনয়বাবুকে দেখাই।"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল, "এই বুঝি শুরু হল! যার সঙ্গে বক্তিয়ারের ভাব হবে তার আর রক্ষে নেই— আর্গিন তো তাকে শুনতেই হবে— আরও অনেক দুঃখ তার কপালে আছে। বিনয়বাবু, আপনার এই বন্ধুটি ছোটো, কিন্তু এর বন্ধুত্বের দায় বড়ো বেশি— সহ্য করতে পারবেন কি না জানি নে।"

বিনয় সুচরিতার এইরূপ অকুণ্ঠিত আলাপে কেমন করিয়া বেশ সহজে যোগ দিবে কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না। লজ্জা করিবে না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াও কোনো প্রকারে ভাঙাচোরা করিয়া একটা জবাব দিল, "না, কিছুই না— আপনি সে— আমি— আমার ও বেশ ভালোই লাগে।"

সতীশ তাহার দিদির কাছ হইতে চাবি আদায় করিয়া আর্গিন আনিয়া উপস্থিত করিল। একটা চৌকা কাচের আবরণের মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের অনুকরণে নীল-রঙ-করা কাপড়ের উপর একটা খেলার জাহাজ রহিয়াছে। সতীশ চাবি দিয়া দম লাগাইতেই আর্গিনের সুরে-তালে জাহাজটা দুলিতে লাগিল এবং সতীশ একবার জাহাজের দিকে ও একবার বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মনের অস্থিরতা সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমনি করিয়া সতীশ মাঝখানে থাকাতে অল্প অল্প করিয়া বিনয়ের সংকোচ ভাঙিয়া গেল, এবং ক্রমে সুচরিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কথা কহাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল না।

সতীশ অপ্রাসঙ্গিক হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিল, "আপনার বন্ধুকে এক-দিন আমাদের এখানে আনবেন না?"

ইহা হইতে বিনয়ের বন্ধু সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া পড়িল। পরেশবাবুরা নূতন কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহারা গোরা সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। বিনয় তাহার বন্ধুর কথা আলোচনা করিতে করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। গোরার যে কিরূপ অসামান্য প্রতিভা, তাহার হৃদয় যে কিরূপ প্রশস্ত, তাহার শক্তি যে কিরূপ অটল, তাহা বলিতে গিয়া বিনয় যেন কথা শেষ করিতে পারিল না। গোরা যে একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের মাথার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে— বিনয় কহিল, "এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই।"

বলিতে বলিতে বিনয়ের মুখে যেন একটা জ্যোতি দেখা দিল, তাহার সমস্ত সংকোচ একেবারে কাটিয়া গেল। এমন-কি, গোরার মত সম্বন্ধে পরেশ-বাবুর সঙ্গে দুই-একটা বাদপ্রতিবাদও হইল। বিনয় বলিল, "গোরা যে হিন্দুসমাজের সমস্তই অসংকোচে গ্রহণ করতে পারছে তার কারণ, সে খুব একটা বড়ো জায়গা থেকে ভারতবর্ষকে দেখছে। তার কাছে ভারতবর্ষের ছোটোবড়ো সমস্তই একটা মহৎ ঐক্যের মধ্যে একটা বৃহৎ সংগীতের মধ্যে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সে-রকম করে দেখা

আমাদের সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে বিদেশী আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতি কেবলই অবিচার করি।”

সুচরিতা কহিল, “আপনি কি বলেন জাতিভেদটা ভালো।”

এমনভাবে কহিল যেন ও-সম্বন্ধে কোনো তর্কই চলিতে পারে না।

বিনয় কহিল, “জাতিভেদটা ভালোও নয়, মন্দও নয়। অর্থাৎ, কোথাও ভালো, কোথাও মন্দ। যদি জিজ্ঞাসা করেন হাত জিনিসটা কি ভালো, আমি বলব, সমস্ত শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ভালো। যদি বলেন ওড়বার পক্ষে কি ভালো, আমি বলব, না— তেমনি ডানা জিনিসটাও ধরবার পক্ষে ভালো নয়।”

সুচরিতা উত্তেজিত হইয়া কহিল, “আমি ও-সমস্ত কথা বুঝতে পারি নে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জাতিভেদ মানেন।”

আর কারও সঙ্গে তর্ক উঠিলে বিনয় জোর করিয়াই বলিত, ‘হাঁ, মানি।’ আজ তাহার তেমন জোর করিয়া বলিতে বাধিল। ইহা কি তাহার ভীরুতা অথবা ‘জাতিভেদ মানি’ বলিলে কথাটা যতদূর পৌঁছে আজ তাহার মন তত-দূর পর্যন্ত যাইতে স্বীকার করিল না— তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। পরেশ পাছে তর্কটা বেশিদূর যায় বলিয়া এইখানেই বাধা দিয়া কহিলেন, “রাধে, তোমার মাকে এবং সকলকে ডেকে আনো— এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।”

সুচরিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই সতীশ তাহার সঙ্গে বকিতে বকিতে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, “বাবা, মা তোমাদের উপরের বারান্দায় আসতে বললেন।”

৯

উপরে গাড়িবারান্দায় একটা টেবিলে শুভ্র কাপড় পাতা, টেবিল ঘেরিয়া চৌকি সাজানো। রেলিঙের বাহিরে কার্নিসের উপরে ছোটো ছোটো টবে

পাতাবাহার এবং ফুলের গাছ। বারান্দার উপর হইতে রাস্তার ধারের শিরীষ ও কৃষ্ণচূড়া গাছের বর্ষাজলধৌত পল্লবিত চিক্কণতা দেখা যাইতেছে।

সূর্য তখনো অস্ত যায় নাই; পশ্চিম আকাশ হইতে ম্লান রৌদ্র সোজা হইয়া বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

ছাতে তখন কেহ ছিল না। একটু পরেই সতীশ সাদা-কালো-রোঁয়াওয়ালা এক ছোটো কুকুর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নাম খুদে। এই কুকুরের যতরকম বিদ্যা ছিল সতীশ তাহা বিনয়কে দেখাইয়া দিল। সে এক পা তুলিয়া সেলাম করিল, মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, একখণ্ড বিস্কুট দেখাইতেই লেজের উপর বসিয়া দুই পা জড়ো করিয়া ভিক্ষা চাহিল। এইরূপে খুদে যে খ্যাতি অর্জন করিল সতীশই তাহা আত্মসাৎ করিয়া গর্ব অনুভব করিল— এই যশোলাভে খুদের লেশমাত্র উৎসাহ ছিল না; বস্তুত যশের চেয়ে বিস্কুটটাকে সে ঢের বেশি সত্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিল।

কোনো একটা ঘর হইতে মাঝে মাঝে মেয়েদের গলার খিল্‌খিল্‌ হাসি ও কৌতুকের কণ্ঠস্বর এবং তাহার সঙ্গে একজন পুরুষের গলাও শুনা যাইতেছিল। এই অপর্যাপ্ত হাস্যকৌতুকের শব্দে বিনয়ের মনের মধ্যে একটা অপূর্ব মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন ঈর্ষার বেদনা বহন করিয়া আনিল। ঘরের ভিতরে মেয়েদের গলার এই আনন্দের কলধ্বনি বয়স হওয়া অবধি সে এমন করিয়া কখনো শুনে নাই; এই আনন্দের মাধুর্য তাহার এত কাছে উচ্ছ্বসিত হইতেছে, অথচ সে ইহা হইতে এত দূরে! সতীশ তাহার কানের কাছে কী বকিতেছিল বিনয় তাহা মন দিয়া শুনিতেই পারিল না।

পরেশবাবুর স্ত্রী তাঁহার তিন মেয়েকে সঙ্গে করিয়া ছাতে আসিলেন; সঙ্গে একজন যুবক আসিল, সে তাঁহাদের দূর আত্মীয়।

পরেশবাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী। তাঁহার বয়স অল্প নহে কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় যে, বিশেষ যত্ন করিয়া সাজ করিয়া আসিয়াছেন। বড়োবয়স পর্যন্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো কাটাইয়া হঠাৎ এক সময় হইতে

আধুনিক কালের সঙ্গে সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; সেইজন্যই তাঁহার সিল্কের শাড়ি বেশি খস্‌খস্‌ এবং উঁচু গোড়ালির জুতা বেশি খুট্‌খট্‌ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্‌ জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন। সেইজন্যই রাধারানীর নাম পরিবর্তন করিয়া তিনি সুচরিতা রাখিয়াছেন। কোনো-এক সম্পর্কে তাঁহার এক শ্বশুর বহুদিন পরে বিদেশের কর্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে জামাইষষ্ঠী পাঠাইয়াছিলেন— পরেশবাবু তখন কর্ম-উপলক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন। বরদাসুন্দরী এই জামাইষষ্ঠীর উপহার সমস্ত ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এ-সকল ব্যাপারকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন। মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পরিয়া বাহিরে যাওয়াকে তিনি এমনভাবে দেখেন, যেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের একটা অঙ্গ। কোনো ব্রাহ্ম-পরিবারে মাটিতে আসন পাতিয়া খাইতে দেখিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আজকাল ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতার অভিমুখে পিছাইয়া পড়িতেছে।

তাঁহার বড়ো মেয়ের নাম লাবণ্য। সে মোটাসোটা, হাসিখুশি, লোকের সঙ্গ এবং গল্পগুজব ভালোবাসে। মুখটি গোলগাল, চোখ দুটি বড়ো, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। বেশভূষার ব্যাপারে সে স্বভাবতই কিছু ঢিলা, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মাতার শাসনে তাহাকে চলিতে হয়। উঁচু গোড়ালির জুতা পরিতে সে সুবিধা-বোধ করে না, তবু না পরিয়া উপায় নাই। বিকালে সাজ করিবার সময় মা স্বহস্তে তাহার মুখে পাউডার ও দুই গালে রঙ লাগাইয়া দেন। একটু মোটা বলিয়া বরদাসুন্দরী তাহার জামা এমনি আঁট করিয়া তৈরি করিয়াছেন যে লাবণ্য যখন সাজিয়া বাহির হইয়া আসে তখন মনে হয়, যেন তাহাকে পাটের বস্তার মতো কলে চাপ দিয়া আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে।

মেজো মেয়ের নাম ললিতা। সে বড়ো মেয়ের বিপরীত বলিলেই হয়। তাহার দিদির চেয়ে সে মাথায় লম্বা, রোগা, রঙ আর-একটু কালো। কথাবার্তা বেশি কয় না, সে আপনার নিয়মে চলে, ইচ্ছা করিলে কড়া কড়া

কথা শুনাইয়া দিতে পারে। বরদাসুন্দরী তাহাকে মনে মনে ভয় করেন, সহজে তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে সাহস করেন না।

ছোটো লীলা, তাহার বয়স বছর দশেক হইবে। সে দৌড়ধাপ উপদ্রব করিতে মজবুত; সতীশের সঙ্গে তাহার ঠেলাঠেলি মারামারি সর্বদাই চলে। বিশেষত খুদে নামধারী কুকুরটার স্বত্বাধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো মীমাংসা হয় নাই। কুকুরের নিজের মত লইলে সে বোধ হয় উভয়ের মধ্যে কাহাকেও প্রভুরূপে নির্বাচন করিত না; তবু দুজনের মধ্যে সে বোধ করি সতীশকেই কিঞ্চিৎ পছন্দ করে। কারণ, লীলার আদরের বেগ সম্বরণ করা এই ছোটো জন্তুটার পক্ষে সহজ ছিল না। বালিকার আদরের চেয়ে বালকের শাসন তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত সুসহ ছিল।

বরদাসুন্দরী আসিতেই বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরেশবাবু কহিলেন, "এঁরই বাড়িতে সেদিন আমরা—"

বরদা কহিলেন, "ওঃ! বড়ো উপকার করেছেন— আপনি আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানবেন।"

শুনিয়া বিনয় এত সংকুচিত হইয়া গেল যে, ঠিকমত উত্তর দিতে পারিল না।

মেয়েদের সঙ্গে যে যুবকটি আসিয়াছিল তাহার সঙ্গেও বিনয়ের আলাপ হইয়া গেল। তাহার নাম সুধীর। সে কলেজে বি. এ. পড়ে। চেহারাটি প্রিয়দর্শন, রঙ গৌর, চোখে চশমা, অল্প গোঁফের রেখা উঠিয়াছে। ভাবখানা অত্যন্ত চঞ্চল— একদণ্ড বসিয়া থাকিতে চায় না, একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত। সর্বদাই মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করিয়া, বিরক্ত করিয়া, তাহাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েরাও তাহার প্রতি কেবলই তর্জন করিতেছে, কিন্তু সুধীরকে নহিলে তাহাদের কোনোমতেই চলে না। সার্কাস দেখাইতে, জুয়লজিকাল গার্ডেনে লইয়া যাইতে, কোনো শখের জিনিস কিনিয়া আনিতে সুধীর সর্বদাই প্রস্তুত। মেয়েদের সঙ্গে সুধীরের অসংকোচ হৃদ্যতার ভাব বিনয়ের কাছে অত্যন্ত নূতন এবং বিস্ময়কর ঠেকিল। প্রথমটা সে এইরূপ

ব্যবহারকে মনে মনে নিন্দাই করিল, কিন্তু সে নিন্দার সঙ্গে একটু যেন ঈর্ষার ভাব মিশিতে লাগিল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "মনে হচ্ছে, আপনাকে যেন দুই-একবার সমাজে দেখেছি।"

বিনয়ের মনে হইল, যেন তাহার কী একটা অপরাধ ধরা পড়িল। সে অনাবশ্যক লজ্জা প্রকাশ করিয়া কহিল, "হাঁ, আমি কেশববাবুর বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে যাই।"

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বুঝি কলেজে পড়ছেন?"

বিনয় কহিল, "না, এখন আর কলেজে পড়ি নে।"

বরদা কহিলেন, "আপনি কলেজে কতদূর পর্যন্ত পড়েছেন?"

বিনয় কহিল, "এম. এ. পাস করেছি।"

শুনিয়া এই বালকের মতো চেহারা যুবকের প্রতি বরদাসুন্দরীর শ্রদ্ধা হইল। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া পরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার মনু যদি থাকত তবে সেও এতদিনে এম. এ. পাস করে বের হত।"

বরদার প্রথম সন্তান মনোরঞ্জন নয় বছর বয়সে মারা গেছে। যে-কোনো যুবক কোনো বড়ো পাস করিয়াছে বা বড়ো পদ পাইয়াছে, ভালো বই লিখিয়াছে বা কোনো ভালো কাজ করিয়াছে শোনেন, বরদার তখনই মনে হয়, মনু বাঁচিয়া থাকিলে তাহার দ্বারাও ঠিক এইগুলি ঘটিত। যাহা হউক, সে যখন নাই তখন বর্তমানে জনসমাজে তাঁহার মেয়ে তিনটির গুণপ্রচারই বরদাসুন্দরীর একটা বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে ছিল। তাঁহার মেয়েরা যে খুব পড়াশুনা করিতেছে, এ কথা বরদা বিশেষ করিয়া বিনয়কে জানাইলেন। মেম তাঁহার মেয়েদের বুদ্ধি ও গুণপনা সম্বন্ধে কবে কী বলিয়াছিল তাহাও বিনয়ের অগোচর রহিল না। যখন মেয়ে-ইস্কুলে প্রাইজ দিবার সময়ে লেপ্টেনেণ্ট্ গবর্নর এবং তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে তোড়া দিবার জন্য ইস্কুলের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে লাবণ্যকেই বিশেষ করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল— এবং গবর্নরের স্ত্রী লাবণ্যকে উৎসাহজনক কী

একটা মিষ্টবাক্য বলিয়াছিলেন তাহাও বিনয় শুনিল।

অবশেষে বরদা লাবণ্যকে বলিলেন, "যে সেলাইটার জন্যে তুমি প্রাইজ পেয়েছিলে সেইটে নিয়ে এসো তো মা।"

একটা পশমের সেলাই-করা টিয়াপাখির মূর্তি এই বাড়ির আত্মীয়-বন্ধুদের নিকট বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মেমের সহযোগিতায় এই জিনিসটা লাবণ্য অনেক দিন হইল রচনা করিয়াছিল, এই রচনায় লাবণ্যের নিজের কৃতিত্ব যে খুব বেশি ছিল তাহাও নহে— কিন্তু নূতন-আলাপী মাত্রকেই এটা দেখাইতে হইবে সেটা ধরা কথা। পরেশ প্রথম-প্রথম আপত্তি করিতেন কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ফল জানিয়া এখন আর আপত্তিও করেন না। এই পশমের টিয়াপাখির রচনানৈপুণ্য লইয়া যখন বিনয় দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়াছে তখন বেহারা আসিয়া একখানি চিঠি পরেশের হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া পরেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, "বাবুকে উপরে নিয়ে আয়।"

বরদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে।"

পরেশ কহিলেন, "আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কৃষ্ণদয়াল তাঁর ছেলেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে পাঠিয়েছেন।"

হঠাৎ বিনয়ের হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল এবং তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার পরক্ষণেই সে হাত মুঠা করিয়া বেশ একটু শক্ত হইয়া বসিল, যেন কোনো প্রতিকূল পক্ষের বিরুদ্ধে সে নিজেকে দৃঢ় রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিল। গোরা যে এই পরিবারের লোকদিগকে অশ্রদ্ধার সহিত দেখিবে ও বিচার করিবে, ইহা আগে হইতেই বিনয়কে যেন কিছু উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

১০

খুঞ্চের উপর জলখাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া চাকরের হাতে দিয়া সুচরিতা ছাতে আসিয়া বসিল এবং সেই মুহূর্তে বেহারার সঙ্গে গোরাও

আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ শুভ্রকায় গোরার আকৃতি আয়তন ও সাজ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল।

গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতাবাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়-তোলা কটকি জুতা। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এরূপ সাজসজ্জা বিনয়ও পূর্বে কখনো দেখে নাই।

আজ গোরার মনে একটা বিরোধের আগুন বিশেষ করিয়াই জ্বলিতেছিল। তাহার কারণও ঘটিয়াছিল।

গ্রহণের স্নান-উপলক্ষে কোনো স্টীমার-কোম্পানি কাল প্রত্যুষে যাত্রী লইয়া ত্রিবেণী রওনা হইয়াছিল। পথের মধ্যে মধ্যে এক-এক স্টেশন হইতে বহুতরো স্ত্রীলোক যাত্রী দুই-একজন পুরুষ-অভিভাবক সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিতেছিল। পাছে জায়গা না পায় এজন্য ভারি ঠেলাঠেলি পড়িয়াছিল। পায়ে কাদা লইয়া জাহাজে চড়িবার তক্তাখানার উপরে টানাটানির চোটে পিছলে কেহ বা অসম্বৃত অবস্থায় নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে; কাহাকেও বা খালাসি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে; কেহ-বা নিজে উঠিয়াছে কিন্তু সঙ্গী উঠিতে পারে নাই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে; মাঝে মাঝে দুই-এক পসলা বৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে ভিজাইয়া দিতেছে; জাহাজে তাহাদের বসিবার স্থান কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মুখে চোখে একটা ত্রস্তব্যস্ত উৎসুক সকরুণ ভাব— তাহারা শক্তিহীন অথচ তাহারা এত ক্ষুদ্র যে জাহাজের মাল্লা হইতে কর্তা পর্যন্ত কেহই তাহাদের অনুনয়ে এতটুকু সাহায্য করিবে না ইহা নিশ্চয় জানে বলিয়া তাহাদের চেষ্টার মধ্যে ভারি একটা কাতর আশঙ্কা প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় গোরা যথাসাধ্য যাত্রীদিগকে সাহায্য করিতেছিল। উপরের ফার্স্ট্ ক্লাসের ডেকে একজন ইংরেজ এবং একটি আধুনিক ধরণের বাঙালিবাবু জাহাজের রেলিং ধরিয়া পরস্পর হাস্যালাপ করিতে করিতে চুরুট মুখে তামাশা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে কোনো যাত্রীর বিশেষ কোনো আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া ইংরেজ

হাসিয়া উঠিতেছিল এবং বাঙালিটিও তাহার সঙ্গে যোগ দিতেছিল।

দুই-তিনটা স্টেশন এইরূপে পার হইলে গোরার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে উপরে উঠিয়া তাহার বজ্রগর্জনে কহিল, "ধিক্ তোমাদের! লজ্জা নাই!"

ইংরেজটা কঠোর দৃষ্টিতে গোরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। বাঙালি উত্তর দিল, "লজ্জা! দেশের এই-সমস্ত পশুবৎ মূঢ়দের জন্যই লজ্জা।"

গোরা মুখ লাল করিয়া কহিল, "মূঢ়ের চেয়ে বড়ো পশু আছে— যার হৃদয় নেই।"

বাঙালি রাগ করিয়া কহিল, "এ তোমার জায়গা নয়— এ ফার্স্ট্ ক্লাস।"

গোরা কহিল, "না, তোমার সঙ্গে একত্রে আমার জায়গা নয়— আমার জায়গা ওই যাত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু, আমি বলে যাচ্ছি, আর আমাকে তোমাদের এই ক্লাসে আসতে বাধ্য কোরো না।"

বলিয়া গোরা হন্ হন্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। ইংরেজ তাহার পর হইতে আরাম-কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলিয়া নভেল পড়ায় মনোনিবেশ করিল। তাহার সহযাত্রী বাঙালি তাহার সঙ্গে পুনরায় আলাপ করিবার চেষ্টা দুই-একবার করিল, কিন্তু আর তাহা তেমন জমিল না। দেশের সাধারণ লোকের দলে সে নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য খান্‌সামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুরগির কোনো ডিশ্ আহারের জন্য পাওয়া যাইবে কি না।

খান্‌সামা কহিল, "না, কেবল রুটি মাখন চা আছে।"

শুনিয়া ইংরেজকে শুনাইয়া বাঙালিটি ইংরেজি ভাষায় কহিল, "creature comforts সম্বন্ধে জাহাজের সমস্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত যাচ্ছেতাই।"

ইংরেজ কোনো উত্তর করিল না। টেবিলের উপর হইতে তাহার খবরের কাগজ উড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল। 'বাবু চৌকি হইতে উঠিয়া কাগজখানা তুলিয়া দিল কিন্তু থ্যাঙ্ক্‌স্ পাইল না।

চন্দননগরে পৌঁছিয়া নামিবার সময় সাহেব সহসা গোরার কাছে গিয়া টুপি একটু তুলিয়া কহিল, "নিজের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত— আশা

করি, আমাকে ক্ষমা করিবে।”

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কিন্তু, শিক্ষিত বাঙালি যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমানে হাসিতে পারে, ইহার আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেদের সকলপ্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে, তাহাদিগকে পশুর মতো লাঞ্ছিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সংগত বলিয়া মনে হয়, ইহার মূলে যে একটা দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে তাহার জন্য গোরার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু, সকলের চেয়ে তাহার এই বাজিল যে, দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না— নিজেকে নির্মমভাবে পৃথক্ করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরব বোধ করিতে পারে। আজ তাই শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই-পড়া ও নকল-করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অদ্ভুত কট্‌কি চটি কিনিয়া, পরিয়া, বুক ফুলাইয়া ব্রাহ্ম-বাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয় মনে মনে ইহা বুঝিতে পারিল, গোরার আজিকার এই-যে সাজ ইহা যুদ্ধসাজ। গোরা কী জানি কী করিয়া বসে, এই ভাবিয়া বিনয়ের মনে একটা ভয়, একটা সংকোচ এবং একটা বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী যখন বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন তখন সতীশ অগত্যা ছাতের এক কোণে একটা টিনের লাঠিম ঘুরাইয়া নিজের চিত্ত-বিনোদনে নিযুক্ত ছিল। গোরাকে দেখিয়া তাহার লাঠিম ঘোরানো বন্ধ হইয়া গেল; সে ধীরে ধীরে বিনয়ের পাশে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে গোরাকে দেখিতে লাগিল এবং কানে কানে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল, “ইনিই কি আপনার বন্ধু?”

বিনয় কহিল, “হাঁ।”

গোরা ছাতে আসিয়া মুহূর্তের এক অংশ কাল বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আর যেন তাহাকে দেখিতেই পাইল না। পরেশকে নমস্কার করিয়া সে অসংকোচে একটা চৌকি টেবিল হইতে কিছু দূরে সরাইয়া লইয়া বসিল। মেয়েরা যে এখানে কোনো এক জায়গায় আছে তাহা লক্ষ্য করা সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল।

বরদাসুন্দরী এই অসভ্যের নিকট হইতে মেয়েদিগকে লইয়া চলিয়া যাইবেন স্থির করিতেছিলেন, এমন সময় পরেশ তাঁহাকে কহিলেন, "এঁর নাম গৌরমোহন, আমার বন্ধু কৃষ্ণদয়ালের ছেলে।"

তখন গোরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিল। যদিও বিনয়ের সঙ্গে আলোচনায় সুচরিতা গোরার কথা পূর্বেই শুনিয়াছিল, তবু এই অভ্যাগতটি যে বিনয়ের বন্ধু, তাহা সে বুঝে নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই গোরার প্রতি তাহার একটা আক্রোশ জন্মিল। ইংরেজি-শেখা কোনো লোকের মধ্যে গোঁড়া হিঁদুয়ানি দেখিলে সহ্য করিতে পারে, সুচরিতার সেরূপ সংস্কার ও সহিষ্ণুতা ছিল না।

পরেশ গোরার কাছে তাঁহার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণদয়ালের খবর লইলেন, তাহার পরে নিজেদের ছাত্র-অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন, "তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনেই এক জুড়ি ছিলুম, দুজনেই মস্ত কালাপাহাড়— কিছুই মানতুম না — হোটেলে খাওয়াটাই একটা কর্তব্য কর্ম বলে মনে করতুম। দুজনে কতদিন সন্ধ্যার সময়ে গোলদিঘিতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে, তার পরে কিরকম করে আমরা হিন্দুসমাজের সংস্কার করব, রাতদুপুর পর্যন্ত তারই আলোচনা করতুম।"

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তিনি কী করেন?"

গোরা কহিল, "এখন তিনি হিন্দু-আচার পালন করেন।"

বরদা কহিলেন, "লজ্জা করে না?"

রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল।

গোরা একটু হাসিয়া কহিল, "লজ্জা করাটা দুর্বল স্বভাবের লক্ষণ। কেউ

কেউ বাপের পরিচয় দিতে লজ্জা করে।"

বরদা। আগে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না?

গোরা। আমিও তো এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলুম।

বরদা। এখন আপনি সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করেন?

গোরা। আকার জিনিসটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব, আমার মনে এমন কুসংস্কার নেই। আকারকে গাল দিলেই কি সে ছোটো হয়ে যায়? আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেছে?

পরেশবাবু মৃদুস্বরে কহিলেন, "আকার যে অন্তবিশিষ্ট।"

গোরা কহিল, "অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন— নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়। যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।"

বরদা মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "নিরাকারের চেয়ে আকার সম্পূর্ণ, আপনি এমন কথা বলেন?"

গোরা। আমি যদি নাও বলতুম তাতে কিছুই আসত যেত না। জগতে আকার আমার বলার উপর নির্ভর করছে না। নিরাকারই যদি যথার্থ পরিপূর্ণতা হত তবে আকার কোথাও স্থান পেত না।

সুচরিতার অত্যন্ত ইচ্ছা করিতে লাগিল, কেহ এই উদ্ধত যুবককে তর্কে একেবারে পরাস্ত লাঞ্ছিত করিয়া দেয়। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া গোরার কথা শুনিতেছে দেখিয়া তাহার মনে মনে রাগ হইল। গোরা এতই জোরের সঙ্গে কথা বলিতেছিল যে, এই জোরকে নত করিয়া দিবার জন্য সুচরিতার মনের মধ্যেও যেন জোর করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বেহারা চায়ের জন্য কাৎলিতে গরম জল আনিল। সুচরিতা উঠিয়া চা তৈরি করিতে নিযুক্ত হইল। বিনয় মাঝে মাঝে চকিতের মতো সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া লইল। যদিচ উপাসনা সম্বন্ধে গোরার সঙ্গে বিনয়ের মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল না, তবু গোরা যে এই ব্রাহ্ম-পরিবারের

মাঝখানে অনাহূত আসিয়া বিরুদ্ধ মত এমন অসংকোচে প্রকাশ করিয়া যাইতেছে, ইহাতে বিনয়কে পীড়া দিতে লাগিল। গোরার এইপ্রকার যুদ্ধোদ্যত আচরণের সহিত তুলনা করিয়া বৃদ্ধ পরেশের একটি আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভাব, সকল প্রকার তর্কবিতর্কের অতীত একটি গভীর প্রসন্নতা, বিনয়ের হৃদয়কে ভক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—'মতামত কিছুই নয়, অন্তঃকরণের মধ্যে পূর্ণতা স্তব্ধতা ও আত্ম-প্রসাদ ইহাই সকলের চেয়ে দুর্লভ। কথার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তাহা লইয়া যতই তর্ক কর না কেন প্রাপ্তির মধ্যে যেটা সত্য সেইটাই আসল।' পরেশ সকল কথাবার্তার মধ্যে মধ্যে এক-একবার চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া লইতেছিলেন— ইহা তাঁহার অভ্যাস— তাঁহার সেই-সময়কার অন্তর্নিবিষ্ট শান্ত মুখশ্রী বিনয় একদৃষ্টে দেখিতেছিল। গোরা যে এই বৃদ্ধের প্রতি ভক্তি অনুভব করিয়া নিজের বাক্য সংযত করিতেছিল না, ইহাতে বিনয় বড়োই আঘাত পাইতেছিল।

সুচরিতা কয়েক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিল। কাহাকে চা খাইতে অনুরোধ করিবে না-করিবে তাহা লইয়া তাহার মনে দ্বিধা হইতেছিল। বরদাসুন্দরী গোরার দিকে চাহিয়াই একেবারে বলিয়া বসিলেন, "আপনি এ-সমস্ত কিছু খাবেন না বুঝি?"

গোরা কহিল, "না।"

বরদা। কেন। জাত যাবে?

গোরা বলিল, "হাঁ।"

বরদা। আপনি জাত মানেন?

গোরা। জাত কি আমার নিজের তৈরি যে মানব না? সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মানি।

বরদা। সমাজকে কি সব কথায় মানতেই হবে?

গোরা। না মানলে সমাজকে ভাঙা হয়।

বরদা। ভাঙলে দোষ কী।

গোরা। যে ডালে সকলে মিলে বসে আছি সে ডাল কাটলেই বা দোষ কী।

সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "মা, মিছে তর্ক করে লাভ কী। উনি আমাদের ছোঁওয়া খাবেন না।"

গোরা সুচরিতার মুখের দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি একবার স্থাপিত করিল। সুচরিতা বিনয়ের দিকে চাহিয়া ঈষৎ সংশয়ের সহিত কহিল, "আপনি কি—"

বিনয় কোনোকালে চা খায় না, মুসলমানের তৈরি পাঁউরুটি-বিস্কুট খাওয়াও অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার না খাইলে নয়। সে জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "হাঁ, খাব বই-কি।" বলিয়া গোরার মুখের দিকে চাহিল। গোরার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ একটু কঠোর হাসি দেখা দিল। বিনয়ের মুখে চা তিতো ও বিস্বাদ লাগিল, কিন্তু সে খাইতে ছাড়িল না। বরদাসুন্দরী মনে মনে বলিলেন, 'আহা, এই বিনয় ছেলেটি বড়ো ভালো।'

তখন তিনি গোরার দিক হইতে একেবারেই মুখ ফিরাইয়া বিনয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাই দেখিয়া পরেশ আস্তে আস্তে গোরার কাছে তাঁহার চৌকি টানিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে মৃদুস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় রাস্তা দিয়া চীনাবাদামওয়ালা গরম চীনাবাদাম-ভাজা হাঁকিয়া যাইতেই লীলা হাততালি দিয়া উঠিল, কহিল, "সুধীরদা, চীনেবাদাম ডাকো।"

বলিতেই ছাতের বারান্দা ধরিয়া সতীশ চীনাবাদামওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর-একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সকলেই পানুবাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিল, কিন্তু তাঁহার আসল নাম হারানচন্দ্র নাগ। দলের মধ্যে ইঁহার বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। যদিও স্পষ্ট করিয়া কোনো পক্ষই কোনো কথা বলে নাই, তথাপি ইঁহার সঙ্গেই সুচরিতার বিবাহ হইবে, এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল। পানুবাবুর হৃদয় যে সুচরিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল

তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না এবং ইহাই লইয়া মেয়েরা সুচরিতাকে সর্বদা ঠাট্টা করিতে ছাড়িত না।

পানুবাবু ইস্কুলে মাস্টারি করেন। বরদাসুন্দরী তাঁহাকে ইস্কুলমাস্টার মাত্র জানিয়া বড়ো শ্রদ্ধা করেন না। তিনি ভাবে দেখান যে, পানুবাবু যে তাঁহার কোনো মেয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই সে ভালোই হইয়াছে। তাঁহার ভাবী জামাতারা ডেপুটিগিরির লক্ষ্যবেধরূপ অতি দুঃসাধ্য পণে আবদ্ধ।

সুচরিতা হারানকে এক পেয়ালা চা অগ্রসর করিয়া দিতেই লাবণ্য দূর হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। সেই হাসিটুকু বিনয়ের অগোচর রহিল না। অতি অল্প কালের মধ্যেই দুই-একটা বিষয়ে বিনয়ের নজর বেশ একটু তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে— দর্শননৈপুণ্য সম্বন্ধে পূর্বে সে প্রসিদ্ধ ছিল না।

এই-যে হারান ও সুধীর এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে অনেক দিন হইতে পরিচিত, এবং এই পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে তাহারা মেয়েদের মধ্যে পরস্পর ইঙ্গিতের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, বিনয়ের বুকের মধ্যে ইহা বিধাতার অবিচার বলিয়া বাজিতে লাগিল।

এ দিকে হারানের অভ্যাগমে সুচরিতার মন যেন একটু আশান্বিত হইয়া উঠিল। গোরার স্পর্ধা যেমন করিয়া হউক কেহ দমন করিয়া দিলে তবে তাহার গায়ের জ্বালা মেটে। অন্য সময়ে হারানের তার্কিকতায় সে অনেকবার বিরক্ত হইয়াছে, কিন্তু আজ এই তর্কবীরকে দেখিয়া সে আনন্দের সঙ্গে তাঁহাকে চা ও পাঁউরুটির রসদ জোগাইয়া দিল।

পরেশ কহিল, “পানুবাবু, ইনি আমাদের—”

হারান কহিলেন, “ওঁকে বিলক্ষণ জানি। উনি এক সময়ে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন।”

এই বলিয়া গোরার সঙ্গে কোনোপ্রকার আলাপের চেষ্টা না করিয়া হারান চায়ের পেয়ালার প্রতি মন দিলেন।

সেই সময়ে দুই-একজন মাত্র বাঙালি সিবিল সার্বিসে উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে আসিয়াছেন। সুধীর তাঁহাদেরই একজনের অভ্যর্থনার গল্প তুলিল। হারান কহিলেন, "পরীক্ষায় বাঙালি যতই পাস করুন, বাঙালির দ্বারা কোনো কাজ হবে না।"

কোনো বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ ডিস্ট্রিক্টের ভার লইয়া যে কখনো কাজ চালাইতে পারিবে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য হারান বাঙালি চরিত্রের নানা দোষ ও দুর্বলতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল ; সে তাহার সিংহনাদকে যথাসাধ্য রুদ্ধ করিয়া কহিল, "এই যদি সত্যই আপনার মত হয় তবে আপনি আরামে এই টেবিলে বসে বসে পাঁউরুটি চিবোচ্ছেন কোন্ লজ্জায় !"

হারান বিস্মিত হইয়া ভুরু তুলিয়া কহিলেন, "কী করতে বলেন !"

গোরা। হয় বাঙালি-চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করুন, নয় গলায় দড়ি দিে মরুন গে। আমাদের জাতের দ্বারা কখনো কিছুই হবে না, এ কথা কি এতই সহজে বলবার। আপনার গলায় রুটি বেধে গেল না ?

হারান। সত্য কথা বলব না ?

গোরা। রাগ করবেন না, কিন্তু এ কথা যদি আপনি যথার্থই সত্য বলে জানতেন তা হলে অমন আরামে অত আস্ফালন করে বলতে পারতেন না। কথাটি মিথ্যে জানেন বলেই আপনার মুখ দিয়ে বেরোল— হারানবাবু, মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ অল্পই আছে।

হারান ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। গোরা কহিল, "আপনি একলাই কি আপনার সমস্ত স্বজাতির চেয়ে বড়ো ? রাগ আপনি করবেন— আর আমাদের পিতৃপিতামহের হয়ে আমরা সমস্ত সহ্য করব !"

ইহার পর হারানের পক্ষে হার মানা আরও শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি আরও সুর চড়াইয়া বাঙালির নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙালি-সমাজের নানাপ্রকার প্রথার উল্লেখে কহিলেন, "এ-সমস্ত থাকতে বাঙালির কোনো

আশা নেই।"

গোরা কহিল, "আপনি যাকে কুপ্রথা বলছেন সে কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বলছেন; নিজে ও সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ইংরেজের সমস্ত কুপ্রথাকেও যখন আপনি ঠিক এমনি করেই অবজ্ঞা করতে পারবেন তখন এ সম্বন্ধে কথা কবেন।"

পরেশ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হারান নিবৃত্ত হইলেন না। সূর্য অস্ত গেল; মেঘের ভিতর হইতে একটা অপরূপ আরক্ত আভায় সমস্ত আকাশ লাবণ্যময় হইয়া উঠিল; সমস্ত তর্কের কোলাহল ছাপাইয়া বিনয়ের প্রাণের ভিতরে একটা সুর বাজিতে লাগিল। পরেশ তাঁহার সায়ংকালীন উপাসনায় মন দিবার জন্য ছাত হইতে উঠিয়া বাগানের প্রান্তে একটা বড়ো চাঁপাগাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে গিয়া বসিলেন।

গোরার প্রতি বরদাসুন্দরীর মন যেমন বিমুখ হইয়াছিল হারানও তেমনি তাঁহার প্রিয় ছিল না। এই উভয়ের তর্ক যখন তাঁহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তিনি বিনয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "আসুন বিনয়বাবু, আমরা ঘরে যাই।"

বরদাসুন্দরীর এই সস্নেহ পক্ষপাত স্বীকার করিয়া বিনয়কে ছাত ছাড়িয়া অগত্যা ঘরের মধ্যে যাইতে হইল। বরদা তাঁহার মেয়েদের ডাকিয়া লইলেন। সতীশ তর্কের গতিক দেখিয়া পূর্বেই চীনাবাদামের কিঞ্চিৎ অংশ সংগ্রহপূর্বক খুদে কুকুরকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছিল।

বরদাসুন্দরী বিনয়ের কাছে তাঁহার মেয়েদের গুণপনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাবণ্যকে বলিলেন, "তোমার সেই খাতাটা এনে বিনয়বাবুকে দেখাও-না।"

বাড়ির নূতন-আলাপীদের এই খাতা দেখানো লাবণ্যর অভ্যাস হইয়াছিল। এমন-কি, সে ইহার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিয়া থাকিত। আজ তর্ক উঠিয়া পড়াতে সে ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

বিনয় খাতা খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কবি মূর এবং লংফেলোর ইংরেজি

কবিতা লেখা। হাতের অক্ষরে যত্ন এবং পারিপাট্য প্রকাশ পাইতেছে। কবিতাগুলির শিরোনামা এবং আরম্ভের অক্ষর রোমান ছাঁদে লিখিত।

এই লেখাগুলি দেখিয়া বিনয়ের মনে অকৃত্রিম বিস্ময় উৎপন্ন হইল। তখনকার দিনে মূরের কবিতা খাতায় কপি করিতে পারা মেয়েদের পক্ষে কম বাহাদুরি ছিল না। বিনয়ের মন যথোচিত অভিভূত হইয়াছে দেখিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার মেজো মেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ললিতা, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, তোমার সেই কবিতাটা—"

ললিতা শক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "না মা, আমি পারব না। সে আমার ভালো মনে নেই।"

বলিয়া সে দূরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে বুঝাইয়া দিলেন, মনে সমস্তই আছে, কিন্তু ললিতা বড়ো চাপা, বিদ্যা বাহির করিতে চায় না। এই বলিয়া ললিতার আশ্চর্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়-স্বরূপ দুই-একটা ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, ললিতা শিশুকাল হইতেই এইরূপ ; কান্না পাইলেও মেয়ে চোখের জল ফেলিতে চাহিত না। এ সম্বন্ধে বাপের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আলোচনা করিলেন।

এইবার লীলার পালা। তাহাকে অনুরোধ করিতেই সে প্রথমে খুব খানিকটে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া, তাহার পরে কল্-টেপা আর্গিনের মতো অর্থ না বুঝিয়া 'Twinkle twinkle little star' কবিতাটা গড় গড় করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

এইবার সংগীতবিদ্যার পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে জানিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের ছাতে তর্ক তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। হারান তখন রাগের মাথায় তর্ক ছাড়িয়া গালি দিবার উপক্রম করিতেছেন। হারানের অসহিষ্ণুতায় লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া সুচরিতা গোরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। হারানের পক্ষে সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।

আকাশের অন্ধকার এবং শ্রাবণের মেঘ ঘনাইয়া আসিল, বেলফুলের মালা হাঁকিয়া রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা চলিয়া গেল। সম্মুখের রাস্তায় কৃষ্ণচূড়াগাছের পল্লবপুঞ্জের মধ্যে জোনাকি জ্বলিতে লাগিল। পাশের বাড়ির পুকুরের জলের উপর একটা নিবিড় কলিমা পড়িয়া গেল।

সান্ধ্য উপাসনা শেষ করিয়া পরেশ ছাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোরা ও হারান উভয়েই লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইল। গোরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "রাত হয়ে গেছে, আজ তবে আসি।"

বিনয়ও ঘর হইতে বিদায় লইয়া ছাতে আসিয়া দেখা দিল। পরেশ গোরাকে কহিলেন, "দেখো, তোমার যখন ইচ্ছা এখানে এসো। কৃষ্ণদয়াল আমার ভাইয়ের মতো ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এখন আমার মতের মিল নেই, দেখাও হয় না, চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ আছে, কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুত্ব রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে। কৃষ্ণদয়ালের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতি নিকটের। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

পরেশের সস্নেহ শান্ত কণ্ঠস্বরে গোরার এতক্ষণকার তর্কতাপ যেন জুড়াইয়া গেল। প্রথমে আসিয়া গোরা পরেশকে বড়ো একটা খাতির করে নাই। যাইবার সময় যথার্থ ভক্তির সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেল। সুচরিতাকে গোরা কোনোপ্রকার বিদায়সম্ভাষণ করিল না। সুচরিতা যে সম্মুখে আছে ইহা কোনো আচরণের দ্বারা স্বীকার করাকেই সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল। বিনয় পরেশকে নতভাবে প্রণাম করিয়া সুচরিতার দিকে ফিরিয়া তাহাকে নমস্কার করিল এবং লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি গোরার অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

হারান এই বিদায়সম্ভাষণ-ব্যাপার এড়াইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া টেবিলের উপরকার একটি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' বই লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

বিনয় ও গোরা চলিয়া যাইবা মাত্র হারান দ্রুতপদে ছাতে আসিয়া পরেশকে কহিলেন, "দেখুন, সকলের সঙ্গেই মেয়েদের আলাপ করিয়ে দেওয়া আমি ভালো মনে করি নে।"

সুচরিতা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাই সে ধৈর্য সম্বরণ করিতে পারিল না; কহিল, "বাবা যদি সে নিয়ম মানতেন তা হলে তো আপনার সঙ্গেও আমাদের আলাপ হতে পারত না।"

হারান কহিলেন, "আলাপ-পরিচয় নিজেদের সমাজের মধ্যেই বদ্ধ হলে ভালো হয়।"

পরেশ হাসিয়া কহিলেন, "আপনি পারিবারিক অন্তঃপুরকে আর-একটুখানি বড়ো করে একটা সামাজিক অন্তঃপুর বানাতে চান। কিন্তু আমি মনে করি, নানা মতের ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েদের মেশা উচিত; নইলে তাদের বুদ্ধিকে জোর করে খর্ব রাখা হয়। এতে ভয় কিম্বা লজ্জার কারণ তো কিছুই দেখি নে।"

হারান। ভিন্ন মতের লোকের সঙ্গে মেয়েরা মিশবে না এমন কথা বলি নে, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় সে ভদ্রতা যে এঁরা জানেন না।

পরেশ। না, না, বলেন কী! ভদ্রতার অভাব আপনি যাকে বলছেন সে একটা সংকোচ মাত্র— মেয়েদের সঙ্গে না মিশলে সেটা কেটে যায় না।

সুচরিতা উদ্ধতভাবে কহিল, "দেখুন পানুবাবু, আজকের তর্কে আমাদেয় সমাজের লোকের ব্যবহারেই আমি লজ্জিত হচ্ছিলুম।"

ইতিমধ্যে লীলা দৌড়িয়া আসিয়া 'দিদি' 'দিদি' করিয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল।

১১

সেদিন তর্কে গোরাকে অপদস্থ করিয়া সুচরিতার সম্মুখে নিজের জয়পতাকা তুলিয়া ধরিবার জন্য হারানের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, গোড়ায় সুচরিতাও তাহাই আশা করিয়াছিল। কিন্তু, দৈবক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল। ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক মতে সুচরিতার সঙ্গে গোরার মিল ছিল

না। কিন্তু, স্বদেশের প্রতি মমত্ব, স্বজাতির জন্য বেদনা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যদিচ দেশের ব্যাপার লইয়া সে সর্বদা আলোচনা করে নাই, কিন্তু সেদিন স্বজাতির নিন্দায় গোরা যখন অকস্মাৎ বজ্রনাদ করিয়া উঠিল তখন সুচরিতার সমস্ত মনের মধ্যে তাহার অনুকূল প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। এমন বলের সঙ্গে, এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধে কেহ তাহার সম্মুখে কথা বলে নাই। সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা স্বজাতি ও স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে; তাহাকে গভীরভাবে সত্যভাবে বিশ্বাস করে না। এইজন্য মুখে কবিত্ব করিবার বেলায় দেশের সম্বন্ধে যাহাই বলুক, দেশের প্রতি তাহাদের ভরসা নাই। কিন্তু, গোরা তাহার স্বদেশের সমস্ত দুঃখদুর্গতিদুর্বলতা ভেদ করিয়াও একটা মহৎ সত্যপদার্থকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইত— সেইজন্য দেশের দারিদ্র্যকে কিছুমাত্র অস্বীকার না করিয়াও সে দেশের প্রতি এমন একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল। দেশের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি এমন তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তাহার কাছে আসিলে, তাহার দ্বিধাবিহীন দেশভক্তির বাণী শুনিলে সংশয়ীকে হার মানিতে হইত। গোরার এই অক্ষুণ্ণ ভক্তির সম্মুখে হারানের অবজ্ঞাপূর্ণ তর্ক সুচরিতাকে প্রতি মুহূর্তে যেন অপমানের মতো বাজিতেছিল। সে মাঝে মাঝে সংকোচ বিসর্জন দিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

তাহার পরে হারান যখন গোরা ও বিনয়ের অসাক্ষাতে ক্ষুদ্র ঈর্ষাবশত তাহাদের প্রতি অভদ্রতার অপবাদ আরোপ করিলেন, তখনও এই অন্যায় ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সুচরিতাকে গোরাদের পক্ষে দাঁড়াইতে হইল।

অথচ গোরার বিরুদ্ধে সুচরিতার মনের বিদ্রোহ একেবারেই যে শান্ত হইয়াছে তাহাও নহে। গোরার একপ্রকার গায়ে-পড়া উদ্ধত হিন্দুয়ানি তাহাকে এখনো মনে মনে আঘাত করিতেছিল। সে একরকম করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল এই হিন্দুয়ানির মধ্যে একটা প্রতিকূলতার ভাব আছে —ইহা সহজ প্রশান্ত নহে, ইহা নিজের ভক্তি-বিশ্বাসের মধ্যে পর্যাপ্ত নহে—

ইহা অন্যকে আঘাত করিবার জন্য সর্বদাই উগ্রভাবে উদ্যত।

সেদিন সন্ধ্যায় সকল কথায়, সকল কাজে, আহার করিবার কালে, লীলাকে গল্প বলিবার সময়, ক্রমাগতই সুচরিতার মনের তলদেশে একটা কিসের বেদনা কেবলই পীড়া দিতে লাগিল— তাহা কোনোমতেই সে দূর করিতে পারিল না। কাঁটা কোথায় আছে তাহা জানিতে পারিলে তবে কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়। মনের কাঁটাটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সেদিন রাত্রে সুচরিতা সেই গাড়িবারান্দার ছাতে একলা বসিয়া রহিল।

রাত্রির স্নিগ্ধ অন্ধকার দিয়া সে নিজের মনের অকারণ তাপ যেন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। তাহার বুকের অনির্দেশ্য বোঝাটার জন্য তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু কান্না আসিল না।

একজন অপরিচিত যুবা কপালে তিলক কাটিয়া আসিয়াছে, অথবা তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাহার অহংকার নত করা গেল না, এইজন্যই সুচরিতা এতক্ষণ ধরিয়া পীড়া বোধ করিতেছে, ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত হাস্যকর কিছুই হইতে পারে না। এই কারণটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মন হইতে সে বিদায় করিয়া দিল। তখন আসল কারণটা মনে পড়িল এবং মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইল। আজ তিন-চার ঘণ্টা সুচরিতা সেই যুবকের সম্মুখেই বসিয়া ছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্কেও যোগ দিয়াছে অথচ সে তাহাকে একেবারে যেন লক্ষ্যমাত্রই করে নাই; যাইবার সময়েও তাহাকে সে যেন চোখে দেখিতেই পাইল না। এই পরিপূর্ণ উপেক্ষাই যে সুচরিতাকে গভীর ভাবে বিঁধিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাহিরের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অনভ্যাস থাকিলে যে-একটা সংকোচ জন্মে, বিনয়ের ব্যবহারে যে-একটি সংকোচের পরিচয় পাওয়া যায়— সেই সংকোচের মধ্যে একটা সলজ্জ নম্রতা আছে। গোরার আচরণে তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাহার সেই কঠোর এবং প্রবল ঔদাসীন্য সহ্য করা বা তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সুচরিতার পক্ষে আজ কেন এমন অসম্ভব হইয়া উঠিল। এতবড়ো উপেক্ষার সম্মুখেও সে যে আত্মসম্বরণ

না করিয়া তর্কে যোগ দিয়াছিল, নিজের এই প্রগল্‌ভতায় সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। হারানের অন্যায় তর্কে একবার যখন সুচরিতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন গোরা তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল; সে চাহনিতে সংকোচের লেশমাত্র ছিল না— কিন্তু সে চাহনির ভিতর কী ছিল তাহাও বোঝা শক্ত। তখন কি সে মনে মনে বলিতেছিল— এ মেয়েটি কী নির্লজ্জ। অথবা, ইহার অহংকার তো কম নয়, পুরুষমানুষের তর্কে এ অনাহূত যোগ দিতে আসে! তাহাই যদি সে মনে করিয়া থাকে তাহাতে কী আসে যায়। কিছুই আসে যায় না, তবু সুচরিতা অত্যন্ত পীড়া বোধ করিতে লাগিল। এ-সমস্তই ভুলিয়া যাইতে, মুছিয়া ফেলিতে সে একান্ত চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই পারিল না। গোরার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল— গোরাকে সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত যুবক বলিয়া সমস্ত মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে চাহিল, কিন্তু তবু সেই বিপুলকায় বজ্রকণ্ঠ পুরুষের সেই নিঃসংকোচ দৃষ্টির স্মৃতির সম্মুখে সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত ছোটো হইয়া গেল — কোনোমতেই সে নিজের গৌরব খাড়া করিয়া রাখিতে পারিল না।

সকলের বিশেষ লক্ষ্যগোচর হওয়া, আদর পাওয়া, সুচরিতার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে যে মনে মনে এই আদর চাহিত তাহা নহে, কিন্তু আজ গোরার নিকট হইতে উপেক্ষা কেন তাহার কাছে এত অসহ্য হইল! অনেক ভাবিয়া সুচরিতা শেষকালে স্থির করিল যে, গোরাকে সে বিশেষ করিয়া হার মানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল বলিয়াই তাহার অবিচলিত অনবধান এত করিয়া হৃদয়ে আঘাত করিতেছে।

এমনি করিয়া নিজের মনখানা লইয়া টানাছেঁড়া করিতে করিতে রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বাতি নিবাইয়া দিয়া বাড়ির সকলেই ঘুমাইতে গিয়াছে। সদর-দরজা বন্ধ হইবার শব্দ হইল—বোঝা গেল বেহারা রান্না-খাওয়া সারিয়া এইবার শুইতে যাইবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় ললিতা তাহার রাত্রির কাপড় পরিয়া ছাতে আসিল। সুচরিতাকে কিছুই না বলিয়া তাহার পাশ দিয়া গিয়া ছাতের এক কোণে রেলিঙ ধরিয়া

দাঁড়াইল। সুচরিতা মনে মনে একটু হাসিল ; বুঝিল, ললিতা তাহার প্রতি অভিমান করিয়াছে। আজ যে তাহার ললিতার সঙ্গে শুইবার কথা ছিল তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, 'ভুলিয়া গেছি' বলিলে ললিতার কাছে অপরাধ ক্ষালন হয় না ; কারণ, ভুলিতে পারাটাই সকলের চেয়ে গুরুতর অপরাধ। সে যে যথাসময়ে প্রতিশ্রুতি মনে করাইয়া দিবে তেমন মেয়ে নয়। এতক্ষণ সে শক্ত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল— যতই সময় যাইতেছিল ততই তাহার অভিমান তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে যখন নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে বিছানা ছাড়িয়া কেবল নীরবে জানাইতে আসিল যে, 'আমি এখনো জাগিয়া আছি।'

সুচরিতা চৌকি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে ললিতার কাছে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল ; কহিল, "ললিতা, লক্ষ্মী ভাই, রাগ কোরো না ভাই।"

ললিতা সুচরিতার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "না, রাগ কেন করব। তুমি বোসো-না।"

সুচরিতা তাহার হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "চলো ভাই, শুতে যাই।"

ললিতা কোনো উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে সুচরিতা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া শোবার ঘরে লইয়া গেল।

ললিতা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কেন তুমি এত দেরি করলে ? জান এগারোটা বেজেছে ? আমি সমস্ত ঘড়ি শুনেছি। এখনি তো তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।"

সুচরিতা ললিতাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "আজ আমার অন্যায় হয়ে গেছে ভাই।"

যেমনি অপরাধ স্বীকার করা ললিতার আর রাগ রহিল না। একেবারে নরম হইয়া কহিল, "এতক্ষণ একলা বসে কার কথা ভাবছিলে দিদি ? পানুবাবুর কথা ?"

তাহাকে তর্জনী দিয়া আঘাত করিয়া সুচরিতা কহিল, "দূর !"

পানুবাবুকে ললিতা সহিতে পারিত না। এমন-কি, তাহার অন্য বোনের মতো তাহাকে লইয়া সুচরিতাকে ঠাট্টা করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য ছিল।

পানুবাবু সুচরিতাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এ কথা মনে করিলে তাহার রাগ হইত।

একটুখানি চুপ করিয়া ললিতা কথা তুলিল, "আচ্ছা, দিদি, বিনয়বাবু লোকটি কিন্তু বেশ। না?"

সুচরিতার মনের ভাবটা যাচাই করিবার উদ্দেশ্য যে এ প্রশ্নের মধ্যে ছিল না, তাহা বলিতে পারি না।

সুচরিতা কহিল, "*হাঁ, বিনয়বাবু লোকটি ভালো বই-কি*— বেশ ভালোমানুষ।"

ললিতা যে সুর আশা করিয়াছিল তাহা তো সম্পূর্ণ বাজিল না। তখন সে আবার কহিল, "কিন্তু যাই বল দিদি, আমার গৌরমোহনবাবুকে একেবারেই ভালো লাগে নি। কী রকম কটা কটা রঙ, কাঠখোট্টা চেহারা, পৃথিবীর কাউকে যেন গ্রাহ্যই করেন না। তোমার কিরকম লাগল?"

সুচরিতা কহিল, "বড়ো বেশি রকম হিঁদুয়ানি।"

ললিতা কহিল, "না, না, আমাদের মেসোমশায়ের তো খুবই হিঁদুয়ানি কিন্তু সে আর-এক রকমের। এ যেন— ঠিক বলতে পারি নে কিরকম।"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল, "কী রকমই বটে।" বলিয়া গোরার সেই উচ্চ শুভ্র ললাটে তিলক-কাটা মূর্তি মনে আনিয়া সুচরিতা রাগ করিল। রাগ করিবার কারণ এই যে, ওই তিলকের দ্বারা গোরা কপালে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে যে, 'তোমাদের হইতে আমি পৃথক।' সেই পার্থক্যের প্রচণ্ড অভিমানকে সুচরিতা যদি ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত তবেই তাহার গায়ের জ্বালা মিটিত।

আলোচনা বন্ধ হইল, ক্রমে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি যখন দুইটা সুচরিতা জাগিয়া দেখিল, বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; মাঝে মাঝে তাহাদের মশারির আবরণ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের আলো চমকিয়া উঠিতেছে; ঘরের কোণে যে প্রদীপ ছিল সেটা নিবিয়া গেছে। সেই রাত্রির নিস্তব্ধতায়, অন্ধকারে, অবিশ্রাম বৃষ্টির শব্দে, সুচরিতার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ

হইতে লাগিল। সে এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুমাইবার অনেক চেষ্টা করিল— পাশেই ললিতাকে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন দেখিয়া তাহার ঈর্ষা জন্মিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বিরক্ত হইয়া সে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। খোলা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সম্মুখের ছাতের দিকে চাহিয়া রহিল— মাঝে মাঝে বাতাসের বেগে গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। সেই সূর্যাস্তরঞ্জিত গাড়িবারান্দার উপর গোরার উদ্দীপ্ত মুখ স্পষ্ট ছবির মতো তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল এবং তখন তর্কের যে-সমস্ত কথা কানে শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল সে-সমস্তই গোরার গভীর প্রবল কণ্ঠস্বরে জড়িত হইয়া আগাগোড়া তাহার মনে পড়িল। কানে বাজিতে লাগিল, 'আপনারা যাদের অশিক্ষিত বলেন, আমি তাদেরই দলে— আপনারা যাকে কুসংস্কার বলেন আমার সংস্কার তাই। যতক্ষণ না আপনি দেশকে ভালোবাসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ্য করতে পারব না।' এ কথার উত্তরে পানুবাবু কহিলেন, 'এমন করলে দেশের সংশোধন হবে কী করে?' গোরা গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, 'সংশোধন! সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়েও বড়ো কথা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। আগে আমরা এক হব, তা হলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে। আপনারা যে পৃথক হয়ে দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চান— আপনারা বলেন, দেশের কুসংস্কার আছে, অতএব আমরা সুসংস্কারীর দল আলাদা হয়ে থাকব। আমি এই কথা বলি, আমি কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারও থেকে পৃথক হব না, এই আমার সকলের চেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা— তার পর এক হ'লে কোন্ সংস্কার থাকবে, কোন্ সংস্কার যাবে, তা আমার দেশই জানে এবং দেশের যিনি বিধাতা তিনিই জানেন।' পানুবাবু কহিলেন, 'এমন-সকল প্রথা ও সংস্কার আছে যা দেশকে এক হতে দিচ্ছে না।' গোরা কহিল, 'যদি এই কথা মনে করেন যে, আগে সেই-সমস্ত-প্রথা ও সংস্কারকে একে একে

উৎপাটিত করে ফেলবেন, তার পরে দেশ এক হবে, তবে সমুদ্রকে ছেঁচে ফেলে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করা হবে। অবজ্ঞা ও অহংকার দূর ক'রে, নম্র হয়ে, ভালোবেসে নিজেকে অন্তরের সঙ্গে সকলের করুন ; সেই ভালোবাসার কাছে সহস্র ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সহজেই হার মানবে। সকল দেশের সকল সমাজেই ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে, কিন্তু দেশের লোকে স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার টানে যতক্ষণ এক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিষ কাটিয়ে চলতে পারে। পচবার কারণ হাওয়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু, বেঁচে থাকলেই সেটা কাটিয়ে চলি, মরে গেলেই পচে উঠি। আমি আপনাকে বলছি, সংশোধন করতে যদি আসেন তো আমরা সহ্য করব না, তা আপনারাই হোন বা মিশনারিই হোন।' পানুবাবু কহিলেন, 'কেন করবেন না।' গোরা কহিল, 'করব না তার কারণ আছে। বাপ-মায়ের সংশোধন সহ্য করা যায়, কিন্তু পাহারাওয়ালার সংশোধনে শোধনের চেয়ে অপমান অনেক বেশি— সেই সংশোধন সহ্য করতে হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আগে আত্মীয় হবেন, তার পরে সংশোধক হবেন— নইলে আপনার মুখের ভালো কথাতেও আমাদের অনিষ্ট হবে। এমনি করিয়া একটি একটি সমস্ত কথা আগাগোড়া সুচরিতার মনে উঠিতে লাগিল এবং এই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা অনির্দেশ্য বেদনাও কেবলই পীড়া দিতে থাকিল। শ্রান্ত হইয়া সুচরিতা বিছানায় ফিরিয়া আসিল এবং চোখের উপর করতল চাপিয়া সমস্ত ভাবনাকে ঠেলিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ ও কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল এবং এই-সমস্ত আলোচনা ভাঙিয়া চুরিয়া তাহার মনের মধ্যে কেবলই আনাগোনা করিতে থাকিল।

১২

বিনয় ও গোরা পরেশের বাড়ি হইতে রাস্তায় বাহির হইলে বিনয় কহিল, "গোরা, একটু আস্তে আস্তে চলো ভাই— তোমার পা দুটো আমাদের চেয়ে

অনেক বড়ো, ওর চালটা একটু খাটো না করলে তোমার সঙ্গে যেতে আমরা হাঁপিয়ে পড়ি।"

গোরা কহিল, "আমি একলাই যেতে চাই, আমার আজ অনেক কথা ভাববার আছে।"

বলিয়া তাহার স্বাভাবিক দ্রুত গতিতে সে বেগে চলিয়া গেল।

বিনয়ের মনে আঘাত লাগিল। সে আজ গোরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। সে সম্বন্ধে গোরার কাছে তিরস্কার ভোগ করিলে সে খুশি হইত। একটা ঝড় হইয়া গেলেই তাহাদের চিরদিনের বন্ধুত্বের আকাশ হইতে গুমট কাটিয়া যাইত এবং সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত।

তাহা ছাড়া আর-একটা কথা তাহাকে পীড়া দিতেছিল। আজ হঠাৎ গোরা পরেশের বাড়িতে প্রথম আসিয়াই বিনয়কে সেখানে বন্ধুভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে করিয়াছে, বিনয় এ বাড়িতে সর্বদাই যাতায়াত করে। অবশ্য, যাতায়াত করিলে যে কোনো অপরাধ আছে তাহা নয়; গোরা যাহাই বলুক, পরেশবাবুর সুশিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়া বিনয় একটা বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে। ইঁহাদের সঙ্গে মেশামেশি করাতে গোরা যদি কোনো দোষ দেখে তবে সেটা তাহার নিতান্ত গোঁড়ামি। কিন্তু পূর্বের কথাবার্তায় গোরা নাকি জানিয়াছে যে, বিনয় পরেশবাবুর বাড়িতে যাওয়া-আসা করে না; আজ সহসা তাহার মনে হইতে পারে যে, সে কথাটা সত্য নয়। বিশেষত বরদাসুন্দরী তাহাকে বিশেষ করিয়া ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, সেখানে তাঁহার মেয়েদের সঙ্গে তাহার আলাপ হইতে লাগিল— গোরার তীক্ষ্ণ লক্ষ হইতে ইহা এড়াইয়া যায় নাই। মেয়েদের সঙ্গে এইরূপ মেলামেশায় ও বরদাসুন্দরীর আত্মীয়তায় মনে মনে বিনয় ভারি একটা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছিল— কিন্তু সেই সঙ্গে এই পরিবারে গোরার সঙ্গে তাহার আদরের পার্থক্য তাহাকে ভিতরে ভিতরে বাজিতেছিল। আজ পর্যন্ত এই দুই সহপাঠীর নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝখানে কেহই বাধাস্বরূপ দাঁড়ায় নাই।

একবার কেবল গোরার ব্রাহ্মসামাজিক উৎসাহে উভয়ের বন্ধুত্বে একটা ক্ষণিক আচ্ছাদন পড়িয়াছিল— কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, বিনয়ের কাছে মত জিনিসটা খুব একটা বড়ো ব্যাপার নহে; সে মত লইয়া যতই লড়ালড়ি করুক-না কেন, মানুষই তাহার কাছে বেশি সত্য। এবারে তাহাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে মানুষের আড়াল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া সে ভয় পাইয়াছে। পরেশের পরিবারের সহিত সম্বন্ধকে বিনয় মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, কারণ, তাহার জীবনে ঠিক এমন আনন্দের আস্বাদন সে আর কখনো পায় নাই— কিন্তু গোরার বন্ধুত্ব বিনয়ের জীবনের অঙ্গীভূত; সেই বন্ধুত্ব হইতে বিরহিত জীবনকেই সে কল্পনা করিতে পারে না।

এ-পর্যন্ত কোনো মানুষকেই বিনয় গোরার মতো তাহার হৃদয়ের এত কাছে আসিতে দেয় নাই। আজ পর্যন্ত সে কেবল বই পড়িয়াছে এবং গোরার সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, ঝগড়া করিয়াছে, আর গোরাকেই ভালোবাসিয়াছে; সংসারে আর-কাহাকেও কিছুমাত্র আমল দিবার অবকাশই হয় নাই। গোরারও ভক্তসম্প্রদায়ের অভাব নাই, কিন্তু বন্ধু বিনয় ছাড়া আর-কেহই ছিল না। গোরার প্রকৃতির মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতার ভাব আছে— এ দিকে সে সামান্য লোকের সঙ্গে মিশিতে অবজ্ঞা করে না, অথচ নানাবিধ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অধিকাংশ লোকই তাহার সঙ্গে একটা দূরত্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ বিনয় বুঝিতে পারিল, পরেশবাবুর পরিজনদের প্রতি তাহার হৃদয় গভীরতর রূপে আকৃষ্ট হইতেছে। অথচ আলাপ বেশিদিনের নহে। ইহাতে সে গোরার কাছে যেন একটা অপরাধের লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

এই-যে বরদাসুন্দরী আজ বিনয়কে তাঁহার মেয়েদের ইংরেজি হস্তলিপি ও শিল্পকাজ দেখাইয়া ও আবৃত্তি শুনাইয়া মাতৃগর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন, গোরার কাছে যে ইহা কিরূপ অবজ্ঞাজনক তাহা বিনয় মনে মনে সুস্পষ্ট কল্পনা করিতেছিল। বস্তুতই ইহার মধ্যে যথেষ্ট হাস্যকর ব্যাপার ছিল;

এবং বরদাসুন্দরীর মেয়েরা যে অল্পস্বল্প ইংরেজি শিখিয়াছে, ইংরেজ মেমের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে, এবং লেপ্টেনাণ্ট্‌ গবর্নরের স্ত্রীর কাছে ক্ষণকালের জন্য প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে, এই গর্বের মধ্যে এক হিসাবে একটা দীনতাও ছিল। কিন্তু এ-সমস্ত বুঝিয়া জানিয়াও বিনয় এই ব্যাপারটাকে গোরার আদর্শ-অনুসারে ঘৃণা করিতে পারে নাই। তাহার এ-সমস্ত বেশ ভালোই লাগিতেছিল। লাবণ্যের মতো মেয়ে— মেয়েটি দিব্য সুন্দর দেখিতে তাহাতে সন্দেহ নাই— বিনয়কে নিজের হাতের লেখা মুরের কবিতা দেখাইয়া যে বেশ একটু অহংকার বোধ করিতেছিল ইহাতে বিনয়েরও অহংকারের তৃপ্তি হইয়াছিল। বরদাসুন্দরীর মধ্যে এ কালের ঠিক রঙটি ধরে নাই, অথচ তিনি অতিরিক্ত উদগ্রভাবে এ-কালীয়তা ফলাইতে ব্যস্ত— বিনয়ের কাছে এই অসামঞ্জস্যের অসংগতিটা ধরা পড়ে নাই যে তাহা নহে, তবুও বরদাসুন্দরীকে বিনয়ের বেশ ভালো লাগিয়াছিল। তাঁহার অহংকার ও অসহিষ্ণুতার সারল্যটুকুতে বিনয়ের প্রীতি বোধ হইয়াছিল। মেয়েরা যে তাহাদের হাসির শব্দে ঘর মধুর করিয়া রাখিয়াছে, চা তৈরি করিয়া পরিবেষণ করিতেছে, নিজেদের হাতের শিল্পে ঘরের দেয়াল সাজাইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি কবিতা পড়িয়া উপভোগ করিতেছে, ইহা যতই সামান্য হউক, বিনয় ইহাতেই মুগ্ধ হইয়াছে। বিনয় এমন রস তাহার মানবসঙ্গবিরল জীবনে আর কখনো পায় নাই। এই মেয়েদের বেশভূষা হাসিকথা কাজকর্ম লইয়া কত মধুর ছবিই যে সে মনে মনে আঁকিতে লাগিল তাহার আর সংখ্যা নাই। শুধু বই পড়িয়া এবং মত লইয়া তর্ক করিতে করিতে যে-ছেলে কখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে জানিতেও পারে নাই, তাহার কাছে পরেশের এই সামান্য বাসাটির অভ্যন্তরে এক নূতন এবং আশ্চর্য জগৎ প্রকাশ পাইল।

গোরা যে বিনয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল সে রাগকে বিনয় অন্যায় মনে করিতে পারিল না। এই দুই বন্ধুর বহুদিনের সম্বন্ধে এত-কাল পরে আজ একটা সত্যকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ষারাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারকে স্পন্দিত করিয়া মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিয়া

উঠিল। বিনয়ের মনে অত্যন্ত একটা ভার বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তাহার জীবন চিরদিন যে পথ বাহিয়া আসিতেছিল আজ তাহা ছাড়িয়া দিয়া আর-একটা নূতন পথ লইয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যে গোরা কোথায় গেল এবং সে কোথায় চলিল!

বিচ্ছেদের মুখে প্রেমের বেগ বাড়িয়া উঠে। গোরার প্রতি প্রেম বিনয়ের হৃদয়ে যে কত বৃহৎ এবং কত প্রবল, আজ সেই প্রেমে আঘাত লাগিবার দিনে তাহা বিনয় অনুভব করিল।

বাসায় আসিয়া রাত্রির অন্ধকার এবং ঘরের নির্জনতাকে বিনয়ের অত্যন্ত নিবিড় এবং শূন্য বোধ হইতে লাগিল। গোরার বাড়ি যাইবার জন্য একবার সে বাহিরে আসিল; কিন্তু আজ রাত্রে গোরার সঙ্গে যে তাহার হৃদয়ের মিলন হইতে পারিবে এমন সে আশা করিতে পারিল না, তাই সে আবার ফিরিয়া গিয়া শ্রান্ত হইয়া বিছানার মধ্যে শুইয়া পড়িল।

পরের দিন সকালে উঠিয়া তাহার মন হালকা হইয়া গেল। রাত্রে কল্পনায় সে আপনার বেদনাকে অনাবশ্যক অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল— সকালে গোরার সহিত বন্ধুত্ব এবং পরেশের পরিবারের সহিত আলাপ, তাহার কাছে একান্ত পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হইল না। ব্যাপারখানা এমন কী গুরুতর, এই বলিয়া কাল রাত্রিকার মনঃপীড়ায় আজ বিনয়ের হাসি পাইল।

বিনয় কাঁধে একখানা চাদর লইয়া দ্রুতপদে গোরার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরা তখন তাহার নীচের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বিনয় যখন রাস্তায় তখনই গোরা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু আজ বিনয়ের আগমনে খবরের কাগজ হইতে তাহার দৃষ্টি উঠিল না। বিনয় আসিয়াই কোনো কথা না বলিয়া ফস্ করিয়া গোরার হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইল।

গোরা কহিল, "বোধ করি তুমি ভুল করছ— আমি গৌরমোহন— একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু।"

বিনয় কহিল, "ভুল তুমিই হয়তো করছ। আমি হচ্ছি শ্রীযুক্ত বিনয়—

উক্ত গৌরমোহনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধু।"

গোরা। কিন্তু গৌরমোহন এতই বেহায়া যে, সে তার কুসংস্কারের জন্য কারও কাছে কোনোদিন লজ্জা বোধ করে না।

বিনয়। বিনয়ও ঠিক তদ্রূপ। তবে কিনা সে নিজের সংস্কার নিয়ে তেড়ে অন্যকে আক্রমণ করতে যায় না।

দেখিতে দেখিতে দুই বন্ধুতে তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল। পাড়াসুদ্ধ লোক বুঝিতে পারিল— আজ গোরার সঙ্গে বিনয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

গোরা কহিল, "তুমি যে পরেশবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করছ, সে কথা সেদিন আমার কাছে অস্বীকার করার কী দরকার ছিল?"

বিনয়। কোনো দরকার-বশত অস্বীকার করি নি— যাতায়াত করি নে বলেই অস্বীকার করেছিলুম। এতদিন পরে কাল প্রথম তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেছি।

গোরা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, অভিমন্যুর মতো তুমি প্রবেশ করবার রাস্তাই জান, বেরোবার রাস্তা জান না।

বিনয়। তা হতে পারে— ওইটে হয়তো আমার জন্মগত প্রকৃতি। আমি যাকে শ্রদ্ধা করি বা ভালোবাসি তাকে আমি ত্যাগ করতে পারি নে। আমার এই স্বভাবের পরিচয় তুমিও পেয়েছ।

গোরা। এখন থেকে তা হলে ওখানে যাতায়াত চলতে থাকবে?

বিনয়। একলা আমারই যে চলতে থাকবে এমন কী কথা আছে? তোমারও তো চলৎশক্তি আছে, তুমি তো স্থাবর পদার্থ নও।

গোরা। আমি তো যাই এবং আসি, কিন্তু তোমার যে লক্ষণ দেখলুম তুমি যে একেবারে যাবারই দাখিল। গরম চা কী রকম লাগল?

বিনয়। কিছু কড়া লেগেছিল।

গোরা। তবে?

বিনয়। না খাওয়াটা তার চেয়ে বেশি কড়া লাগত।

গোরা। সমাজপালনটা তা হলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতাপালন?

বিনয়। সব সময়ে নয়। কিন্তু দেখো গোরা, সমাজের সঙ্গে যেখানে হৃদয়ের সংঘাত বাধে সেখানে আমার পক্ষে—

গোরা অধীর হইয়া উঠিয়া বিনয়কে কথাটা শেষ করিতেই দিল না। সে গর্জিয়া কহিল, "হৃদয়! সমাজকে তুমি ছোটো করে তুচ্ছ করে দেখ বলেই কথায় কথায় তোমার হৃদয়ের সংঘাত বাধে। কিন্তু সমাজকে আঘাত করলে তার বেদনা যে কতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় তা যদি অনুভব করতে তা হলে তোমার ওই হৃদয়টার কথা তুলতে তোমার লজ্জা বোধ হত। পরেশবাবুর মেয়েদের মনে একটুখানি আঘাত দিতে তোমার ভারি কষ্ট লাগে— কিন্তু আমার কষ্ট লাগে, এতটুকুর জন্যে সমস্ত দেশকে যখন অনায়াসে আঘাত করতে পার।"

বিনয় কহিল, "তবে সত্য কথা বলি ভাই গোরা। এক পেয়ালা চা খেলে সমস্ত দেশকে যদি আঘাত করা হয় তবে সে আঘাতে দেশের উপকার হবে। তার থেকে বাঁচিয়ে চললে দেশটাকে অত্যন্ত দুর্বল, বাবু করে তোলা হবে।"

গোরা। ওগো, মশায়, ও-সমস্ত যুক্তি আমি জানি— আমি যে একেবারে অবুঝ তা মনে কোরো না। কিন্তু এ-সমস্ত এখনকার কথা নয়। রুগি ছেলে যখন ওষুধ খেতে চায় না, মা তখন সুস্থ শরীরেও নিজে ওষুধ খেয়ে তাকে জানাতে চায় যে তোমার সঙ্গে আমার এক দশা— এটা তো যুক্তির কথা নয়, এটা ভালোবাসার কথা। এই ভালোবাসা না থাকলে যতই যুক্তি থাক্-না, ছেলের সঙ্গে মায়ের যোগ নষ্ট হয়। তা হলে কাজও নষ্ট হয়। আমিও চায়ের পেয়ালা নিয়ে তর্ক করি না— কিন্তু দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারি না— চা না খাওয়া তার চেয়ে ঢের সহজ— পরেশবাবুর মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়া তার চেয়ে ঢের ছোটো। সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলাই আমাদের এখনকার অবস্থায় সকলের চেয়ে প্রধান কাজ। যখন মিলন হয়ে যাবে তখন চা খাবে কি না-খাবে দু কথায় সে তর্কের মীমাংসা হয়ে যাবে।

বিনয়। তা হলে আমার দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাবার অনেক বিলম্ব আছে দেখছি।

গোরা। না, বেশি বিলম্ব করবার দরকার নেই। কিন্তু, বিনয়, আমাকে আর কেন? হিন্দুসমাজের অনেক অপ্রিয় জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ছাড়বার সময় এসেছে। নইলে পরেশবাবুর মেয়েদের মনে আঘাত লাগবে।

এমন সময় অবিনাশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে গোরার শিষ্য। গোরার মুখ হইতে সে যাহা শোনে তাহাই সে নিজের বুদ্ধির দ্বারা ছোটো এবং নিজের ভাষার দ্বারা বিকৃত করিয়া চারি দিকে বলিয়া বেড়ায়। গোরার কথার যাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না, অবিনাশের কথা তাহারা বেশ বোঝে ও প্রশংসা করে।

বিনয়ের প্রতি অবিনাশের অত্যন্ত একটা ঈর্ষার ভাব আছে। তাই সে জো পাইলেই বিনয়ের সঙ্গে নির্বোধের মতো তর্ক করিতে চেষ্টা করে। বিনয় তাহার মূঢ়তায় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে; তখন গোরা অবিনাশের তর্ক নিজে তুলিয়া লইয়া বিনয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অবিনাশ মনে করে তাহারই যুক্তি যেন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে।

অবিনাশ আসিয়া পড়াতে গোরার সঙ্গে মিলন-ব্যাপারে বিনয় বাধা পাইল। সে তখন উঠিয়া উপরে গেল। আনন্দময়ী তাঁহার ভাঁড়ার-ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন, "অনেক ক্ষণ থেকে তোমাদের গলা শুনতে পাচ্ছি। এত সকালে যে? জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছ তো?"

অন্য দিন হইলে বিনয় বলিত 'না, খাই নাই'— এবং আনন্দময়ীর সম্মুখে বসিয়া তাহার আহার জমিয়া উঠিত। কিন্তু আজ বলিল, "না, মা, খাব না— খেয়েই বেরিয়েছি।"

আজ বিনয় গোরার কাছে অপরাধ বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। পরেশবাবুর সঙ্গে তাহার সংস্রবের জন্য গোরা যে এখনো তাহাকে ক্ষমা করে নাই, তাহাকে একটু যেন দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে, ইহা অনুভব করিয়া

তাহার মনের ভিতরে ভিতরে একটা ক্লেশ হইতেছিল। সে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া আলুর খোসা ছাড়াইতে বসিয়া গেল।

মিনিট পনেরো পরে নীচে গিয়া দেখিল, গোরা অবিনাশকে লইয়া বাহির হইয়া গেছে। গোরার ঘরে বিনয় অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে খবরের কাগজ হাতে লইয়া শূন্যমনে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

১৩

মধ্যাহ্নে গোরার কাছে যাইবার জন্য বিনয়ের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিনয় গোরার কাছে নিজেকে নত করিতে কোনোদিন সংকোচ বোধ করে নাই। কিন্তু নিজের অভিমান না থাকিলেও বন্ধুত্বের অভিমানকে ঠেকানো শক্ত। পরেশবাবুর কাছে ধরা দিয়া বিনয় গোরার প্রতি তাহার এতদিনকার নিষ্ঠায় একটু যেন খাটো হইয়াছে বলিয়া অপরাধ অনুভব করিতেছিল বটে, কিন্তু সেজন্য গোরা তাহাকে পরিহাস ও ভর্ৎসনা করিবে এই পর্যন্তই আশা করিয়াছিল, তাহাকে যে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে মনেও করে নাই। বাসা হইতে খানিকটা দূর বাহির হইয়া বিনয় আবার ফিরিয়া আসিল; বন্ধুত্ব পাছে অপমানিত হয়, এই ভয়ে সে গোরার বাড়িতে যাইতে পারিল না।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গোরাকে একখানা চিঠি লিখিবে বলিয়া কাগজ-কলম লইয়া বিনয় বসিয়াছে; বসিয়া অকারণে কলমটাকে ভোঁতা অপবাদ দিয়া একটা ছুরি লইয়া অতিশয় যত্নে একটু একটু করিয়া তাহার সংস্কার করিতে লাগিয়াছে, এমন সময় নীচে হইতে 'বিনয়' বলিয়া ডাক আসিল। বিনয় কলম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া বলিল, "মহিমদাদা, আসুন, উপরে আসুন।"

মহিম উপরের ঘরে আসিয়া বিনয়ের খাটের উপর বেশ চৌকা হইয়া

বসিলেন এবং ঘরের আসবাবপত্র বেশ ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "দেখো, বিনয়, তোমার বাসা যে আমি চিনি নে তা নয়— মাঝে মাঝে তোমার খবর নিয়ে যাই এমন ইচ্ছাও করে। কিন্তু, আমি জানি তোমরা আজকালকার ভালো ছেলে, তোমাদের এখানে তামাকটি পাবার জো নেই, তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে—"

বিনয়কে ব্যস্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া মহিম কহিলেন, "তুমি ভাবছ এখনি বাজার থেকে নতুন হুঁকো কিনে এনে আমাকে তামাক খাওয়াবে, সে চেষ্টা কোরো না। তামাক না দিলে ক্ষমা করতে পারব, কিন্তু নতুন হুঁকোয় আনাড়ি হাতের সাজা তামাক আমার সহ্য হবে না।"

এই বলিয়া মহিম বিছানা হইতে একটা হাতপাখা তুলিয়া লইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে কহিলেন, "আজ রবিবারের দিবানিদ্রাটা সম্পূর্ণ মাটি করে তোমার এখানে এসেছি, তার একটু কারণ আছে। আমার একটি উপকার তোমাকে করতেই হবে।"

বিনয় "কী উপকার" জিজ্ঞাসা করিল। মহিম কহিলেন, "আগে কথা দাও, তবে বলব।"

বিনয়। আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় তবে তো?

মহিম। কেবলমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। আর কিছু নয়, তুমি একবার 'হাঁ' বললেই হয়।

বিনয়। আমাকে এত করে কেন বলছেন। আপনি তো জানেন, আমি আপনাদের ঘরেরই লোক— পারলে আপনার উপকার করব না, এ হতেই পারে না।

মহিম পকেট হইতে একটা পানের দোনা বাহির করিয়া তাহা হইতে গোটা দুয়েক পান বিনয়কে দিয়া বাকি তিনটে নিজের মুখে পুরিলেন ও চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন, "আমার শশিমুখীকে তো তুমি জানই। দেখতে-শুনতে নেহাত মন্দ নয়, অর্থাৎ বাপের মতো হয় নি। বয়স প্রায় দশের কাছাকাছি হল, এখন ওকে পাত্রস্থ করবার সময় হয়েছে। কোন্

লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়বে, এই ভেবে আমার তো রাত্রে ঘুম হয় না।”

বিনয় কহিল, “ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, এখনো সময় আছে।”

মহিম। নিজের মেয়ে যদি থাকত তো বুঝতে কেন ব্যস্ত হচ্ছি। বছর গেলেই বয়েস আপনি বাড়ে, কিন্তু পাত্র তো আপনি আসে না। কাজেই দিন যত যায় মন ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখন, তুমি যদি একটু আশ্বাস দাও তা হলে না হয় দু-দিন সবুর করতেও পারি।

বিনয়। আমার তো বেশি লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় নেই— কলকাতার মধ্যে আপনাদের বাড়ি ছাড়া আর-কোনো বাড়ি জানি নে বললেই হয়— তবু আমি খোঁজ করে দেখব।

মহিম। শশিমুখীর স্বভাবচরিত্র তো জান।

বিনয়। জানি বই-কি। ওকে এতটুকুবেলা থেকে দেখে আসছি— লক্ষ্মী মেয়ে।

মহিম। তবে আর বেশিদূর খোঁজ করবার কী দরকার বাপু। ও মেয়ে তোমারই হাতে আমি সমর্পণ করব।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, “বলেন কী!”

মহিম। কেন, অন্যায় কী বলেছি? অবশ্য, কুলে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো— কিন্তু, বিনয়, এত পড়াশুনো করে যদি তোমরা কুল মানবে তবে হল কী!

বিনয়। না, না, কুলের কথা হচ্ছে না, কিন্তু বয়েস যে—

মহিম। বল কী! শশীর বয়েস কম কী হল! হিঁদুর ঘরের মেয়ে তো মেমসাহেব নয়— সমাজকে তো উড়িয়ে দিলে চলে না।

মহিম সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন— বিনয়কে তিনি অস্থির করিয়া তুলিলেন। অবশেষে বিনয় কহিল, “আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।”

মহিম। আমি তো আজ রাত্রেই দিন স্থির করছি নে।

বিনয়। তবু, বাড়ির লোকদের—

মহিম। হাঁ, সে তো বটেই। তাঁদের মত নিতে হবে বই-কি। তোমার

খুড়োমশায় যখন বর্তমান আছেন তাঁর অমতে তো কিছু হতে পারে না।

এই বলিয়া পকেট হইতে দ্বিতীয় পানের দোনা নিঃশেষ করিয়া যেন কথাটা পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছে, এইরূপ ভাব করিয়া মহিম চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পূর্বে আনন্দময়ী একবার শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের প্রস্তাব আভাসে উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয় তাহা কানেও তোলে নাই। আজও প্রস্তাবটা যে বিশেষ সংগত বোধ হইল তাহা নহে, কিন্তু তবু কথাটা মনের মধ্যে একটুখানি যেন স্থান পাইল। বিনয়ের মনে হইল, এই বিবাহ ঘটিলে আত্মীয়তা-সম্বন্ধে গোরা তাহাকে কোনোদিন ঠেলিতে পারিবে না। বিবাহ ব্যাপারটাকে হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত করাকে ইংরেজিয়ানা বলিয়াই সে এতদিন পরিহাস করিয়া আসিয়াছে, তাই শশিমুখীকে বিবাহ করাটা তাহার কাছে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। মহিমের এই প্রস্তাব লইয়া গোরার সঙ্গে পরামর্শ করিবার যে একটা উপলক্ষ্য জুটিল আপাতত ইহাতেই সে খুশি হইল। বিনয়ের ইচ্ছা, গোরা এই লইয়া তাহাকে একটু পীড়াপীড়ি করে। মহিমকে সহজে সম্মতি না দিলে মহিম গোরাকে দিয়া তাহাকে অনুরোধ করাইবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে বিনয়ের সন্দেহ ছিল না।

এই-সমস্ত আলোচনা করিয়া বিনয়ের মনের অবসাদ কাটিয়া গেল। সে তখনই গোরার বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চাদর কাঁধে বাহির হইয়া পড়িল। অল্প একটু দূর যাইতেই পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইল, "বিনয়বাবু!" পিছন ফিরিয়া দেখিল সতীশ তাহাকে ডাকিতেছে।

সতীশকে সঙ্গে লইয়া আবার বিনয় বাসায় প্রবেশ করিল। সতীশ পকেট হইতে রুমালের পুঁটুলি বাহির করিয়া কহিল, "এর মধ্যে কী আছে বলুন দেখি।"

বিনয় 'মড়ার মাথা' 'কুকুরের বাচ্ছা' প্রভৃতি নানা অসম্ভব জিনিসের নাম করিয়া সতীশের নিকট তর্জন লাভ করিল। তখন সতীশ তাহার রুমাল খুলিয়া গোটাপাঁচেক কালো কালো ফল বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ

কী বলুন দেখি।"

বিনয় যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। অবশেষে পরাভব স্বীকার করিলে সতীশ কহিল, রেঙ্গুনে তাহার এক মামা আছেন, তিনি সেখানকার এই ফল তাহার মার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন— মা তাহারই পাঁচটা বিনয়বাবুকে উপহার পাঠাইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের ম্যাঙ্গোস্টিন ফল তখনকার দিনে কলিকাতায় সুলভ ছিল না; তাই বিনয় ফলগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া টিপিয়া-টুপিয়া কহিল, "সতীশবাবু, ফলগুলো খাব কী করে?"

সতীশ বিনয়ের এই অজ্ঞতায় হাসিয়া কহিল, "দেখবেন, কামড়ে খাবেন না যেন— ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়।"

সতীশ নিজেই এই ফল কামড় দিয়া খাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া আজ কিছুক্ষণ পূর্বে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছে— সেই জন্য বিনয়ের অনভিজ্ঞতায় বিজ্ঞজনোচিত হাস্য করিয়া তাহার মনের বেদনা দূর হইল।

তাহার পরে দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে কিছু ক্ষণ কৌতুকালাপ হইলে পর সতীশ কহিল, "বিনয়বাবু, মা বলেছেন, আপনার যদি সময় থাকে তো একবার আমাদের বাড়ি আসতে হবে— আজ লীলার জন্মদিন।"

বিনয় বলিল, "আজ, ভাই, আমার সময় হবে না, আজ আমি আর-এক জায়গায় যাচ্ছি।"

সতীশ। কোথায় যাচ্ছেন?

বিনয়। আমার বন্ধুর বাড়িতে।

সতীশ। আপনার সেই বন্ধু?

বিনয়। হাঁ।

'বন্ধুর বাড়িতে যেতে পারেন, অথচ আমাদের বাড়ি যাবেন না' ইহার যৌক্তিকতা সতীশ বুঝিতে পারিল না— বিশেষত বিনয়ের এই বন্ধুকে সতীশের ভালো লাগে নাই; সে যেন ইস্কুলের হেড্‌মাস্টারের চেয়ে কড়া

লোক, তাহাকে আগিন শুনাইয়া কেহ যশ লাভ করিবে সে এমন ব্যক্তিই নয়। এমন লোকের কাছে যাইবার জন্য বিনয় যে কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করিবে তাহা সতীশের কাছে ভালোই লাগিল না। সে কহিল, "না, বিনয়বাবু, আপনি আমাদের বাড়ি আসুন।"

'আহ্বানসত্ত্বেও পরেশবাবুর বাড়িতে না গিয়া গোরার কাছে যাইব' বিনয় এটা মনে মনে খুব আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিল। আহত বন্ধুত্বের অভিমানকে আজ সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না, গোরার প্রতি বন্ধুত্বের গৌরবকেই সে সকলের ঊর্ধ্বে রাখিবে, ইহাই সে স্থির করিয়াছিল।

কিন্তু হার মানিতে তাহার বেশি ক্ষণ লাগিল না। দ্বিধা করিতে করিতে, মনের মধ্যে আপত্তি করিতে করিতে, অবশেষে বালকের হাত ধরিয়া সেই আটাত্তর নম্বরেরই পথে সে চলিল। বর্মা হইতে আগত দুর্লভ ফলের এক অংশ বিনয়কে মনে করিয়া পাঠানোতে যে আত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে খাতির না করা বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব।

বিনয় পরেশবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিল, পানুবাবু এবং আর কয়েক জন অপরিচিত ব্যক্তি পরেশবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। লীলার জন্মদিনের মধ্যাহ্নভোজনে তাহারা নিমন্ত্রিত ছিল। পানুবাবু যেন বিনয়কে দেখিতে পান নাই, এমনি ভাবে চলিয়া গেলেন।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই বিনয় খুব একটা হাসির ধ্বনি এবং দৌড়া-দৌড়ির শব্দ শুনিতে পাইল। সুধীর লাবণ্যর চাবি চুরি করিয়াছে; শুধু তাই নয়, দেরাজের মধ্যে লাবণ্যর খাতা আছে এবং সেই খাতার মধ্যে কবিযশঃ-প্রার্থিনীর উপহাস্যতার উপকরণ আছে, তাহাই এই দস্যু লোকসমাজে উদ্‌ঘাটন করিবে বলিয়া শাসাইতেছে; ইহাই লইয়া উভয় পক্ষে যখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে এমন সময়ে রঙ্গভূমিতে বিনয় প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া লাবণ্যর দল মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্ধান করিল। সতীশ তাহাদের কৌতুকের ভাগ লইবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল। কিছু ক্ষণ পরে সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "মা আপনাকে একটু বসতে

বললেন, এখনই তিনি আসছেন। বাবা অনাথবাবুদের বাড়ি গেছেন, তাঁরও আসতে দেরি হবে না।"

সুচরিতা বিনয়ের সংকোচ ভাঙিয়া দিবার জন্য গোরার কথা তুলিল। হাসিয়া কহিল, "তিনি বোধ হয় আমাদের এখানে আর কখনো আসবেন না ?"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

সুচরিতা কহিল, "আমরা পুরুষদের সামনে বেরোই দেখে তিনি নিশ্চয় অবাক হয়ে গেছেন। ঘরকরনার মধ্যে ছাড়া মেয়েদের আর কোথাও দেখলে তিনি বোধ হয় তাদের শ্রদ্ধা করতে পারেন না।"

বিনয় ইহার উত্তর দিতে কিছু মুশকিলে পড়িয়া গেল। কথাটার প্রতিবাদ করিতে পারিলেই সে খুশি হইত, কিন্তু মিথ্যা বলিবে কী করিয়া। বিনয় কহিল, "গোরার মত এই যে, ঘরের কাজেই মেয়েরা সম্পূর্ণ মন না দিলে তাদের কর্তব্যের একাগ্রতা নষ্ট হয়।"

সুচরিতা কহিল, "তা হলে মেয়েপুরুষে মিলে ঘর-বাহিরকে একেবারে ভাগ করে নিলেই তো ভালো হত। পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় বলে তাঁদের বাইরের কর্তব্য হয়তো ভালো করে সম্পন্ন হয় না। আপনিও আপনার বন্ধুর মতে মত দেন নাকি ?"

নারীনীতি সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত তো বিনয় গোরার মতেই মত দিয়া আসিয়াছিল। ইহা লইয়া সে কাগজে লেখালেখিও করিয়াছে। কিন্তু সেইটেই যে বিনয়ের মত, এখন তাহা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। সে কহিল, "দেখুন, আসলে এ-সকল বিষয়ে আমরা অভ্যাসের দাস। সেইজন্যেই মেয়েদের বাইরে বেরোতে দেখলে মনে খটকা লাগে— অন্যায় বা অকর্তব্য বলে যে খারাপ লাগে, সেটা কেবল আমরা জোর করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি। যুক্তিটা এ স্থলে উপলক্ষ মাত্র, সংস্কারটাই আসল।"

সুচরিতা কহিল, "আপনার বন্ধুর মনে বোধ হয় সংস্কারগুলো খুব দৃঢ়।"

বিনয়। বাইরে থেকে দেখে হঠাৎ তাই মনে হয়। কিন্তু একটা কথা আপনি মনে রাখবেন, আমাদের দেশের সংস্কারগুলিকে তিনি যে চেপে ধরে

থাকেন, তার কারণ এ নয় যে সেই সংস্কারগুলিকেই তিনি শ্রেয় মনে করেন। আমরা দেশের প্রতি অন্ধ অশ্রদ্ধাবশত দেশের সমস্ত প্রথাকে অবজ্ঞা করতে বসেছিলুম বলেই তিনি এই প্রলয়কার্যে বাধা দিতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, আগে আমাদের দেশকে শ্রদ্ধার দ্বারা প্রীতির দ্বারা সমগ্রভাবে পেতে হবে, জানতে হবে, তার পরে আপনিই ভিতর থেকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নিয়মে সংশোধনের কাজ চলবে।

সুচরিতা কহিল, "আপনিই যদি হত তা হলে এতদিন হয় নি কেন?"

বিনয়। হয় নি তার কারণ, ইতিপূর্বে দেশ বলে আমাদের সমস্ত দেশকে, জাতি বলে আমাদের সমস্ত জাতিকে এক করে দেখতে পারি নি। তখন যদি বা আমাদের স্বজাতিকে অশ্রদ্ধা করি নি তেমনি শ্রদ্ধাও করি নি, অর্থাৎ তাকে লক্ষ্যই করা যায় নি— সেইজন্যেই তার শক্তি জাগে নি। এক সময়ে রোগীর দিকে না তাকিয়ে তাকে বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল— এখন তাকে ডাক্তারখানায় আনা হয়েছে বটে, কিন্তু ডাক্তার তাকে এতই অশ্রদ্ধা করে যে, একে একে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা ছাড়া আর-কোনো দীর্ঘ শুশ্রূষাসাধ্য চিকিৎসা সম্বন্ধে সে ধৈর্য ধরে বিচার করে না। এই সময়ে আমার বন্ধু ডাক্তারটি বলছেন, 'আমার এই পরমাত্মীয়টিকে যে চিকিৎসার চোটে আগাগোড়া নিঃশেষ করে ফেলবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। এখন আমি এই ছেদনকার্য একেবারেই বন্ধ করে দেব এবং অনুকূল পথ্য দ্বারা আগে এর নিজের ভিতরকার জীবনী-শক্তিকে জাগিয়ে তুলব, তার পরে ছেদন করলেও রোগী সইতে পারবে, ছেদন না করলেও হয়তো রোগী সেরে উঠবে।' গোরা বলেন, গভীর শ্রদ্ধাই আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সকলের চেয়ে বড়ো পথ্য— এই শ্রদ্ধার অভাবেই আমরা দেশকে সমগ্রভাবে জানতে পারছি নে— জানতে পারছি নে বলেই তার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করছি তা কুব্যবস্থা হয়ে উঠছে। দেশকে ভালো না বাসলে তাকে ভালো করে জানবার ধৈর্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভালো করতে চাইলেও তার ভালো করা যায় না।

সুচরিতা একটু একটু করিয়া খোঁচা দিয়া দিয়া গোরার সম্বন্ধে আলোচনাকে নিবিতে দিল না। বিনয়ও গোরার পক্ষে তাহার যাহা-কিছু বলিবার তাহা খুব ভালো করিয়াই বলিতে লাগিল। এমন যুক্তির কথা এমন দৃষ্টান্ত দিয়া এমন গুছাইয়া আর কখনো যেন সে বলে নাই; গোরাও তাহার নিজের মত এমন পরিষ্কার করিয়া এমন উজ্জ্বল করিয়া বলিতে পারিত কি না সন্দেহ। বিনয়ের বুদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতার এই অপূর্ব উত্তেজনায় তাহার মনে একটা আনন্দ জন্মিতে লাগিল এবং সেই আনন্দে তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বিনয় কহিল, "দেখুন, শাস্ত্রে বলে, আত্মানং বিদ্ধি— আপনাকে জানো। নইলে মুক্তি কিছুতেই নেই। আমি আপনাকে বলছি, আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের প্রকাশ রূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক বলে মনে করতে পারি নে। আমাদের সকলের মন যখন তুচ্ছ আকর্ষণে নূতনের প্রলোভনে বাহিরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন ওই একটিমাত্র লোক এই-সমস্ত বিক্ষিপ্ততার মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জনে সেই পুরাতন মন্ত্র বলছে— আত্মানং বিদ্ধি।"

এই আলোচনা আরও অনেক ক্ষণ চলিতে পারিত— সুচরিতাও ব্যগ্র হইয়া শুনিতেছিল— কিন্তু হঠাৎ পাশের একটা ঘর হইতে সতীশ চীৎকার করিয়া আবৃত্তি আরম্ভ করিল—

"বোলো না কাতর স্বরে না করি বিচার
জীবন স্বপনসম, মায়ার সংসার।"

বেচারা সতীশ বাড়ির অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে বিদ্যা ফলাইবার কোনো অবকাশ পায় না। লীলা পর্যন্ত ইংরেজি কবিতা আওড়াইয়া সভা গরম করিয়া তোলে, কিন্তু সতীশকে বরদাসুন্দরী ডাকেন না। অথচ লীলার সঙ্গে সকল বিষয়েই সতীশের খুব একটা প্রতিযোগিতা আছে। কোনোমতে লীলার দর্প চূর্ণ করা সতীশের জীবনের প্রধান সুখ।" বিনয়ের সম্মুখে কাল লীলার পরীক্ষা হইয়া গেছে। তখন অনাহূত সতীশ তাহাকে ছাড়াইয়া

উঠিবার কোনো চেষ্টা করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিলেও বরদাসুন্দরী তখনই তাহাকে দাবাইয়া দিতেন; তাই সে আজ পাশের ঘরে যেন আপন মনে উচ্চস্বরে কাব্যচর্চায় প্রবৃত্ত হইল। শুনিয়া সুচরিতা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমন সময় লীলা তাহার মুক্ত বেণী দোলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া সুচরিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে কী একটা বলিল। অমনি সতীশ ছুটিয়া তাহার পিছনে আসিয়া কহিল, "আচ্ছা, লীলা, বলো দেখি 'মনোযোগ' মানে কী।"

লীলা কহিল, "বলব না।"

সতীশ। ইস্! বলব না! জান না তাই বলো-না।

বিনয় সতীশকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বলো দেখি, 'মনোযোগ' মানে কী।"

সতীশ সগর্বে মাথা তুলিয়া কহিল, "মনোযোগ মানে মনোনিবেশ।"

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "মনোনিবেশ বলতে কী বোঝায়?"

আত্মীয় না হইলে আত্মীয়কে এমন বিপদে কে ফেলিতে পারে! সতীশ প্রশ্নটা যেন শুনিতে পায় নাই, এমনি ভাবে লাফাইতে লাফাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় আজ পরেশবাবুর বাড়ি হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া গোরার কাছে যাইবে নিশ্চয় স্থির করিয়া আসিয়াছিল। বিশেষত গোরার কথা বলিতে বলিতে গোরার কাছে যাইবার উৎসাহও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তাই সে ঘড়িতে চারটে বাজিতে শুনিয়া তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

সুচরিতা কহিল, "আপনি এখনি যাবেন? মা আপনার জন্যে খাবার তৈরি করছেন; আর-একটু পরে গেলে চলবে না?"

বিনয়ের পক্ষে এ তো প্রশ্ন নয়, এ হুকুম। সে তখনই বসিয়া পড়িল। লাবণ্য রঙিন রেশমের কাপড়ে সাজিয়া-গুজিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল,

"দিদি, খাবার তৈরি হয়েছে। মা ছাতে আসতে বললেন।"

ছাতে আসিয়া বিনয়কে আহারে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বরদাসুন্দরী তাঁহার সব সন্তানদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। ললিতা সুচরিতাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। লাবণ্য একটা চৌকিতে বসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দুই লোহার কাঠি লইয়া বুনানির কার্যে লাগিল। তাহাকে কবে একজন বলিয়াছিল, বুনানির সময় তাহার কোমল আঙুলগুলির খেলা ভারি সুন্দর দেখায়; সেই অবধি লোকের সাক্ষাতে বিনা প্রয়োজনে বুনানি করা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

পরেশ আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ রবিবারে উপাসনা-মন্দিরে যাইবার কথা। বরদাসুন্দরী বিনয়কে কহিলেন, "যদি আপত্তি না থাকে, আমাদের সঙ্গে সমাজে যাবেন?"

ইহার পর কোনো ওজর-আপত্তি করা চলে না। দুই গাড়িতে ভাগ করিয়া সকলে উপাসনালয়ে গেলেন। ফিরিবার সময় যখন গাড়িতে উঠিতেছেন তখন হঠাৎ সুচরিতা চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "ওই-যে গৌরমোহনবাবু যাচ্ছেন।"

গোরা যে এই দলকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই, এইরূপ ভাব করিয়া সে বেগে চলিয়া গেল। গোরার এই উদ্ধত অশিষ্টতায় বিনয় পরেশবাবুদের কাছে লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিল। কিন্তু সে মনে মনে স্পষ্ট বুঝিল, বিনয়কেই এই দলের মধ্যে দেখিয়া গোরা এমন প্রবল বেগে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল। এত ক্ষণ তাহার মনের মধ্যে যে-একটি আনন্দের আলো জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে নিবিয়া গেল। সুচরিতা বিনয়ের মনের ভাব ও তাহার কারণটা তখনই বুঝিতে পারিল, এবং বিনয়ের মতো বন্ধুর প্রতি গোরার এই অবিচারে ও ব্রাহ্মদের প্রতি তাহার এই অন্যায় অশ্রদ্ধায় গোরার উপরে আবার তাহার রাগ হইল— কোনো মতে গোরার পরাভব ঘটে, এই সে মনে মনে ইচ্ছা করিল।

গোরা যখন মধ্যাহ্নে খাইতে বসিল আনন্দময়ী আস্তে আস্তে কথা পাড়িলেন, "আজ সকালে বিনয় এসেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি?"

গোরা খাবার থালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল, "হাঁ, হয়েছিল।"

আনন্দময়ী অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার পর কহিলেন, "তাকে থাকতে বলেছিলুম, কিন্তু সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল।"

গোরা কোনো উত্তর করিল না। আনন্দময়ী কহিলেন, "তার মনে কী একটা কষ্ট হয়েছে গোরা। আমি তাকে এমন কখনো দেখি নি। আমার মন বড়ো খারাপ হয়ে আছে।"

গোরা চুপ করিয়া খাইতে লাগিল। আনন্দময়ী অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়াই গোরাকে মনে মনে একটু ভয় করিতেন। সে যখন নিজে তাঁহার কাছে মন না খুলিত তখন তিনি তাহাকে কোনো কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতেন না। অন্যদিন হইলে এইখানেই চুপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু আজ বিনয়ের জন্য তাঁহার মন বড়ো বেদনা পাইতেছিল বলিয়াই কহিলেন, "দেখো, গোরা, একটি কথা বলি, রাগ কোরো না। ভগবান অনেক মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সকলের জন্যে কেবল একটি মাত্র পথ খুলে রাখেন নি। বিনয় তোমাকে প্রাণের মতো ভালোবাসে, তাই সে তোমার কাছ থেকে সমস্তই সহ্য করে— কিন্তু তোমারই পথে তাকে চলতে হবে, এ জবরদস্তি করলে সেটা সুখের হবে না।"

গোরা কহিল, "মা, আর-একটু দুধ এনে দাও।"

কথাটা এইখানেই চুকিয়া গেল। আহারান্তে আনন্দময়ী তাঁহার তক্তপোশে চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতে লাগিলেন। লছমিয়া বাড়ির বিশেষ কোনো ভৃত্যের দুর্ব্যবহারসম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দময়ীকে টানিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মেজের উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

গোরা চিঠিপত্র লিখিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিল। গোরা তাহার উপর রাগ করিয়াছে, বিনয় তাহা আজ সকালে স্পষ্ট দেখিয়া গেছে, তবু যে সে এই রাগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য গোরার কাছে আসিবে না, ইহা হইতেই পারে না জানিয়া সে সকল কর্মের মধ্যেই বিনয়ের পদশব্দের জন্য কান পাতিয়া রহিল।

বেলা বহিয়া গেল— বিনয় আসিল না। লেখা ছাড়িয়া গোরা উঠিবে মনে করিতেছে, এমন সময় মহিম আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আসিয়াই চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "শশিমুখীর বিয়ের কথা কী ভাবছ গোরা?"

এ কথা গোরা এক দিনের জন্যও ভাবে নাই, সুতরাং অপরাধীর মতো তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

বাজারে পাত্রের মূল্য যে কিরূপ চড়া এবং ঘরে অর্থের অবস্থা যে কিরূপ অসচ্ছল তাহা আলোচনা করিয়া গোরাকে একটা উপায় ভাবিতে বলিলেন। গোরা যখন ভাবিয়া কিনারা পাইল না তখন তিনি তাহাকে চিন্তাসংকট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিনয়ের কথাটা পাড়িলেন। এত ঘোরফের করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মহিম গোরাকে মুখে যাই বলুন মনে মনে ভয় করিতেন।

এ প্রসঙ্গে বিনয়ের কথা যে উঠিতে পারে, গোরা তাহা কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিশেষত গোরা এবং বিনয় স্থির করিয়াছিল, তাহারা বিবাহ না করিয়া দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবে। গোরা তাই বলিল, "বিনয় বিয়ে করবে কেন!"

মহিম কহিলেন, "এই বুঝি তোমাদের হিঁদুয়ানি! হাজার টিকি রাখ আর ফোঁটা কাট সাহেবিয়ানা হাড়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। শাস্ত্রের মতে বিবাহটা যে ব্রাহ্মণের ছেলের একটা সংস্কার তা জান?"

মহিম এখনকার ছেলেদের মতো আচারও লঙ্ঘন করেন না, আবার শাস্ত্রের ধারও ধারেন না। হোটেলে খানা খাইয়া বাহাদুরি করাকেও তিনি বাড়াবাড়ি মনে করেন, আবার গোরার মতো সর্বদা শ্রুতিস্মৃতি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি

করাকেও তিনি প্রকৃতিস্থ লোকের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন না। কিন্তু, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ— গোরার কাছে শাস্ত্রের দোহাই পাড়িতে হইল।

এ প্রস্তাব যদি দুই দিন আগে আসিত তবে গোরা একেবারে কানেই লইত না। আজ তাহার মনে হইল, কথাটা নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। অন্তত এই প্রস্তাবটা লইয়া এখনই বিনয়ের বাসায় যাইবার একটা উপলক্ষ্য জুটিল।

গোরা শেষকালে বলিল, "আচ্ছা, বিনয়ের ভাবখানা কী বুঝে দেখি।"

মহিম কহিলেন, "সে আর বুঝতে হবে না। তোমার কথা সে কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। ও ঠিক হয়ে গেছে। তুমি বললেই হবে।"

সেই সন্ধ্যার সময়েই গোরা বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। ঝড়ের মতো তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, বাবু আটাত্তর নম্বর বাড়িতে গিয়াছেন। শুনিয়া গোরার সমস্ত মন বিকল হইয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন যাহার জন্য গোরার মনে শান্তি ছিল না সেই বিনয় আজকাল গোরার কথা মনে করিবার অবকাশমাত্র পায় না। গোরা রাগই করুক আর দুঃখিতই হউক, বিনয়ের শান্তি ও সান্ত্বনার কোনো ব্যাঘাত ঘটিবে না!

পরেশবাবুর পরিবারদের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে গোরার অন্তঃকরণ একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বিদ্রোহ বহন করিয়া পরেশবাবুর বাড়ির দিকে ছুটিল। ইচ্ছা ছিল, সেখানে এমন-সকল কথা উত্থাপন করিবে যাহা শুনিয়া এই ব্রাহ্মপরিবারের হাড়ে জ্বালা ধরিবে এবং বিনয়েরও আরাম বোধ হইবে না।

পরেশবাবুর বাসায় গিয়া শুনিল, তাঁহারা কেহই বাড়িতে নাই, সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন। মুহূর্তকালের জন্য সংশয় হইল, বিনয় হয়তো যায় নাই— সে হয়তো এই ক্ষণেই গোরার বাড়িতে গেছে।

থাকিতে পারিল না। গোরা তাহার স্বাভাবিক ঝড়ের গতিতে মন্দিরের

দিকেই গেল। দ্বারের কাছে গিয়া দেখিল, বিনয় বরদাসুন্দরীর অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের গাড়িতে উঠিতেছে— সমস্ত রাস্তার মাঝখানে নির্লজ্জের মতো অন্য পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়া বসিতেছে! মূঢ়! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়! এত সত্বর! এত সহজে! তবে বন্ধুত্বের আর ভদ্রস্থতা নাই। গোরা ঝড়ের মতোই ছুটিয়া চলিয়া গেল— আর, গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বিনয় রাস্তার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বরদাসুন্দরী মনে করিলেন, আচার্যের উপদেশ তাহার মনের মধ্যে কাজ করিতেছে— তিনি তাই কোনো কথা বলিলেন না।

১৫

রাত্রে গোরা বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকার ছাতের উপর বেড়াইতে লাগিল। তাহার নিজের উপর রাগ হইল। রবিবারটা কেন সে এমন বৃথা কাটিতে দিল। ব্যক্তিবিশেষের প্রণয় লইয়া অন্য সমস্ত কাজ নষ্ট করিবার জন্য তো গোরা পৃথিবীতে আসে নাই। বিনয় যে পথে যাইতেছে সে পথ হইতে তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কেবলই সময় নষ্ট এবং নিজের মনকে পীড়িত করা হইবে। অতএব, জীবনের যাত্রাপথে এখন হইতে বিনয়কে বাদ দিতে হইবে। জীবনে গোরার একটিমাত্র বন্ধু আছে, তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গোরা তাহার ধর্মকে সত্য করিয়া তুলিবে। এই বলিয়া গোরা জোর করিয়া হাত নাড়িয়া বিনয়ের সংস্রবকে নিজের চারি দিক হইতে যেন সরাইয়া ফেলিল।

এমন সময় মহিম ছাতে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন; কহিলেন, "মানুষের যখন ডানা নেই তখন এই তেতলা বাড়ি তৈরি করা কেন? ডাঙার মানুষ হয়ে আকাশে বাস করবার চেষ্টা করলে আকাশবিহারী দেবতার সয় না।— বিনয়ের কাছে গিয়েছিলে?"

গোরা তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, "বিনয়ের সঙ্গে শশিমুখীর বিয়ে হতে পারবে না।"

মহিম। কেন! বিনয়ের মত নেই নাকি?

গোরা। আমার মত নেই।

মহিম হাত উল্‌টাইয়া কহিলেন, "বেশ! এ আবার একটা নতুন ফ্যাসাদ দেখছি। তোমার মত নেই! কারণটা কী শুনি।"

গোরা। আমি বেশ বুঝেছি, বিনয়কে আমাদের সমাজে ধরে রাখা শক্ত হবে। ওর সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের বিবাহ চলবে না।

মহিম। ঢের ঢের হিঁদুয়ানি দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলুম না। কাশী-ভাটপাড়া ছাড়িয়ে গেলে! তুমি যে দেখি, ভবিষ্যৎ দেখে বিধান দাও। কোন্ দিন বলবে, স্বপ্নে দেখলুম খৃস্টান হয়েছ, গোবর খেয়ে জাতে উঠতে হবে।

অনেক বকাবকির পর মহিম কহিলেন, "মেয়েকে তো মূর্খর হাতে দিতে পারি নে। যে ছেলে লেখাপড়া শিখেছে, যার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, সে ছেলে মাঝে মাঝে শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলবেই। সেজন্যে তার সঙ্গে তর্ক করো, তাকে গাল দাও— কিন্তু তার বিয়ে বন্ধ করে মাঝে থেকে আমার মেয়েটাকে শাস্তি দাও কেন! তোমাদের সমস্তই উল্‌টো বিচার।"

মহিম নীচে আসিয়া আনন্দময়ীকে কহিলেন, "মা, তোমার গোরাকে তুমি ঠেকাও।"

আনন্দময়ী উদ্‌বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হয়েছে?"

মহিম। শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ আমি একরকম পাকা করেই এনেছিলুম। গোরাকেও রাজি করেছিলুম, ইতিমধ্যে গোরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে হিঁদু নয়— মনু-পরাশরের সঙ্গে তার মতের একটু-আধটু অনৈক্য হয়ে থাকে। তাই গোরা বেঁকে দাঁড়িয়েছে— গোরা বাঁকলে কেমন বাঁকে সে তো জানই। কলিযুগের জনক যদি পণ করতেন যে বাঁকা গোরাকে সোজা করলে তবে সীতা দেব, তবে শ্রীরামচন্দ্র

হার মেনে যেতেন, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। মনু-পরাশরের নীচেই পৃথিবীর মধ্যে সে একমাত্র তোমাকেই মানে। এখন তুমি যদি গতি করে দাও তো মেয়েটা তরে যায়। অমন পাত্র খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

এই বলিয়া গোরার সঙ্গে আজ ছাতে যা কথাবার্তা হইয়াছে মহিম তাহা সমস্ত বিবৃত করিয়া কহিলেন। বিনয়ের সঙ্গে গোরার একটা বিরোধ যে ঘনাইয়া উঠিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ীর মন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী উপরে আসিয়া দেখিলেন, গোরা ছাতে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ঘরে একটা চৌকির উপর বসিয়া আর-একটা চৌকিতে পা তুলিয়া বই পড়িতেছে। আনন্দময়ী তাহার কাছে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। গোরা সামনের চৌকি হইতে পা নামাইয়া খাড়া হইয়া বসিয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "বাবা গোরা, আমার একটি কথা রাখিস— বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস নে। আমার কাছে তোরা দুজনে দুটি ভাই— তোদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে আমি সইতে পারব না।"

গোরা কহিল, "বন্ধু যদি বন্ধন কাটতে চায় তবে তার পিছনে ছুটোছুটি করে আমি সময় নষ্ট করতে পারব না।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "বাবা, আমি জানি নে তোমাদের মধ্যে কী হয়েছে, কিন্তু বিনয় তোমার বন্ধন কাটাতে চাচ্ছে এ কথা যদি বিশ্বাস কর তবে তোমার বন্ধুত্বের জোর কোথায়?"

গোরা। মা, আমি সোজা চলতে ভালোবাসি— যারা দু দিক রাখতে চায় আমার সঙ্গে তাদের বনবে না। দু নৌকোয় পা দেওয়া যার স্বভাব আমার নৌকো থেকে তাকে পা সরাতে হবে— এতে আমারই কষ্ট হোক আর তারই কষ্ট হোক।

আনন্দময়ী। কী হয়েছে বল্ দেখি। ব্রাহ্মদের ঘরে সে যাওয়া-আসা করে, এই তো তার অপরাধ?

গোরা। সে অনেক কথা মা।

আনন্দময়ী। হোক অনেক কথা— কিন্তু, আমি একটি কথা বলি, গোরা, সব বিষয়েই তোমার এত জেদ যে, তুমি যা ধর তা কেউ ছাড়াতে পারে না। কিন্তু বিনয়ের বেলাই তুমি এমন আলগা কেন? তোমার অবিনাশ যদি দল ছাড়তে চাইত তুমি কি তাকে সহজে ছাড়তে? তোমার বন্ধু বলেই কি ও তোমার সকলের চেয়ে কম?

গোরা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আনন্দময়ীর এই কথাতে সে নিজের মনটা পরিষ্কার দেখিতে পাইল। এত ক্ষণ সে মনে করিতেছিল যে, সে কর্তব্যের জন্য তাহার বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিতে যাইতেছে, এখন স্পষ্ট বুঝিল —ঠিক তাহার উল্‌টা। তাহার বন্ধুত্বের অভিমানে বেদনা লাগিয়াছে বলিয়াই বিনয়কে বন্ধুত্বের চরম শাস্তি দিতে সে উদ্যত হইয়াছে। সে মনে জানিত, বিনয়কে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বন্ধুত্বই যথেষ্ট— অন্য কোনো প্রকার চেষ্টা প্রণয়ের অসম্মান।

আনন্দময়ী যেই বুঝিলেন তাঁহার কথাটা গোরার মনে একটুখানি লাগিয়াছে অমনি তিনি আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিবার উপক্রম করিলেন। গোরাও হঠাৎ বেগে উঠিয়া পড়িয়া আলনা হইতে চাদর তুলিয়া কাঁধে ফেলিল।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও গোরা?"

গোরা কহিল, "আমি বিনয়ের বাড়ি যাচ্ছি।"

আনন্দময়ী। খাবার তৈরি আছে, খেয়ে যাও।

গোরা। আমি বিনয়কে ধরে আনছি, সেও এখানে খাবে।

আনন্দময়ী আর কিছু না বলিয়া নীচের দিকে চলিলেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ থামিয়া কহিলেন, "ওই বিনয় আসছে।"

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া পড়িল। আনন্দময়ীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তিনি স্নেহে বিনয়ের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "বিনয়, বাবা, তুমি খেয়ে আস নি?"

বিনয় কহিল, "না, মা।"

আনন্দময়ী। তোমাকে এইখানেই খেতে হবে।

বিনয় একবার গোরার মুখের দিকে চাহিল। গোরা কহিল, "বিনয়, অনেক দিন বাঁচবে। তোমার ওখানেই যাচ্ছিলুম।"

আনন্দময়ীর বুক হালকা হইয়া গেল— তিনি তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন।

দুই বন্ধু ঘরে আসিয়া বসিলে গোরা যাহা-তাহা একটা কথা তুলিল— কহিল, "জান? আমাদের ছেলেদের জন্যে একজন বেশ ভালো জিম্‌নাষ্টিক মাস্টার পেয়েছি। সে শেখাচ্ছে বেশ।"

মনের ভিতরের আসল কথাটা এখনও কেহ পাড়িতে সাহস করিল না।

দুই জনে যখন খাইতে বসিয়া গেল তখন আনন্দময়ী তাহাদের কথাবার্তায় বুঝিতে পারিলেন এখনো তাহাদের উভয়ের মধ্যে বাধো-বাধো রহিয়াছে— পর্দা উঠিয়া যায় নাই। তিনি কহিলেন, "বিনয়, রাত অনেক হয়েছে, তুমি আজ এইখানেই শুয়ো। আমি তোমার বাসায় খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিনয় চকিতের মধ্যে গোরার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ। খেয়ে রাস্তায় হাঁটা নিয়ম নয়। তা হলে এইখানেই শোওয়া যাবে।"

আহারান্তে দুই বন্ধু ছাতে আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল। ভাদ্রমাস পড়িয়াছে; শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছে। হালকা পাৎলা সাদা মেঘ ক্ষণিক ঘুমের ঘোরের মতো মাঝে মাঝে চাঁদকে একটুখানি ঝাপসা করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে উড়িয়া চলিতেছে। চারি দিকে দিগন্ত পর্যন্ত নানা আয়তনের উঁচুনিচু ছাতের শ্রেণী ছায়াতে আলোতে এবং মাঝে মাঝে গাছের মাথার সঙ্গে মিশিয়া যেন সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাণ্ড অবাস্তব খেয়ালের মতো পড়িয়া রহিয়াছে।

গির্জার ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজিল; বরফওয়ালা তাহার শেষ হাঁক হাঁকিয়া চলিয়া গেল। গাড়ির শব্দ মন্দ হইয়া আসিয়াছে। গোরাদের

গলিতে জাগরণের লক্ষণ নাই, কেবল প্রতিবেশীর আস্তাবলে কাঠের মেজের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ এক-একবার শোনা যাইতেছে এবং কুকুর ঘেউঘেউ করিয়া উঠিতেছে। দুইজনে অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে বিনয়, প্রথমটা একটু দ্বিধা করিয়া, অবশেষে পরিপূর্ণবেগে তাহার মনের কথাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। বিনয় কহিল, "ভাই গোরা, আমার বুক ভরে উঠেছে। আমি জানি, এ-সব বিষয়ে তোমার মন নেই, কিন্তু তোমাকে না বললে আমি বাঁচব না। আমি ভালোমন্দ কিছুই বুঝতে পারছি নে— কিন্তু এটা নিশ্চয়, এর সঙ্গে কোনো চাতুরী খাটবে না। বইয়েতে অনেক কথা পড়েছি এবং এতদিন মনে করে এসেছি সব জানি। ঠিক যেন ছবিতে জল দেখে মনে করতুম সাঁতার দেওয়া খুব সহজ— কিন্তু আজ জলের মধ্যে পড়ে এক মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি এ তো ফাঁকি নয়।"

এই বলিয়া বিনয় তাহার জীবনের এই আশ্চর্য আবির্ভাবকে একান্ত চেষ্টায় গোরার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিতে লাগিল।

বিনয় বলিতে লাগিল, আজকাল তাহার কাছে সমস্ত দিন ও রাত্রির মধ্যে কোথাও যেন কিছু ফাঁক নাই— সমস্ত আকাশের মধ্যে কোথাও যেন কোনো রন্ধ্র নাই, সমস্ত একেবারে নিবিড়ভাবে ভরিয়া গেছে— বসন্তকালের মউচাক যেমন মধুতে ভরিয়া ফাটিয়া যাইতে চায়, তেমনিতরো। আগে এই বিশ্বচরাচরের অনেকখানি তাহার জীবনের বাহিরে পড়িয়া থাকিত— যেটুকুতে তাহার প্রয়োজন সেইটুকুতেই তাহার দৃষ্টি বদ্ধ ছিল। আজ সমস্তই তাহার সম্মুখে আসিতেছে, সমস্তই তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, সমস্তই একটা নূতন অর্থে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে জানিত না পৃথিবীকে সে এত ভালোবাসে, আকাশ এমন আশ্চর্য, আলোক এমন অপূর্ব, রাস্তার অপরিচিত পথিকের প্রবাহও এমন গভীরভাবে সত্য। তাহার ইচ্ছা করে সকলের জন্য সে একটা-কিছু করে, তাহার সমস্ত শক্তিকে আকাশের সূর্যের মতো সে জগতের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

বিনয় যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে এই-সমস্ত কথা বলিতেছে তাহা

হঠাৎ মনে হয় না। সে যেন কাহারও নাম মুখে আনিতে পারে না, আভাস দিতে গেলেও কুন্ঠিত হইয়া পড়ে। এই-যে আলোচনা করিতেছে ইহার জন্য সে যেন কাহার প্রতি অপরাধ অনুভব করিতেছে। ইহা অন্যায়, ইহা অপমান— কিন্তু, আজ এই নির্জন রাত্রে, নিস্তব্ধ আকাশে, বন্ধুর পাশে বসিয়া এ অন্যায়টুকু সে কোনোমতেই কাটাইতে পারিল না।

সে কী মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপোলের কোমলতার মধ্যে কী সুকুমার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে! হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কী আশ্চর্য আলোর মতো ফুটিয়া পড়ে! ললাটে কী বুদ্ধি! এবং ঘন পল্লবের ছায়া-তলে দুই চক্ষুর মধ্যে কী নিবিড় অনির্বচনীয়তা! আর, সেই দুটি হাত— সেবা এবং স্নেহকে সৌন্দর্যে সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে। বিনয় নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে, এই আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ করে, বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া চোখের সামনে মূর্তিমান দেখিতে পাইবে ইহার চেয়ে আশ্চর্য কিছুই নাই।

কিন্তু, এ কী পাগলামি! এ কী অন্যায়! হোক অন্যায়, আর তো ঠেকাইয়া রাখা যায় না। এই স্রোতেই যদি কোনো একটা কূলে তুলিয়া দেয় তো ভালো; আর যদি ভাসাইয়া দেয়, যদি তলাইয়া লয়, তবে উপায় কী! মুশকিল এই যে, উদ্ধারের ইচ্ছাও হয় না— এতদিনকার সমস্ত সংস্কার, সমস্ত স্থিতি, হারাইয়া চলিয়া যাওয়াই যেন জীবনের সার্থক পরিণাম।

গোরা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। এই ছাতে এমনি নির্জন নিষুপ্ত জ্যোৎস্নারাত্রে আরও অনেক দিন দুই জনে অনেক কথা হইয়া গেছে— কত সাহিত্য, কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা ভবিষ্যৎ জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে দুই জনের কত সংকল্প; কিন্তু এমন কথা ইহার পূর্বে আর-কোনোদিন হয় নাই। মানবহৃদয়ের এমন একটা সত্য পদার্থ, এমন একটা প্রবল প্রকাশ এমন করিয়া গোরার সামনে আসিয়া পড়ে নাই। এই-সমস্ত

ব্যাপারকে সে এতদিন কবিত্বের আবর্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে— আজ সে ইহাকে এত কাছে দেখিল যে ইহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না। শুধু তাহাই নয়, ইহার বেগ তাহার মনকে ঠেলা দিল, ইহার পুলক তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল। তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দা মুহূর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এতদিনকার রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎ-নিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল।

চন্দ্র কখন এক সময় ছাদগুলার নীচে নামিয়া গেল। পূর্বদিকে তখন নিদ্রিত মুখের হাসির মতো একটুখানি আলোকের আভাস দিয়াছে। এত ক্ষণ পরে বিনয়ের মনটা হালকা হইয়া একটা সংকোচ উপস্থিত হইল। একটু-খানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার এ-সমস্ত কথা তোমার কাছে খুব ছোটো। তুমি আমাকে হয়তো মনে মনে অবজ্ঞা করছ। কিন্তু কী করব বলো, কখনো তোমার কাছে কিছু লুকোই নি— আজও লুকোলুম না, তুমি বোঝ আর না বোঝ।"

গোরা বলিল, "বিনয়, এ-সব কথা আমি যে ঠিক বুঝি তা বলতে পারি নে। দু দিন আগে তুমিও বুঝতে না। জীবনব্যাপারের মধ্যে এই-সমস্ত আবেগ এবং আবেশ আমার কাছে যে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত ছোটো ঠেকেছে, সে কথাও অস্বীকার করতে পারি নে। তাই বলে এটা যে বাস্তবিকই ছোটো তা হয়তো নয়— এর শক্তি, এর গভীরতা আমি প্রত্যক্ষ করি নি বলেই এটা আমার কাছে বস্তুহীন মায়ার মতো ঠেকেছে— কিন্তু তোমার এতবড়ো উপলব্ধিকে আজ আমি মিথ্যা বলব কী করে? আসল কথা হচ্ছে এই, যে লোক যে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বাইরের সত্য যদি তার কাছে ছোটো হয়ে না থাকে, তবে সে ব্যক্তি কাজ করতেই পারে না। এইজন্যই ঈশ্বর দূরের জিনিসকে মানুষের দৃষ্টির কাছে খাটো করে দিয়েছেন— সব সত্যকেই সমান প্রত্যক্ষ করিয়ে তাঁকে মহা বিপদে ফেলেন নি। আমাদের একটা দিক বেছে নিতেই হবে, সব একসঙ্গে আঁকড়ে ধরবার লোভ ছাড়তেই হবে,

নইলে সত্যকেই পাব না। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে সত্যের যে মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করছ আমি সেখানে সে মূর্তিকে অভিবাদন করতে যেতে পারব না— তা হলে আমার জীবনের সত্যকে হারাতে হবে। হয় এ দিক নয় ও দিক।"

বিনয় কহিল, "হয় বিনয়, নয় গোরা। আমি নিজেকে ভরে নিতে দাঁড়িয়েছি, তুমি নিজেকে ত্যাগ করতে দাঁড়িয়েছ।"

গোরা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "বিনয়, তুমি মুখে মুখে বই রচনা কোরো না। তোমার কথা শুনে আমি একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমার জীবনে তুমি আজ একটা প্রবল সত্যের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ— তার সঙ্গে ফাঁকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে— সে আর থাকবার জো নেই। আমি যে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকেও অমনি করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব, এই আমার আকাঙ্ক্ষা। তুমি এতদিন বই-পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে— আমিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই জানি। প্রেম আজ তোমার কাছে যখনই প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝতে পেরেছ, বইয়ের জিনিসের চেয়ে এ কত সত্য— এ তোমার সমস্ত জগৎ-চরাচর অধিকার করে বসেছে, কোথাও তুমি এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছ না। স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নেই— সেদিন সে আমার ধনপ্রাণ, আমার অস্থিমজ্জারক্ত, আমার আকাশ-আলোক, আমার সমস্তই অনায়াসে আকর্ষণ করে নিতে পারবে। স্বদেশের সেই সত্যমূর্তি যে কী আশ্চর্য অপরূপ, কী সুনিশ্চিত সুগোচর, তার আনন্দ তার বেদনা যে কী প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্যার স্রোতের মতো জীবনমৃত্যুকে এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে যায়, তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পারছি। তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে— তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনো দিন বুঝতে পারব কি না জানি না, কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করছি।"

বলিতে বলিতে গোরা মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া ছাতে বেড়াইতে লাগিল। পূর্বদিকের উষার আভাস তাহার কাছে যেন একটা বাক্যের মতো, বার্তার মতো প্রকাশ পাইল; যেন প্রাচীন তপোবনের একটা বেদমন্ত্রের মতো উচ্চারিত হইয়া উঠিল; তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল— মুহূর্তের জন্য সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণ কালের জন্য তাহার মনে হইল, তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির্লেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটি জ্যোতির্ময় শতদলে সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল— তাহার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত চেতনা, সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

গোরা যখন আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল তখন সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বিনয়, তোমার এ প্রেমকেও পার হয়ে আসতে হবে— আমি বলছি, ওখানে থামলে চলবে না। আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করছেন তিনি যে কতবড়ো সত্য একদিন তোমাকে আমি তা দেখাব। আমার মনের মধ্যে আজ ভারি আনন্দ হচ্ছে— তোমাকে আজ আমি আর-কারও হাতে ছেড়ে দিতে পারব না।"

বিনয় মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া গোরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গোরা তাহাকে একটা অপূর্ব উৎসাহে দুই হাত দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল; কহিল, "ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব— আমরা দুজনে এক; আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

গোরার এই গভীর উৎসাহের বেগ বিনয়েরও হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল; সে কোনো কথা না বলিয়া গোরার এই আকর্ষণে আপনাকে ছাড়িয়া দিল।

গোরা বিনয় দুই জনে নীরবে পাশাপাশি বেড়াইতে লাগিল। পূর্বাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। গোরা কহিল, "ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়— সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে পুজো নয়;

সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পুজো করতে হবে— আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড়ো আনন্দ মনে হচ্ছে— সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই —সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হবে, সম্পূর্ণ দিতে হবে— মাধুর্য নয়, এ একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব— এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ংকর— এর মধ্যে সেই কঠিন ঝংকার আছে যাতে করে সপ্ত সুর এক সঙ্গে বেজে উঠে তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলে আমার বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে ওঠে— আমার মনে হয়, এই আনন্দই পুরুষের আনন্দ— এই হচ্ছে জীবনের তাণ্ডবনৃত্য— পুরাতনের প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা। রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি— আজকেকার এই আসন্ন প্রভাতের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি— দেখো, আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্ছে।"

বলিয়া বিনয়ের হাত লইয়া গোরা নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল।

বিনয় কহিল, "ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, আমাকে কোনো দিন তুমি দ্বিধা করতে দিয়ো না। একেবারে ভাগ্যের মতো নির্দয় হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যেয়ো। আমাদের দুই জনের এক পথ, কিন্তু আমাদের শক্তি তো সমান নয়।"

গোরা কহিল, "আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু একটা মহৎ আনন্দে আমাদের ভিন্ন প্রকৃতিকে এক করে দেবে— তোমাতে আমাতে যে ভালোবাসা আছে তার চেয়ে বড়ো প্রেমে আমাদের এক করে দেবে। সেই প্রেম যত ক্ষণে সত্য না হবে তত ক্ষণে আমাদের দুজনের মধ্যে পদে পদে অনেক আঘাত-সংঘাত বিরোধ-বিচ্ছেদ ঘটতে থাকবে— তার পরে একদিন আমরা সমস্ত ভুলে গিয়ে, আমাদের পার্থক্যকে, আমাদের বন্ধুত্বকেও ভুলে গিয়ে, একটা প্রকাণ্ড, একটা প্রচণ্ড আত্মপরিহারের মধ্যে অটল বলে মিলে গিয়ে দাঁড়াতে পারব— সেই কঠিন আনন্দই আমাদের বন্ধুত্বের শেষ পরিণাম হবে।"

বিনয় গোরার হাত ধরিয়া কহিল, "তাই হোক।"

গোরা কহিল, "ততদিন কিন্তু আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দেব। আমার সব অত্যাচার তোমাকে সইতে হবে— কেননা, আমাদের বন্ধুত্বকেই জীবনের শেষ লক্ষ্য করে দেখতে পারব না— যেমন করে হোক, তাকেই বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করে তার অসম্মান করব না। এতে যদি বন্ধুত্ব ভেঙে পড়ে তা হলে উপায় নেই, কিন্তু যদি বেঁচে থাকে তা হলে বন্ধুত্ব সার্থক হবে।"

এমন সময়ে দুইজনে পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল, আনন্দময়ী ছাতে আসিয়াছেন। তিনি দুইজনের হাত ধরিয়া ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "চলো, শোবে চলো।"

দুইজনেই বলিল, "আর ঘুম হবে না মা।"

"হবে" বলিয়া আনন্দময়ী দুই বন্ধুকে জোর করিয়া বিছানায় পাশাপাশি শোওয়াইয়া দিলেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দুজনের শিয়রের কাছে পাখা করিতে বসিলেন।

বিনয় কহিল, "মা, তুমি পাখা করতে বসলে কিন্তু আমাদের ঘুম হবে না।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কেমন না হয় দেখব। আমি চলে গেলেই তোমরা আবার কথা আরম্ভ করে দেবে, সেটি হচ্ছে না।"

দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িলে আনন্দময়ী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দেখিলেন, মহিম উপরে উঠিয়া আসিতেছেন। আনন্দময়ী কহিলেন, "এখন না— কাল সমস্ত রাত ওরা ঘুমোয় নি। আমি এইমাত্র ওদের ঘুম পাড়িয়ে আসছি।"

মহিম কহিলেন, "বাস্ রে, একেই বলে বন্ধুত্ব! বিয়ের কথাটা উঠেছিল কি জান?"

আনন্দময়ী। জানি নে।

মহিম। বোধ হয় একটা কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙবে কখন? শীঘ্র বিয়েটা না হলে বিঘ্ন অনেক আছে।

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "ওরা ঘুমিয়ে পড়ার দরুন বিঘ্ন হবে না— আজ দিনের মধ্যেই ঘুম ভাঙবে।"

১৬

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তুমি সুচরিতার বিয়ে দেবে না নাকি ?"

পরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্ত গম্ভীর ভাবে কিছু ক্ষণ পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন ; তার পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "পাত্র কোথায় ?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "কেন, পানুবাবুর সঙ্গে ওর বিবাহের কথা তো ঠিক হয়েই আছে— অন্তত আমরা তো মনে মনে তাই জানি, সুচরিতাও জানে।"

পরেশ কহিলেন, "পানুবাবুকে রাধারানীর ঠিক পছন্দ হয় বলে আমার মনে হচ্ছে না।"

বরদাসুন্দরী। দেখো, ওইগুলো আমার ভালো লাগে না। সুচরিতাকে আমার আপন মেয়েদের থেকে কোনোদিন তফাত করে দেখি নে, কিন্তু তাই বলে এ কথাও তো বলতে হয়, উনিই বা কী এমন অসামান্য— পানুবাবুর মতো বিদ্বান ধার্মিক লোক যদি ওকে পছন্দ করে থাকে সেটা কি উড়িয়ে দেবার জিনিস ? তুমি যাই বল আমার লাবণ্যকে তো দেখতে ওর চেয়ে অনেক ভালো, কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমরা যাকে পছন্দ করে দেব ও তাকেই বিয়ে করবে, কখনো "না" বলবে না। তোমরা যদি সুচরিতার দেমাক বাড়িয়ে তোল তা হলে ওর পাত্র মেলাই ভার হবে।

পরেশ ইহার পরে আর কোনো কথাই বলিলেন না। বরদাসুন্দরীর সঙ্গে তিনি কোনোদিন তর্ক করিতেন না। বিশেষত সুচরিতার সম্বন্ধে।

সতীশকে জন্ম দিয়া যখন সুচরিতার মার মৃত্যু হয় তখন সুচরিতার বয়স সাত। তাহার পিতা রামশরণ হালদার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং পাড়ার লোকের অত্যাচারে গ্রাম ছাড়িয়া ঢাকায় আসিয়া আশ্রয় লন। সেখানে পোস্ট্ আপিসের কাজে যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন পরেশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। সুচরিতা তখন হইতে পরেশকে ঠিক নিজের পিতার মতোই জানিত।

রামশরণের মৃত্যু হঠাৎ ঘটিয়াছিল। তাঁহার টাকাকড়ি যাহা-কিছু ছিল তাহা তাঁহার ছেলে ও মেয়ের নামে দুই ভাগে দান করিয়া তিনি উইলপত্রে পরেশবাবুকে ব্যবস্থা করিবার ভার দিয়াছিলেন। তখন হইতে সতীশ ও সুচরিতা পরেশের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

ঘরের বা বাহিরের লোকে সুচরিতার প্রতি বিশেষ স্নেহ বা মনোযোগ করিলে বরদাসুন্দরীর মনে ভালো লাগিত না। অথচ যে কারণেই হউক, সুচরিতা সকলের কাছ হইতেই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। বরদাসুন্দরীর মেয়েরা তাহার ভালোবাসা লইয়া পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করিত। বিশেষত মেজো মেয়ে ললিতা তাহার ঈর্ষাপরায়ণ প্রণয়ের দ্বারা সুচরিতাকে দিনরাত্রি যেন আঁকড়িয়া থাকিতে চাহিত।

পড়াশুনার খ্যাতিতে তাঁহার মেয়েরা তখনকার কালের সকল বিদুষীকেই ছাড়াইয়া যাইবে, বরদাসুন্দরীর মনে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুচরিতা তাঁহার মেয়েদের সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ হইয়া এ সম্বন্ধে তাহাদের সমান ফললাভ করিবে, ইহা তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না। সেইজন্য ইস্কুলে যাইবার সময় সুচরিতার নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিতে থাকিত।

সেই-সকল বিঘ্নের কারণ অনুমান করিয়া পরেশ সুচরিতার ইস্কুল বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে নিজেই পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শুধু তাই নয়, সুচরিতা বিশেষভাবে তাঁহারই যেন সঙ্গিনীর মতো হইয়া উঠিল। তিনি তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন, যেখানে যাইতেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, যখন দূরে থাকিতে বাধ্য হইতেন তখন চিঠিতে বহুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিতেন। এমনি করিয়া সুচরিতার মন তাহার বয়স ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া অনেকটা পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখশ্রীতে ও আচরণে যে-একটি গাম্ভীর্যের বিকাশ হইয়াছিল তাহাতে কেহ তাহাকে বালিকা বলিয়া গণ্য করিতে পারিত না, এবং লাবণ্য যদিচ বয়সে প্রায় তাহার সমান ছিল তবু সকল বিষয়ে সুচরিতাকে সে আপনার চেয়ে বড়ো বলিয়াই মনে করিত, এমন-কি,

বরদাসুন্দরীও তাহাকে ইচ্ছা করিলেও কোনোমতেই তুচ্ছ করিতে পারিতেন না।

পাঠকেরা পূর্বেই পরিচয় পাইয়াছেন, হারানবাবু অত্যন্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মসমাজের সকল কাজেই তাঁহার হাত ছিল— তিনি নৈশস্কুলের শিক্ষক, কাগজের সম্পাদক, স্ত্রীবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি— কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তি ছিল না। এই যুবকটি যে একদিন ব্রাহ্মসমাজে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সকলেরই মনে এই আশা ছিল। বিশেষত ইংরেজি ভাষায় তাঁহার অধিকার ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে খ্যাতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যোগে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই-সকল নানা কারণে অন্যান্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় সুচরিতাও হারানবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় হারানবাবুর সহিত পরিচয়ের জন্য তাহার মনের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্যও জন্মিয়াছিল।

অবশেষে বিখ্যাত হারানবাবুর সঙ্গে শুধু যে পরিচয় হইল তাহা নহে, অল্প দিনের মধ্যেই সুচরিতার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের আকৃষ্টভাব প্রকাশ করিতে হারানবাবু সংকোচ বোধ করিলেন না। স্পষ্ট করিয়া তিনি যে সুচরিতার নিকট তাঁহার প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে— কিন্তু সুচরিতার সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা-পূরণ, তাহার ত্রুটি-সংশোধন, তাহার উৎসাহ-বর্ধন, তাহার উন্নতি-সাধনের জন্য তিনি এমনি মনোযোগী হইয়া উঠিলেন যে, এই কন্যাকে যে তিনি বিশেষভাবে আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সকলের কাছেই সুগোচর হইয়া উঠিল।

এই ঘটনায় হারানবাবুর প্রতি বরদাসুন্দরীর পূর্বতন শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেল এবং ইহাকে তিনি সামান্য ইস্কুলমাস্টার মাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চেষ্টা করিলেন।

সুচরিতাও যখন বুঝিতে পারিল যে, সে বিখ্যাত হারানবাবুর চিত্ত জয় করিয়াছে তখন মনের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত গর্ব অনুভব করিল।

প্রধান পক্ষের নিকট হইতে কোনো প্রস্তাব উপস্থিত না হইলেও, হারানবাবুর সঙ্গেই সুচরিতার বিবাহ নিশ্চয় বলিয়া সকলে যখন স্থির করিয়াছিল তখন সুচরিতাও মনে মনে তাহাতে সায় দিয়াছিল এবং হারানবাবু ব্রাহ্মসমাজের যে-সকল হিতসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন কিরূপ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা সেও তাহার উপযুক্ত হইবে এই তাহার এক বিশেষ উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে কোনো মানুষকে বিবাহ করিতে যাইতেছে তাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারে নাই— সে যেন ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সুমহৎ মঙ্গলকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, সেই মঙ্গল প্রচুর গ্রন্থপাঠ-দ্বারা অত্যুচ্চ বিদ্বান এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিরতিশয় গম্ভীর। এই বিবাহের কল্পনা তাহার কাছে ভয় সম্ভ্রম ও দুঃসাধ্য দায়িত্ববোধের দ্বারা রচিত একটা পাথরের কেল্লার মতো বোধ হইতে লাগিল— তাহা যে কেবল সুখে বাস করিবার তাহা নহে, তাহা লড়াই করিবার— তাহা পারিবারিক নহে, তাহা ঐতিহাসিক।

এই অবস্থাতেই যদি বিবাহ হইয়া যাইত তবে অন্তত কন্যাপক্ষের সকলেই এই বিবাহকে বিশেষ একটা সৌভাগ্য বলিয়াই জ্ঞান করিত। কিন্তু, হারানবাবু নিজের উৎসৃষ্ট মহৎ জীবনের দায়িত্বকে এতই বড়ো করিয়া দেখিতেন যে, কেবলমাত্র ভালো লাগার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করাকে তিনি নিজের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। এই বিবাহ-দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কী পরিমাণে লাভবান হইবে তাহা সম্পূর্ণ বিচার না করিয়া তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। এই কারণে তিনি সেই দিক হইতে সুচরিতাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে পরীক্ষা দিতেও হয়। হারানবাবু পরেশবাবুর ঘরে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে তাঁহার বাড়ির লোকে যে পানু বলিয়া ডাকিত, এ পরিবারেও তাঁহার সেই পানুবাবু নাম প্রচার হইল। এখন তাঁহাকে কেবলমাত্র ইংরেজি বিদ্যার ভাণ্ডার, তত্ত্বজ্ঞানের আধার ও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের অবতাররূপে দেখা সম্ভবপর হইল না— তিনি যে মানুষ এই পরিচয়টাই সকলের চেয়ে নিকট হইয়া উঠিল। তখন

তিনি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অধিকারী না হইয়া ভালো-লাগা মন্দ-লাগার আয়ত্তাধীন হইয়া আসিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হারানবাবুর যে ভাবটা পূর্বে দূর হইতে সুচরিতার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল সেই ভাবটাই নিকটে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য মঙ্গল ও সুন্দর আছে হারানবাবু তাহার অভিভাবকস্বরূপ হইয়া তাহার রক্ষকতার ভার লওয়াতে তাঁহাকে অত্যন্ত অসংগতরূপে ছোটো দেখিতে হইল। সত্যের সঙ্গে মানুষের যথার্থ সম্বন্ধ ভক্তির সম্বন্ধ— তাহাতে মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী করিয়া তোলে। তাহা না করিয়া যেখানে মানুষকে উদ্ধত ও অহংকৃত করে সেখানে মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতাকে সেই সত্যের তুলনাতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে। এইখানে পরেশবাবুর সঙ্গে হারানের প্রভেদ সুচরিতা মনে মনে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন তাহার সম্মুখে তাঁহার মাথা যেন সর্বদা নত হইয়া আছে; সে সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র প্রগল্‌ভতা নাই, তাহার গভীরতার মধ্যে তিনি নিজের জীবনকে তলাইয়া দিয়াছেন। পরেশবাবুর শান্ত মুখচ্ছবি দেখিলে, তিনি যে-সত্যকে হৃদয়ে বহন করিতেছেন তাহারই মহত্ত্ব চোখে পড়ে। কিন্তু হারানবাবুর সেরূপ নহে— তাঁহার ব্রাহ্মত্ব বলিয়া একটা উগ্র আত্মপ্রকাশ অন্য-সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত কথায় ও কাজে অশোভনরূপে বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে সম্প্রদায়ের কাছে তাঁহার আদর বাড়িয়াছিল, কিন্তু সুচরিতা পরেশের শিক্ষাগুণে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে পারে নাই বলিয়া হারানবাবুর একান্ত ব্রাহ্মিকতা সুচরিতার স্বাভাবিক মানবত্বকে যেন পীড়া দিত। হারানবাবু মনে করিতেন, ধর্মসাধনার ফলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এমন আশ্চর্য স্বচ্ছ হইয়াছে যে, অন্য সকল লোকেরই ভালোমন্দ ও সত্যাসত্য তিনি অতি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এইজন্য সকলকেই তিনি সর্বদাই বিচার করিতে উদ্যত। বিষয়ী লোকেরাও পরনিন্দা পরচর্চা করিয়া

থাকে, কিন্তু যাহারা ধার্মিকতার ভাষায় এই কাজ করে তাহাদের সেই নিন্দার সঙ্গে আধ্যাত্মিক অহংকার মিশ্রিত হইয়া সংসারে একটা অত্যন্ত সুতীব্র উপদ্রবের সৃষ্টি করে। সুচরিতা তাহা একেবারেই সহিতে পারিত না। ব্রাহ্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে সুচরিতার মনে যে কোনো গর্ব ছিল না তাহা নহে, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা বড়ো লোক তাঁহারা যে ব্রাহ্ম হওয়ারই দরুন বিশেষ একটা শক্তি লাভ করিয়া বড়ো হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে যাহারা চরিত্রভ্রষ্ট তাহারা যে ব্রাহ্ম না-হওয়ারই কারণে বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া নষ্ট হইয়াছে, এ কথা লইয়া হারানবাবুর সঙ্গে সুচরিতার অনেক বার তর্ক হইয়া গিয়াছে।

হারানবাবু ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ করিয়া যখন বিচারে পরেশ-বাবুকেও অপরাধী করিতে ছাড়িতেন না তখনই সুচরিতা যেন আহত ফণিনীর মতো অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। সে সময়ে বাংলাদেশে ইংরেজি-শিক্ষিত দলের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্তু, পরেশ-বাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন; কালীসিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্ত সুচরিতাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হারানবাবুর কাছে তাহা ভালো লাগে নাই। এ-সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্মপরিবার হইতে নির্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেও এ গুলি পড়েন নাই। রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্‌গীতাকে তিনি হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বাইব্‌লই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পরেশবাবু যে তাঁহার শাস্ত্রচর্চা এবং ছোটোখাটো নানা বিষয়ে ব্রাহ্ম-অব্রাহ্মের সীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন না, তাহাতে হারানের গায়ে যেন কাঁটা বিঁধিত। পরেশের আচরণে প্রকাশ্যে বা মনে মনে কেহ কোনোপ্রকার দোষারোপ করিবে, এমন স্পর্ধা সুচরিতা কখনোই সহিতে পারে না। এবং এইরূপ স্পর্ধা প্রকাশ হইয়া পড়াতেই হারানবাবু সুচরিতার কাছে খাটো হইয়া গেছেন।

এইরূপে নানা কারণে হারানবাবু পরেশবাবুর ঘরে দিনে দিনে নিষ্প্রভ

হইয়া আসিতেছেন। বরদাসুন্দরীও যদিচ ব্রাহ্ম-অব্রাহ্মের ভেদরক্ষায় হারানবাবুর অপেক্ষা কোনো অংশে কম উৎসাহী নহেন এবং তিনিও তাঁহার স্বামীর আচরণে অনেক সময় লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন, তথাপি হারানবাবুকে তিনি আদর্শ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। হারানবাবুর সহস্র দোষ তাঁহার চোখে পড়িত।

হারানবাবুর সাম্প্রদায়িক উৎসাহের অত্যাচারে এবং সংকীর্ণ নীরসতায় যদিও সুচরিতার মন ভিতরে ভিতরে প্রতিদিন তাঁহার উপর হইতে বিমুখ হইতেছিল তথাপি হারানবাবুর সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হইবে, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষের মনে কোনো তর্ক বা সন্দেহ ছিল না। ধর্মসামাজিক দোকানে যে ব্যক্তি নিজের উপরে খুব বড়ো অক্ষরে উচ্চ মূল্যের টিকিট মারিয়া রাখে অন্য লোকেও ক্রমে ক্রমে তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লয়। এইজন্য হারানবাবু তাঁহার মহৎ সংকল্পের অনুবর্তী হইয়া যথোচিত পরীক্ষা-দ্বারা সুচরিতাকে পছন্দ করিয়া লইলেই যে সকলেই তাহা মাথা পাতিয়া লইবে, এ সম্বন্ধে হারানবাবুর এবং অন্য কাহারও মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এমন-কি, পরেশবাবুও হারানবাবুর দাবি মনে মনে অগ্রাহ্য করেন নাই। সকলেই হারানবাবুকে ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিত, তিনিও বিরুদ্ধ বিচার না করিয়া তাহাতে সায় দিতেন। এজন্য, হারানবাবুর মতো লোকের পক্ষে সুচরিতা যথেষ্ট হইবে কি না ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল, সুচরিতার পক্ষে হারানবাবু কী পর্যন্ত উপাদেয় হইবে তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই।

এই বিবাহপ্রস্তাবে কেহই যেমন সুচরিতার কথাটা ভাবা আবশ্যক বোধ করে নাই, সুচরিতাও তেমনি নিজের কথা ভাবে নাই। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকেরই মতো সেও ধরিয়া লইয়াছিল যে, হারানবাবু যেদিন বলিবেন, 'আমি এই কন্যাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি' সেই দিনই সে এই বিবাহ-রূপ তাহার মহৎ কর্তব্য স্বীকার করিয়া লইবে।

এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময় সেদিন গোরাকে উপলক্ষ্য করিয়া হারানবাবুর সঙ্গে সুচরিতার যে দুই-চারিটি উষ্ণবাক্যের আদান-

প্রদান হইয়া গেল তাহার সুর শুনিয়াই পরেশের মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে, সুচরিতা হারানবাবুকে হয়তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না, হয়তো উভয়ের স্বভাবের মধ্যে মিল না হইবার কারণ আছে। এইজন্যই বরদাসুন্দরী যখন বিবাহের জন্য তাগিদ দিতেছিলেন তখন পরেশ তাহাতে পূর্বের মতো সায় দিতে পারিলেন না।

সেই দিনই বরদাসুন্দরী সুচরিতাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, "তুমি যে তোমার বাবাকে ভাবিয়ে তুলেছ।"

শুনিয়া সুচরিতা চমকিয়া উঠিল ; সে যে ভুলিয়াও পরেশবাবুর উদ্‌বেগের কারণ হইয়া উঠিবে, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই হইতে পারে না। সে মুখ বিবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমি কী করেছি!"

বরদাসুন্দরী। কী জানি বাছা! তাঁর মনে হয়েছে যে, তুমি পানুবাবুকে পছন্দ কর না। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকেই জানে, পানুবাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ এক-রকম স্থির— এ অবস্থায় যদি তুমি—

সুচরিতা। কই, মা, আমি তো এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কাউকে বলি নি।

সুচরিতার আশ্চর্য হইবার কারণ ছিল। সে হারানবাবুর ব্যবহারে বার বার বিরক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিবাহপ্রস্তাবের বিরুদ্ধে সে কোনোদিন মনেও কোনো চিন্তা করে নাই। এই বিবাহে সে সুখী হইবে কি না-হইবে সে তর্কও তাহার মনে কোনোদিন উদিত হয় নাই ; কারণ, এ বিবাহ যে সুখদুঃখের দিক দিয়া বিচার্য নহে ইহাই সে জানিত।

তখন তাহার মনে পড়িল, সেদিন পরেশবাবুর সামনেই পানুবাবুর প্রতি সে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতেই তিনি উদ্‌বিগ্ন হইয়াছেন, মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। এমন অসংযম তো সে পূর্বে কোনোদিন প্রকাশ করে নাই, পরেও কখনো করিবে না বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিল।

এ দিকে হারানবাবুও সেইদিনই অনতিকাল পরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এতদিন তাঁহার বিশ্বাস

ছিল যে, সুচরিতা তাঁহাকে মনে মনে পূজা করে ; এই পূজার অর্ঘ্য তাঁহার ভাগে আরও সম্পূর্ণতর হইত যদি বৃদ্ধ পরেশবাবুর প্রতি সুচরিতার অন্ধ-সংস্কার-বশত একটি অসংগত ভক্তি না থাকিত। পরেশবাবুর জীবনের নানা অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া দিলেও তাঁহাকে সুচরিতা যেন দেবতা বলিয়াই জ্ঞান করিত। ইহাতে হারানবাবু মনে মনে হাস্যও করিয়াছেন ক্ষুণ্ণও হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার আশা ছিল কালক্রমে উপযুক্ত অবসরে এই অযথা ভক্তিকে যথাপথে একাগ্রধারায় প্রবাহিত করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, হারানবাবু যতদিন নিজেকে সুচরিতার ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন ততদিন তাহার ছোটোখাটো কাজ ও আচরণ লইয়া কেবল সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে সর্বদা উপদেশ দিয়া গড়িয়া তুলিতেই প্রবৃত্ত ছিলেন— বিবাহ সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া উত্থাপন করেন নাই। সেদিন সুচরিতার দুই-একটি কথা শুনিয়া যখন হঠাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন সেও তাঁহাকে বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে অবিচলিত গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে যে দুই-একবার সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে পূর্বের ন্যায় নিজের গৌরব তিনি অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার কথায় ও আচরণে একটা কলহের ভাব দেখা দিয়াছে। তাহাকে লইয়া অকারণে বা ছোটো ছোটো উপলক্ষ্য ধরিয়া খুঁৎখুঁৎ করিয়াছেন। তৎ-সত্ত্বেও সুচরিতার অবিচলিত ঔদাসীন্যে তাঁহাকে মনে মনে হার মানিতে হইয়াছে এবং নিজের মর্যাদাহানিতে বাড়িতে আসিয়া পরিতাপ করিয়াছেন।

যাহা হউক, সুচরিতার শ্রদ্ধাহীনতার দুই-একটা লক্ষণ দেখিয়া হারান-বাবুর পক্ষে তাঁহার পরীক্ষকের উচ্চ আসনে দীর্ঘকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকা শক্ত হইয়া উঠিল। পূর্বে এত ঘন ঘন পরেশবাবুর বাড়িতে যাতায়াত করিতেন না— সুচরিতার প্রেমে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন পাছে তাঁহাকে এরূপ কেহ সন্দেহ করে এই আশঙ্কায় তিনি সপ্তাহে কেবল একবার করিয়া আসিতেন এবং সুচরিতা যেন তাঁহার ছাত্রী এমনিভাবে নিজের ওজন রাখিয়া চলিতেন।

কিন্তু, এই কয়দিন হঠাৎ কী হইয়াছে, হারানবাবু তুচ্ছ একটা ছুতা লইয়া দিনে একাধিক বারও আসিয়াছেন এবং ততোধিক তুচ্ছ ছুতা ধরিয়া সুচরিতার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরেশবাবুও এই উপলক্ষে উভয়কে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন এবং তাঁহার সন্দেহও ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।

আজ হারানবাবু আসিতেই বরদাসুন্দরী তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, পানুবাবু, আপনি আমাদের সুচরিতাকে বিবাহ করবেন এই কথা সকলেই বলে, কিন্তু আপনার মুখ থেকে তো কোনোদিন কোনো কথা শুনতে পাই নে। যদি সত্যই আপনার এরকম অভিপ্রায় থাকে তা হলে স্পষ্ট করে বলেন না কেন?"

হারানবাবু আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। এখন সুচরিতাকে তিনি কোনোমতে বন্দী করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন— তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ব্রাহ্মসমাজের হিতকল্পে যোগ্যতার পরীক্ষা পরে করিলেও চলিবে। হারান-বাবু বরদাসুন্দরীকে কহিলেন, "এ কথা বলা বাহুল্য বলেই বলি নি। সুচরিতার আঠারো বছর বয়সের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেম।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "আপনার আবার একটু বাড়াবাড়ি আছে। আমরা তো চোদ্দ বছর হলেই যথেষ্ট মনে করি।"

সেদিন চা খাইবার সময় পরেশবাবু সুচরিতার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সুচরিতা হারানবাবুকে এত যত্ন-অভ্যর্থনা অনেক দিন করে নাই। এমন-কি, হারানবাবু যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে লাবণ্যের নূতন একটা শিল্পকলার পরিচয় দিবার উপলক্ষে আরও একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

পরেশবাবুর মন নিশ্চিন্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, তিনি ভুল করিয়াছেন। এমন-কি, তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, এই দুইজনের মধ্যে হয়তো নিগূঢ় একটা প্রণয়কলহ ঘটিয়াছিল, আবার সেটা মিটমাট হইয়া গেছে।

সেইদিন বিদায় হইবার সময় হারান পরেশবাবুর কাছে বিবাহের

প্রস্তাব পাড়িলেন। জানাইলেন, এ সম্বন্ধে বিলম্ব করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

পরেশবাবু একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "কিন্তু, আপনি যে আঠারো বছরের কমে মেয়েদের বিয়ে হওয়া অন্যায় বলেন। এমন-কি, আপনি কাগজেও সে কথা লিখেছেন।"

হারানবাবু কহিলেন, "সুচরিতার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কারণ, ওঁর মনের যেরকম পরিণতি হয়েছে অনেক বড়ো বয়সের মেয়েরও এমন দেখা যায় না।"

পরেশবাবু প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কহিলেন, "তা হোক পানুবাবু। যখন বিশেষ কোনো অহিত দেখা যাচ্ছে না তখন আপনার মত-অনুসারে রাধারানীর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই কর্তব্য।"

হারানবাবু নিজের দুর্বলতা প্রকাশ হওয়ায় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই কর্তব্য। কেবল আমার ইচ্ছা এই যে, একদিন সকলকে ডেকে ঈশ্বরের নাম করে সম্বন্ধটা পাকা করা হোক।"

পরেশবাবু কহিলেন, "সে অতি উত্তম প্রস্তাব।"

১৭

ঘণ্টা দুই-তিন নিদ্রার পর যখন গোরা ঘুম ভাঙিয়া পাশে চাহিয়া দেখিল বিনয় ঘুমাইতেছে, তখন তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। স্বপ্নে একটা প্রিয় জিনিস হারাইয়া জাগিয়া উঠিয়া যখন দেখা যায় তাহা হারায় নাই, তখন যেমন আরাম বোধ হয় গোরার সেইরূপ হইল। বিনয়কে ত্যাগ করিলে গোরার জীবন যে কতখানি পঙ্গু হইয়া পড়ে, আজ নিদ্রাভঙ্গে বিনয়কে পাশে দেখিয়া তাহা সে অনুভব করিতে পারিল। এই আনন্দের আঘাতে চঞ্চল হইয়া গোরা ঠেলাঠেলি করিয়া বিনয়কে জাগাইয়া দিল এবং কহিল, "চলো, একটা কাজ আছে।"

গোরার প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে— নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার এরূপ যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। গোরাকে ইহারা দাদাঠাকুর বলিত এবং কড়িবাঁধা হুঁকা দিয়া অভ্যর্থনা করিত। কেবলমাত্র ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্যই গোরা জোর করিয়া তামাক খাওয়া ধরিয়াছিল।

এই দলের মধ্যে নন্দ গোরার সর্বপ্রধান ভক্ত ছিল। নন্দ ছুতারের ছেলে। বয়স বাইশ। সে তাহার বাপের দোকানে কাঠের বাক্স তৈয়ারি করিত। ধাপার মাঠে শিকারির দলে নন্দর মতো অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ কাহারও ছিল না। ক্রিকেট খেলায় গোলা ছুঁড়িতেও সে অদ্বিতীয় ছিল।

গোরা তাহার শিকার ও ক্রিকেটের দলে ভদ্র ছাত্রদের সঙ্গে এই-সকল ছুতার-কামারের ছেলেদের একসঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছিল। এই মিশ্রিত দলের মধ্যে নন্দ সকলপ্রকার খেলায় ও ব্যায়ামে সকলের সেরা ছিল। ভদ্র ছাত্ররা কেহ কেহ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, কিন্তু গোরার শাসনে সকলেরই তাহাকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।

এই নন্দর পায়ে কয়েক দিন হইল একটা বাটালি পড়িয়া গিয়া ক্ষত হওয়ায় সে খেলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। বিনয়কে লইয়া এই কয়দিন গোরার মন বিকল ছিল, সে তাহাদের বাড়িতে যাইতে পারে নাই। আজ প্রভাতেই বিনয়কে সঙ্গে করিয়া সে ছুতারপাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

নন্দদের দোতলা খোলার ঘরের দ্বারের কাছে আসিতেই ভিতর হইতে মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা গেল। নন্দর বাপ বা অন্য পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই। পাশে একটি তামাকের দোকান ছিল; তাহার কর্তা আসিয়া কহিল, "নন্দ আজ ভোরবেলায় মারা পড়িয়াছে, তাহাকে দাহ করিতে লইয়া গেছে।"

নন্দ মারা গিয়াছে! এমন স্বাস্থ্য, এমন শক্তি, এমন তেজ, এমন হৃদয়,

এত অল্প বয়স— সেই নন্দ আজ ভোরবেলায় মারা গিয়াছে। সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া গোরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দ একজন সামান্য ছুতারের ছেলে— তাহার অভাবে ক্ষণকালের জন্য সংসারের যেটুকু ফাঁক পড়িল তাহা অতি অল্প লোকেরই চোখে পড়িবে, কিন্তু আজ গোরার কাছে নন্দর মৃত্যু নিদারুণরূপে অসংগত ও অসম্ভব বলিয়া ঠেকিল। গোরা যে দেখিয়াছে তাহার প্রাণ ছিল— এত লোক তো বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাহার মতো এত প্রচুর প্রাণ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়!

কী করিয়া তাহার মৃত্যু হইল খবর লইতে গিয়া শোনা গেল যে, তাহার ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছিল। নন্দর বাপ ডাক্তার আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু নন্দর মা জোর করিয়া বলিল, তাহার ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। ভূতের ওঝা কাল সমস্ত রাত তাহার গায়ে ছেঁকা দিয়াছে, তাহাকে মারিয়াছে এবং মন্ত্র পড়িয়াছে। ব্যামোর আরম্ভে গোরাকে খবর দিবার জন্য নন্দ একবার অনুরোধ করিয়াছিল— কিন্তু, পাছে গোরা আসিয়া ডাক্তারি মতে চিকিৎসা করিবার জন্য জেদ করে, এই ভয়ে নন্দর মা কিছুতেই গোরাকে খবর পাঠাইতে দেয় নাই।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বিনয় কহিল, "কী মূঢ়তা, আর তার কী ভয়ানক শাস্তি!"

গোরা কহিল, "এই মূঢ়তাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে তুমি নিজে এর বাইরে আছ মনে করে সান্ত্বনা লাভ কোরো না বিনয়। এই মূঢ়তা যে কত বড়ো আর এর শাস্তি যে কতখানি তা যদি স্পষ্ট করে দেখতে পেতে, তা হলে ওই একটা আক্ষেপোক্তিমাত্র প্রকাশ করে ব্যাপারটাকে নিজের কাছ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে না।"

মনের উত্তেজনার সঙ্গে গোরার পদক্ষেপ ক্রমশই দ্রুত হইতে লাগিল। বিনয় তাহার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে সমান পা রাখিয়া চলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

গোরা বলিতে লাগিল, "সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে

রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ— ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই— জগতে সত্যের সঙ্গে কী রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কী করে! আর তুমি-আমি মনে করছি যে, আমরা যখন দু-পাতা বিজ্ঞান পড়েছি তখন আমরা আর এদের দলে নেই। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেনো, চার দিকের হীনতার আকর্ষণ থেকে অল্প লোক কখনোই নিজেকে বই-পড়া বিদ্যার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এরা যতদিন পর্যন্ত জগদ্‌ব্যাপারের মধ্যে নিয়মের আধিপত্যকে বিশ্বাস না করবে, যতদিন পর্যন্ত মিথ্যা ভয়ের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকেরাও এর প্রভাব ছাড়াতে পারবে না।"

বিনয় কহিল, "শিক্ষিত লোকেরা ছাড়াতে পারলেই বা তাতে কী! কজনই বা শিক্ষিত লোক। শিক্ষিত লোকদের উন্নত করবার জন্যেই যে অন্য লোকদের উন্নত হতে হবে তা নয়— বরঞ্চ অন্য লোকদের বড়ো করবার জন্যই শিক্ষিত লোকদের শিক্ষার গৌরব।"

গোরা বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "আমি তো ঠিক ওই কথাই বলতে চাই। কিন্তু, তোমরা নিজেদের ভদ্রতা ও শিক্ষার অভিমানে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দিব্য নিশ্চিন্ত হতে পার এটা আমি বারম্বার দেখেছি বলেই তোমাদের আমি সাবধান করে দিতে চাই যে, নীচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনোই তোমাদের যথার্থ নিষ্কৃতি নেই। নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাস্তুল কখনোই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবে না, তা তিনি যতই উচ্চে থাকুন-না কেন।"

বিনয় নিরুত্তরে গোরার সঙ্গে চলিতে লাগিল।

গোরা কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "না, বিনয়, এ আমি কিছুতেই সহজে সহ্য করিতে পারব না। ওই-যে ভূতের ওঝা এসে আমার নন্দকে মেরে গেছে তার মার আমাকে লাগছে, আমার সমস্ত দেশকে লাগছে। আমি এই-সব ব্যাপারকে এক-একটা ছোটো এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে কোনোমতেই দেখতে পারি নে।"

তথাপি বিনয়কে নিরুত্তর দেখিয়া গোরা গর্জিয়া উঠিল, "বিনয়, আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি মনে মনে কী ভাবছ। তুমি ভাবছ, এর প্রতিকার নেই কিম্বা প্রতিকারের সময় উপস্থিত হতে অনেক বিলম্ব আছে। তুমি ভাবছ, এই যে-সমস্ত ভয় এবং মিথ্যা সমস্ত ভারতবর্ষকে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভারতবর্ষের এ বোঝা হিমাচলের মতো বোঝা, একে ঠেলে টলাতে পারবে কে! কিন্তু, আমি এরকম করে ভাবতে পারি নে, যদি ভাবতুম তা হলে বাঁচতে পারতুম না। যা-কিছু আমার দেশকে আঘাত করছে তার প্রতিকার আছেই, তা সে যতবড়ো প্রবল হোক— এবং একমাত্র আমাদের হাতেই তার প্রতিকার আছে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে বলেই আমি চারি দিকের এত দুঃখদুর্গতি-অপমান সহ্য করতে পারছি।"

বিনয় কহিল, "এতোবড়ো দেশজোড়া প্রকাণ্ড দুর্গতির সামনে বিশ্বাসকে খাড়া করে রাখতে আমার সাহসই হয় না।"

গোরা কহিল, "অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপের শিখা ছোটো। সেই এতবড়ো অন্ধকারের চেয়ে এতটুকু শিখার উপরে আমি বেশি আস্থা রাখি। দুর্গতি চিরস্থায়ী হতে পারে, এ কথা আমি কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারি নে— সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তি তাকে ভিতরে বাহিরে কেবলই আঘাত করছে, আমরা যে যতই ছোটো হই সেই জ্ঞানের দলে প্রাণের দলে দাঁড়াব; দাঁড়িয়ে যদি মরি তবু এ কথা নিশ্চয় মনে রেখে মরব যে, আমাদের দলের জিত হবে— দেশের জড়তাকেই সকলের চেয়ে বড়ো এবং প্রবল মনে করে তারই উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকব না। আমি তো বলি— জগতে শয়তানের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা আর ভূতের ভয় করা ঠিক একই কথা; ওতে ফল হয় এই যে, রোগের সত্যকার চিকিৎসায় প্রবৃত্তিই হয় না। যেমন মিথ্যা ভয় তেমনি মিথ্যা ওঝা, দুয়ে মিলেই আমাদের মারতে থাকে। বিনয়, আমি তোমাকে বার বার বলছি, এ কথা এক মুহূর্তের জন্যে স্বপ্নেও অসম্ভব বলে মনে কোরো না যে, আমাদের এই দেশ মুক্ত হবেই, অজ্ঞানতাকে চিরদিন জড়িয়ে থাকবে না এবং ইংরেজ তাকে আপনার

বাণিজ্যতরীর পিছনে চিরকাল শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। এই কথা মনে দৃঢ় রেখে প্রতিদিনই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার জন্য ভবিষ্যতের কোন্‌-এক তারিখে লড়াই আরম্ভ হবে, তোমরা তারই উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ। আমি বলছি, লড়াই আরম্ভ হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে লড়াই চলছে, এ সময়ে যদি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পার তা হলে তার চেয়ে কাপুরুষতা তোমাদের কিছুই হতে পারে না।

বিনয় কহিল, "দেখো, গোরা, তোমার সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আমি এই দেখতে পাই যে, পথে ঘাটে আমাদের দেশে প্রতিদিন যা ঘটছে এবং অনেক দিন ধরেই যা ঘটে আসছে তুমি প্রত্যহই তাকে যেন নূতন চোখে দেখতে পাও। নিজের নিশ্বাসপ্রশ্বাসকে আমরা যেমন ভুলে থাকি এগুলোও আমাদের কাছে তেমনি— এতে আমাদের আশাও দেয় না, হতাশও করে না; এতে আমাদের আনন্দ নেই, দুঃখও নেই— দিনের পর দিন অত্যন্ত শূন্যভাবে চলে যাচ্ছে, চারি দিকের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের দেশকে অনুভবমাত্র করছি নে।"

হঠাৎ গোরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিল— সে দুই হাত মুঠা করিয়া রাস্তার মাঝখানে এক জুড়িগাড়ির পিছনে ছুটিতে লাগিল এবং বজ্রগর্জনে সমস্ত রাস্তার লোককে চকিত করিয়া চীৎকার করিল, "থামাও গাড়ি!" একটা মোটা ঘড়ির চেন-পরা বাবু গাড়ি হাঁকাইতেছিল, সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া দুই তেজস্বী ঘোড়াকে চাবুক কষাইয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক-ঝাঁকা ফল সবজি আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্যসামগ্রী লইয়া কোনো ইংরেজ প্রভুর পাকশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেন-পরা বাবুটি তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল, বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনোমতে তাহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাঁকাসমেত

জিনিসগুলা রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে 'ড্যাম শুয়ার' বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা দিল। বৃদ্ধ 'আল্লা' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিসগুলা নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিসগুলা নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল। মুসলমান মুটে ভদ্রলোক পথিকের এই ব্যবহারে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া কহিল, "আপনি কেন কষ্ট করছেন বাবু— এ আর কোনো কাজে লাগবে না।"

গোরা এ কাজের অনাবশ্যকতা জানিত এবং সে ইহাও জানিত, যাহার সাহায্য করা হইতেছে সে লজ্জা অনুভব করিতেছে— বস্তুত সাহায্য হিসাবে এরূপ কাজের বিশেষ মূল্য নাই— কিন্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্যায় অপমান করিয়াছে আর-এক ভদ্রলোক সেই অপমানিতের সঙ্গে নিজেকে সমান করিয়া ধর্মের ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে এ কথা রাস্তার লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। ঝাঁকা ভরতি হইলে গোরা তাহাকে বলিল, "যা লোকসান গেছে সে তো তোমার সইবে না। চলো, আমাদের বাড়ি চলো, আমি সমস্ত পুরো দাম দিয়ে কিনে নেব। কিন্তু, বাবা, একটা কথা তোমাকে বলি, তুমি কথাটি না বলে যে অপমান সহ্য করলে, আল্লা তোমাকে এ জন্য মাপ করবেন না।"

মুসলমান কহিল, "যে দোষী আল্লা তাকেই শাস্তি দেবেন, আমাকে কেন দেবেন!"

গোরা কহিল, "যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী। কেননা, সে জগতে অন্যায়ের সৃষ্টি করে। আমার কথা বুঝবে না তবু মনে রেখো, ভালোমানুষি ধর্ম নয়; তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে, তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন তাই তিনি ভালোমানুষ সেজে ধর্ম প্রচার করেন নি।"

সেখান হইতে গোরাদের বাড়ি নিকট নয় বলিয়া গোরা সেই মুসলমানকে বিনয়ের বাসায় লইয়া গেল। বিনয়ের দেরাজের সামনে দাঁড়াইয়া বিনয়কে

কহিল, "টাকা বের করো।"

বিনয় কহিল, "তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বসো গে-না, আমি দিচ্ছি।"

বলিয়া হঠাৎ চাবি খুঁজিয়া পাইল না। অধীর গোরা এক টান দিতেই দুর্বল দেরাজ বদ্ধ চাবির বাধা না মানিয়া খুলিয়া গেল।

দেরাজ খুলিতেই পরেশবাবুর পরিবারের সকলের একত্রে তোলা একটা বড়ো ফোটোগ্রাফ সর্বাগ্রে চোখে পড়িল। এটি বিনয় তাহার বালকবন্ধু সতীশের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

টাকা সংগ্রহ করিয়া গোরা সেই মুসলমানকে বিদায় করিল, কিন্তু ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিল না। গোরাকে এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়ও কোনো কথা তুলিতে পারিল না— অথচ দুই চারিটা কথা হইয়া গেলে বিনয়ের মন সুস্থ হইত।

গোরা হঠাৎ বলিল, "চললুম।"

বিনয় কহিল, "বাঃ, তুমি একলা যাবে কি! মা যে আমাকে তোমাদের ওখানে খেতে বলেছেন। অতএব, আমিও চললুম।"

দুই জনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বাকি পথ গোরা আর কোনো কথা কহিল না। ডেস্কের মধ্যে ওই ছবিখানি দেখিয়া গোরাকে আবার সহসা স্মরণ করাইয়া দিল যে, বিনয়ের চিত্তের একটা প্রধান ধারা এমন একটা পথে চলিয়াছে যে পথের সঙ্গে গোরার জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্রমে বন্ধুত্বের আদিগঙ্গা নির্জীব হইয়া ওই দিকেই মূল ধারাটা বহিতে পারে, এ আশঙ্কা অব্যক্তভাবে গোরার হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে একটা অনির্দেশ্য ভারের মতো চাপিয়া পড়িল। সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে এতদিন দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ছিল না— এখন আর তাহা রক্ষা করা কঠিন হইতেছে, বিনয় এক জায়গায় স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতেছে।

গোরা যে কেন চুপ করিয়া গেল বিনয় তাহা বুঝিল। কিন্তু এই নীরবতার বেড়া গায়ে পড়িয়া ঠেলিয়া ভাঙিতে তাহার সংকোচ বোধ হইল। গোরার মনটা যে জায়গায় আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে একটা সত্যকার

ব্যবধান আছে, ইহা বিনয় নিজেও অনুভব করে।

বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিতেই দেখা গেল, মহিম পথের দিকে চাহিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই বন্ধুকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "ব্যাপারখানা কী! কাল তো তোমাদের সমস্ত রাত না ঘুমিয়েই কেটেছে— আমি ভাবছিলুম, দুজনে বুঝি বা ফুটপাথের উপরে কোথাও আরামে ঘুমিয়ে পড়েছ। বেলা তো কম হয় নি। যাও, বিনয়, নাইতে যাও।"

বিনয়কে তাগিদ করিয়া নাহিতে পাঠাইয়া মহিম গোরাকে লইয়া পড়িলেন; কহিলেন, "দেখো, গোরা, তোমাকে যে কথাটা বলেছিলুম সেটা একটু বিবেচনা করে দেখো। বিনয়কে যদি তোমার অনাচারী বলে সন্দেহ হয় তা হলে আজকালকার বাজারে হিন্দু পাত্র পাব কোথায়? শুধু হিঁদুয়ানি হলেও তো চলবে না, লেখাপড়াও তো চাই! ওই লেখাপড়াতে হিঁদুয়ানিতে মিললে যে পদার্থটা হয় সেটা আমাদের হিন্দুমতে ঠিক শাস্ত্রীয় জিনিস নয় বটে কিন্তু মন্দ জিনিসও নয়। যদি তোমার মেয়ে থাকত তা হলে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তোমার মতের ঠিক মিল হয়ে যেত।"

গোরা কহিল, "তা, বেশ তো— বিনয় বোধ হয় আপত্তি করবে না।"

মহিম কহিল, "শোনো একবার! বিনয়ের আপত্তির জন্যে কে ভাবছে! তোমার আপত্তিকেই তো ডরাই। তুমি নিজের মুখে একবার বিনয়কে অনুরোধ করো, আমি আর কিছু চাই নে— তাতে যদি ফল না হয় তো না হবে।"

গোরা কহিল, "আচ্ছা।"

মহিম মনে মনে কহিল, 'এইবার ময়রার দোকানে সন্দেশ এবং গয়লার দোকানে দই ক্ষীর ফরমাশ দিতে পারি।'

গোরা অবসরক্রমে বিনয়কে কহিল, "শশিমুখীর সঙ্গে তোমার বিবাহের জন্য দাদা ভারি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেছেন। এখন, তুমি কী বল?"

বিনয়। আগে তোমার কী ইচ্ছা সেইটে বলো।

গোরা। আমি তো বলি, মন্দ কী!

বিনয়। আগে তো তুমি মন্দই বলতে। আমরা দুজনের কেউ বিয়ে করব না, এ তো এক রকম ঠিক হয়েই ছিল।

গোরা। এখন ঠিক করা গেল, তুমি বিয়ে করবে আর আমি করব না।

বিনয়। কেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

গোরা। পৃথক ফল হবার ভয়েই এই ব্যবস্থা করা যাচ্ছে। বিধাতা কোনো কোনো মানুষকে সহজেই বেশি ভারগ্রস্ত করে গড়ে থাকেন, কেউ বা সহজেই দিব্য ভারহীন— এই উভয় জীবকে একত্রে জুড়ে চালাতে গেলে এদের একটির উপর বাইরে থেকে বোঝা চাপিয়ে দুজনের ওজন সমান করে নিতে হয়। তুমি বিবাহ করে একটু দায়গ্রস্ত হলে পর তোমাতে আমাতে সমান চালে চলতে পারব।

বিনয় একটু হাসিল এবং কহিল, "যদি সেই মৎলব হয় তবে এই দিকেই বাটখারাটি চাপাও।"

গোরা। বাটখারাটি সম্বন্ধে আপত্তি নেই তো?

বিনয়। ওজন সমান করবার জন্যে যা হাতের কাছে আসে তাতেই কাজ চালানো যেতে পারে। ও পাথর হলেও হয়, ঢেলা হলেও হয়, যা খুশি।

গোরা যে বিবাহপ্রস্তাবে কেন উৎসাহ প্রকাশ করিল তাহা বিনয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না। পাছে বিনয় পরেশবাবুর পরিবারের মধ্যে বিবাহ করিয়া বসে গোরার মনে এই সন্দেহ হইয়াছে, অনুমান করিয়া বিনয় মনে মনে হাসিল। এরূপ বিবাহের সংকল্প ও সম্ভাবনা তাহার মনে এক মুহূর্তের জন্যও উদিত হয় নাই। এ যে হইতেই পারে না। যাই হোক, শশিমুখীকে বিবাহ করিলে এরূপ অদ্ভুত আশঙ্কার একেবারে মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই উভয়ের বন্ধুত্বসম্বন্ধ পুনরায় সুস্থ ও শান্ত হইবে ও পরেশ-বাবুদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেও তাহার কোনো দিক হইতে কোনো সংকোচের কারণ থাকিবে না, এই কথা চিন্তা করিয়া সে শশিমুখীর সহিত বিবাহে সহজেই সম্মতি দিল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে রাত্রের নিদ্রার ঋণশোধ করিতে দিন কাটিয়া গেল।

সেদিন দুই বন্ধুর মধ্যে আর কোনো কথা হইল না, কেবল জগতের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারের পর্দা পড়িলে প্রণয়ীদের মধ্যে যখন মনের পর্দা উঠিয়া যায় সেই সময় বিনয় ছাতের উপরে বসিয়া সিধা আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল, "দেখো, গোরা, একটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই। আমার মনে হয়, আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা ভারতবর্ষকে আধখানা করে দেখি।"

গোরা। কেন বলো দেখি।

বিনয়। আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখি নে।

গোরা। তুমি ইংরেজদের মতো মেয়েদের বুঝি ঘরে বাইরে, জলে স্থলে শূন্যে, আহারে আমোদে কর্মে, সর্বত্রই দেখতে চাও? তাতে ফল হবে এই যে, পুরুষের চেয়ে মেয়েকেই বেশি করে দেখতে থাকবে— তাতেও দৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট হবে।

বিনয়। না, না, তুমি আমার কথাটাকে ওরকম করে উড়িয়ে দিলে চলবে না। ইংরেজের মতো করে দেখব কি না-দেখব সে কথা কেন তুলছ? আমি বলছি, এটা সত্য যে, স্বদেশের মধ্যে মেয়েদের অংশকে আমাদের চিন্তার মধ্যে আমরা যথাপরিমাণে আনি নে। তোমার কথাই আমি বলতে পারি, তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে এক মুহূর্তও ভাব না— দেশকে তুমি যেন নারীহীন করে জান— সেরকম জানা কখনোই সত্য জানা নয়।

গোরা। আমি যখন আমার মাকে দেখেছি, মাকে জেনেছি, তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখেছি এবং জেনেছি।

বিনয়। ওটা তুমি নিজেকে ভোলাবার জন্যে একটা সাজিয়ে কথা বললে মাত্র। ঘরের কাজের মধ্যে ঘরের লোকে ঘরের মেয়েদের অতিপরিচিত ভাবে দেখলে তাতে যথার্থ দেখাই হয় না। নিজেদের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের বাইরে আমরা দেশের মেয়েদের যদি দেখতে পেতুম তা হলে আমাদের স্বদেশের সৌন্দর্য এবং সম্পূর্ণতাকে আমরা দেখতুম, দেশের এমন একটি

মূর্তি দেখা যেত যার জন্যে প্রাণ দেওয়া সহজ হত— অন্তত তা হলে, দেশের মেয়েরা যেন কোথাও নেই, এরকম ভুল আমাদের কখনোই ঘটতে পারত না। জানি, ইংরেজের সমাজের সঙ্গে কোনোরকম তুলনা করতে গেলেই তুমি আগুন হয়ে উঠবে— আমি তা করতে চাই নে— আমি জানি নে, ঠিক কতটা পরিমাণে এবং কিরকম ভাবে আমাদের মেয়েরা সমাজে প্রকাশ পেলে তাদের মর্যাদা লঙ্ঘন হয় না, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে, মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে আছে— আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পারছে না।

গোরা। তুমি এ কথাটা সম্প্রতি হঠাৎ আবিষ্কার করলে কী করে?

বিনয়। হাঁ, সম্প্রতিই আবিষ্কার করেছি এবং হঠাৎ আবিষ্কারই করেছি। এতবড়ো সত্য আমি এতদিন জানতুম না। জানতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। আমরা যেমন চাষাকে কেবলমাত্র তার চাষবাস, তাঁতিকে তার কাপড়-তৈরির মধ্যে দেখি ব'লে তাদের ছোটোলোক বলে অবজ্ঞা করি, তারা সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের চোখে পড়ে না, এবং ছোটোলোক-ভদ্রলোকের সেই বিচ্ছেদের দ্বারাই দেশ দুর্বল হয়েছে, ঠিক সেইরকম কারণেই দেশের মেয়েদের কেবল তাদের রান্নাবান্না বাটনা-বাটার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখছি বলেই মেয়েদের মেয়েমানুষ বলে অত্যন্ত খাটো করে দেখি— এতে করে আমাদের সমস্ত দেশই খাটো হয়ে গেছে।

গোরা। দিন আর রাত্রি, সময়ের এই যেমন দুটো ভাগ— পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতোই প্রচ্ছন্ন— তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্মের হিসাব থেকে আমরা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই বলে তার যে গভীর কর্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না। সে গোপন বিশ্রামের অন্তরালে আমাদের ক্ষতিপূরণ করে, আমাদের পোষণের সহায়তা করে। যেখানে সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা সেখানে রাতকে জোর করে দিন করে তোলে— সেখানে গ্যাস জ্বালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি জ্বালিয়ে সমস্ত

রাত নাচগান হয়— তাতে ফল কী হয়? ফল এই হয় যে, রাত্রির যে স্বাভাবিক নিভৃত কাজ তা নষ্ট হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদেরও যদি তেমনি আমরা প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে টেনে আনি তা হলে তাদের নিগূঢ় কর্মের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়— তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি ভঙ্গ হয়, সমাজে একটা মত্ততা প্রবেশ করে। সেই মত্ততাকে হঠাৎ শক্তি বলে ভ্রম হয়, কিন্তু সে-শক্তি বিনাশ করবারই শক্তি। শক্তির দুটো অংশ আছে— এক অংশ ব্যক্ত, আর-এক অংশ অব্যক্ত; এক অংশ উদ্যোগ, আর-এক অংশ বিশ্রাম; এক অংশ প্রয়োগ আর-এক অংশ সম্বরণ। শক্তির এই সামঞ্জস্য যদি নষ্ট কর তা হলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু সে ক্ষোভ মঙ্গলকর নয়। নরনারী সমাজশক্তির দুই দিক; পুরুষই ব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্ত বলেই যে মস্ত তা নয়— নারী অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে যদি কেবলই ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয় তা হলে সমস্ত মূলধন খরচ করে ফেলে সমাজকে দ্রুতবেগে দেউলে করবার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই জন্যে বলছি, আমরা পুরুষরা যদি থাকি যজ্ঞের ক্ষেত্রে, মেয়েরা যদি থাকেন ভাঁড়ার আগলে, তা হলেই মেয়েরা অদৃশ্য থাকলেও যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে। সব শক্তিকেই একই দিকে একই জায়গায় একই রকমে খরচ করতে চায় যারা তারা উন্মত্ত।

বিনয়। গোরা, তুমি যা বললে আমি তার প্রতিবাদ করতে চাই নে— কিন্তু আমি যা বলছিলুম তুমিও তার প্রতিবাদ কর নি। আসল কথা—

গোরা। দেখো, বিনয়, এর পরে এ কথাটা নিয়ে আর অধিক যদি বকাবকি করা যায় তা হলে সেটা নিতান্ত তর্ক হয়ে দাঁড়াবে। আমি স্বীকার করছি, তুমি সম্প্রতি মেয়েদের সম্বন্ধে যতটা সচেতন হয়ে উঠেছ আমি ততটা হই নি— সুতরাং তুমি যা অনুভব করছ আমাকেও তাই অনুভব করাবার চেষ্টা করা কখনো সফল হবে না। অতএব, এ সম্বন্ধে আপাতত আমাদের মতভেদ রইল বলেই মেনে নেওয়া যাক-না।

গোরা কথাটাকে উড়াইয়া দিল। কিন্তু, বীজকে উড়াইয়া দিলেও সে

মাটিতে পড়ে এবং মাটিতে পড়িলে সুযোগমত অঙ্কুরিত হইতে বাধা থাকে না। এ-পর্যন্ত জীবনের ক্ষেত্র হইতে গোরা স্ত্রীলোককে একেবারেই সরাইয়া রাখিয়াছিল ; সেটাকে একটা অভাব বা ক্ষতি বলিয়া সে কখনো স্বপ্নেও অনুভব করে নাই। আজ বিনয়ের অবস্থান্তর দেখিয়া সংসারে স্ত্রীজাতির বিশেষ সত্তা ও প্রভাব তাহার কাছে গোচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, ইহার স্থান কোথায়, ইহার প্রয়োজন কী তাহা সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই— এইজন্য বিনয়ের সঙ্গে এ কথা লইয়া তর্ক করিতে তাহার ভালো লাগে না। বিষয়টাকে সে অস্বীকার করিতেও পারে না, আয়ত্ত করিতেও পারিতেছে না— এইজন্য ইহাকে আলোচনার বাহিরে রাখিতে চায়।

রাত্রে বিনয় যখন বাসায় ফিরিতেছিল তখন আনন্দময়ী তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “শশিমুখীর সঙ্গে, বিনয়, তোমার বিবাহ নাকি ঠিক হয়ে গেছে ?”

বিনয় সলজ্জ হাস্যের সহিত কহিল, “হাঁ মা— গোরা এই শুভকর্মের ঘটক।”

আনন্দময়ী কহিলেন, “শশিমুখী মেয়েটি ভালো— কিন্তু, বাছা, ছেলে-মানুষি কোরো না। আমি তোমার মন জানি বিনয়— একটু দোমনা হয়েছ বলেই তাড়াতাড়ি এ কাজ করে ফেলছ। এখনো বিবেচনা করে দেখবার সময় আছে, তোমার বয়স হয়েছে বাবা— এতবড়ো একটা কাজ অশ্রদ্ধা করে কোরো না।”

বলিয়া বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। বিনয় কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

১৮

বিনয় আনন্দময়ীর কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতে বাসায় গেল। আনন্দময়ীর মুখের একটি কথাও এ-পর্যন্ত বিনয়ের কাছে কোনোদিন উপেক্ষিত হয় নাই। সে-রাত্রে তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যেন একটা মুক্তির ভাব অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, গোরার বন্ধুত্বকে সে একটা খুব বড়ো দাম দিয়া চুকাইয়া দিয়াছে। এক দিকে শশিমুখীকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়া সে জীবন-ব্যাপী যে একটা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে ইহার পরিবর্তে আর-এক দিকে তাহার বন্ধন আলগা দিবার অধিকার হইয়াছে। বিনয় সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মপরিবারে বিবাহ করিবার জন্য লুব্ধ হইয়াছে, গোরা তাহার প্রতি এই-যে অত্যন্ত অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিল— এই মিথ্যা সন্দেহের কাছে সে শশিমুখীর বিবাহকে চিরন্তন জামিন-স্বরূপে রাখিয়া নিজেকে খালাস করিয়া লইল। ইহার পরে বিনয় পরেশের বাড়িতে নিঃসংকোচে এবং ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল।

যাহাদিগকে ভালো লাগে তাহাদের ঘরের লোকের মতো হইয়া উঠা বিনয়ের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নহে। সে যেই গোরার দিকের সংকোচ তাহার মন হইতে দূর করিয়া দিল অমনি দেখিতে দেখিতে অল্প কালের মধ্যেই পরেশবাবুর ঘরের সকলের কাছেই যেন বহুদিনের আত্মীয়ের মতো হইয়া উঠিল।

কেবল ললিতার মনে যে-কয়দিন সন্দেহ ছিল যে, সুচরিতার মন হয়তো বা বিনয়ের দিকে কিছু ঝুঁকিয়াছে, সেই কয়দিন বিনয়ের বিরুদ্ধে তাহার মন যেন অস্ত্রধারণ করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন সে স্পষ্ট বুঝিল যে, সুচরিতা বিনয়ের প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী নহে তখন তাহার মনের বিদ্রোহ দূর হইয়া সে ভারি আরাম বোধ করিল এবং বিনয়বাবুকে অসামান্য ভালো লোক বলিয়া মনে করিতে তাহার কোনো বাধা রহিল না।

হারানবাবুও বিনয়ের প্রতি বিমুখ হইলেন না— তিনি একটু যেন বেশি করিয়া স্বীকার করিলেন যে, বিনয়ের ভদ্রতাজ্ঞান আছে। গোরার যে সেটা নাই, ইহাই এই স্বীকারোক্তির ইঙ্গিত।

বিনয় কখনো হারানবাবুর সম্মুখে কোনো তর্কের বিষয় তুলিত না এবং সুচরিতারও চেষ্টা ছিল যাহাতে না তোলা হয়— এইজন্য বিনয়ের দ্বারা

ইতিমধ্যে চায়ের টেবিলের শান্তিভঙ্গ হইতে পায় নাই।

কিন্তু, হারানের অনুপস্থিতিতে সুচরিতা নিজে চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহার সামাজিক মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত করিত। গোরা এবং বিনয়ের মতো শিক্ষিত লোক কেমন করিয়া যে দেশের প্রাচীন কুসংস্কারগুলির সমর্থন করিতে পারে, ইহা জানিবার কৌতূহল কিছুতেই তাহার নিবৃত্ত হইত না। গোরা ও বিনয়কে সে যদি না জানিত তবে এ-সকল মত কেহ স্বীকার করে জানিলে সুচরিতা দ্বিতীয় কোনো কথা না শুনিয়া তাহাকে অবজ্ঞার যোগ্য বলিয়া স্থির করিত। কিন্তু, গোরাকে দেখিয়া অবধি গোরাকে সে কোনোমতে মন হইতে অশ্রদ্ধা করিয়া দূর করিতে পারিতেছে না। তাই সুযোগ পাইলেই ঘুরিয়া-ফিরিয়া বিনয়ের সঙ্গে সে গোরার মত ও জীবনের আলোচনা উত্থাপন করে এবং প্রতিবাদের দ্বারা সকল কথা শেষ পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিতে থাকে। পরেশ সুচরিতাকে সকল সম্প্রদায়ের মত শুনিতে দেওয়াই তাহার সুশিক্ষার উপায় বলিয়া জানিতেন, এইজন্য তিনি এ-সকল তর্কে কোনোদিন শঙ্কা-অনুভব বা বাধাপ্রদান করেন নাই।

একদিন সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, গৌরমোহনবাবু কি সত্যই জাতিভেদ মানেন, না, ওটা দেশানুরাগের একটা বাড়াবাড়ি ?"

বিনয় কহিল, "আপনি কি সিঁড়ির ধাপগুলোকে মানেন? ওগুলোও তো সব বিভাগ — কোনোটা উপরে, কোনোটা নীচে।"

সুচরিতা। নীচে থেকে উপরে উঠতে হয় বলেই মানি— নইলে মানবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমান জায়গায় সিঁড়িকে না মানলেও চলে।

বিনয়। ঠিক বলেছেন— আমাদের সমাজ একটা সিঁড়ি— এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা হচ্ছে নীচে থেকে উপরে উঠিয়ে দেওয়া— মানব-জীবনের একটা পরিণামে নিয়ে যাওয়া। যদি সমাজকে সংসারকেই পরিণাম বলে জানতুম, তা হলে কোনো বিভাগ-ব্যবস্থার প্রয়োজনই ছিল না— তা হলে য়ুরোপীয় সমাজের মতো প্রত্যেকে অন্যের চেয়ে বেশি দখল করবার জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারি করে চলতুম; সংসারে যে কৃতকার্য হত সেই

মাথা তুলত, যার চেষ্টা নিষ্ফল হত সে একেবারেই তলিয়ে যেত। আমরা সংসারের ভিতর দিয়ে সংসারকে পার হতে চাই বলেই সংসারের কর্তব্যকে প্রবৃত্তি ও প্রতিযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করি নি— সংসারকর্মকে ধর্ম বলে স্থির করেছি, কেননা কর্মের দ্বারা অন্য কোনো সফলতা নয়, মুক্তি লাভ করতে হবে— সেইজন্য এক দিকে সংসারের কাজ, অন্য দিকে সংসারকাজের পরিণাম, উভয় দিকে তাকিয়ে আমাদের সমাজ বর্ণভেদ অর্থাৎ বৃত্তিভেদ স্থাপন করেছেন।

সুচরিতা। আমি যে আপনার কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারছি তা নয়। আমার প্রশ্ন এই যে, যে উদ্দেশ্যে সমাজে বর্ণভেদ প্রচলিত হয়েছে আপনি বলছেন, সে উদ্দেশ্য কি সফল হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন?

বিনয়। পৃথিবীতে সফলতার চেহারা দেখতে পাওয়া বড়ো শক্ত। গ্রীসের সফলতা আজ গ্রীসের মধ্যে নেই, সেজন্যে বলতে পারি নে গ্রীসের সমস্ত আইডিয়াই ভ্রান্ত এবং ব্যর্থ। গ্রীসের আইডিয়া এখনো মানবসমাজের মধ্যে নানা আকারে সফলতা লাভ করছে। ভারতবর্ষ যে জাতিভেদ ব'লে সামাজিক সমস্যার একটা বড়ো উত্তর দিয়েছিলেন— সে উত্তরটা এখনো মরে নি, সেটা এখনো পৃথিবীর সামনে রয়েছে। য়ুরোপও সামাজিক সমস্যার অন্য কোনো সদুত্তর এখনো দিতে পারে নি, সেখানে কেবলই ঠেলাঠেলি হাতাহাতি চলছে— ভারতবর্ষের এই উত্তরটা মানবসমাজে এখনো সফলতার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে— আমরা একে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্ধতা-বশত উড়িয়ে দিলেই যে এ উড়ে যাবে তা মনেও করবেন না। আমরা ছোটো ছোটো সম্প্রদায়েরা জলবিম্বের মতো সমুদ্রে মিশিয়ে যাব, কিন্তু ভারতবর্ষের সহজ প্রতিভা হতে এই-যে একটা প্রকাণ্ড মীমাংসা উদ্ভূত হয়েছে— পৃথিবীর মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত এর কাজ না হবে ততক্ষণ এ স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে।

সুচরিতা সংকুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি রাগ করবেন না, কিন্তু সত্যি করে বলুন, এ-সমস্ত কথা কি আপনি গৌরমোহনবাবুর প্রতি-ধ্বনির মতো বলছেন, না এ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "আপনাকে সত্য করেই বলছি, গোরার মতো আমার বিশ্বাসের জোর নেই। জাতিভেদের আবর্জনা ও সমাজের বিকার-গুলো যখন দেখতে পাই তখন আমি অনেক সময়েই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি ; কিন্তু গোরা বলে, বড়ো জিনিসকে ছোটো করে দেখলেই সন্দেহ জন্মে— গাছের ভাঙা ডাল ও শুকনো পাতাকেই গাছের চরম প্রকৃতি বলে দেখা বুদ্ধির অসহিষ্ণুতা— ভাঙা ডালকে প্রশংসা করতে বলি নে, কিন্তু বনস্পতিকে দেখো এবং তার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করো।"

সুচরিতা। গাছের শুকনো পাতাটা নাহয় নাই ধরা গেল, কিন্তু গাছের ফলটা তো দেখতে হবে। জাতিভেদের ফলটা আমাদের দেশের পক্ষে কিরকম ?

বিনয়। যাকে জাতিভেদের ফল বলছেন সেটা অবস্থার ফল, শুধু জাতিভেদের নয়। নড়া দাঁত দিয়ে চিবোতে গেলে ব্যথা লাগে সেটা দাঁতের অপরাধ নয়, নড়া দাঁতের অপরাধ। নানা কারণে আমাদের মধ্যে বিকার ও দুর্বলতা ঘটেছে বলেই ভারতবর্ষের আইডিয়াকে আমরা সফল না করে বিকৃত করছি— সে বিকার আইডিয়ার মূলগত নয়। আমাদের ভিতর প্রাণ ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ঘটলেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। গোরা সেইজন্যে বার বার বলে যে, মাথা ধরে বলে মাথাটাকে উড়িয়ে দিলে চলবে না— সুস্থ হও, সবল হও।

সুচরিতা। আচ্ছা, তা হলে আপনি ব্রাহ্মণ জাতকে নরদেবতা বলে মানতে বলেন ? আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোয় মানুষ পবিত্র হয় ?

বিনয়। পৃথিবীতে অনেক সম্মানই তো আমাদের নিজের সৃষ্টি। রাজাকে যতদিন যে কারণেই হোক দরকার থাকে ততদিন মানুষ তাকে অসামান্য বলে প্রচার করে। কিন্তু, রাজা তো সত্যি অসামান্য নয়। অথচ নিজের সামান্যতার বাধা ভেদ করে তাকে অসামান্য হয়ে উঠতে হবে, নইলে সে রাজত্ব করতে পারবেই না। আমরা রাজার কাছে থেকে উপযুক্তরূপ

রাজত্ব পাবার জন্যে তাকে অসামান্য করে গড়ে তুলি— আমাদের সেই সম্মানের দাবি রাজাকে রক্ষা করতে হয়, তাকে অসামান্য হতে হয়। মানুষের সকল সম্বন্ধের মধ্যেই এই কৃত্রিমতা আছে। এমন-কি, বাপ-মার যে আদর্শ আমরা সকলে মিলে খাড়া করে রেখেছি তাতে করেই সমাজে বাপ-মাকে বিশেষভাবে বাপ-মা করে রেখেছে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক স্নেহে নয়। একান্নবর্তী পরিবারে বড়ো ভাই ছোটো ভাইয়ের জন্য অনেক সহ্য ও অনেক ত্যাগ করে— কেন করে? আমাদের সমাজে দাদাকে বিশেষভাবে দাদা করে তুলেছে, অন্য সমাজে তা করে নি। ব্রাহ্মণকেও যদি যথার্থভাবে ব্রাহ্মণ করে গড়ে তুলতে পারি তা হলে সে কি সমাজের পক্ষে সামান্য লাভ! আমরা নরদেবতা চাই— আমরা নরদেবতাকে যদি যথার্থই অন্তরের সঙ্গে বুদ্ধিপূর্বক চাই তা হলে নরদেবতাকে পাব, আর যদি মূঢ়ের মতো চাই তা হলে যে-সমস্ত অপদেবতা সকল-রকম দুষ্কর্ম করে থাকে এবং আমাদের মাথার উপরে পায়ের ধুলো দেওয়া যাদের জীবিকার উপায় তাদের দল বাড়িয়ে ধরণীর ভার বৃদ্ধি করা হবে।

সুচরিতা। আপনার সেই নরদেবতা কি কোথাও আছে?

বিনয়। বীজের মধ্যে যেমন গাছ আছে তেমনি আছে, ভারতবর্ষের আন্তরিক অভিপ্রায় এবং প্রয়োজনের মধ্যে আছে। অন্য দেশ ওয়েলিংটনের মতো সেনাপতি, নিউটনের মতো বৈজ্ঞানিক, রথ্‌চাইল্ডের মতো লক্ষপতি চায়, আমাদের দেশ ব্রাহ্মণকে চায়। ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে 'পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ', যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত— সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়— সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে, প্রত্যেক কর্মকে সর্বদাই একটি মুক্তির সুর জোগাবার জন্যই ব্রাহ্মণকে চাই— রাঁধবার জন্যে এবং ঘণ্টা নাড়বার জন্যে নয়— সমাজের সার্থকতাকে সমাজের চোখের সামনে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে রাখবার জন্যে ব্রাহ্মণকে চাই। এই ব্রাহ্মণের আদর্শকে আমরা

যত বড়ো করে অনুভব করব ব্রাহ্মণের সম্মানকে তত বড়ো করে তুলতে হবে। সে সম্মান রাজার সম্মানের চেয়ে অনেক বেশি ; সে সম্মান দেবতারই সম্মান। এ দেশে ব্রাহ্মণ যখন সেই সম্মানের যথার্থ অধিকারী হবে তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত করতে পারবে না। আমরা কি রাজার কাছে মাথা হেঁট করি ? অত্যাচারীর বন্ধন গলায় পরি ? নিজের ভয়ের কাছে আমাদের মাথা নত, নিজের লোভের জালে আমরা জড়িয়ে আছি, নিজের মূঢ়তার কাছে আমরা দাসানুদাস। ব্রাহ্মণ তপস্যা করুন ; সেই ভয় থেকে, লোভ থেকে, মূঢ়তা থেকে আমাদের মুক্ত করুন— আমরা তাঁদের কাছ থেকে যুদ্ধ চাই নে, বাণিজ্য চাই নে, আর-কোনো প্রয়োজন চাই নে— তাঁরা আমাদের সমাজের মাঝখানে মুক্তির সাধনাকে সত্য করে তুলুন।

পরেশবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন ; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভারতবর্ষকে যে আমি জানি তা বলতে পারি নে এবং ভারতবর্ষ যে কী চেয়েছিলেন এবং কোনোদিন তা পেয়েছিলেন কি না তা আমি নিশ্চয় জানি নে— কিন্তু, যে দিন চলে গেছে সেই দিনে কি কখনো ফিরে যাওয়া যায় ? বর্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়— অতীতের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলে কি কোনো কাজ হবে ?"

বিনয় কহিল, "আপনি যেমন বলছেন আমিও ওইরকম করে ভেবেছি এবং অনেক বার বলেওছি— গোরা বলে যে, অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি সে অতীত ? বর্তমানের হাঁকডাকের আড়ালে পড়ে আমাদের দৃষ্টির অতীত হয়েছে বলেই সে অতীত নয়, সে ভারতবর্ষের মজ্জার মধ্যে রয়েছে। কোনো সত্য কোনোদিনই অতীত হতে পারে না। সেইজন্যই ভারতবর্ষের এই সত্য আমাদের আঘাত করতে আরম্ভ করেছে। একদিন একে যদি আমাদের একজনও সত্য বলে চিনতে ও গ্রহণ করতে পারে তা হলেই আমাদের শক্তির খনির দ্বারে প্রবেশের পথ খুলে যাবে, অতীতের ভাণ্ডার বর্তমানের সামগ্রী হয়ে উঠবে। আপনি কি মনে করছেন ভারতবর্ষের কোথাও সেরকম সার্থকজন্মা লোকের আবির্ভাব হয় নি ?"

সুচরিতা কহিল, "আপনি যেরকম করে এ-সব কথা বলছেন ঠিক সাধারণ লোকে এরকম করে বলে না— সেইজন্যে আপনাদের মতকে সমস্ত দেশের জিনিস বলে ধরে নিতে মনে সংশয় হয়।"

বিনয় কহিল, "দেখুন, সূর্যের উদয় ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকেরা এক রকম করে ব্যাখ্যা করে, আবার সাধারণ লোকে আর-এক রকম করে ব্যাখ্যা করে। তাতে সূর্যের উদয়ের বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি করে না। তবে কিনা সত্যকে ঠিকমত করে জানার দরুন আমাদের একটা লাভ আছে। দেশের যে-সকল সত্যকে আমরা খণ্ডিত করে বিক্ষিপ্ত করে দেখি, গোরা তার সমস্তকে এক করে সংশ্লিষ্ট করে দেখতে পায়, গোরার সেই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে— কিন্তু সেইজন্যই কি গোরার সেই দেখাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে করবেন— আর যারা ভেঙেচুরে দেখে তাদের দেখাটাই সত্য?"

সুচরিতা চুপ করিয়া রহিল। বিনয় কহিল, "আমাদের দেশে সাধারণত যে-সকল লোক নিজেকে পরম হিন্দু বলে অভিমান করে আমার বন্ধু গোরাকে আপনি সে দলের লোক বলে মনে করবেন না। আপনি যদি ওর বাপ কৃষ্ণদয়ালবাবুকে দেখতেন তা হলে বাপ ও ছেলের তফাত বুঝতে পারতেন। কৃষ্ণদয়ালবাবু সর্বদাই কাপড় ছেড়ে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে, পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে, নিজেকে সুপবিত্র করে রাখবার জন্যে অহরহ ব্যস্ত হয়ে আছেন; রান্না সম্বন্ধে খুব ভালো বামুনকেও তিনি বিশ্বাস করেন না পাছে তার ব্রাহ্মণত্বের কোথাও কোনো ত্রুটি থাকে; গোরাকে তাঁর ঘরের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেন না; কখনো যদি কাজের খাতিরে তাঁর স্ত্রীর মহলে আসতে হয় তা হলে ফিরে গিয়ে নিজেকে শোধন করে নেন; পৃথিবীতে দিনরাত অত্যন্ত আলগোছে আছেন পাছে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোনো দিক থেকে নিয়মভঙ্গের কণামাত্র ধুলো তাঁকে স্পর্শ করে— ঘোর বাবু যেমন রোদ কাটিয়ে, ধুলো বাঁচিয়ে, নিজের রঙের জেল্লা, চুলের বাহার, কাপড়ের পারিপাট্য রক্ষা করতে সর্বদা ব্যস্ত হয়ে থাকে সেইরকম। গোরা এরকমই নয়। সে হিঁদুয়ানি নিয়মকে অশ্রদ্ধা করে না কিন্তু সে অমন খুঁটে খুঁটে চলতে পারে না। সে হিন্দুধর্মকে

ভিতরের দিক থেকে এবং খুব বড়োরকম করে দেখে, সে কোনোদিন মনেও করে না যে, হিন্দুধর্মের প্রাণ নিতান্ত শৌখিন প্রাণ— অল্প একটু ছোঁয়া-ছুঁয়িতেই শুকিয়ে যায়, ঠেকাঠেকিতেই মারা পড়ে।"

সুচরিতা। কিন্তু, তিনি তো খুব সাবধানে ছোঁয়াছুঁয়ি মেনে চলেন বলেই মনে হয়।

বিনয়। তার ওই সতর্কতাটা একটা অদ্ভুত জিনিস। তাকে যদি প্রশ্ন করা যায় সে তখনই বলে, 'হাঁ আমি এ-সমস্তই মানি— ছুঁলে জাত যায়, খেলে পাপ হয়, এ-সমস্তই অভ্রান্ত সত্য।' কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, এ কেবল ওর গায়ের জোরের কথা— এ-সব কথা যতই অসংগত হয় ততই ও যেন সকলকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলে। পাছে বর্তমান হিন্দুয়ানির সামান্য কথাটাকেও অস্বীকার করলে অন্য মূঢ় লোকের কাছে হিন্দুয়ানির বড়ো জিনিসেরও অসম্মান ঘটে এবং যারা হিন্দুয়ানিকে অশ্রদ্ধা করে তারা সেটাকে নিজের জিত বলে গণ্য করে, এইজন্যে গোরা নির্বিচারে সমস্তই মেনে চলতে চায়— আমার কাছেও এ সম্বন্ধে কোনো শৈথিল্য প্রকাশ করতে চায় না।

পরেশবাবু কহিলেন, "ব্রাহ্মদের মধ্যেও এরকম লোক অনেক আছে। তারা হিন্দুয়ানির সমস্ত সংস্রবই নির্বিচারে পরিহার করতে চায়, পাছে বাইরের কোনো লোক ভুল করে যে তারা হিন্দুধর্মের কুপ্রথাকেও স্বীকার করে। এ-সকল লোক পৃথিবীতে বেশ সহজভাবে চলতে পারে না— এরা হয় ভাণ করে নয় বাড়াবাড়ি করে; মনে করে, সত্য দুর্বল, এবং সত্যকে কেবল কৌশল করে কিম্বা জোর করে রক্ষা করা যেন কর্তব্যের অঙ্গ। আমার উপরে সত্য নির্ভর করছে, সত্যের উপরে আমি নির্ভর করছি নে' এইরকম যাদের ধারণা তাদেরই বলে গোঁড়া। সত্যের জোরকে যারা বিশ্বাস করে নিজেদের জবরদস্তিকে তারা সংযত রাখে। বাইরের লোকে দু-দিন দশ-দিন ভুল বুঝলে সামান্যই ক্ষতি, কিন্তু কোনো ক্ষুদ্র সংকোচে সত্যকে স্বীকার না করতে পারলে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি। আমি ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই

এই প্রার্থনা করি যে, ব্রাহ্মের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক, আমি যেন সত্যকে সর্বত্রই নতশিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি— বাইরের কোনো বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখতে পারে।"

এই বলিয়া পরেশবাবু স্তব্ধ হইয়া আপনার মনকে যেন আপনার অন্তরে ক্ষণকালের জন্য সমাধান করিলেন। পরেশবাবু মৃদুস্বরে এই যে-কয়টি কথা বলিলেন তাহা এতক্ষণের সমস্ত আলোচনার উপরে যেন একটা বড়ো সুর আনিয়া দিল— সে সুর যে ওই কয়টি কথার সুর তাহা নহে, তাহা পরেশবাবুর নিজের জীবনের একটি প্রশান্ত গভীরতার সুর। সুচরিতা এবং ললিতার মুখে একটি আনন্দিত ভক্তির দীপ্তি আলো ফেলিয়া গেল। বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সেও মনে মনে জানিত, গোরার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জবর্দস্তি আছে— সত্যের বাহকদের বাক্যে মনে ও কর্মে যে একটি সহজ ও সরল শান্তি থাকা উচিত তাহা গোরার নাই— পরেশবাবুর কথা শুনিয়া সে কথা তাহার মনে যেন আরও স্পষ্ট করিয়া আঘাত করিল। অবশ্য, বিনয় এতদিন গোরার পক্ষে এই বলিয়া মনে মনে তর্ক করিয়াছে যে, সমাজের অবস্থা যখন টলমল, বাহিরের দেশকালের সঙ্গে যখন বিরোধ বাধিয়াছে, তখন সত্যের সৈনিকরা স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে পারে না— তখন সাময়িক প্রয়োজনের আকর্ষণে সত্যের মধ্যেও ভাঙচুর আসিয়া পড়ে। আজ পরেশ-বাবুর কথায় বিনয় ক্ষণকালের জন্য মনে প্রশ্ন করিল যে, সাময়িক প্রয়োজন-সাধনের লুব্ধতায় সত্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা সাধারণ লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার গোরা কি সেই সাধারণ লোকের দলে?

সুচরিতা রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলে পর ললিতা তাহার খাটের এক ধারে আসিয়া বসিল। সুচরিতা বুঝিল, ললিতার মনের ভিতর একটা কোনো কথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কথাটা যে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহাও সুচরিতা বুঝিয়াছিল।

সেইজন্য সুচরিতা আপনি কথা পাড়িল, "বিনয়বাবুকে কিন্তু আমার বেশ

ভালো লাগে।"

ললিতা কহিল, "তিনি কিনা কেবলই গৌরবাবুর কথাই বলেন, সেইজন্যে তোমার ভালো লাগে।"

সুচরিতা এ কথাটার ভিতরকার ইঙ্গিতটা বুঝিয়াও বুঝিল না। সে একটা সরল ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "তা সত্যি, ওঁর মুখ থেকে গৌরবাবুর কথা শুনতে আমার ভারি আনন্দ হয়। আমি যেন তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাই।"

ললিতা কহিল, "আমার তো কিছু ভালো লাগে না— আমার রাগ ধরে।"

সুচরিতা আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কেন?"

ললিতা কহিল, "গোরা, গোরা, গোরা, দিনরাত্রি কেবল গোরা। ওঁর বন্ধু গোরা হয়তো খুব মস্ত লোক, বেশ তো, ভালোই তো— কিন্তু উনিও তো মানুষ।"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল, "তা তো বটেই, কিন্তু তার ব্যাঘাত কী হয়েছে?"

ললিতা। ওঁর বন্ধু ওঁকে এমনি ঢেকে ফেলেছেন যে উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। যেন কাঁচপোকায় তেলাপোকাকে ধরেছে— ওরকম অবস্থায় কাঁচপোকার উপরেও আমার রাগ ধরে, তেলাপোকার উপরেও আমার শ্রদ্ধা হয় না।

ললিতার কথার ঝাঁজ দেখিয়া সুচরিতা কিছু না বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ললিতা কহিল, "দিদি, তুমি হাসছ, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, আমাকে যদি কেউ ওরকম করে চাপা দিতে চেষ্টা করত আমি তাকে এক দিনের জন্যেও সহ্য করতে পারতুম না। এই মনে করো তুমি— লোকে যাই মনে করুক, তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখ নি— তোমার সেরকম প্রকৃতিই নয়— সেইজন্যেই আমি তোমাকে এত ভালোবাসি। আসল, বাবার কাছে থেকে তোমার ওই শিক্ষা হয়েছে— তিনি সব লোককেই তার জায়গাটুকু ছেড়ে দেন।"

এই পরিবারের মধ্যে সুচরিতা এবং ললিতা পরেশবাবুর পরম ভক্ত— 'বাবা' বলিতেই তাহাদের হৃদয় যেন স্ফীত হইয়া উঠে।

সুচরিতা কহিল, "বাবার সঙ্গে কি আর কারও তুলনা হয়! কিন্তু, যাই বল ভাই, বিনয়বাবু ভারি চমৎকার করে বলতে পারেন।"

ললিতা। ও গুলো ওঁর মনের কথা নয় বলেই অত চমৎকার করে বলেন। যদি নিজের কথা বলতেন তা হলে বেশ দিব্যি সহজ কথা হত; মনে হত না যে, ভেবে ভেবে বানিয়ে বানিয়ে বলছেন। চমৎকার কথার চেয়ে সে আমার ঢের ভালো লাগে।

সুচরিতা। তা, রাগ করিস কেন ভাই? গৌরমোহনবাবুর কথাগুলো ওঁর নিজেরই কথা হয়ে গেছে।

ললিতা। তা যদি হয় তো সে ভারি বিশ্রী— ঈশ্বর কি বুদ্ধি দিয়েছেন পরের কথা ব্যাখ্যা করবার, আর মুখ দিয়েছেন পরের কথা চমৎকার করে বলবার জন্যে! অমন চমৎকার কথায় কাজ নেই।

সুচরিতা। কিন্তু, এটা তুই বুঝছিস নে কেন যে, বিনয়বাবু গৌরমোহন-বাবুকে ভালোবাসেন— তাঁর সঙ্গে ওঁর মনের সত্যিকার মিল আছে।

ললিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, না, সম্পূর্ণ মিল নেই। গৌরমোহনবাবুকে মেনে চলা ওঁর অভ্যাস হয়ে গেছে— সেটা দাসত্ব, সে ভালোবাসা নয়। অথচ উনি জোর করে মনে করতে চান যে, তাঁর সঙ্গে ওঁর ঠিক এক মত; সেইজন্যেই তাঁর মতগুলিকে উনি অত চেষ্টা করে চমৎকার করে বলে নিজেকে ও অন্যকে ভোলাতে ইচ্ছা করেন। উনি কেবলই নিজের মনের সন্দেহকে বিরোধকে চাপা দিয়ে চলতে চান, পাছে গৌরমোহনবাবুকে না-মানতে হয়। তাঁকে না-মানবার সাহস ওঁর নেই। ভালোবাসা থাকলে মতের সঙ্গে না মিললেও মানা যেতে পারে— অন্ধ না হয়েও নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায়— ওঁর তো তা নয়— উনি গৌরমোহন-বাবুকে মানছেন হয়তো ভালোবাসা থেকে, অথচ কিছুতে সেটা স্বীকার করতে পারছেন না। ওঁর কথা শুনলেই সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আচ্ছা,

দিদি, তুমি বোঝ নি? সত্যি বলো।”

সুচরিতা ললিতার মতো এ কথা এমন করিয়া ভাবেই নাই। কারণ, গোরাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্যই তাহার কৌতূহল ব্যগ্র হইয়াছিল; বিনয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার জন্য তাহার আগ্রহই ছিল না। সুচরিতা ললিতার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল, “আচ্ছা, বেশ, তোর কথাই মেনে নেওয়া গেল— তা কী করতে হবে বল্।”

ললিতা। আমার ইচ্ছা করে, ওঁর বন্ধুর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁকে স্বাধীন করে দিতে।

সুচরিতা। চেষ্টা করে দেখ্-না ভাই।

ললিতা। আমার চেষ্টায় হবে না— তুমি একটু মনে করলেই হয়।

সুচরিতা যদিও ভিতরে ভিতরে বুঝিয়াছিল যে, বিনয় তাহার প্রতি অনুরক্ত তবু সে ললিতার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

ললিতা কহিল, “গৌরমোহনবাবুর শাসন কাটিয়েও উনি যে তোমার কাছে এমন করে ধরা দিতে আসছেন তাতেই আমার ওঁকে ভালো লাগে। ওঁর অবস্থার কেউ হলে ব্রাহ্ম-মেয়েদের গাল দিয়ে নাটক লিখত— ওঁর মন এখনো খোলসা আছে, তোমাকে ভালোবাসেন আর বাবাকে ভক্তি করেন এই তার প্রমাণ। বিনয়বাবুকে ওঁর নিজের ভাবে খাড়া করিয়ে দিতে হবেই দিদি। উনি যে কেবলই গৌরমোহনবাবুকে প্রচার করতে থাকেন সে আমার অসহ্য বোধ হয়।”

এমন সময় ‘দিদি’ ‘দিদি’ করিয়া সতীশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনয় তাহাকে আজ গড়ের মাঠে সার্কাস দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। যদিও অনেক রাত্রি হইয়াছিল তবু তাহার এই প্রথম সার্কাস দেখার উৎসাহ সে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। সার্কাসের বর্ণনা করিয়া সে কহিল, “বিনয়বাবুকে আজ আমার বিছানায় ধরে আনছিলুম। তিনি বাড়িতে ঢুকেছিলেন, তার পরে আবার চলে গেলেন। বললেন, কাল আসবেন। দিদি, আমি তাঁকে বলেছি, তোমাদের একদিন সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতে।”

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি তাতে কী বললেন?"

সতীশ কহিল, "তিনি বললেন, মেয়েরা বাঘ দেখলে ভয় করবে। আমার কিন্তু কিছু ভয় হয় নি।"

বলিয়া সতীশ পৌরুষ-অভিমানে বুক ফুলাইয়া বসিল।

ললিতা কহিল, "তা বই-কি! তোমার বন্ধু বিনয়বাবুর সাহস যে কত বড়ো তা বেশ বুঝতে পারছি। না ভাই দিদি, আমাদের সঙ্গে করে ওঁকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতেই হবে।"

সতীশ কহিল, "কাল যে দিনের বেলায় সার্কাস হবে।"

ললিতা কহিল, "সেই তো ভালো। দিনের বেলাতেই যাব।"

পরদিন বিনয় আসিতেই ললিতা বলিয়া উঠিল, "এই-যে, ঠিক সময়েই বিনয়বাবু এসেছেন। চলুন।"

বিনয়। কোথায় যেতে হবে?

ললিতা। সার্কাসে।

সার্কাসে! দিনের বেলায় এক-তাঁবু লোকের সামনে মেয়েদের লইয়া সার্কাসে যাওয়া! বিনয় তো হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ললিতা কহিল, "গৌরমোহনবাবু বুঝি রাগ করবেন?"

ললিতার এই প্রশ্নে বিনয় একটু চকিত হইয়া উঠিল।

ললিতা আবার কহিল, "সার্কাসে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে গৌরমোহনবাবুর একটা মত আছে?"

বিনয় কহিল, "নিশ্চয় আছে।"

ললিতা। সেটা কিরকম আপনি ব্যাখ্যা করে বলুন। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে আসি, তিনিও শুনবেন।

বিনয় খোঁচা খাইয়া হাসিল। ললিতা কহিল, "হাসছেন কেন বিনয়বাবু? আপনি কাল সতীশকে বলেছিলেন, মেয়েরা বাঘকে ভয় করে— আপনি কাউকে ভয় করেন না নাকি?"

ইহার পরে সেদিন মেয়েদের লইয়া বিনয় সার্কাসে গিয়াছিল। শুধু তাই

নয়, গোরার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা ললিতার এবং সম্ভবত এ বাড়ির অন্য মেয়েদের কাছে কিরূপ ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, সে কথাটাও বার বার তাহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

তাহার পর যেদিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা হইল ললিতা যেন নিরীহ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরমোহনবাবুকে সেদিনকার সার্কাসের গল্প বলেছেন ?"

এ প্রশ্নের খোঁচা বিনয়কে গভীর করিয়া বাজিল ; কেননা, তাহাকে কর্ণমূল্ রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে হইল, "না, এখনো বলা হয় নি।"

লাবণ্য হাসিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "বিনয়বাবু, আসুন-না।"

ললিতা কহিল, "কোথায় ? সার্কাসে নাকি ?"

লাবণ্য কহিল, "বাঃ, আজ আবার সার্কাস কোথায়! আমি ডাকছি, আমার রুমালের চার ধারে পেন্‌সিল দিয়ে একটা পাড় এঁকে দিতে— আমি সেলাই করব। বিনয়বাবু কী সুন্দর আঁকতে পারেন!"

লাবণ্য বিনয়কে ধরিয়া লইয়া গেল।

১৯

সকালবেলায় গোরা কাজ করিতেছিল। বিনয় খামকা আসিয়া অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে কহিল, "সেদিন পরেশবাবুর মেয়েদের নিয়ে আমি সার্কাস দেখতে গিয়েছিলুম।"

গোরা লিখিতে লিখিতেই বলিল, "শুনেছি।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি কার কাছে শুনলে ?"

গোরা। অবিনাশের কাছে। সেও সেদিন সার্কাস দেখতে গিয়েছিল।

গোরা আর কিছু না বলিয়া লিখিতে লাগিল। গোরা এ খবরটা আগেই শুনিয়াছে, সেও আবার অবিনাশের কাছ হইতে শুনিয়াছে, সুতরাং তাহাতে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কোনো অভাব ঘটে নাই— ইহাতে

তাহার চিরসংস্কারবশত বিনয় মনের মধ্যে ভারি একটা সংকোচ বোধ করিল। সার্কাসে যাওয়া এবং এ কথাটা এমন করিয়া লোকসমাজে না উঠিলেই সে খুশি হইত।

এমন সময়ে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত না ঘুমাইয়া সে মনে মনে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। ললিতা মনে করে, সে গোরাকে ভয় করে এবং ছোটো ছেলে যেমন করিয়া মাস্টারকে মানে তেমনি করিয়াই সে গোরাকে মানিয়া চলে। এমন অন্যায় করিয়াও মানুষকে মানুষ ভুল বুঝিতে পারে! গোরা বিনয় যে একাত্মা; অসামান্যতাগুণে গোরার উপরে তাহার একটা ভক্তি আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ললিতা যে-রকমটা মনে করিয়াছে সেটা গোরার প্রতিও অন্যায়, বিনয়ের প্রতিও অন্যায়। বিনয় নাবালক নয় এবং গোরাও নাবালকের অছি নহে।

গোরা নিঃশব্দে লিখিয়া যাইতে লাগিল, আর ললিতার মুখের সেই তীক্ষ্ণাগ্র গুটি দুই-তিন প্রশ্ন বার বার বিনয়ের মনে পড়িল। বিনয় তাহাকে সহজে বরখাস্ত করিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের মনে একটা বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া উঠিল। 'সার্কাস দেখিতে গিয়াছি তো কী হইয়াছে। অবিনাশ কে যে, সে সেই কথা লইয়া গোরার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসে— এবং গোরাই বা কেন আমার গতিবিধি সম্বন্ধে সেই অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়। আমি কি গোরার নজরবন্দী! কাহার সঙ্গে মিশিব, কোথায় যাইব, গোরার কাছে তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে! বন্ধুত্বের প্রতি এ যে বিষম উপদ্রব!'

গোরা ও অবিনাশের উপর বিনয়ের এত রাগ হইত না যদি নিজের ভীরুতাকে নিজের মধ্যে সহসা স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি না করিত। গোরার কাছে যে সে কোনো কথা ক্ষণকালের জন্যও ঢাকাঢাকি করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেজন্য সে আজ মনে মনে যেন গোরাকেই অপরাধী করিতে চেষ্টা করিতেছে। সার্কাসে যাওয়া লইয়া গোরা যদি বিনয়ের সঙ্গে দুটো ঝগড়ার

কথা বলিত তাহা হইলেও সেটাতে বন্ধুত্বের সাম্য রক্ষিত হইত এবং বিনয় সান্ত্বনা পাইত— কিন্তু, গোরা যে গম্ভীর হইয়া মস্ত বিচারক সাজিয়া মৌনর দ্বারা বিনয়কে অবজ্ঞা করিবে, ইহাতে ললিতার কথার কাঁটা তাহাকে পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে লাগিল।

এই সময় মহিম হুঁকা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডিবা হইতে ভিজা ন্যাক্ড়ার আবরণ তুলিয়া একটা পান বিনয়ের হাতে দিয়া কহিলেন, "বাবা বিনয়, এ দিকে তো সমস্ত ঠিক— এখন তোমার খুড়োমশায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাঁকে তুমি চিঠি লিখেছ তো?"

এই বিবাহের তাগিদ আজ বিনয়কে অত্যন্ত খারাপ লাগিল; অথচ সে জানিত, মহিমের কোনো দোষ নাই— তাঁহাকে কথা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, এই কথা দেওয়ার মধ্যে সে একটা দীনতা অনুভব করিল। আনন্দময়ী তো তাহাকে একপ্রকার বারণ করিয়াছিলেন— তাহার নিজেরও তো এ বিবাহের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না— তবে গোলেমালে ক্ষণকালের মধ্যেই এ কথাটা পাকিয়া উঠিল কী করিয়া! গোরা যে ঠিক তাড়া লাগাইয়াছিল তাহা তো বলা যায় না। বিনয় যদি একটু মনের সঙ্গে আপত্তি করিত তাহা হইলেও যে গোরা পীড়াপীড়ি করিত তাহা নহে। কিন্তু তবু— সেই তবুটুকুর উপরেই ললিতার খোঁচা আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। সেদিনকার কোনো বিশেষ ঘটনা নহে, কিন্তু অনেক দিনের প্রভুত্ব ইহার পশ্চাতে আছে। বিনয় নিতান্তই কেবল ভালোবাসিয়া এবং একান্তই ভালোমানুষি-বশত গোরার আধিপত্য অনায়াসে সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সেইজন্যই এই প্রভুত্বের সম্বন্ধই বন্ধুত্বের মাথার উপর চড়িয়া বসিয়াছে। এতদিন বিনয় ইহা অনুভব করে নাই, কিন্তু আর তো ইহাকে অস্বীকার করিয়া চলে না। তবে শশিমুখীকে কি বিবাহ করিতেই হইবে!

বিনয় কহিল, "না, খুড়োমশায়কে এখনো চিঠি লেখা হয় নি।"

মহিম কহিলেন, "ওটা আমারই ভুল হয়েছে। এ চিঠি তো তোমার

লেখবার কথা নয়— ও আমিই লিখব। তাঁর পুরো নামটা কী বলো তো, বাবা।"

বিনয় কহিল, "আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আশ্বিন-কার্তিকে তো বিবাহ হতেই পারবে না। এক অঘ্রান মাস— কিন্তু, তাতেও গোল আছে। আমাদের পরিবারের ইতিহাসে বহুপূর্বে অঘ্রান মাসে কবে কার কী দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেই অবধি আমাদের বংশে অঘ্রানে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্ম বন্ধ আছে।"

মহিম হুঁকোটা ঘরের কোণের দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া কহিলেন, "বিনয়, তোমরা যদি এ-সমস্ত মানবে তবে লেখাপড়া শেখাটা কি কেবল পড়া মুখস্থ করে মরা! একে তো পোড়া দেশে শুভদিন খুঁজেই পাওয়া যায় না, তার পরে আবার ঘরে ঘরে প্রাইভেট পাঁজি খুলে বসলে কাজকর্ম চলবে কী করে?"

বিনয় কহিল, "আপনি ভাদ্র-আশ্বিন মাসই বা মানেন কেন?"

মহিম কহিলেন, "আমি মানি বুঝি! কোনো কালেই না। কী করব বাবা— এ মুলুকে ভগবানকে না মানলেও বেশ চলে যায়, কিন্তু ভাদ্র-আশ্বিন বৃহস্পতি-শনি তিথিনক্ষত্র না মানলে যে কোনোমতে ঘরে টিঁকতে দেয় না। আবার তাও বলি— মানি নে বলছি বটে, কিন্তু কাজ করবার বেলা দিনক্ষণের অন্যথা হলেই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে— দেশের হাওয়ায় যেমন ম্যালেরিয়া হয় তেমনি ভয়ও হয়, ওটা কাটিয়ে উঠতে পারলুম না।"

বিনয়। আমাদের বংশে অঘ্রানের ভয়টাও কাটবে না। অন্তত খুড়িমা কিছুতেই রাজি হবেন না।

এমন করিয়া সেদিনকার মতো বিনয় কোনোমতে কথাটা চাপা দিয়া রাখিল।

বিনয়ের কথার সুর শুনিয়া গোরা বুঝিল, বিনয়ের মনে একটা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে বিনয়ের দেখাই পাওয়া যাইতেছিল না। গোরা বুঝিয়াছিল, বিনয় পরেশবাবুর বাড়ি পূর্বের চেয়েও আরও ঘন

ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পরে আজ এই বিবাহের প্রস্তাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় গোরার মনে খটকা বাধিল।

সাপ যেমন কাহাকেও গিলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে কোনোমতেই ছাড়িতে পারে না— গোরা তেমনি তাহার কোনো সংকল্প ছাড়িয়া দিতে বা তাহার একটু-আধটু বাদ দিতে একেবারে অক্ষম বলিলেই হয়। অপর পক্ষ হইতে কোনো বাধা অথবা শৈথিল্য উপস্থিত হইলে তাহার জেদ আরও চড়িয়া উঠিতে থাকে। দ্বিধাগ্রস্ত বিনয়কে সবলে ধরিয়া রাখিবার জন্য গোরার সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্যত হইয়া উঠিল।

গোরা তাহার লেখা ছাড়িয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "বিনয়, একবার যখন তুমি দাদাকে কথা দিয়েছ তখন কেন ওঁকে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে মিথ্যে কষ্ট দিচ্ছ?"

বিনয় হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কথা দিয়েছি— না তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে কথা কেড়ে নেওয়া হয়েছে?"

গোরা বিনয়ের এই অকস্মাৎ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত এবং কঠিন হইয়া উঠিয়া কহিল, "কথা কে কেড়ে নিয়েছিল?"

বিনয় কহিল, "তুমি।"

গোরা। আমি! তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার পাঁচ-সাতটার বেশি কথাই হয় নি— তাকে বলে কথা কেড়ে নেওয়া!

বস্তুত বিনয়ের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ কিছুই ছিল না— গোরা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, কথা অল্পই হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে এমন-কিছু বেশি তাগিদ ছিল না যাহাকে পীড়াপীড়ি বলা চলে— তবু এ কথা সত্য, গোরাই বিনয়ের কাছ হইতে তাহার সম্মতি যেন লুঠ করিয়া লইয়াছিল। যে কথার বাহ্য প্রমাণ অল্প সেই অভিযোগ সম্বন্ধে মানুষের ক্ষোভও কিছু বেশি হইয়া থাকে। তাই বিনয় কিছু অসংগত রাগের সুরে বলিল, "কেড়ে নিতে বেশি কথার দরকার করে না।"

গোরা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নাও, তোমার কথা

ফিরিয়ে নাও। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে করেই নেব বা দস্যুবৃত্তি করেই নেব এত বড়ো মহামূল্য কথা এটা নয়।"

পাশের ঘরেই মহিম ছিলেন— গোরা বজ্রস্বরে তাঁহাকে ডাকিল, "দাদা!"

মহিম শশব্যস্ত হইয়া ঘরে আসিতেই গোরা কহিল, "দাদা, আমি তোমাকে গোড়াতেই বলি নি যে, শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ হতে পারে না— আমার তাতে মত নেই!"

মহিম। নিশ্চয় বলেছিলে। তুমি ছাড়া এমন কথা আর কেউ বলতে পারত না। অন্য কোনো ভাই হলে ভাইঝির বিবাহপ্রস্তাবে প্রথম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ করত।

গোরা। তুমি কেন আমাকে দিয়ে বিনয়ের কাছে অনুরোধ করালে?

মহিম। মনে করেছিলুম তাতে কাজ পাওয়া যাবে, আর-কোনো কারণ নেই।

গোরা মুখ লাল করিয়া বলিল, "আমি এ-সবের মধ্যে নেই। বিবাহের ঘটকালি করা আমার ব্যবসায় নয়, আমার অন্য কাজ আছে।"

এই বলিয়া গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হতবুদ্ধি মহিম বিনয়কে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সেও একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। মহিম দেয়ালের কোণ হইতে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া টান দিতে লাগিলেন।

গোরার সঙ্গে বিনয়ের ইতিপূর্বে অনেক দিন অনেক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন আকস্মিক প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের মতো ব্যাপার আর কখনো হয় নাই। বিনয় নিজের কৃত কর্মে প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পরে বাড়ি গিয়া তাহার বুকের মধ্যে শেল বিঁধিতে লাগিল। এই ক্ষণকালের মধ্যেই গোরাকে সে যে কত বড়ো একটা আঘাত দিয়াছে তাহা মনে করিয়া তাহার আহারে বিশ্রামে রুচি রহিল না। বিশেষত এ ঘটনায় গোরাকে দোষী করা যে নিতান্তই অদ্ভুত ও অসংগত হইয়াছে ইহাই

তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; সে বার বার বলিল, 'অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়!'

বেলা দুইটার সময় আনন্দময়ী সবে যখন আহার সারিয়া সেলাই লইয়া বসিয়াছেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাঁহার কাছে বসিল। আজ সকাল-বেলাকার কতকটা খবর তিনি মহিমের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন। আহারের সময় গোরার মুখ দেখিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, একটা ঝড় হইয়া গেছে।

বিনয় আসিয়াই কহিল, "মা, আমি অন্যায় করেছি। শশিমুখীর সঙ্গে বিবাহের কথা নিয়ে আমি আজ সকালে গোরাকে যা বলেছি তার কোনো মানে নেই।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা হোক বিনয়— মনের মধ্যে কোনো-একটা ব্যথা চাপতে গেলে ওইরকম করেই বেরিয়ে পড়ে। ও ভালোই হয়েছে। এ ঝগড়ার কথা দু-দিন পরে তুমিও ভুলবে, গোরাও ভুলে যাবে।"

বিনয়। কিন্তু, মা, শশিমুখীর সঙ্গে আমার বিবাহে কোনো আপত্তি নেই, সেই কথা আমি তোমাকে জানাতে এসেছি।

আনন্দময়ী। বাছা, তাড়াতাড়ি ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার একটা ঝঞ্ঝাটে পোড়ো না। বিবাহটা চিরকালের জিনিস, ঝগড়া দু-দিনের।

বিনয় কোনোমতেই শুনিল না। সে এ প্রস্তাব লইয়া এখনই গোরার কাছে যাইতে পারিল না। মহিমকে গিয়া জানাইল— বিবাহের প্রস্তাবে কোনো বিঘ্ন নাই, মাঘ মাসেই কার্য সম্পন্ন হইবে, খুড়োমহাশয়ের যাহাতে কোনো অমত না হয় সে ভার বিনয় নিজেই লইবে।

মহিম কহিলেন, "পানপত্রটা হয়ে যাক-না।"

বিনয় কহিল, "তা বেশ, সেটা গোরার সঙ্গে পরামর্শ করে করবেন।"

মহিম ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আবার গোরার সঙ্গে পরামর্শ?"

বিনয় কহিল, "না, তা না হলে চলবে না।"

মহিম কহিলেন, “না যদি চলে তা হলে তো কথাই নেই, কিন্তু—” বলিয়া একটা পান লইয়া মুখে পুরিলেন।

২০

মহিম সেদিন গোরাকে কিছু না বলিয়া তাহার পরের দিন তাহার ঘরে গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গোরাকে পুনর্বার রাজি করাইতে বিস্তর লড়ালড়ি করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যেই আসিয়া বলিলেন যে, বিনয় কাল বিকালে আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধে পাকা কথা দিয়া গেছে ও পানপত্র সম্বন্ধে গোরার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছে, গোরা তখনই নিজের সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, “বেশ তো, পানপত্র হয়ে যাক-না।”

মহিম আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, “এখন তো বলছ ‘বেশ তো’। এর পরে আবার বাগড়া দেবে না তো?”

গোরা কহিল, “আমি তো বাধা দিয়ে বাগড়া দিই নি, অনুরোধ করেই বাগড়া দিয়েছি।”

মহিম। অতএব তোমার কাছে আমার মিনতি এই যে, তুমি বাধাও দিয়ো না, অনুরোধও কোরো না। কুরুপক্ষে নারায়ণী সেনাতেও আমার কাজ নেই, আর পাণ্ডবপক্ষে নারায়ণেও আমার দরকার দেখি নে। আমি একলা যা পারি সেই ভালো— ভুল করেছিলুম— তোমার সহায়তাও যে এমন বিপরীত তা আমি পূর্বে জানতুম না। যা হোক, কাজটা হয় এটাতে তোমার ইচ্ছা আছে তো?

গোরা। হাঁ, ইচ্ছা আছে।

মহিম। তা হলে ইচ্ছাই থাক্, কিন্তু চেষ্টায় কাজ নেই।

গোরা রাগ করে বটে এবং রাগের মুখে সবই করিতে পারে সেটাও সত্য, কিন্তু সেই রাগকে পোষণ করিয়া নিজের সংকল্প নষ্ট করা তাহার স্বভাব নয়। বিনয়কে যেমন করিয়া হউক সে বাঁধিতে চায়, এখন

অভিমানের সময় নহে। গতকল্যকার ঝগড়ার প্রতিক্রিয়ার দ্বারাতেই যে বিবাহের কথাটা পাকা হইল, বিনয়ের বিদ্রোহই যে বিনয়ের বন্ধনকে দৃঢ় করিল, সে কথা মনে করিয়া গোরা কালিকার ঘটনায় মনে মনে খুশি হইল। বিনয়ের সঙ্গে তাহাদের চিরন্তন স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গোরা কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না। কিন্তু এবার দুজনকার মাঝখানে তাহাদের একান্ত সহজ ভাবের একটুখানি ব্যতিক্রম ঘটিল।

গোরা এবার বুঝিয়াছে, দূর হইতে বিনয়কে টানিয়া রাখা শক্ত হইবে— বিপদের ক্ষেত্র যেখানে সেইখানেই পাহারা দেওয়া চাই। গোরা মনে ভাবিল, 'আমি যদি পরেশবাবুদের বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত রাখি তাহা হইলে বিনয়কে ঠিক গণ্ডির মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিব।'

সেই দিনই, অর্থাৎ ঝগড়ার পরদিন অপরাহ্ণে গোরা বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজই গোরা আসিবে, বিনয় কোনোমতেই এমন আশা করে নাই। সেইজন্য সে মনে মনে যেমন খুশি তেমনি আশ্চর্য হইয়া উঠিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় গোরা পরেশবাবুদের মেয়েদের কথাই পাড়িল, অথচ তাহার মধ্যে কিছুমাত্র বিরূপতা ছিল না। এই আলোচনায় বিনয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে বেশি চেষ্টার প্রয়োজন করে না।

সুচরিতার সঙ্গে বিনয় যে-সকল কথার আলোচনা করিয়াছে তাহা আজ সে বিস্তারিত করিয়া গোরাকে বলিতে লাগিল। সুচরিতা যে বিশেষ আগ্রহের সহিত এ-সকল প্রসঙ্গ আপনি উত্থাপিত করে এবং যতই তর্ক করুক-না কেন মনের অলক্ষ্য দেশে সে যে ক্রমশই অল্প অল্প করিয়া সায় দিতেছে, এ কথা জানাইয়া গোরাকে বিনয় উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিল।

বিনয় গল্প করিতে করিতে কহিল, "নন্দর মা ভূতের ওঝা এনে নন্দকে কী করে মেরে ফেলেছে এবং তাই নিয়ে তোমার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল তাই যখন বলছিলুম তখন তিনি বললেন, 'আপনারা মনে করেন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে মেয়েদের রাঁধতে-বাড়তে আর ঘর নিকোতে দিলেই তাদের সমস্ত কর্তব্য হয়ে গেল। এ দিকে এমনি করে তাদের বুদ্ধিসুদ্ধি সমস্ত খাটো

করে রেখে দেবেন, তার পরে যখন তারা ভূতের ওঝা ডাকে তখনো আপনারা রাগ করতে ছাড়বেন না। যাদের পক্ষে দুটি-একটি পরিবারের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বজগৎ তারা কখনোই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না— এবং তারা মানুষ না হলেই পুরুষের সমস্ত বড়ো কাজকে নষ্ট করে অসম্পূর্ণ করে পুরুষকে তারা নীচের দিকে ভারাক্রান্ত করে নিজেদের দুর্গতির শোধ তুলবেই। নন্দর মাকে আপনারা এমন করে গড়েছেন এবং এমন জায়গায় ঘিরে রেখেছেন যে, আজ প্রাণের দায়েও আপনারা যদি তাকে সুবুদ্ধি দিতে চান তো সেখানে গিয়ে পৌঁছবেই না।' আমি এ নিয়ে তর্ক করবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সত্য বলছি, গোরা, মনে মনে তাঁর সঙ্গে মতের মিল হওয়াতে আমি জোরের সঙ্গে তর্ক করতে পারি নি। তাঁর সঙ্গে তবু তর্ক চলে, কিন্তু ললিতার সঙ্গে তর্ক করতে আমার সাহস হয় না। ললিতা যখন ভ্রূ তুলে বললেন, 'আপনারা মনে করেন, জগতের কাজ আপনারা করবেন আর আপনাদের কাজ আমরা করব! সেটি হবার জো নেই। জগতের কাজ হয় আমরাও চালাব, নয় আমরা বোঝা হয়ে থাকব ; আমরা যদি বোঝা হই— তখন রাগ করে বলবেন : পথে নারী বিবর্জিতা। কিন্তু নারীকেও যদি চলতে দেন তা হলে, পথেই হোক আর ঘরেই হোক, নারীকে বিবর্জন করার দরকার হয় না'— তখন আমি আর কোনো উত্তর না করে চুপ করে রইলুম। ললিতা সহজে কথা কন না, কিন্তু যখন কন তখন খুব সাবধানে উত্তর দিতে হয়। যাই বল, গোরা, আমার মনে খুব বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের মেয়েরা যদি চীন রমণীদের পায়ের মতো সংকুচিত হয়ে থাকে তা হলে আমাদের কোনো কাজ এগোবে না।"

গোরা। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে না, এমন কথা তো আমি কোনো-দিন বলি নে।

বিনয়। চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ পড়ালেই বুঝি শিক্ষা দেওয়া হয়?

গোরা। আচ্ছা, এবার থেকে বিনয়বোধ প্রথম ভাগ ধরানো যাবে।

সেদিন দুই বন্ধুতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই পরেশবাবুর মেয়েদের কথা

হইতে হইতে রাত হইয়া গেল।

গোরা একলা বাড়ি ফিরিবার পথে ওই-সকল কথাই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল এবং ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিল পরেশবাবুর মেয়েদের কথা মন হইতে তাড়াইতে পারিল না। গোরার জীবনে এ উপসর্গ কোনোকালেই ছিল না, মেয়েদের কথা সে কোনোদিন চিন্তামাত্রই করে নাই। জগদ্‌ব্যাপারে এটাও যে একটা কথার মধ্যে, এবার বিনয় তাহা প্রমাণ করিয়া দিল। ইহাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না, ইহার সঙ্গে হয় আপোষ নয় লড়াই করিতে হইবে।

পরদিন বিনয় যখন গোরাকে কহিল, "পরেশবাবুর বাড়িতে একবার চলোই-না, অনেক দিন যাও নি, তিনি তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন", তখন গোরা বিনা আপত্তিতে রাজি হইল। শুধু রাজি হওয়া নহে, তাহার মনের মধ্যে পূর্বের মতো নিরুৎসুক ভাব ছিল না। প্রথমে সুচরিতা ও পরেশবাবুর কন্যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গোরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, তাহার পরে মধ্যে অবজ্ঞাপূর্ণ বিরুদ্ধ ভাব তাহার মনে জন্মিয়াছিল, এখন তাহার মনে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে। বিনয়ের চিত্তকে কিসে যে এত করিয়া আকর্ষণ করিতেছে তাহা জানিবার জন্য তাহার মনে একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে।

উভয়ে যখন পরেশবাবুর বাড়ি গিয়া পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দোতলার ঘরে একটা তেলের শেজ জ্বালাইয়া হারান তাঁহার একটা ইংরেজি লেখা পরেশবাবুকে শুনাইতেছিলেন। এ স্থলে পরেশবাবু বস্তুত উপলক্ষমাত্র ছিলেন— সুচরিতাকে শোনানোই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুচরিতা টেবিলের দূরপ্রান্তে চোখের উপর হইতে আলো আড়াল করিবার জন্য মুখের সামনে একটা তালপাতার পাখা তুলিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে আপন স্বাভাবিক বাধ্যতাবশত প্রবন্ধটি শুনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কেবলই অন্য দিকে যাইতেছিল।

এমন সময় চাকর আসিয়া যখন গোরা ও বিনয়ের আগমন-সংবাদ

জ্ঞাপন করিল, তখন সুচরিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে চৌকি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই পরেশবাবু কহিলেন, "রাধে, যাচ্ছ কোথায়? আর কেউ নয়, আমাদের বিনয় আর গৌর এসেছে।"

সুচরিতা সংকুচিত হইয়া আবার বসিল। হারানের সুদীর্ঘ ইংরেজি রচনাপাঠে ভঙ্গ ঘটাতে সুচরিতার আরাম বোধ হইল; গোরা আসিয়াছে শুনিয়া তাহার মনে যে একটা উত্তেজনা হয় নাই তাহাও নহে, কিন্তু হারানবাবুর সম্মুখে গোরার আগমনে তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি এবং সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। দুজনে পাছে বিরোধ বাধে এই মনে করিয়া, অথবা কী যে তাহার কারণ তাহা বলা শক্ত।

গৌরের নাম শুনিয়াই হারানবাবুর মনের ভিতরটা একেবারে বিমুখ হইয়া উঠিল। গৌরের নমস্কারে কোনো মতে প্রতিনমস্কার করিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। হারানকে দেখিবা মাত্র গোরার সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি সশস্ত্রে উদ্যত হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী তাঁহার তিন মেয়েকে লইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার সময় পরেশবাবু গিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন। পরেশবাবুর যাইবার সময় হইয়াছে। এমন সময় গোরা ও বিনয় আসিয়া পড়াতে তাঁহার বাধা পড়িল; কিন্তু, আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না জানিয়া তিনি হারান ও সুচরিতাকে কানে কানে বলিয়া গেলেন, "তোমরা এঁদের নিয়ে একটু বোসো, আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আসছি।"

দেখিতে দেখিতে গোরা এবং হারানবাবুর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। যে প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক তাহা এই— কলিকাতার অনতিদূরবর্তী কোনো জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউন্‌লো সাহেবের সহিত ঢাকায় থাকিতে পরেশবাবুদের আলাপ হইয়াছিল। পরেশবাবুর স্ত্রীকন্যারা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেন বলিয়া সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী ইঁহাদিগকে বিশেষ খাতির করিতেন। সাহেব তাঁহার জন্মদিনে প্রতি বৎসরে কৃষিপ্রদর্শনী মেলা করিয়া থাকেন। এবারে বরদাসুন্দরী ব্রাউন্‌লো সাহেবের স্ত্রীর সহিত দেখা করিবার সময়

ইংরেজি কাব্যসাহিত্য প্রভৃতিতে নিজের কন্যাদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা উত্থাপন করাতে মেমসাহেব সহসা কহিলেন, 'এবার মেলায় লেপ্টেনান্ট্ গবর্নর সস্ত্রীক আসিবেন, আপনার মেয়েরা যদি তাঁহাদের সম্মুখে একটা ছোটোখাটো ইংরেজি কাব্যনাট্য অভিনয় করেন তো বড়ো ভালো হয়।' এই প্রস্তাবে বরদাসুন্দরী অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ তিনি মেয়েদের রিহার্সাল দেওয়াইবার জন্যই কোনো বন্ধুর বাড়িতে লইয়া গিয়াছেন। এই মেলায় গোরার উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হইবে কি না জিজ্ঞাসা করায় গোরা কিছু অনাবশ্যক উগ্রতার সহিত বলিয়াছিল— 'না'। এই প্রসঙ্গে এ দেশে ইংরেজ-বাঙালির সম্বন্ধ ও পরস্পর সামাজিক সম্মিলনের বাধা লইয়া দুই তরফে রীতিমত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল।

হারান কহিলেন, "বাঙালিরই দোষ। আমাদের এত কুসংস্কার ও কুপ্রথা যে, আমরা ইংরেজের সঙ্গে মেলবার যোগ্যই নই।"

গোরা কহিল, "যদি তাই সত্য হয় তবে সেই অযোগ্যতাসত্ত্বেও ইংরেজের সঙ্গে মেলবার জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়ানো আমাদের পক্ষে লজ্জাকর।"

হারান কহিলেন, "কিন্তু যাঁরা যোগ্য হয়েছেন তাঁরা ইংরেজের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়ে থাকেন— যেমন এঁরা সকলে।"

গোরা। একজনের সমাদরের দ্বারা অন্য-সকলের অনাদরটা যেখানে বেশি করে ফুটে ওঠে সেখানে এরকম সমাদরকে আমি অপমান বলে গণ্য করি।

দেখিতে দেখিতে হারানবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং গোরা তাঁহাকে রহিয়া রহিয়া বাক্যশেলে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

দুই পক্ষে এইরূপে যখন তর্ক চলিতেছে সুচরিতা টেবিলের প্রান্তে বসিয়া পাখার আড়াল হইতে গোরাকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। কী কথা হইতেছে তাহা তাহার কানে আসিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার মন ছিল না। সুচরিতা যে গোরাকে অনিমেষনেত্রে দেখিতেছে সে সম্বন্ধে তাহার নিজের যদি চেতনা থাকিত তবে সে লজ্জিত হইত, কিন্তু সে যেন

আত্মবিস্মৃত হইয়া গোরাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। গোরা তাহার বলিষ্ঠ দুই বাহু টেবিলের উপরে রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল; তাহার প্রশস্ত শুভ্র ললাটের উপর বাতির আলো পড়িয়াছে; তাহার মুখে কখনো অবজ্ঞার হাস্য কখনো বা ঘৃণার ভ্রূকুটি তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে; তাহার মুখের প্রত্যেক ভাবলীলায় একটা আত্মমর্যাদার গৌরব লক্ষিত হইতেছে; সে যাহা বলিতেছে তাহা যে কেবলমাত্র সাময়িক বিতর্ক বা আক্ষেপের কথা নহে, প্রত্যেক কথা যে তাহার অনেক দিনের চিন্তা এবং ব্যবহারের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার মধ্যে যে কোনোপ্রকার দ্বিধা দুর্বলতা বা আকস্মিকতা নাই তাহা কেবল তাহার কণ্ঠস্বরে নহে, তাহার মুখে এবং তাহার সমস্ত শরীরেই যেন সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। সুচরিতা বিস্মিত হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। সুচরিতা তাহার জীবনে এতদিন পরে এই প্রথম একজনকে একটি বিশেষ মানুষ, একটি বিশেষ পুরুষ বলিয়া যেন দেখিতে পাইল। তাহাকে আর-দশজনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারিল না। এই গোরার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া হারানবাবু অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের এবং মুখের আকৃতি, তাঁহার হাবভাবভঙ্গী, এমন-কি, তাঁহার জামা এবং চাদরখানা পর্যন্ত যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। এতদিন বারম্বার বিনয়ের সঙ্গে গোরার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সুচরিতা গোরাকে একটা বিশেষ দলের একটা বিশেষ মতের অসামান্য লোক বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহার দ্বারা দেশের একটা-কোনো বিশেষ মঙ্গল-উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে এইমাত্র সে কল্পনা করিয়াছিল— আজ সুচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে কেবল গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন, সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া, যেন চতুর্দিকে

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।

হারানবাবু সুচরিতার এই তদ্গত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার তর্কের যুক্তিগুলি জোর পাইতেছিল না। অবশেষে এক সময় নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং সুচরিতাকে নিতান্ত আত্মীয়ের মতো ডাকিয়া কহিলেন, "সুচরিতা, একবার এ ঘরে এসো, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

সুচরিতা একেবারে চমকিয়া উঠিল। তাহাকে কে যেন মারিল। হারানবাবুর সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে তিনি যে কখনো তাহাকে এরূপ আহ্বান করিতে পারেন না তাহা নহে। অন্য সময় হইলে সে কিছু মনেই করিত না; কিন্তু আজ গোরা ও বিনয়ের সম্মুখে সে নিজেকে অপমানিত বোধ করিল। বিশেষত গোরা তাহার মুখের দিকে এমন এক রকম করিয়া চহিল যে, সে হারানবাবুকে ক্ষমা করিতে পারিল না। প্রথমটা, সে যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হারানবাবু তখন কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "শুনছ সুচরিতা? আমার একটা কথা আছে, একবার এ ঘরে আসতে হবে।"

সুচরিতা তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইয়া কহিল, "এখন থাক্— বাবা আসুন, তার পর হবে।"

বিনয় উঠিয়া কহিল, "আমরা নাহয় যাচ্ছি।"

সুচরিতা তাড়াতাড়ি কহিল, "না, বিনয়বাবু, উঠবেন না। বাবা আপনাদের থাকতে বলেছেন। তিনি এলেন বলে।"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুল অনুনয়ের ভাব প্রকাশ পাইল। হরিণীকে যেন ব্যাধের হাতে ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

"আমি আর থাকতে পারছি নে, আমি তবে চললুম" বলিয়া হারানবাবু দ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। রাগের মাথায় বাহির হইয়া আসিয়া

পরক্ষণেই তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল, কিন্তু তখন ফিরিবার আর কোনো উপলক্ষ খুঁজিয়া পাইলেন না।

হারানবাবু চলিয়া গেলে সুচরিতা একটা কোন্ সুগভীর লজ্জায় মুখ যখন রক্তিম ও নত করিয়া বসিয়া ছিল, কী করিবে কী বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, সেই সময় গোরা তাহার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া লইবার অবকাশ পাইয়াছিল। গোরা শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য যে প্রগল্‌ভতা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সুচরিতার মুখশ্রীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একটা উজ্জ্বলতা নিঃসন্দেহ প্রকাশ পাইতেছিল, কিন্তু নম্রতা ও লজ্জার দ্বারা তাহা কী সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে। মুখের ডৌলটি কী সুকুমার! ভ্রূযুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ। ঠোঁটদুটি চুপ করিয়া আছে, কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য সেই দুটি ঠোঁটের মাঝখানে যেন কোমল একটি কুঁড়ির মতো রহিয়াছে। নবীনা রমণীর বেশভূষার প্রতি গোরা পূর্বে কোনোদিন ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই এবং না দেখিয়াই সে-সমস্তের প্রতি তাহার একটা ধিক্‌কারভাব ছিল— আজ সুচরিতার দেহে তাহার নূতন ধরণের শাড়ি পরার ভঙ্গী তাহার একটু বিশেষভাবে ভালো লাগিল। সুচরিতার একটি হাত টেবিলের উপরে ছিল, তাহার জামার আস্তিনের কুঞ্চিত প্রান্ত হইতে সেই হাতখানি আজ গোরার চোখে কোমল হৃদয়ের একটি কল্যাণপূর্ণ বাণীর মতো বোধ হইল। দীপালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় সুচরিতাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ঘরটি তাহার আলো, তাহার দেয়ালের ছবি, তাহার গৃহসজ্জা, তাহার পারিপাট্য লইয়া একটি যেন বিশেষ অখণ্ড রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিল। তাহা যে গৃহ, তাহা যে সেবাকুশলা নারীর যত্নে স্নেহে সৌন্দর্যে মণ্ডিত, তাহা যে দেয়াল ও কড়িবরগা-ছাদের চেয়ে অনেক বেশি— ইহা আজ গোরার কাছে মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। গোরা আপনার চতুর্দিকের আকাশের মধ্যে একটা সজীব সত্তা অনুভব করিল— তাহার হৃদয়কে চারি দিক হইতেই একটা হৃদয়ের হিল্লোল

আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, একটা কিসের নিবিড়তা তাহাকে যেন বেষ্টন করিয়া ধরিল। এরূপ অপূর্ব উপলব্ধি তাহার জীবনে কোনোদিন ঘটে নাই। দেখিতে দেখিতে ক্রমশই সুচরিতার কপালের ভ্রষ্ট কেশ হইতে তাহার পায়ের কাছে শাড়ির পাড়টুকু পর্যন্ত অত্যন্ত সত্য এবং অত্যন্ত বিশেষ হইয়া উঠিল। একই কালে সমগ্রভাবে সুচরিতা এবং সুচরিতার প্রত্যেক অংশ স্বতন্ত্রভাবে গোরার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিতে না পারিয়া সকলেই এক-প্রকার কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তখন বিনয় সুচরিতার দিকে চাহিয়া কহিল, "সেদিন আমাদের কথা হচ্ছিল—", বলিয়া একটা কথা উত্থাপন করিয়া দিল।

সে কহিল, "আপনাকে তো বলেইছি, আমার এমন একদিন ছিল যখন আমার মনে বিশ্বাস ছিল, আমাদের দেশের জন্যে, সমাজের জন্যে, আমাদের কিছু আশা করবার নেই— চিরদিনই আমরা নাবালকের মতো কাটাব এবং ইংরেজ আমাদের অছি নিযুক্ত হয়ে থাকবে— যেখানে যা যেমন আছে সেইরকমই থেকে যাবে— ইংরেজের প্রবল শক্তি এবং সমাজের প্রবল জড়তার বিরুদ্ধে আমাদের কোথাও কোনো উপায়মাত্র নেই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই এইরকম মনের ভাব। এমন অবস্থায় মানুষ, হয় নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকে নয় উদাসীনভাবে কাটায়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা এই কারণেই চাকরির উন্নতি ছাড়া আর কোনো কথা ভাবে না, ধনী লোকেরা গবর্মেণ্টের খেতাব পেলেই জীবন সার্থক বোধ করে— আমাদের জীবনের যাত্রা-পথটা অল্প একটু দূরে গিয়েই, বাস্‌, ঠেকে যায়— সুতরাং সুদূর উদ্দেশ্যের কল্পনাও আমাদের মাথায় আসে না আর তার পাথেয় সংগ্রহও অনাবশ্যক বলে মনে করি। আমিও এক সময়ে ঠিক করেছিলুম, গোরার বাবাকে মুরুব্বি ধরে একটা চাকরির জোগাড় করে নেব। এমন সময় গোরা আমাকে বললে, 'না, গবর্মেণ্টের চাকরি তুমি কোনোমতেই করতে পারবে না।' "

গোরা এই কথায় সুচরিতার মুখে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস দেখিয়া কহিল, "আপনি মনে করবেন না, গবর্মেণ্টের উপর রাগ করে আমি এমন কথা বলছি। গবর্মেণ্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেণ্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব বোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে— যত দিন যাচ্ছে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠছে। আমি জানি, আমার একটি আত্মীয় সাবেক কালের ডেপুটি ছিলেন— এখন তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন—তাঁকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বাবু, তোমার বিচারে এত বেশি লোক খালাস পায় কেন?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'সাহেব তার একটি কারণ আছে; তুমি যাদের জেলে দাও তারা তোমার পক্ষে কুকুর-বিড়াল মাত্র, আর আমি যাদের জেলে দিই তারা যে আমার ভাই হয়।' এত বড়ো কথা বলতে পারে এমন ডেপুটি তখনো ছিল, এবং শুনতে পারে এমন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, চাকরির দড়াদড়ি অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠছে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে দেশের লোক ক্রমেই কুকুর-বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে; এবং এমনি করে পদের উন্নতি হতে হতে তাঁদের যে কেবলই অধোগতি হচ্ছে এ কথার অনুভূতি পর্যন্ত তাঁদের চলে যাচ্ছে। পরের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের লোকদের নিচু করে দেখব এবং নিচু করে দেখবা মাত্রই তাদের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য হব, এতে কোনো মঙ্গল হতে পারে না।"

বলিয়া গোরা টেবিলে একটা মুষ্টি-আঘাত করিল: তেলের শেজটা কাঁপিয়া উঠিল।

বিনয় কহিল, "গোরা, এ টেবিলটা গবর্মেণ্টের নয়, আর এই শেজটা পরেশবাবুদের।"

শুনিয়া গোরা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যের প্রবল ধ্বনিতে সমস্ত বাড়িটা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঠাট্টা শুনিয়া গোরা যে ছেলে-মানুষের মতো এমন প্রচুরভাবে হাসিয়া উঠিতে পারে, ইহাতে সুচরিতা

আশ্চর্য বোধ করিল এবং তাহার মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দ হইল। যাহারা বড়ো কথার চিন্তা করে তাহারা যে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে, এ কথা তাহার জানা ছিল না।

গোরা সেদিন অনেক কথাই বলিল। সুচরিতা যদিও চুপ করিয়া ছিল কিন্তু তাহার মুখের ভাবে গোরা এমন একটা সায় পাইল যে, উৎসাহে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শেষকালে সুচরিতাকেই যেন বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দেখুন একটি কথা মনে রাখবেন— যদি এমন ভুল সংস্কার আমাদের হয় যে, ইংরেজরা যখন প্রবল হয়ে উঠেছে তখন আমরাও ঠিক ইংরেজটি না হলে কোনোমতে প্রবল হতে পারব না, তা হলে সে অসম্ভব কোনোদিন সম্ভব হবে না এবং কেবলই নকল করতে করতে আমরা দুয়ের বার হয়ে যাব। এ কথা নিশ্চয় জানবেন, ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে; সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে, ভারত রক্ষা পাবে। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে এইটে যদি আমরা না শিখে থাকি তবে সমস্তই ভুল শিখেছি। আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালোমন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান। যদি বিকৃতি থাকে তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন— কিন্তু একে দেখুন, বুঝুন, ভাবুন, এর দিকে মুখ ফেরান, এর সঙ্গে এক হোন। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, বাইরে থেকে, খৃস্টানি সংস্কারে বাল্যকাল হতে অস্থিমজ্জায় দীক্ষিত হয়ে, একে আপনি বুঝতেই পারবেন না, একে কেবলই আঘাত করতেই থাকবেন, এর কোনো কাজেই লাগবেন না।"

গোরা বলিল বটে 'আমার অনুরোধ'— কিন্তু এ তো অনুরোধ নয়, এ যেন আদেশ। কথার মধ্যে এমন একটা প্রচণ্ড জোর যে, তাহা অন্যের সম্মতির অপেক্ষাই করে না। সুচরিতা মুখ নত করিয়াই সমস্ত শুনিল। এমন একটা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে গোরা যে তাহাকেই বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া এই কথা-কয়টি কহিল তাহাতে সুচরিতার মনের মধ্যে একটা

আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিল। সে আন্দোলন যে কিসের তখন তাহা ভাবিবার সময় ছিল না। ভারতবর্ষ বলিয়া যে একটা বৃহৎ প্রাচীন সত্তা আছে, সুচরিতা সে কথা কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্যও ভাবে নাই। এই সত্তা যে দূর অতীত ও সুদূর ভবিষ্যৎকে অধিকারপূর্বক নিভৃতে থাকিয়া মানবের বিরাট ভাগ্যজালে একটা বিশেষ রঙের সুতা একটা বিশেষভাবে বুনিয়া চলিয়াছে— সেই সুতা যে কত সূক্ষ্ম, কত বিচিত্র এবং কত সুদূর সার্থকতার সহিত তাহার কত নিগূঢ় সম্বন্ধ— সুচরিতা আজ তাহা গোরার প্রবল কণ্ঠের কথা শুনিয়া যেন হঠাৎ এক রকম করিয়া উপলব্ধি করিল। প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবন যে এত বড়ো একটা সত্তার দ্বারা বেষ্টিত, অধিকৃত, তাহা সচেতনভাবে অনুভব না করিলে আমরা যে কতই ছোটো হইয়া এবং চারি দিক সম্বন্ধে কতই অন্ধ হইয়া কাজ করিয়া যাই নিমেষের মধ্যেই তাহা যেন সুচরিতার কাছে প্রকাশ পাইল। সেই অকস্মাৎ চিত্ত-স্ফূর্তির আবেগে সুচরিতা তাহার সমস্ত সংকোচ দূর করিয়া দিয়া অত্যন্ত সহজ বিনয়ের সহিত কহিল, "আমি দেশের কথা কখনো এমন ক'রে, বড়ো ক'রে, সত্য ক'রে ভাবি নি। কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি— ধর্মের সঙ্গে দেশের যোগ কী? ধর্ম কি দেশের অতীত নয়?"

গোরার কানে সুচরিতার মৃদু কণ্ঠের এই প্রশ্ন বড়ো মধুর লাগিল। সুচরিতার বড়ো বড়ো দুইটি চোখের মধ্যে এই প্রশ্নটি আরও মধুর করিয়া দেখা দিল। গোরা কহিল, "দেশের অতীত যা, দেশের চেয়ে যা অনেক বড়ো, তাই দেশের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর এমনি করে বিচিত্রভাবে আপনার অনন্ত স্বরূপকেই ব্যক্ত করছেন। যাঁরা বলেন, সত্য এক, অতএব কেবলই একটি ধর্মই সত্য, ধর্মের একটিমাত্র রূপই সত্য— তাঁরা, সত্য যে এক কেবল এই সত্যটিই মানেন, আর সত্য যে অন্তহীন সে সত্যটা মানতে চান না। অন্তহীন এক অন্তহীন অনেকে আপনাকে প্রকাশ করেন— জগতে সেই লীলাই তো দেখছি। সেইজন্যই ধর্মমত বিচিত্র হয়ে সেই ধর্মরাজকে নানা দিক দিয়ে উপলব্ধি করাচ্ছে। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলছি,

ভারতবর্ষের খোলা জালনা দিয়ে আপনি সূর্যকে দেখতে পাবেন— সেজন্যে সমুদ্রপারে গিয়ে খৃস্টান গির্জার জালনায় বসবার কোনো দরকার হবে না।"

সুচরিতা কহিল, "আপনি বলতে চান, ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। সেই বিশেষত্বটি কী ?"

গোরা কহিল, "সেটা হচ্ছে এই যে, ব্রহ্ম যিনি নির্বিশেষ তিনি বিশেষের মধ্যেই ব্যক্ত। কিন্তু তাঁর বিশেষের শেষ নেই। জল তাঁর বিশেষ, স্থল তাঁর বিশেষ, বায়ু তাঁর বিশেষ, অগ্নি তাঁর বিশেষ, প্রাণ তাঁর বিশেষ, বুদ্ধি প্রেম সমস্তই তাঁর বিশেষ— গণনা করে কোথাও তাঁর অন্ত পাওয়া যায় না— বিজ্ঞান তাই নিয়ে মাথা ঘুরিয়ে মরছে। যিনি নিরাকার তাঁর আকারের অন্ত নেই— হ্রস্বদীর্ঘ-স্থূলসূক্ষ্মের অনন্ত প্রবাহই তাঁর। যিনি অনন্ত বিশেষ তিনিই নির্বিশেষ, যিনি অনন্তরূপ তিনিই অরূপ। অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে ন্যূনাধিক পরিমাণে কোনো একটিমাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেছে— ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু সেই বিশেষকেই ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও অনন্তগুণে অতিক্রম করে আছেন, এ কথা ভারতবর্ষের কোনো ভক্ত কোনোদিন অস্বীকার করেন না।"

সুচরিতা কহিল, "জ্ঞানী করেন না, কিন্তু অজ্ঞানী ?"

গোরা কহিল, "আমি তো পূর্বেই বলেছি, অজ্ঞানী সকল দেশেই সকল সত্যকেই বিকৃত করবে।"

সুচরিতা কহিল, "কিন্তু আমাদের দেশে সেই বিকার কি বেশি দূর পর্যন্ত পৌঁছয় নি ?"

গোরা কহিল, "তা হতে পারে। কিন্তু তার কারণ ধর্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা, এই দুটো অঙ্গকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে স্বীকার করতে চায় বলেই যারা সূক্ষ্মকে গ্রহণ করতে পারে না তারা স্থূলটাকেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থূলের মধ্যে নানা অদ্ভুত বিকার ঘটাতে থাকে। কিন্তু, যিনি রূপেও সত্য অরূপেও সত্য, স্থূলেও সত্য সূক্ষ্মেও

সত্য, ধ্যানেও সত্য প্রত্যক্ষেও সত্য, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে দেহে মনে কর্মে উপলব্ধি করবার যে আশ্চর্য বিচিত্র ও প্রকাণ্ড চেষ্টা করেছে তাকে আমরা মূঢ়ের মতো অশ্রদ্ধা করে য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর নাস্তিকতায়-আস্তিকতায়-মিশ্রিত একটা সংকীর্ণ নীরস অঙ্গহীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব এ হতেই পারে না। আমি যা বলছি তা আপনাদের আশৈশবের সংস্কারবশত ভালো করে বুঝতেই পারবেন না, মনে করবেন এ লোকটার ইংরেজি শিখেও শিক্ষার কোনো ফল হয় নি ; কিন্তু ভারতবর্ষের সত্য প্রকৃতি ও সত্য সাধনার প্রতি যদি আপনার কোনোদিন শ্রদ্ধা জন্মে, ভারতবর্ষ নিজেকে সহস্র বাধা ও বিকৃতির ভিতর দিয়েও যেরকম করে প্রকাশ করছে সেই প্রকাশের গভীর অভ্যন্তরে যদি প্রবেশ করতে পারেন, তা হলে— তা হলে, কী আর বলব, আপনার ভারতবর্ষীয় স্বভাবকে শক্তিকে ফিরে পেয়ে আপনি মুক্তি লাভ করবেন।"

সুচরিতা অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া গোরা কহিল, "আমাকে আপনি একটা গোঁড়া ব্যক্তি বলে মনে করবেন না। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়া লোকেরা, বিশেষত যারা হঠাৎ নতুন গোঁড়া হয়ে উঠেছে, তারা যে ভাবে কথা কয় আমার কথা সে ভাবে গ্রহণ করবেন না। ভারতবর্ষের নানাপ্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা গভীর ও বৃহৎ ঐক্য দেখতে পেয়েছি, সেই ঐক্যের আনন্দে আমি পাগল। সেই ঐক্যের আনন্দেই, ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে এক দলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার মনে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের এই বাণী কেউ-বা বোঝে, কেউ-বা বোঝে না— তা নাই হল— আমি আমার ভারতবর্ষের সকলের সঙ্গে এক ; তারা আমার সকলেই আপন ; তাদের সকলের মধ্যেই চিরন্তন ভারতবর্ষের নিগূঢ় আবির্ভাব নিয়ত কাজ করছে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহমাত্র নেই।"

গোরার প্রবল কণ্ঠের এই কথাগুলি ঘরের দেয়ালে, টেবিলে, সমস্ত আসবাবপত্রেও যেন কাঁপিতে লাগিল।

এ-সমস্ত কথা সুচরিতার পক্ষে খুব স্পষ্ট বুঝিবার কথা নহে— কিন্তু অনুভূতির প্রথম অস্পষ্ট সঞ্চারের বেগ অত্যন্ত প্রবল। জীবনটা যে নিতান্তই চারটে দেয়ালের মধ্যে বা একটা দলের মধ্যে বদ্ধ নহে, এই উপলব্ধিটা সুচরিতাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল।

এমন সময় সিঁড়ির কাছ হইতে মেয়েদের উচ্চহাস্যমিশ্রিত দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। বরদাসুন্দরী ও মেয়েদের লইয়া পরেশবাবু ফিরিয়াছেন। সুধীর সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় মেয়েদের উপর কী-একটা উৎপাত করিতেছে, তাহাই লইয়া এই হাস্যধ্বনির সৃষ্টি।

লাবণ্য ললিতা ও সতীশ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই গোরাকে দেখিয়া সংযত হইয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল— সতীশ বিনয়ের চৌকির পাশে দাঁড়াইয়া কানে কানে তাহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ শুরু করিয়া দিল। ললিতা সুচরিতার পশ্চাতে চৌকি টানিয়া তাহার আড়ালে অদৃশ্য-প্রায় হইয়া বসিল।

পরেশ আসিয়া কহিলেন, "আমার ফিরতে বড়ো দেরি হয়ে গেল। পানুবাবু বুঝি চলে গেছেন?"

সুচরিতা তাহার কোনো উত্তর দিল না; বিনয় কহিল, "হাঁ, তিনি থাকতে পারলেন না।"

গোরা উঠিয়া কহিল, "আজ আমরাও আসি।"

বলিয়া পরেশবাবুকে নত হইয়া নমস্কার করিল।

পরেশবাবু কহিলেন, "আজ আর তোমাদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় পেলুম না। বাবা, যখন তোমার অবকাশ হবে মাঝে মাঝে এসো।"

গোরা ও বিনয় ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া পড়িলেন। উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি কহিলেন, "আপনারা এখন যাচ্ছেন নাকি?"

গোরা কহিল, "হাঁ।"

বরদাসুন্দরী বিনয়কে কহিলেন, "কিন্তু, বিনয়বাবু, আপনি যেতে পারছেন

না— আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে।”

সতীশ লাফাইয়া উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিল এবং কহিল, “হাঁ মা, বিনয়বাবুকে যেতে দিয়ো না; উনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকবেন।”

বিনয় কিছু কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর দিতে পারিতেছিল না দেখিয়া বরদাসুন্দরী গোরাকে কহিলেন, “বিনয়বাবুকে কি আপনি নিয়ে যেতে চান? ওঁকে আপনার দরকার আছে?”

গোরা কহিল, “কিছু না। বিনয়, তুমি থাকো-না— আমি আসছি।”

বলিয়া গোরা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিনয়ের থাকা সম্বন্ধে বরদাসুন্দরী যখনই গোরার সম্মতি লইলেন সেই মুহূর্তেই বিনয় ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ললিতার এই ছোটোখাটো হাসি-বিদ্রূপের সঙ্গে বিনয় ঝগড়া করিতেও পারে না, অথচ ইহা তাহাকে কাঁটার মতো বেঁধে। বিনয় ঘরে আসিয়া বসিতেই ললিতা কহিল, “বিনয়বাবু, আজ আপনি পালালেই ভালো করতেন।”

বিনয় কহিল, “কেন?”

ললিতা। মা আপনাকে বিপদে ফেলবার মৎলব করছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের মেলায় যে অভিনয় হবে তাতে একজন লোক কম পড়ছে— মা আপনাকে ঠিক করেছেন।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল, “কী সর্বনাশ! এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।”

ললিতা হাসিয়া কহিল, “সে আমি মাকে আগেই বলেছি। এ অভিনয়ে আপনার বন্ধু কখনোই আপনাকে যোগ দিতে দেবেন না।”

বিনয় খোঁচা খাইয়া কহিল, “বন্ধুর কথা রেখে দিন। আমি সাত জন্মে

কখনো অভিনয় করি নি— আমাকে কেন ?”

ললিতা কহিল, “আমরাই বুঝি জন্মজন্মান্তর অভিনয় করে আসছি ?”

এইসময় বরদাসুন্দরী ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। ললিতা কহিল, “মা, তুমি অভিনয়ে বিনয়বাবুকে মিথ্যা ডাকছ। আগে ওঁর বন্ধুকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে—”

বিনয় কাতর হইয়া কহিল, “বন্ধুর রাজি হওয়া নিয়ে কথাই হচ্ছে না। অভিনয় তো করলেই হয় না— আমার যে ক্ষমতাই নেই।”

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “সেজন্যে ভাববেন না— আমরা আপনাকে শিখিয়ে ঠিক করে নিতে পারব। ছোটো ছোটো মেয়েরা পারবে আর আপনি পারবেন না ?”

বিনয়ের উদ্ধারের কোনো উপায় রহিল না।

২১

গোরা তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিল। বাড়ি যাইবার সহজ পথ ছাড়িয়া সে অনেকটা ঘুরিয়া গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিল। তখন কলিকাতার গঙ্গা ও গঙ্গার ধার বণিক্‌-সভ্যতার লাভলোলুপ কুশ্রীতায় জলে স্থলে আক্রান্ত হইয়া তীরে রেলের লাইন ও নীরে ব্রিজের বেড়ি পরে নাই। তখনকার শীতসন্ধ্যায় নগরের নিঃশ্বাসকালিমা আকাশকে এমন নিবিড় করিয়া আচ্ছন্ন করিত না। নদী তখন বহুদূর হিমালয়ের নির্জন গিরিশৃঙ্গ হইতে কলিকাতার ধূলিলিপ্ত ব্যস্ততার মাঝখানে শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিত।

প্রকৃতি কোনোদিন গোরার মনকে আকর্ষণ করিবার অবকাশ পায় নাই। তাহার মন নিজের সচেষ্টতার বেগে নিজে কেবলই তরঙ্গিত হইয়া ছিল; যে জল-স্থল-আকাশ অব্যবহিতভাবে তাহার চেষ্টার ক্ষেত্র তাহাকে সে লক্ষ্যই করে নাই।

আজ কিন্তু নদীর উপরকার ওই আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার-দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারম্বার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ; কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে, আর কতকগুলি দীপহীন নিস্তব্ধ। ও পারের নিবিড় গাছ-গুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতিগ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মতো তিমিরভেদী অনিমেষদৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর-মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়া ছিল— আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন্ দ্বারটা খোলা পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল— আজ কী হইল। আজ কোন্‌খানে সে প্রকৃতিকে স্বীকার করিল এবং করিবা মাত্রই এই গভীর কালো জল, এই নিবিড় কালো তট, ওই উদার কালো আকাশ তাহাকে বরণ করিয়া লইল। আজ প্রকৃতির কাছে কেমন করিয়া গোরা ধরা পড়িয়া গেছে।

পথের ধারে সদাগরের আপিসের বাগানে কোন্ বিলাতি লতা হইতে একটা অপরিচিত ফুলের মৃদুকোমল গন্ধ গোরার ব্যাকুল হৃদয়ের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। নদী তাহাকে লোকালয়ের অশ্রান্ত কর্মক্ষেত্র হইতে কোন্ অনির্দেশ্য সুদূরের দিকে আঙুল দেখাইয়া দিল; সেখানে নির্জন জলের ধারে গাছগুলি শাখা মিলাইয়া কী ফুল ফুটাইয়াছে, কী ছায়া ফেলিয়াছে! সেখানে নির্মল নীলাকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া। চারি দিক হইতে মাধুর্যের আবর্ত আসিয়া হঠাৎ গোরাকে যে-একটা অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির আকর্ষণে টানিয়া লইয়া চলিল পূর্বে কোনোদিন সে তাহার কোনো পরিচয় জানিত না। ইহা একই কালে বেদনায় এবং আনন্দে তাহার সমস্ত মনকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে অভিহত করিতে লাগিল।

আজ এই হেমন্তের রাত্রে, নদীর তীরে, নগরের অব্যক্ত কোলাহলে এবং নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে গোরা বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। এই মহারানীকে সে এতদিন নতমস্তকে স্বীকার করে নাই বলিয়াই আজ অকস্মাৎ তাহার শাসনের ইন্দ্রজাল আপন সহস্রবর্ণের সূত্রে গোরাকে জল-স্থল-আকাশের সঙ্গে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিল। গোরা নিজের সম্বন্ধে নিজেই বিস্মিত হইয়া নদীর জনশূন্য ঘাটের একটা পঁইঠায় বসিয়া পড়িল। বার বার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব এবং ইহার কী প্রয়োজন। যে সংকল্প-দ্বারা সে আপনার জীবনকে আগাগোড়া বিধিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সাজাইয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে ইহার স্থান কোথায়? ইহা কি তাহার বিরুদ্ধ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল, কোন্ দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল— কোন্ অনিন্দ্যসুন্দর হাতখানির আঙুলগুলি স্পর্শসৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল— গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুৎ চকিত হইয়া উঠিল। একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়া দিল। সে তাহার এই নূতন অনুভূতিকে সমস্ত দেহ মন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল; ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।

অনেক রাত্রে যখন গোরা বাড়ি গেল তখন আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত করলে যে বাবা? তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।"

গোরা কহিল, "কী জানি, মা, আজ কী মনে হল— অনেক ক্ষণ গঙ্গার ঘাটে বসে ছিলুম।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনয় সঙ্গে ছিল বুঝি?

গোরা কহিল, "না, আমি একলাই ছিলুম।"

আনন্দময়ী মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইলেন। বিনা প্রয়োজনে গোরা যে এত রাত পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভাবিবে এমন ঘটনা কখনোই হয় নাই। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবা তাহার স্বভাবই নহে। গোরা যখন অন্যমনস্ক হইয়া খাইতেছিল আনন্দময়ী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার মুখে যেন একটা কেমনতরো উতলাভাবের উদ্দীপনা।

আনন্দময়ী কিছু ক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বুঝি বিনয়ের বাড়ি গিয়েছিলে?"

গোরা কহিল, "না, আজ আমরা দুজনেই পরেশবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম।"

শুনিয়া আনন্দময়ী চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঁদের সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?"

গোরা কহিল, "হাঁ, হয়েছে।"

আনন্দময়ী। ওঁদের মেয়েরা বুঝি সকলের সাক্ষাতেই বেরোন?

গোরা। হাঁ, ওঁদের কোনো বাধা নেই।

অন্য সময় হইলে এরূপ উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা প্রকাশ পাইত, আজ তাহার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া আনন্দময়ী আবার চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া গোরা অন্য দিনের মতো অবিলম্বে মুখ ধুইয়া দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে গেল না। সে অন্যমনস্কভাবে তাহার শোবার ঘরের পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের গলিটা পূর্বের দিকে একটা বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে; সেই বড়ো রাস্তার পূর্বপ্রান্তে একটা ইস্কুল আছে; সেই ইস্কুলের সংলগ্ন জমিতে একটা পুরাতন জামগাছের মাথার উপরে পাৎলা একখণ্ড সাদা কুয়াশা ভাসিতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে আসন্ন সূর্যোদয়ের অরুণরেখা ঝাপসা হইয়া দেখা দিতেছিল। গোরা চুপ করিয়া অনেক ক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সেই ক্ষীণ কুয়াশাটুকু মিশিয়া গেল, উজ্জ্বল রৌদ্র গাছের শাখার ভিতর দিয়া যেন

অনেকগুলো ঝক্‌ঝকে সঙিনের মতো বিঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রাস্তা জনতায় ও কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় হঠাৎ গলির মোড়ে অবিনাশের সঙ্গে আর-কয়েকটি ছাত্রকে তাহার বাড়ির দিকে আসিতে দেখিয়া গোরা তাহার এই আবেশের জালকে যেন এক প্রবল টানে ছিন্ন করিয়া ফেলিল ; সে নিজের মনকে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়া বলিল, 'না, এ-সব কিছু নয় ; এ কোনোমতেই চলিবে না।' বলিয়া দ্রুতবেগে শোবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গোরার বাড়িতে তাহার দলবল আসিয়াছে অথচ গোরা তাহার অনেক পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া নাই, এমন ঘটনা ইহার পূর্বে আর একদিনও ঘটিতে পায় নাই। এই সামান্য ত্রুটিতেই গোরাকে ভারি একটা ধিক্‌কার দিল ; সে মনে মনে স্থির করিল, আর সে পরেশবাবুর বাড়ি যাইবে না এবং বিনয়ের সঙ্গেও যাহাতে কিছুদিন দেখা না হইয়া এই-সমস্ত আলোচনা বন্ধ থাকে সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

সেদিন নীচে গিয়া এই পরামর্শ হইল যে, গোরা তাহার দলের দুই-তিন জনকে সঙ্গে করিয়া পায়ে হাঁটিয়া গ্রাণ্ড্‌ট্রাঙ্ক রোড দিয়া ভ্রমণে বাহির হইবে ; পথের মধ্যে গৃহস্থবাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিবে, সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই লইবে না।

এই অপূর্ব সংকল্প মনে লইয়া গোরা হঠাৎ কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া এইরূপ খোলা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার একটা প্রবল আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল। ভিতরে ভিতরে তাহার হৃদয় যে একটা জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে, এই বাহির হইবার কল্পনাতেই সেটা যেন ছিন্ন হইয়া গেল বলিয়া তাহার মনে হইল। এই-সমস্ত ভাবের আবেশ যে মায়ামাত্র এবং কর্মই যে সত্য, সেই কথাটা খুব জোরের সহিত নিজের মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া লইয়া, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্য ইস্কুল-ছুটির বালকের মতো গোরা তাহার একতলার বসিবার ঘর ছাড়িয়া প্রায় ছুটিয়া বাহির হইল। সেই সময় কৃষ্ণদয়াল গঙ্গাস্নান

সারিয়া, ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া, নামাবলী গায়ে দিয়া মনে মনে মন্ত্র জপ করিতে করিতে ঘরে চলিয়াছিলেন। গোরা একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল। লজ্জিত হইয়া গোরা তাড়াতাড়ি তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। তিনি শশব্যস্ত হইয়া 'থাক্ থাক্' বলিয়া সসংকোচে চলিয়া গেলেন। পূজায় বসিবার পূর্বে গোরার স্পর্শে তাঁহার গঙ্গাস্নানের ফল মাটি হইল। কৃষ্ণদয়াল যে গোরার সংস্পর্শই বিশেষ করিয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, গোরা তাহা ঠিক বুঝিত না; সে মনে করিত, শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া সর্বপ্রকারে সকলেরই সংস্রব বাঁচাইয়া চলাই অহরহ তাঁহার সতর্কতার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আনন্দময়ীকে তো তিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া দূরে পরিহার করিতেন; মহিম কাজের লোক, মহিমের সঙ্গে তাঁহার দেখা-সাক্ষাতেরই অবকাশ ঘটিত না। সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল মহিমের কন্যা শশিমুখীকে তিনি কাছে লইয়া তাহাকে সংস্কৃত স্তোত্র মুখস্থ করাইতেন এবং পূজার্চনা-বিধিতে দীক্ষিত করিতেন।

কৃষ্ণদয়াল গোরা-কর্তৃক তাঁহার পাদস্পর্শে ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিলে পর তাঁহার সংকোচের কারণ সম্বন্ধে গোরার চেতনা হইল এবং সে মনে মনে হাসিল। এইরূপে পিতার সহিত গোরার সমস্ত সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং মাতার অনাচারকে সে যতই নিন্দা করুক, এই আচারদ্রোহিনী মাকেই গোরা তাহার জীবনের সমস্ত ভক্তি সমর্পণ করিয়া পূজা করিত।

আহারান্তে গোরা একটি ছোটো পুঁটলিতে গোটাকয়েক কাপড় লইয়া সেটা বিলাতি পর্যটকদের মতো পিঠে বাঁধিয়া মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "মা, আমি কিছুদিনের মতো বেরোব।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কোথায় যাবে বাবা?"

গোরা কহিল, "সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি নে।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনো কাজ আছে?"

গোরা কহিল, "কাজ বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু নয়— এই যাওয়াটাই একটা কাজ।"

আনন্দময়ীকে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া গোরা কহিল, "মা, দোহাই তোমার, আমাকে বারণ করতে পারবে না। তুমি তো আমাকে জানই, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব এমন ভয় নেই। আমি মাকে ছেড়ে বেশিদিন কোথাও থাকতে পারি নে।"

মার প্রতি তাহার ভালোবাসা গোরা কোনোদিন মুখে এমন করিয়া বলে নাই— তাই আজ কথাটা বলিয়াই সে লজ্জিত হইল।

পুলকিত আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি তাহার লজ্জাটা চাপা দিয়া কহিলেন, "বিনয় সঙ্গে যাবে বুঝি?"

গোরা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, মা, বিনয় যাবে না। ওই দেখো, অমনি মার মনে ভাবনা হচ্ছে, বিনয় না গেলে তাঁর গোরাকে পথে-ঘাটে রক্ষা করবে কে। বিনয়কে যদি তুমি আমার রক্ষক মনে কর সেটা তোমার একটা কুসংস্কার— এবার নিরাপদে ফিরে এলে ওই সংস্কারটা তোমার ঘুচবে।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝে মাঝে খবর পাব তো?"

গোরা কহিল, "খবর পাবে না বলেই ঠিক করে রাখো— তার পরে যদি পাও তো খুশি হবে। ভয় কিছুই নেই; তোমার গোরাকে কেউ নেবে না। মা, তুমি আমার যতটা মূল্য কল্পনা কর আর-কেউ ততটা করে না। তবে এই বোঁচকাটির উপর যদি কারও লোভ হয় তবে এটি তাকে দান করে দিয়ে চলে আসব; এটা রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দান করব না— সে নিশ্চয়।"

গোরা আনন্দময়ীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল, তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া হাত চুম্বন করিলেন, কোনোপ্রকার নিষেধমাত্র করিলেন না। নিজের কষ্ট হইবে বলিয়া অথবা কল্পনায় অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া আনন্দময়ী কখনো কাহাকেও নিষেধ করিতেন না। নিজের জীবনে তিনি অনেক বাধাবিপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের পৃথিবী তাঁহার কাছে অপরিচিত নহে; তাঁহার মনে ভয় বলিয়া কিছু ছিল না। গোরা যে কোনো

বিপদে পড়িবে সে ভয় তিনি মনে আনেন নাই— কিন্তু গোরার মনের মধ্যে যে কী-একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে, সেই কথাই তিনি কাল হইতে ভাবিতেছেন। আজ হঠাৎ গোরা অকারণে ভ্রমণ করিতে চলিল শুনিয়া তাঁহার সেই ভাবনা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

গোরা পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া রাস্তায় যেই পা দিয়াছে এমন সময় হাতে ঘনরক্ত বসোরা গোলাপযুগল সযত্নে লইয়া বিনয় তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরা কহিল, "বিনয়, তোমার দর্শনে অযাত্রা কি সুযাত্রা এবারে তার পরীক্ষা হবে।"

বিনয় কহিল, "বেরোচ্ছ নাকি?"

গোরা কহিল, "হাঁ।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

গোরা কহিল, "প্রতিধ্বনি উত্তর করিল 'কোথায়'।"

বিনয়। প্রতিধ্বনির চেয়ে ভালো উত্তর নেই নাকি?

গোরা। না। তুমি মার কাছে যাও, সব শুনতে পাবে। আমি চললুম।

বলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। বিনয় অন্তঃপুরে গিয়া আনন্দময়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের 'পরে গোলাপফুল দুইটি রাখিল।

আনন্দময়ী ফুল তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পেলে বিনয়?"

বিনয় তাহার ঠিক স্পষ্ট উত্তরটি না দিয়া কহিল, "ভালো জিনিসটি পেলেই আগে মায়ের পুজোর জন্যে সেটি দিতে ইচ্ছা করে।"

তার পরে আনন্দময়ীর তক্তপোষের উপর বসিয়া বিনয় কহিল, "মা, তুমি কিন্তু অন্যমনস্ক আছ।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কেন বলো দেখি।"

বিনয় কহিল, "আজ আমার বরাদ্দ পানটা দেবার কথা ভুলেই গেছ।"

আনন্দময়ী লজ্জিত হইয়া বিনয়কে পান আনিয়া দিলেন।

তাহার পরে সমস্ত দুপরবেলা ধরিয়া দুইজনে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

গোরার নিরুদ্দেশ-ভ্রমণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বিনয় কোনো পরিষ্কার খবর বলিতে পারিল না।

আনন্দময়ী কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বুঝি তুমি গোরাকে নিয়ে পরেশবাবুর ওখানে গিয়েছিলে?"

বিনয় গতকল্যকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল। আনন্দময়ী প্রত্যেক কথাটি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শুনিলেন।

যাইবার সময় বিনয় কহিল, "মা, পূজা তো সাঙ্গ হল, এবার তোমার চরণের প্রসাদী ফুল দুটো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি?"

আনন্দময়ী হাসিয়া গোলাপফুল দুইটি বিনয়ের হাতে দিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এ গোলাপ দুইটি যে কেবল সৌন্দর্যের জন্যই আদর পাইতেছে তাহা নহে— নিশ্চয়, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অতীত আরও অনেক গভীর তত্ত্ব ইহার মধ্যে আছে।

বিকালবেলায় বিনয় চলিয়া গেলে তিনি কতই ভাবিতে লাগিলেন। ভগবানকে ডাকিয়া বার বার প্রার্থনা করিলেন— গোরাকে যেন অসুখী হইতে না হয় এবং বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদের যেন কোনো কারণ না ঘটে।

২২

গোলাপফুলের একটু ইতিহাস আছে।

কাল রাত্রে গোরা তো পরেশবাবুর বাড়ি হইতে চলিয়া আসিল, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে সেই অভিনয়ে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব লইয়া বিনয়কে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

এই অভিনয়ে ললিতার যে কোনো উৎসাহ ছিল তাহা নহে, সে বরঞ্চ এ-সব ব্যাপার ভালোই বাসিত না। কিন্তু, কোনোমতে বিনয়কে এই অভিনয়ে জড়িত করিবার জন্য তাহার মনের মধ্যে যেন একটা জেদ চাপিয়া

গিয়াছিল। যে-সমস্ত কাজ গোরার মতবিরুদ্ধ, বিনয়কে দিয়া তাহা সাধন করাইবার জন্য তাহার একটা রোখ জন্মিয়াছিল। বিনয় যে গোরার অনুবর্তী, ইহা ললিতার কাছে কেন এত অসহ্য হইয়াছিল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। যেমন করিয়া হোক, সমস্ত বন্ধন কাটিয়া বিনয়কে স্বাধীন করিয়া দিতে পারিলে সে যেন বাঁচে, এমনি হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতা তাহার বেণী দুলাইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "কেন মশায়, অভিনয়ে দোষটা কী ?"

বিনয় কহিল, "অভিনয়ে দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু ওই ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে অভিনয় করতে যাওয়া আমার মনে ভালো লাগছে না।"

ললিতা। আপনি নিজের মনের কথা বলছেন না আর-কারও ?

বিনয়। অন্যের মনের কথা বলবার ভার আমার উপরে নেই, বলাও শক্ত। আপনি হয়তো বিশ্বাস করেন না, আমি নিজের মনের কথাটাই বলে থাকি— কখনো নিজের জবানিতে, কখনও বা অন্যের জবানিতে।

ললিতা এ কথার কোনো জবাব না দিয়া একটুখানি মুচকিয়া হাসিল মাত্র। একটু পরে কহিল, "আপনার বন্ধু গৌরবাবু বোধ হয় মনে করেন, ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেই খুব একটা বীরত্ব হয়, ওতেই ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার ফল হয়।"

বিনয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমার বন্ধু হয়তো না মনে করতে পারেন, কিন্তু আমি মনে করি। লড়াই নয় তো কী ? যে লোক আমাকে গ্রাহ্যই করে না— মনে করে, আমাকে কড়ে আঙুল তুলে ইশারায় ডাক দিলেই আমি কৃতার্থ হয়ে যাব, তার সেই উপেক্ষার সঙ্গে উপেক্ষা দিয়েই যদি লড়াই না করি তা হলে আত্মসম্মানকে বাঁচাব কী করে ?"

ললিতা নিজে অভিমানী স্বভাবের লোক, বিনয়ের মুখের এই অভিমান-বাক্য তাহার ভালোই লাগিল। কিন্তু, সেইজন্যই তাহার নিজের পক্ষের যুক্তিকে দুর্বল অনুভব করিয়াই ললিতা অকারণ বিদ্রূপের খোঁচায় বিনয়কে

কথায় কথায় আহত করিতে লাগিল।

শেষকালে বিনয় কহিল, "দেখুন, আপনি তর্ক করছেন কেন— আপনি বলুন-না কেন 'আমার ইচ্ছা আপনি অভিনয়ে যোগ দেন'। তা হলে আমি আপনার অনুরোধ-রক্ষার খাতিরে নিজের মতটাকে বিসর্জন দিয়ে একটা সুখ পাই।"

ললিতা কহিল, "বাঃ, তা আমি কেন বলব? সত্যি যদি আপনার কোনো মত থাকে তা হলে সেটা আমার অনুরোধে কেন ত্যাগ করতে যাবেন? কিন্তু, সেটা সত্যি হওয়া চাই।"

বিনয় কহিল, "আচ্ছা, সেই কথাই ভালো। আমার সত্যিকার কোনো মত নেই। আপনার অনুরোধে নাই হল, আপনার তর্কেই পরাস্ত হয়ে আমি অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হলুম।"

এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্রই বিনয় উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল, "অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাকে কী করতে হবে বলে দেবেন।"

বরদাসুন্দরী সগর্বে কহিলেন, "সেজন্যে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, আমরা আপনাকে ঠিক তৈরি করে নিতে পারব। কেবল অভ্যাসের জন্য রোজ আপনাকে নিয়মিত আসতে হবে।"

বিনয় কহিল, "আচ্ছা। আজ তবে আসি।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "সে কী কথা! আপনাকে খেয়ে যেতে হচ্ছে।"

বিনয় কহিল, "আজ নাই খেলুম।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "না, না, সে হবে না।"

বিনয় খাইল, কিন্তু অন্য দিনের মতো তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ছিল না। আজ সুচরিতাও কেমন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া ছিল। যখন ললিতার সঙ্গে বিনয়ের লড়াই চলিতেছিল তখন সে বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। আজ রাত্রে কথাবার্তা আর জমিল না।

বিদায়ের সময় বিনয় ললিতার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমি

হার মানলুম তবু আপনাকে খুশি করতে পারলুম না।"

ললিতা কোনো জবাব না দিয়া চলিয়া গেল।

ললিতা সহজে কাঁদিতে জানে না, কিন্তু আজ তাহার চোখ দিয়া জল যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল। কী হইয়াছে! কেন সে বিনয়বাবুকে বার বার এমন করিয়া খোঁচা দিতেছে এবং নিজে ব্যথা পাইতেছে!

বিনয় যতক্ষণ অভিনয়ে যোগ দিতে নারাজ ছিল ললিতার জেদও ততক্ষণ কেবলই চড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু যখনই সে রাজি হইল তখনই তাহার সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। যোগ না দিবার পক্ষে যতগুলি তর্ক সমস্ত তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন তাহার মন পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিল, 'কেবল আমার অনুরোধ রাখিবার জন্য বিনয়বাবুর এমন করিয়া রাজি হওয়া উচিত হয় নাই। অনুরোধ! কেন অনুরোধ রাখিবেন! তিনি মনে করেন, অনুরোধ রাখিয়া তিনি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করিতেছেন। তাঁহার এই ভদ্রতাটুকু পাইবার জন্য আমার যেন অত্যন্ত মাথাব্যথা!'

কিন্তু, এখন অমন করিয়া স্পর্ধা করিলে চলিবে কেন। সত্যই যে সে বিনয়কে অভিনয়ের দলে টানিবার জন্য ক্রমাগত নির্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছে। বিনয় ভদ্রতার দায়ে তাহার এত জেদের অনুরোধ রাখিয়াছে বলিয়া রাগ করিলেই বা চলিবে কেন। এই ঘটনায় ললিতার নিজের উপরে এমনই তীব্র ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হইল যে স্বভাবত এতটা হইবার কোনো কারণ ছিল না। অন্যদিন হইলে তাহার মনের চাঞ্চল্যের সময় সে সুচরিতার কাছে যাইত। আজ গেল না এবং কেন যে তাহার বুকটাকে ঠেলিয়া তুলিয়া তাহার চোখ দিয়া এমন করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল তাহা সে নিজেই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না।

পরদিন সকালে সুধীর লাবণ্যকে একটি তোড়া আনিয়া দিয়াছিল। সেই তোড়ার একটি বোঁটায় দুইটি বিকচোন্মুখ বসোরা গোলাপ ছিল। ললিতা সেটি তোড়া হইতে খুলিয়া লইল। লাবণ্য কহিল, "ও কী করছিস!"

ললিতা কহিল, "তোড়ায় অনেকগুলো বাজে ফুল-পাতার মধ্যে ভালো ফুলকে বাঁধা দেখলে আমার কষ্ট হয়, ওরকম দড়ি দিয়ে সব জিনিসকে এক শ্রেণীতে জোর করে বাঁধা বর্বরতা।"

এই বলিয়া সমস্ত ফুলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ললিতা সেগুলিকে ঘরের এ দিকে ও দিকে পৃথক করিয়া সাজাইল; কেবল গোলাপ দুটিকে হাতে করিয়া লইয়া গেল।

সতীশ ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "দিদি, ফুল কোথায় পেলে?"

ললিতা তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, "আজ তোর বন্ধুর বাড়িতে যাবি নে?"

বিনয়ের কথা এতক্ষণ সতীশের মনে ছিল না, কিন্তু তাহার উল্লেখমাত্রেই লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "হাঁ যাব।"

বলিয়া তখনই যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল।

ললিতা তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে গিয়ে কী করিস?"

সতীশ সংক্ষেপে কহিল, "গল্প করি।"

ললিতা কহিল, "তিনি তোকে এত ছবি দেন, তুই তাঁকে কিছু দিস নে কেন?"

বিনয় ইংরেজি কাগজ প্রভৃতি হইতে সতীশের জন্য নানাপ্রকার ছবি কাটিয়া রাখিত। একটা খাতা করিয়া সতীশ এই ছবিগুলি তাহাতে গঁদ দিয়া আঁটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে পাতা পুরাইবার জন্য তাহার নেশা এতই চড়িয়া গিয়াছে যে ভালো বই দেখিলেও তাহা হইতে ছবি কাটিয়া লইবার জন্য তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিত। এই লোলুপতার অপরাধে তাহার দিদিদের কাছে তাহাকে বিস্তর তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছে।

সংসারে প্রতিদান বলিয়া যে একটা দায় আছে সে কথাটা হঠাৎ আজ সতীশের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে সে বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভাঙা টিনের বাক্সটির মধ্যে তাহার নিজের বিষয়সম্পত্তি যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে তাহার কোনোটারই আসক্তিবন্ধন ছেদন করা তাহার পক্ষে সহজ নহে।

সতীশের উদ্‌বিগ্ন মুখ দেখিয়া ললিতা হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিয়া কহিল, "থাক্ থাক্, তোকে আর অত ভাবতে হবে না। আচ্ছা, এই গোলাপফুল দুটো তাঁকে দিস।"

এত সহজে সমস্যার মীমাংসা হইল দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং ফুল দুটি লইয়া তখনই সে তাহার বন্ধুঋণ শোধ করিবার জন্য চলিল।

রাস্তায় বিনয়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। 'বিনয়বাবু বিনয়বাবু' করিয়া দূর হইতে তাহাকে ডাক দিয়া সতীশ তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জামার মধ্যে ফুল লুকাইয়া কহিল, "আপনার জন্যে কী এনেছি বলুন দেখি।"

বিনয়কে হার মানাইয়া গোলাপফুল দুইটি বাহির করিল। বিনয় কহিল, "বাঃ, কী চমৎকার! কিন্তু, সতীশবাবু, এটি তো তোমার নিজের জিনিস নয়। চোরাই মাল নিয়ে শেষকালে পুলিসের হাতে পড়ব না তো?"

এই ফুল দুটিকে ঠিক নিজের জিনিস বলা যায় কি না সে সম্বন্ধে সতীশের হঠাৎ ধোঁকা লাগিল। সে একটু ভাবিয়া কহিল, "না, বাঃ, ললিতাদিদি আমাকে দিলেন যে আপনাকে দিতে।"

এ কথাটার এইখানেই নিষ্পত্তি হইল এবং বিকালে তাহাদের বাড়ি যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া বিনয় সতীশকে বিদায় দিল।

কাল রাত্রে ললিতার কথার খোঁচা খাইয়া বিনয় তাহার বেদনা ভুলিতে পারিতেছিল না। বিনয়ের সঙ্গে কাহারও প্রায় বিরোধ হয় না। সেইজন্য এইপ্রকার তীব্র আঘাত সে কাহারও কাছে প্রত্যাশাই করে না। ইতিপূর্বে ললিতাকে বিনয় সুচরিতার পশ্চাদ্‌বর্তিনী করিয়াই দেখিয়াছিল। কিন্তু, অঙ্কুশাহত হাতি যেমন তাহার মাহুতকে ভুলিবার সময় পায় না, কিছুদিন হইতে ললিতা সম্বন্ধে বিনয়ের সেই দশা হইয়াছিল। কী করিয়া ললিতাকে একটুখানি প্রসন্ন করিবে এবং শান্তি পাইবে, বিনয়ের এই চিন্তাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া ললিতার তীব্রহাস্যদিগ্ধ জ্বালাময় কথাগুলি একটার পর একটা কেবলই তাহার মনে বাজিয়া উঠিত

এবং তাহার নিদ্রা দূর করিয়া রাখিত। ‘আমি গোরার ছায়ার মতো, আমার নিজের কোনো পদার্থ নাই, ললিতা এই বলিয়া অবজ্ঞা করেন— কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ অসত্য।’ ইহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তি সে মনের মধ্যে জড়ো করিয়া তুলিত। কিন্তু, এ-সমস্ত যুক্তি তাহার কোনো কাজে লাগিত না। কারণ, ললিতা তো স্পষ্ট করিয়া এ অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে আনে নাই— এ কথা লইয়া তর্ক করিবার অবকাশই তাহাকে দেয় নাই। বিনয়ের জবাব দিবার এত কথা ছিল তবু সেগুলা ব্যবহার করিতে না পারিয়া তাহার মনে ক্ষোভ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে কাল রাত্রে হারিয়াও যখন ললিতার মুখ সে প্রসন্ন দেখিল না তখন বাড়িতে আসিয়া সে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ‘সত্যই কি আমি এতই অবজ্ঞার পাত্র!’

এইজন্যই সতীশের কাছে যখন সে শুনিল যে ললিতাই তাহাকে গোলাপফুল দুটি সতীশের হাত দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে তখন সে অত্যন্ত একটা উল্লাস বোধ করিল। সে ভাবিল, অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হওয়াতেই সন্ধির নিদর্শনস্বরূপ ললিতা তাহাকে খুশি হইয়া এই গোলাপ দুটি দিয়াছে। প্রথমে মনে করিল, ‘ফুল দুটি বাড়িতে রাখিয়া আসি।’ তাহার পরে ভাবিল, ‘না, এই শান্তির ফুল মায়ের পায়ে দিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়া আনি।’

সেদিন বিকালে বিনয় যখন পরেশবাবুর বাড়িতে গেল তখন সতীশ ললিতার কাছে তাহার ইস্কুলের পড়া বলিয়া লইতেছে। বিনয় ললিতাকে কহিল, “যুদ্ধেরই রঙ লাল, অতএব সন্ধির ফুল সাদা হওয়া উচিত ছিল।”

ললিতা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল। বিনয় তখন একটি গুচ্ছ শ্বেতকরবী চাদরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ললিতার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, “আপনার ফুল দুটি যতই সুন্দর হোক তবু তাতে ক্রোধের রঙটুকু আছে; আমার এ ফুল সৌন্দর্যে তার কাছে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু শান্তির শুভ্র রঙে নম্রতা স্বীকার করে আপনার কাছে হাজির হয়েছে।”

ললিতা কর্ণমূল রাঙা করিয়া কহিল, “আমার ফুল আপনি কাকে

বলছেন!”

বিনয় কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, “তবে তো ভুল বুঝেছি। সতীশবাবু, কার ফুল কাকে দিলে!”

সতীশ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, “বাঃ, ললিতাদিদি যে দিতে বললে।”

বিনয়। কাকে দিতে বললেন?

সতীশ। আপনাকে।

ললিতা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া সতীশের পিঠে এক চাপড় মারিয়া কহিল, “তোর মতো বোকা তো আমি দেখি নি। বিনয়বাবুর ছবির বদলে তুই তাঁকে ফুল দিতে চাইলি নে?”

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, “হাঁ তাই তো, কিন্তু তুমিই আমাকে দিতে বললে না?”

সতীশের সঙ্গে তকরার করিতে গিয়া ললিতা আরও বেশি করিয়া জালে জড়াইয়া পড়িল। বিনয় স্পষ্ট বুঝিল, ফুল দুটি ললিতাই দিয়াছে, কিন্তু বেনামিতেই কাজ করা তাহার অভিপ্রায় ছিল। বিনয় কহিল, “আপনার ফুলের দাবি আমি ছেড়েই দিচ্ছি, কিন্তু তাই বলে আমার এই ফুলের মধ্যে ভুল কিছুই নেই। আমাদের বিবাদনিষ্পত্তির শুভ উপলক্ষে এই ফুল কয়টি—”

ললিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, “আমাদের বিবাদই বা কী, আর তার নিষ্পত্তিই বা কিসের?”

বিনয় কহিল, “একেবারে আগাগোড়া সমস্তই মায়া? বিবাদও ভুল, ফুলও তাই, নিষ্পত্তিও মিথ্যা? শুধু শুক্তিতে রজত ভ্রম নয়, শুক্তিটা সুদ্ধই ভ্রম। ওই যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে অভিনয়ের একটা কথা হচ্ছিল সেটা—”

ললিতা কহিল, “সেটা ভ্রম নয়। কিন্তু, তা নিয়ে ঝগড়া কিসের? আপনি কেন মনে করছেন আপনাকে এইটেতে রাজি করবার জন্যে আমি মস্ত একটা লড়াই বাধিয়ে দিয়েছি, আপনি সম্মত হওয়াতেই আমি কৃতার্থ

হয়েছি ? আপনার কাছে অভিনয় করাটা যদি অন্যায় বোধ হয় কারও কথা শুনে কেনই বা তাতে রাজি হবেন ?"

এই বলিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সমস্তই উল্‌টা ব্যাপার হইল। আজ ললিতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে, সে বিনয়ের কাছে নিজের হার স্বীকার করিবে এবং যাহাতে অভিনয়ে বিনয় যোগ না দেয় তাহাকে সেইরূপ অনুরোধ করিবে, কিন্তু এমন করিয়া কথাটা উঠিল এবং এমন ভাবে তাহার পরিণতি হইল যে, ফল ঠিক উল্‌টা দাঁড়াইল। বিনয় মনে করিল, সে যে অভিনয় সম্বন্ধে এতদিন বিরুদ্ধতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহারই প্রতিঘাতের উত্তেজনা এখনো ললিতার মনে রহিয়া গেছে। বিনয় যে কেবল বাহিরে হার মানিয়াছে, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার বিরোধ রহিয়াছে, এইজন্য ললিতার ক্ষোভ দূর হইতেছে না। ললিতা এই ব্যাপারটাতে যে এতটা আঘাত পাইয়াছে, ইহাতে বিনয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে স্থির করিল, এই কথাটা লইয়া সে আর-কোনা আলোচনা উপহাসচ্ছলেও করিবে না এবং এমন নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই কাজটাকে সম্পন্ন করিয়া তুলিবে যে কেহ তাহার প্রতি ঔদাসীন্যের অপরাধ আরোপ করিতে পারিবে না।

সুচরিতা আজ প্রাতঃকাল হইতে নিজের শোবার ঘরে নিভৃতে বসিয়া 'খৃষ্টের অনুকরণ' -নামক একটি ইংরেজি ধর্মগ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। আজ সে তাহার অন্যান্য নিয়মিত কর্মে যোগ দেয় নাই। মাঝে মাঝে গ্রন্থ হইতে মন ভ্রষ্ট হইয়া পড়াতে বইয়ের লেখাগুলি তাহার কাছে ছায়া হইয়া পড়িতেছিল— আবার পরক্ষণে নিজের উপর রাগ করিয়া বিশেষ বেগের সহিত চিত্তকে গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ করিতেছিল, কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছিল না।

এক সময়ে দূর হইতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হইল বিনয়বাবু আসিয়াছেন ; তখনই চমকিয়া উঠিয়া, বই রাখিয়া বাহিরের ঘরে যাইবার জন্য মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজের এই ব্যস্ততাতে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সুচরিতা

আবার চৌকির উপর বসিয়া বই লইয়া পড়িল। পাছে কানে শব্দ যায় বলিয়া দুই কান চাপিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমন সময় ললিতা তাহার ঘরে আসিল। সুচরিতা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোর কী হয়েছে বল্ তো।"

ললিতা তীব্র ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "কিছু না।"

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ছিলি ?"

ললিতা কহিল, "বিনয়বাবু এসেছেন, তিনি বোধ হয় তোমার সঙ্গে গল্প করতে চান।"

বিনয়বাবুর সঙ্গে আর-কেহ আসিয়াছে কি না, এ প্রশ্ন সুচরিতা আজ উচ্চারণ করিতেও পারিল না। যদি আর-কেহ আসিত তবে নিশ্চয় ললিতা তাহার উল্লেখ করিত, কিন্তু তবু মন নিঃসংশয় হইতে পারিল না। আর সে নিজেকে দমনের চেষ্টা না করিয়া গৃহাগত অতিথির প্রতি কর্তব্যের উপলক্ষে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল। ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যাবি নে ?"

ললিতা একটু অধৈর্যের স্বরে কহিল, "তুমি যাও-না, আমি পরে যাচ্ছি।"

সুচরিতা বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিনয় সতীশের সঙ্গে গল্প করিতেছে।

সুচরিতা কহিল, "বাবা বেরিয়ে গেছেন, এখনই আসবেন। মা আপনাদের সেই অভিনয়ের কবিতা মুখস্থ করাবার জন্যে লাবণ্য ও লীলাকে নিয়ে মাস্টারমশায়ের বাড়িতে গেছেন— ললিতা কোনোমতেই গেল না। তিনি বলে গেছেন, আপনি এলে আপনাকে বসিয়ে রাখতে— আপনার আজ পরীক্ষা হবে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এর মধ্যে নেই ?"

সুচরিতা কহিল, "সবাই অভিনেতা হলে জগতে দর্শক হবে কে ?"

বরদাসুন্দরী সুচরিতাকে এ-সকল ব্যাপারে যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিতেন। তাই তাহার গুণপনা দেখাইবার জন্য এবারও ডাক পড়ে নাই।

অন্য দিন এই দুই ব্যক্তি একত্র হইলে কথার অভাব হইত না। আজ

উভয় পক্ষেই এমন বিঘ্ন ঘটিয়াছে যে কোনোমতেই কথা জমিতে চাহিল না। সুচরিতা গোরার প্রসঙ্গ তুলিবে না পণ করিয়া আসিয়াছিল। বিনয়ও পূর্বের মতো সহজে গোরার কথা তুলিতে পারে না। তাহাকে ললিতা এবং হয়তো এ বাড়ির সকলেই গোরার একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ বলিয়া মনে করে, ইহাই কল্পনা করিয়া গোরার কথা তুলিতে সে বাধা পায়।

অনেক দিন এমন হইয়াছে, বিনয় আগে আসিয়াছে, গোরা তাহার পরে আসিয়াছে— আজও সেইরূপ ঘটিতে পারে ইহাই মনে করিয়া সুচরিতা যেন একপ্রকার সচকিত অবস্থায় রহিল। গোরা পাছে আসিয়া পড়ে এই তাহার একটা ভয় ছিল এবং পাছে না আসে এই আশঙ্কাও তাহাকে বেদনা দিতেছিল।

বিনয়ের সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ভাবে দুই-চারটে কথা হওয়ার পর সুচরিতা আর-কোনো উপায় না দেখিয়া সতীশের ছবির খাতাখানা লইয়া সতীশের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ছবি সাজাইবার ত্রুটি ধরিয়া নিন্দা করিয়া সতীশকে রাগাইয়া তুলিল। সতীশ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। আর, বিনয় টেবিলের উপর তাহার প্রত্যাখ্যাত করবীগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, 'অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও আমার এই ফুল কয়টা ললিতার লওয়া উচিত ছিল।'

হঠাৎ একটা পায়ের শব্দে চমকিয়া সুচরিতা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, হারানবাবু ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। তাহার চমকটা অত্যন্ত সুগোচর হওয়াতে সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হারানবাবু একটা চৌকিতে বসিয়া কহিলেন, "কই, আপনাদের গৌরবাবু আসেন নি?"

বিনয় হারানবাবুর এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন, তাঁকে কোনো প্রয়োজন আছে?"

হারানবাবু কহিলেন, "আপনি আছেন অথচ তিনি নেই, এ তো প্রায়

দেখা যায় না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

বিনয়ের মনে বড়ো রাগ হইল— পাছে তাহা প্রকাশ পায় এইজন্য সংক্ষেপে কহিল, "তিনি কলকাতায় নেই।"

হারান। প্রচারে গেছেন বুঝি?

বিনয়ের রাগ বাড়িয়া উঠিল, কোনো জবাব করিল না। সুচরিতাও কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। হারানবাবু দ্রুতপদে সুচরিতার অনুবর্তন করিলেন, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া উঠিতে পারিলেন না। হারানবাবু দূর হইতে কহিলেন, "সুচরিতা, একটা কথা আছে।"

সুচরিতা কহিল "আজ আমি ভালো নেই।"

বলিতে বলিতেই তাহার শয়নগৃহে কপাট পড়িল।

এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া অভিনয়ের পালা দিবার জন্য যখন বিনয়কে আর-একটা ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন তাহার অনতিকাল পরেই অকস্মাৎ ফুলগুলিকে আর সেই টেবিলের উপরে দেখা যায় নাই। সে রাত্রে ললিতাও বরদাসুন্দরীর অভিনয়ের আখড়ায় দেখা দিল না, এবং সুচরিতা 'খৃষ্টের অনুকরণ' বইখানি কোলের উপর মুড়িয়া ঘরের বাতিটাকে এক কোণে আড়াল করিয়া দিয়া অনেক রাত পর্যন্ত দ্বারের বহির্বর্তী অন্ধকার রাত্রির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার সম্মুখে যেন একটা কোন্ অপরিচিত অপূর্ব দেশ মরীচিকার মতো দেখা দিয়াছিল; জীবনের এতদিনকার সমস্ত জানাশুনার সঙ্গে সেই দেশের একটা কোথায় একান্ত বিচ্ছেদ আছে; সেইজন্য সেখানকার বাতায়নে যে আলোগুলি জ্বলিতেছে তাহা তিমির-নিশীথিনীর নক্ষত্রমালার মতো একটা সুদূরতার রহস্যে মনকে ভীত করিতেছে; অথচ মনে হইতেছে, 'জীবন আমার তুচ্ছ, এতদিন যাহা নিশ্চয় বলিয়া জানিয়াছি তাহা সংশয়াকীর্ণ এবং প্রত্যহ যাহা করিয়া আসিতেছি তাহা অর্থহীন— ওইখানেই হয়তো জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে, কর্ম মহৎ হইয়া উঠিবে এবং জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারিব। ওই অপূর্ব অপরিচিত ভয়ংকর দেশের অজ্ঞাত সিংহদ্বারের সম্মুখে কে আমাকে দাঁড় করাইয়া দিল!

কেন আমার হৃদয় এমন করিয়া কাঁপিতেছে, কেন আমার পা অগ্রসর হইতে গিয়া এমন করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে!'

২৩

অভিনয়ের অভ্যাস উপলক্ষে বিনয় প্রত্যহই আসে। সুচরিতা তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখে, তাহার পরে হাতের বইটার দিকে মন দেয় অথবা নিজের ঘরে চলিয়া যায়। বিনয়ের একলা আসার অসম্পূর্ণতা প্রত্যহই তাহাকে আঘাত করে, কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন করে না। অথচ দিনের পর দিন এমনিভাবে যতই যাইতে লাগিল গোরার বিরুদ্ধে সুচরিতার মনের একটা অভিযোগ প্রতিদিন যেন তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। গোরা যেন আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, এমনি একটা ভাব যেন সেদিন ছিল।

অবশেষে সুচরিতা যখন শুনিল, গোরা নিতান্তই অকারণে কিছুদিনের জন্য কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, তখন কথাটাকে সে একটা সামান্য সংবাদের মতো উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল— কিন্তু, কথাটা তাহার মনে বিঁধিয়াই রহিল। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়ে— অন্যমনস্ক হইয়া আছে, হঠাৎ দেখে এই কথাটাই সে মনে মনে ভাবিতেছিল।

গোরার সঙ্গে সেদিনকার আলোচনার পর তাহার এরূপ হঠাৎ অন্তর্ধান সুচরিতা একেবারেই আশা করে নাই। গোরার মতের সঙ্গে নিজের সংস্কারের এতদূর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সেদিন তাহার অন্তঃকরণে বিদ্রোহের উজান হাওয়া কিছুমাত্র ছিল না, সেদিন সে গোরার মতগুলি স্পষ্ট বুঝিতেছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু গোরা মানুষটাকে সে যেন একরকম করিয়া বুঝিয়াছিল। গোরার মত যাহাই থাক্-না সে মতে যে মানুষকে ক্ষুদ্র করে নাই, অবজ্ঞার যোগ্য করে নাই, বরঞ্চ তাহার চিত্তের বলিষ্ঠতাকে যেন প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিয়াছে— ইহা সেদিন সে প্রবলভাবে অনুভব করিয়াছে। এ-সকল

কথা আর-কাহারও মুখে সে সহ্য করিতেই পারিত না, রাগ হইত, সে লোকটাকে মূঢ় মনে করিত, তাহাকে শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিবার জন্য মনে চেষ্টার উত্তেজনা হইত; কিন্তু, সেদিন গোরার সম্বন্ধে তাহার কিছুই হইল না; গোরার চরিত্রের সঙ্গে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে, অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে এবং মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বরের মর্মভেদী প্রবলতার সঙ্গে তাহার কথাগুলি মিলিত হইয়া একটা সজীব ও সত্য আকার ধারণ করিয়াছিল। এ-সমস্ত মত সুচরিতা নিজে গ্রহণ না করিতে পারে, কিন্তু আর-কেহ যদি ইহাকে এমনভাবে সমস্ত বুদ্ধি-বিশ্বাস সমস্ত জীবন দিয়া গ্রহণ করে তবে তাহাকে ধিক্‌কার দিবার কিছুই নাই, এমন-কি বিরুদ্ধ সংস্কার অতিক্রম করিয়াও তাহাকে শ্রদ্ধা করা যাইতে পারে— এই ভাবটা সুচরিতাকে সেদিন সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল। মনের এই অবস্থাটা সুচরিতার পক্ষে একেবারে নূতন। মতের পার্থক্য সম্বন্ধে সে অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিল; পরেশবাবুর এক-প্রকার নির্লিপ্ত সমাহিত শান্ত জীবনের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও সে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে বাল্যকাল হইতে বেষ্টিত ছিল বলিয়া মত জিনিসটাকে অতিশয় একান্ত করিয়া দেখিত, সেইদিনই প্রথম সে মানুষের সঙ্গে মতের সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া দেখিয়া একটা যেন সজীব সমগ্র পদার্থের রহস্যময় সত্তা অনুভব করিল। মানবসমাজকে কেবল আমার পক্ষ এবং অন্য পক্ষ এই দুই সাদা কালো ভাগে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার যে ভেদদৃষ্টি তাহাই সেদিন সে ভুলিয়াছিল এবং ভিন্ন মতের মানুষকে মুখ্যভাবে মানুষ বলিয়া এমন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, ভিন্ন মতটা তাহার কাছে গৌণ হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন সুচরিতা অনুভব করিয়াছিল যে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে গোরা একটা আনন্দ বোধ করিতেছে। সে কি কেবলমাত্র নিজের মত প্রকাশ করিবারই আনন্দ! সেই আনন্দদানে সুচরিতারও কি কোনো হাত ছিল না! হয়তো ছিল না। হয়তো গোরার কাছে কোনো মানুষের কোনো মূল্য নাই, সে নিজের মত এবং উদ্দেশ্য লইয়াই একেবারে সকলের নিকট হইতে সুদূর হইয়া আছে— মানুষরা তাহার কাছে মত প্রয়োগ করিবার

উপলক্ষমাত্র।

সুচরিতা এ কয়দিন বিশেষ করিয়া উপাসনায় মন দিয়াছিল। সে যেন পূর্বের চেয়েও পরেশবাবুকে বেশি করিয়া আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একদিন পরেশবাবু তাঁহার ঘরে একলা বসিয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময় সুচরিতা তাঁহার কাছে চুপ করিয়া আসিয়া বসিল।

পরেশবাবু বই টেবিলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রাধে!"

সুচরিতা কহিল, "কিছু না।"

বলিয়া তাঁহার টেবিলের উপরে যদিচ বই-কাগজ প্রভৃতি গোছানোই ছিল তবু সেগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া অন্য রকম করিয়া গুছাইতে লাগিল; একটু পরে বলিয়া উঠিল, "বাবা, আগে তুমি আমাকে যেরকম পড়াতে এখন সেরকম করে পড়াও না কেন?"

পরেশবাবু সস্নেহে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, "আমার ছাত্রী যে আমার ইস্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে গেছে। এখন তো তুমি নিজে পড়েই বুঝতে পার।"

সুচরিতা কহিল, "না, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি নে, আমি আগের মতো তোমার কাছে পড়ব।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, কাল থেকে পড়াব।"

সুচরিতা আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাবা, সেদিন বিনয়বাবু জাতিভেদের কথা অনেক বললেন, তুমি আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বল না কেন?"

পরেশবাবু কহিলেন, "মা, তুমি তো জানই, তোমরা আপনি ভেবে বুঝতে চেষ্টা করবে, আমার বা আর-কারও মত কেবল অভ্যস্ত কথার মতো ব্যবহার করবে না, আমি বরাবর তোমাদের সঙ্গে সেইরকম করেই ব্যবহার করেছি। প্রশ্নটা ঠিকমত মনে জেগে ওঠবার পূর্বেই সে সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিতে যাওয়া আর ক্ষুধা পাবার পূর্বেই খাবার খেতে দেওয়া একই,

তাতে কেবল অরুচি এবং অপাক হয়। তুমি আমাকে যখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, আমি যা বুঝি বলব।"

সুচরিতা কহিল, "আমি তোমাকে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছি, আমরা জাতিভেদকে নিন্দা করি কেন?"

পরেশবাবু কহিলেন, "একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে প্রবেশ করলে ভাত ফেলে দিতে হয়, মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে অধর্ম না বলে কী বলব? মানুষকে যারা এমন ভয়ানক অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনোই পৃথিবীতে বড়ো হতে পারে না, অন্যের অবজ্ঞা তাদের সইতেই হবে।"

সুচরিতা গোরার মুখে শোনা কথার অনুসরণ করিয়া কহিল, "এখনকার সমাজে যে বিকার উপস্থিত হয়েছে তাতে অনেক দোষ থাকতে পারে; সে দোষ তো সমাজের সকল জিনিসেই ঢুকেছে, তাই বলে আসল জিনিসটাকে দোষ দেওয়া যায় কি?"

পরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে কহিলেন, "আসল জিনিসটা কোথায় আছে জানলে বলতে পারতুম। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দেশে মানুষ মানুষকে অসহ্য ঘৃণা করছে এবং তাতে আমাদের সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, এমন অবস্থায় একটা কাল্পনিক আসল জিনিসের কথা চিন্তা করে মন সান্ত্বনা মানে কই।"

সুচরিতা পুনশ্চ গোরাদের কথার প্রতিধ্বনি-স্বরূপে কহিল, "আচ্ছা, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখাই তো আমাদের দেশের চরমতত্ত্ব ছিল।"

পরেশবাবু কহিলেন, "সমদৃষ্টিতে দেখা জ্ঞানের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। সমদৃষ্টির মধ্যে প্রেমও নেই, ঘৃণাও নেই— সমদৃষ্টি রাগদ্বেষের 'অতীত। মানুষের হৃদয় এমনতরো হৃদয়ধর্মবিহীন জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেইজন্যে আমাদের দেশে এরকম সাম্যতত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও নীচজাতকে দেবালয়ে পর্যন্ত প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। যদি দেবতার ক্ষেত্রেও আমাদের

দেশে সাম্য না থাকে তবে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সে তত্ত্ব থাকলেই কী, আর না থাকলেই কী।”

সুচরিতা পরেশবাবুর কথা অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে কহিল, “আচ্ছা, বাবা, তুমি বিনয়বাবুদের এ-সব কথা বোঝাবার চেষ্টা কর না কেন?”

পরেশবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, “বিনয়বাবুদের বুদ্ধি কম বলে যে এ-সব কথা বোঝেন না তা নয়; বরঞ্চ তাঁদের বুদ্ধি বেশি বলেই তাঁরা বুঝতে চান না, কেবল বোঝাতেই চান। তাঁরা যখন ধর্মের দিক থেকে, অর্থাৎ সকলের চেয়ে বড়ো সত্যের দিক থেকে এ-সব কথা অন্তরের সঙ্গে বুঝতে চাইবেন তখন তোমার বাবার বুদ্ধির জন্যে তাঁদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে না। এখন তাঁরা অন্য দিক থেকে দেখছেন, এখন আমার কথা তাঁদের কোনো কাজেই লাগবে না।”

গোরাদের কথা যদিও সুচরিতা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছিল, তবু তাহা তাহার সংস্কারের সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহার অন্তরের মধ্যে বেদনা দিতেছিল। সে শান্তি পাইতেছিল না। আজ পরেশবাবুর সঙ্গে কথা কহিয়া সেই বিরোধ হইতে সে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল। গোরা বিনয় বা আর-কেহই যে পরেশবাবুর চেয়ে কোনো বিষয়ে ভালো বুঝে, এ কথা সুচরিতা কোনোমতেই মনে স্থান দিতে চায় না। পরেশবাবুর সঙ্গে যাহার মতের অনৈক্য হইয়াছে সুচরিতা তাহার উপর রাগ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সম্প্রতি গোরার সঙ্গে আলাপের পর গোরার কথা একেবারে রাগ বা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছিল না বলিয়াই সুচরিতা এমন একটা কষ্ট বোধ করিতেছিল। সেই কারণেই আবার শিশুকালের মতো করিয়া পরেশবাবুকে তাঁহার ছায়াটির ন্যায় নিয়ত আশ্রয় করিবার জন্য তাহার হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। চৌকি হইতে উঠিয়া দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সুচরিতা পরেশবাবুর পিছনে তাঁহার চৌকির পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল, “বাবা, আজ বিকালে আমাকে

নিয়ে উপাসনা কোরো।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আচ্ছা।"

তাহার পরে নিজের শোবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া সুচরিতা গোরার কথাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু, গোরার সেই বুদ্ধি ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মুখ তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, গোরার কথা শুধু কথা নহে, সে যেন গোরা স্বয়ং; সে কথার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে— তাহা বিশ্বাসের বলে এবং স্বদেশপ্রেমের বেদনায় পরিপূর্ণ। তাহা মত নয় যে তাহাকে প্রতিবাদ করিয়াই চুকাইয়া দেওয়া যাইবে— তাহা যে সম্পূর্ণ মানুষ, এবং সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে যে হাত ওঠে না। অত্যন্ত একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া সুচরিতার কান্না আসিতে লাগিল। কেহ যে তাহাকে এত বড়ো একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনের মতো অনায়াসে দূরে চলিয়া যাইতে পারে এই কথা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিল অথচ কষ্ট পাইতেছে বলিয়াও ধিক্‌কারের সীমা রহিল না।

২৪

এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, ইংরেজ কবি ড্রাইডেনের রচিত সংগীত বিষয়ক একটা কবিতা বিনয় ভাবব্যক্তির সহিত আবৃত্তি করিয়া যাইবে এবং মেয়েরা অভিনয়মঞ্চে উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইয়া কাব্যলিখিত ব্যাপারের মূক অভিনয় করিতে থাকিবে। এ ছাড়া মেয়েরাও ইংরেজি কবিতা-আবৃত্তি এবং গান প্রভৃতি করিবে।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে অনেক ভরসা দিয়াছিলেন যে, তাহাকে তাঁহারা কোনো প্রকারে তৈরি করিয়া লইবেন। তিনি নিজে ইংরেজি অতি সামান্যই শিখিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার দলের দুই-একজন পণ্ডিতের প্রতি তাঁহার

নির্ভর ছিল।

কিন্তু, যখন আখড়া বসিল, বিনয় তাহার আবৃত্তির দ্বারা বরদাসুন্দরীর পণ্ডিতসমাজকে বিস্মিত করিয়া দিল। তাঁহাদের মণ্ডলীবহির্ভূত এই ব্যক্তিকে গড়িয়া লইবার সুখ হইতে বরদাসুন্দরী বঞ্চিত হইলেন। পূর্বে যাহারা বিনয়কে বিশেষ কেহ বলিয়া খাতির করে নাই তাহারা, বিনয় এমন ভালো ইংরেজি পড়ে বলিয়া তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন-কি, হারানবাবুও তাঁহার কাগজে মাঝে মাঝে লিখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। এবং সুধীর তাহাদের ছাত্রসভায় মাঝে মাঝে ইংরেজি বক্তৃতা করিবার জন্য বিনয়কে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

ললিতার অবস্থাটা ভারি অদ্ভুতরকম হইল। বিনয়কে যে কোনো সাহায্য কাহাকেও করিতে হইল না, সেজন্য সে খুশিও হইল আবার তাহাতে তাহার মনের মধ্যে একটা অসন্তোষও জন্মিল। বিনয় যে তাহাদের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরঞ্চ তাহাদের সকলের চেয়ে ভালো, সে যে মনে মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবে এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনোপ্রকার শিক্ষার প্রত্যাশা করিবে না, ইহাতে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। বিনয়ের সম্বন্ধে সে যে কী চায়, কেমনটা হইলে তাহার মন বেশ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। মাঝে হইতে তাহার অপ্রসন্নতা কেবলই ছোটোখাটো বিষয়ে তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়কেই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিনয়ের প্রতি ইহা যে সুবিচার নহে এবং শিষ্টতাও নহে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া সে কষ্ট পাইল এবং নিজেকে দমন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল— কিন্তু অকস্মাৎ অতি সামান্য উপলক্ষেই কেন যে তাহার একটা অসংগত অন্তর্জ্বালা সংযমের শাসন লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িত তাহা সে বুঝিতে পারিত না। পূর্বে যে ব্যাপারে যোগ দিবার জন্য সে বিনয়কে অবিশ্রাম উত্তেজিত করিয়াছে, এখন তাহা হইতে নিরস্ত করিবার জন্যই তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু, এখন

সমস্ত আয়োজনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া বিনয় অকারণে পলাতক হইবে কী বলিয়া। সময়ও আর অধিক নাই; এবং নিজের একটা নূতন নৈপুণ্য আবিষ্কার করিয়া সে নিজেই এই কাজে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

অবশেষে ললিতা বরদাসুন্দরীকে কহিল, "আমি এতে থাকব না।"

বরদাসুন্দরী তাঁহার মেজো মেয়েকে বেশ চিনিতেন, তাই নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

ললিতা কহিল, "আমি যে পারি নে।"

বস্তুত, যখন হইতে বিনয়কে আর আনাড়ি বলিয়া গণ্য করিবার উপায় ছিল না তখন হইতেই ললিতা বিনয়ের সম্মুখে কোনোমতেই আবৃত্তি বা অভিনয় অভ্যাস করিতে চাহিত না। সে বলিত, 'আমি আপনি আলাদা অভ্যাস করিব।' ইহাতে সকলেরই অভ্যাসে বাধা পড়িত, কিন্তু ললিতাকে কিছুতেই পারা গেল না। অবশেষে, হার মানিয়া অভ্যাসক্ষেত্রে ললিতাকে বাদ দিয়াই কাজ চালাইতে হইল।

কিন্তু, যখন শেষ অবস্থায় ললিতা একেবারেই ভঙ্গ দিতে চাহিল তখন বরদাসুন্দরীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতেই পারিবে না। তখন তিনি পরেশবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। পরেশবাবু সামান্য বিষয়ে কখনোই তাঁহার মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই অনুসারে সে পক্ষও আয়োজন করিয়াছেন, সময়ও অত্যন্ত সংকীর্ণ, এই-সমস্ত বিবেচনা করিয়া পরেশবাবু ললিতাকে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "ললিতা, এখন তুমি ছেড়ে দিলে যে অন্যায় হবে।"

ললিতা রুদ্ধরোদন কণ্ঠে কহিল, "বাবা, আমি যে পারি নে। আমার হয় না।"

পরেশ কহিলেন, "তুমি ভালো না পারলে তোমার অপরাধ হবে না, কিন্তু না করলে অন্যায় হবে।"

ললিতা মুখ নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; পরেশবাবু কহিলেন, "মা, যখন

তুমি ভার নিয়েছ তখন তোমাকে তো সম্পন্ন করতেই হবে। পাছে অহংকারে ঘা লাগে বলে আর তো পালাবার সময় নেই। লাগুক-না ঘা, সেটাকে অগ্রাহ্য করেও তোমাকে কর্তব্য করতে হবে। পারবে না মা?"

ললিতা পিতার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "পারব।"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় বিশেষ করিয়া বিনয়ের সম্মুখেই সমস্ত সংকোচ সম্পূর্ণ দূর করিয়া সে যেন একটা অতিরিক্ত বলের সঙ্গে, যেন স্পর্ধা করিয়া নিজের কর্তব্যে প্রবৃত্ত হইল। বিনয় এতদিন তাহার আবৃত্তি শোনে নাই। আজ শুনিয়া আশ্চর্য হইল। এমন সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ— কোথাও কিছুমাত্র জড়িমা নাই, এবং ভাব-প্রকাশের মধ্যে এমন একটা নিঃসংশয় বল যে শুনিয়া বিনয় প্রত্যাশাতীত আনন্দ লাভ করিল। এই কণ্ঠস্বর তাহার কানে অনেক ক্ষণ ধরিয়া বাজিতে লাগিল।

কবিতা-আবৃত্তিতে ভালো আবৃত্তিকারকের সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটা বিশেষ মোহ উৎপন্ন করে। সেই কবিতার ভাবটি তাহার পাঠককে মহিমা দান করে— সেটা যেন তাহার কণ্ঠস্বর তাহার মুখশ্রী তাহার চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হইয়া দেখা দেয়। ফুল যেমন গাছের শাখায় তেমনি কবিতাটিও আবৃত্তিকারকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে বিশেষ সম্পদ দান করে।

ললিতাও বিনয়ের কাছে কবিতায় মণ্ডিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ললিতা এতদিন তাহার তীব্রতার দ্বারা বিনয়কে অনবরত উত্তেজিত করিয়া রাখিয়াছিল। যেখানে ব্যথা সেইখানেই কেবলই যেমন হাত পড়ে, বিনয়ও তেমনি কয়দিন ললিতার উষ্ণ বাক্য এবং তীক্ষ্ণ হাস্য ছাড়া আর-কিছু ভাবিতেই পারে নাই। কেন যে ললিতা এমন করিল, তেমন বলিল, ইহাই তাহাকে বারম্বার আলোচনা করিতে হইয়াছে; ললিতার অসন্তোষের রহস্য যতই সে ভেদ করিতে না পারিয়াছে ততই ললিতার চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে। হঠাৎ ভোরের বেলা ঘুম হইতে জাগিয়া সে কথা তাহার মনে পড়িয়াছে; পরেশবাবুর বাড়িতে আসিবার সময় প্রত্যহই তাহার মনে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, আজ না-জানি ললিতাকে

কিরূপভাবে দেখা যাইবে। যেদিন ললিতা লেশমাত্র প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছে সেদিন বিনয় যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে এবং এই ভাবটি কী করিলে স্থায়ী হয় সেই চিন্তাই করিয়াছে, কিন্তু এমন কোনো উপায় খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার আয়ত্তাধীন।

এ কয়দিনের এই মানসিক আলোড়নের পর ললিতার কাব্য-আবৃত্তির মাধুর্য বিনয়কে বিশেষ করিয়া এবং প্রবল করিয়া বিচলিত করিল। তাহার এত ভালো লাগিল যে, কী বলিয়া প্রশংসা করিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার মুখের সামনে ভালোমন্দ কোনো কথাই বলিতে তাহার সাহস হয় না— কেননা, তাহাকে ভালো বলিলেই যে সে খুশি হইবে মনুষ্যচরিত্রের এই সাধারণ নিয়ম ললিতার সম্বন্ধে না খাটিতে পারে— এমন-কি, সাধারণ নিয়ম বলিয়াই হয়তো খাটিবে না— এই কারণে, বিনয় উচ্ছ্বসিত হৃদয় লইয়া বরদাসুন্দরীর নিকট ললিতার ক্ষমতার অজস্র প্রশংসা করিল। ইহাতে, বিনয়ের বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতি বরদাসুন্দরীর শ্রদ্ধা আরও দৃঢ় হইল।

আর-একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। ললিতা যখনই নিজে অনুভব করিল তাহার আবৃত্তি ও অভিনয় অনিন্দনীয় হইয়াছে, সুগঠিত নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়া যেমন করিয়া চলিয়া যায় সেও যখন তেমনি সুন্দর করিয়া তাহার কর্তব্যের দুরূহতার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তখন হইতে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহার তীব্রতাও দূর হইল। বিনয়কে বিমুখ করিবার জন্য তাহার চেষ্টামাত্র রহিল না। এই কাজটাতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল এবং রিহার্সাল ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে তাহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইল। এমন-কি, আবৃত্তি অথবা অন্য-কিছু সম্বন্ধে বিনয়ের কাছে উপদেশ লইতে তাহার কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না।

ললিতার এই পরিবর্তনে বিনয়ের বুকের উপর হইতে যেন একটা পাথরের বোঝা নামিয়া গেল। এত আনন্দ হইল যে, যখন-তখন আনন্দময়ীর কাছে গিয়া বালকের মতো ছেলেমানুষি করিতে লাগিল। সুচরিতার কাছে বসিয়া অনেক কথা বকিবার জন্য তাহার মনে কথা জমিতে থাকিল, কিন্তু আজকাল

সুচরিতার সঙ্গে তাহার দেখাই হয় না। সুযোগ পাইলেই ললিতার সঙ্গে আলাপ করিতে বসিত, কিন্তু ললিতার কাছে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইয়াই কথা বলিতে হইত; ললিতা যে মনে মনে তাহাকে এবং তাহার সকল কথাকে তীক্ষ্ণভাবে বিচার করে ইহা জানিত বলিয়া ললিতার সম্মুখে তাহার কথার স্রোতে স্বাভাবিক বেগ থাকিত না। ললিতা মাঝে মাঝে বলিত, "আপনি যেন বই পড়ে এসে কথা বলছেন, এমন করে বলেন কেন?"

বিনয় উত্তর করিত, "আমি যে এত বয়স পর্যন্ত কেবল বই পড়েই এসেছি, সেইজন্য মনটা ছাপার বইয়ের মতো হয়ে গেছে।"

ললিতা বলিত, "আপনি খুব ভালো করে বলবার চেষ্টা করবেন না— নিজের কথাটা ঠিক করে বলে যাবেন। আপনি এমন চমৎকার করে বলেন যে আমার সন্দেহ হয়, আপনি আর-কারও কথা ভেবে সাজিয়ে বলছেন।"

এই কারণে স্বাভাবিক ক্ষমতাবশত একটা কথা বেশ সুসজ্জিত হইয়া বিনয়ের মনে আসিলে ললিতাকে বলিবার সময় চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহা সাদা করিয়া এবং স্বল্প করিয়া বলিতে হইত। কোনো একটা অলংকৃত বাক্য তাহার মুখে হঠাৎ আসিলে সে লজ্জিত হইয়া পড়িত।

ললিতার মনের ভিতর হইতে একটা যেন অকারণ মেঘ কাটিয়া গিয়া তাহার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বরদাসুন্দরীও তাহার পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। সে এখন পূর্বের ন্যায় কথায় কথায় আপত্তি প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া বসে না, সকল কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। আগামী অভিনয়ের সাজসজ্জা ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহার মনে প্রত্যহ নানাপ্রকার নূতন নূতন কল্পনার উদয় হইতে লাগিল, তাহাই লইয়া সে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ সম্বন্ধে বরদাসুন্দরীর উৎসাহ যতই বেশি হউক, তিনি খরচের কথাটাও ভাবেন— সেইজন্য, ললিতা যখন অভিনয়-ব্যাপারে বিমুখ ছিল তখনও যেমন তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ ঘটিয়াছিল এখন তাহার উৎসাহিত অবস্থাতেও তেমনি তাঁহার সংকট উপস্থিত হইল। কিন্তু, ললিতার উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তিকে আঘাত করিতেও সাহস হয় না; যে

কাজে সে উৎসাহ বোধ করে সে কাজের কোথাও লেশমাত্র অসম্পূর্ণতা ঘটিলে সে একেবারে দমিয়া যায়, তাহাতে যোগ দেওয়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে।

ললিতা তাহার মনের এই উচ্ছ্বসিত অবস্থায় সুচরিতার কাছে অনেক-বার ব্যগ্র হইয়া গিয়াছে। সুচরিতা হাসিয়াছে, কথা কহিয়াছে বটে, কিন্তু ললিতা তাহার মধ্যে বারম্বার এমন একটা বাধা অনুভব করিয়াছে যে সে মনে মনে রাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

একদিন সে পরেশবাবুর কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, সুচিদিদি যে কোণে বসে বসে বই পড়বে আর আমরা অভিনয় করতে যাব, সে হবে না। ওকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।"

পরেশবাবুও কয়দিন ভাবিতেছিলেন, সুচরিতা তাহার সঙ্গিনীদের নিকট হইতে কেমন যেন দূরবর্তিনী হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থা তাহার চরিত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন। ললিতার কথা শুনিয়া আজ তাঁহার মনে হইল, আমোদ-প্রমোদে সকলের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে সুচরিতার এইরূপ পার্থক্যের ভাব প্রশ্রয় পাইয়া উঠিবে। পরেশবাবু ললিতাকে কহিলেন, "তোমার মাকে বলো গে।"

ললিতা কহিল, "মাকে আমি বলব, কিন্তু সুচিদিদিকে রাজি করবার ভার তোমাকে নিতে হবে।"

পরেশবাবু যখন বলিলেন তখন সুচরিতা আর আপত্তি করিতে পারিল না— সে আপন কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইল।

সুচরিতা কোণ হইতে বাহির হইয়া আসিতেই বিনয় তাহার সহিত পূর্বের ন্যায় আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু এই কয়দিনে কী-একটা হইয়াছে, ভালো করিয়া সুচরিতার যেন নাগাল পাইল না। তাহার মুখশ্রীতে, তাহার দৃষ্টিপাতে এমন একটা সুদূরত্ব প্রকাশ পাইতেছে যে তাহার কাছে অগ্রসর হইতে সংকোচ উপস্থিত হয়। পূর্বেও মেলামেশা ও কাজকর্মের মধ্যে সুচরিতার একটা নির্লিপ্ততা ছিল, এখন সেইটে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া

উঠিয়াছে। সে যে অভিনয়কার্যের অভ্যাসে যোগ দিয়াছিল তাহার মধ্যেও তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় নাই। কাজের জন্য তাহাকে যতটুকু দরকার সেইটুকু সারিয়াই সে চলিয়া যাইত। সুচরিতার এইরূপ দূরত্ব প্রথমে বিনয়কে অত্যন্ত আঘাত দিল। বিনয় মিশুক লোক, যাহাদের সঙ্গে তার সৌহৃদ্য তাহাদের নিকট হইতে কোনোপ্রকার বাধা পাইলে বিনয়ের পক্ষে তাহা অত্যন্ত কঠিন হয়। এই পরিবারে সুচরিতার নিকট হইতেই এতদিন সে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে, এখন হঠাৎ বিনা কারণে প্রতিহত হইয়া বড়োই বেদনা পাইল। কিন্তু, যখন বুঝিতে পারিল, এই একই কারণে সুচরিতার প্রতি ললিতার মনেও অভিমানের উদয় হইয়াছে তখন বিনয় সান্ত্বনালাভ করিল এবং ললিতার সহিত তাহার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইল। তাহার নিকট হইতে সুচরিতাকে এড়াইয়া চলিবার অবকাশও সে দিল না, সে আপনিই সুচরিতার নিকট-সংস্রব পরিত্যাগ করিল এবং এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে সুচরিতা বিনয়ের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গেল।

এবারে কয়দিন গোরা উপস্থিত না থাকাতে বিনয় অত্যন্ত অবাধে পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে সকল রকম করিয়া মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল। বিনয়ের স্বভাব এইরূপ অবারিতভাবে প্রকাশ পাওয়াতে পরেশবাবুর বাড়ির সকলেই একটা বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিল। বিনয়ও নিজের এইরূপ বাধামুক্ত স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দ পাইল এমন আর কখনো পায় নাই। তাহাকে যে ইঁহাদের সকলেরই ভালো লাগিতেছে, ইহাই অনুভব করিয়া তাহার ভালো লাগাইবার শক্তি আরও বাড়িয়া উঠিল।

প্রকৃতির এই প্রসারণের সময়ে, নিজেকে স্বতন্ত্র শক্তিতে অনুভব করিবার দিনে, বিনয়ের কাছ হইতে সুচরিতা দূরে চলিয়া গেল। এই ক্ষতি, এই আঘাত, অন্য সময় হইলে দুঃসহ হইত, কিন্তু এখন সেটা সে সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্য এই যে, ললিতাও সুচরিতার ভাবান্তর উপলক্ষ করিয়া তাহার প্রতি পূর্বের ন্যায় অভিমান প্রকাশ করে নাই। আবৃত্তি ও অভিনয়ের উৎসাহই কি তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল?

এ দিকে সুচরিতাকে অভিনয়ে যোগ দিতে দেখিয়া হঠাৎ হারানবাবুও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তিনি 'প্যারাডাইস লস্ট্' হইতে এক অংশ আবৃত্তি করিবেন এবং ড্রাইডেনের কাব্য-আবৃত্তির ভূমিকা-স্বরূপে সংগীতের মোহিনীশক্তি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিবেন বলিয়া স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে বরদাসুন্দরী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, ললিতাও সন্তুষ্ট হইল না। হারানবাবু নিজে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া এই প্রস্তাব পূর্বেই পাকা করিয়া আসিয়াছিলেন। ললিতা যখন বলিল ব্যাপারটাকে এত সুদীর্ঘ করিয়া তুলিলে ম্যাজিস্ট্রেট হয়তো আপত্তি করিবেন, তখন হারানবাবু পকেট হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্র বাহির করিয়া ললিতার হাতে দিয়া তাহাকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন।

গোরা বিনা কাজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, কবে ফিরিবে তাহা কেহ জানিত না। যদিও সুচরিতা এ সম্বন্ধে কোনো কথা মনে স্থান দিবে না ভাবিয়াছিল, তবু প্রতিদিনই তাহার মনের ভিতরে আশা জন্মিত যে আজ হয়তো গোরা আসিবে। এ আশা কিছুতেই সে মন হইতে দমন করিতে পারিত না। গোরার ঔদাসীন্য এবং নিজের মনের এই অবাধ্যতায় যখন সে নিরতিশয় পীড়া বোধ করিতেছিল, যখন কোনোমতে এই জাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় হারানবাবু একদিন বিশেষভাবে ঈশ্বরের নাম করিয়া সুচরিতার সহিত তাহার সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য পরেশবাবুকে পুনর্বার অনুরোধ করিলেন। পরেশবাবু কহিলেন, "এখনো তো বিবাহের বিলম্ব আছে, এত শীঘ্র আবদ্ধ হওয়া কি ভালো?"

হারানবাবু কহিলেন, "বিবাহের পূর্বে কিছুকাল এই আবদ্ধ অবস্থায় যাপন করা উভয়ের মনের পরিণতির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক বলে মনে করি। প্রথম পরিচয় এবং বিবাহের মাঝখানে এইরকম একটা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, যাতে সাংসারিক দায়িত্ব নেই অথচ বন্ধন আছে— এটা বিশেষ উপকারী।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, সুচরিতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

হারানবাবু কহিলেন, "তিনি তো পূর্বেই মত দিয়েছেন।"

হারানবাবুর প্রতি সুচরিতার মনের ভাব সম্বন্ধে পরেশবাবুর এখনো সন্দেহ ছিল, তাই তিনি নিজে সুচরিতাকে ডাকিয়া তাহার নিকট হারানবাবুর প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সুচরিতা নিজের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকে একটা কোথাও চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করিতে পারিলে বাঁচে— তাই সে এমন অবিলম্বে এবং নিশ্চিতভাবে সম্মতি দিল যে, পরেশবাবুর সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া গেল। বিবাহের এত পূর্বে আবদ্ধ হওয়া কর্তব্য কি না তাহা তিনি ভালোরূপ বিবেচনা করিবার জন্য সুচরিতাকে অনুরোধ করিলেন— তৎসত্ত্বেও সুচরিতা এ প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

ব্রাউন্‌লো সাহেবের নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিয়া একটি বিশেষ দিনে সকলকে ডাকিয়া ভাবী দম্পতির সম্বন্ধ পাকা করা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

সুচরিতার ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, তাহার মন যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে। সে মনে মনে স্থির করিল, হারানবাবুকে বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজে যোগ দিবার জন্য সে মনকে কঠোরভাবে প্রস্তুত করিবে। হারানবাবুর নিকট হইতেই সে প্রত্যহ খানিকটা করিয়া ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরেজি বই পড়িয়া তাঁহারই নির্দেশমত চলিতে থাকিবে, এইরূপ সংকল্প করিল। তাহার পক্ষে যাহা দুরূহ, এমন-কি অপ্রিয়, তাহাই গ্রহণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সে মনের মধ্যে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিল।

হারানবাবুর সম্পাদিত ইংরেজি কাগজ কিছুকাল ধরিয়া সে পড়ে নাই। আজ সেই কাগজ ছাপা হইবা মাত্র তাহা হাতে আসিয়া পড়িল। বোধ করি হারানবাবু বিশেষ করিয়াই পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সুচরিতা কাগজখানি ঘরে লইয়া গিয়া স্থির হইয়া বসিয়া পরম কর্তব্যের মতো তাহার প্রথম লাইন হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল। শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে নিজেকে ছাত্রীর মতো জ্ঞান করিয়া এই পত্রিকা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

জাহাজ পালে চলিতে চলিতে হঠাৎ পাহাড়ে ঠেকিয়া কাত হইয়া পড়িল।

এই সংখ্যায় 'সেকেলে বায়ুগ্রস্ত' -নামক একটি প্রবন্ধ আছে, তাহাতে, বর্তমান কালের মধ্যে বাস করিয়াও যাহারা সেকালের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। যুক্তিগুলি যে অসংগত তাহা নহে, বস্তুত এরূপ যুক্তি সুচরিতা সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু প্রবন্ধটি পড়িবা মাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে এই আক্রমণের লক্ষ্য গোরা। অথচ তাহার নাম নাই, অথবা তাহার লিখিত কোনো প্রবন্ধের উল্লেখ নাই। বন্দুকের প্রত্যেক গুলির দ্বারা একটা করিয়া মানুষ মারিয়া সৈনিক যেমন খুশি হয়, এই প্রবন্ধের প্রত্যেক বাক্যে তেমনি কোনো-একটি সজীব পদার্থ বিদ্ধ হইতেছে বলিয়া যেন একটা হিংসার আনন্দ ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই প্রবন্ধ সুচরিতার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহার প্রত্যেক যুক্তি প্রতিবাদের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে তাহার ইচ্ছা হইল। সে মনে মনে কহিল, 'গৌরমোহনবাবু যদি ইচ্ছা করেন তবে এই প্রবন্ধকে তিনি ধুলায় লুটাইয়া দিতে পারেন।' গোরার উজ্জ্বল মুখ তাহার চোখের সামনে জ্যোতির্ময় হইয়া জাগিয়া উঠিল এবং তাহার প্রবল কণ্ঠস্বর সুচরিতার বুকের ভিতর পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই মুখের ও বাক্যের অসামান্যতার কাছে এই প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের ক্ষুদ্রতা এমনই তুচ্ছ হইয়া উঠিল যে সুচরিতা কাগজখানাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল।

অনেক কাল পরে সুচরিতা আপনি সেদিন বিনয়ের কাছে আসিয়া বসিল এবং তাহাকে কথায় কথায় বলিল, "আচ্ছা, আপনি যে বলেছিলেন যে-সব কাগজে আপনাদের লেখা বেরিয়েছে আমাকে পড়তে এনে দেবেন, কই দিলেন না?"

বিনয় এ কথা বলিল না যে ইতিমধ্যে সুচরিতার ভাবান্তর দেখিয়া সে আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহস করে নাই— সে কহিল, "আমি সেগুলো একত্র সংগ্রহ করে রেখেছি, কালই এনে দেব।"

বিনয় পরদিন পুস্তিকা ও কাগজের এক পুঁটলি আনিয়া সুচরিতাকে দিয়া গেল। সুচরিতা সেগুলি হাতে পাইয়া আর পড়িল না, বাক্সের মধ্যে

রাখিয়া দিল। পড়িতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিল বলিয়াই পড়িল না। চিত্তকে কোনোমতেই বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের বিদ্রোহী চিত্তকে পুনর্বার হারানবাবুর শাসনাধীনে সমর্পণ করিয়া আর-একবার সে সান্ত্বনা অনুভব করিল।

২৫

রবিবার দিন সকালে আনন্দময়ী পান সাজিতেছিলেন, শশিমুখী তাঁহার পাশে বসিয়া সুপারি কাটিয়া স্তূপাকার করিতেছিল। এমন সময় বিনয় আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই শশিমুখী তাহার কোলের আঁচল হইতে সুপারি ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। আনন্দময়ী একটুখানি মুচকিয়া হাসিলেন।

বিনয় সকলেরই সঙ্গে ভাব করিয়া লইতে পারিত। শশিমুখীর সঙ্গে এতদিন তাহার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। উভয় পক্ষেই পরস্পরের প্রতি খুব উপদ্রব চলিত। শশিমুখী বিনয়ের জুতা লুকাইয়া রাখিয়া তাহার নিকট হইতে গল্প আদায় করিবার উপায় বাহির করিয়াছিল। বিনয় শশিমুখীর জীবনের দুই-একটা সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহাতে যথেষ্ট রঙ ফলাইয়া দুই-একটা গল্প বানাইয়া রাখিয়াছিল। তাহারই অবতারণা করিলে শশিমুখী বড়োই জব্দ হইত। প্রথমে সে বক্তার প্রতি মিথ্যাভাষণের অপবাদ দিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করিত; তাহাতে হার মানিলে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিত। সেও বিনয়ের জীবনচরিত বিকৃত করিয়া পাল্‌টা গল্প বানাইবার চেষ্টা করিয়াছে— কিন্তু, রচনাশক্তিতে সে বিনয়ের সমকক্ষ না হওয়াতে এ সম্বন্ধে বড়ো-একটা সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, বিনয় এ বাড়িতে আসিলেই সব কাজ ফেলিয়া শশিমুখী তাহার সঙ্গে গোলমাল করিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। এক-একদিন এত উৎপাত করিত যে আনন্দময়ী তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। কিন্তু দোষ তো

তাহার একলার ছিল না, বিনয় তাহাকে এমনি উত্তেজিত করিয়া তুলিত যে, আত্মসম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। সেই শশিমুখী আজ যখন বিনয়কে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল তখন আনন্দময়ী হাসিলেন, কিন্তু সে হাসি সুখের হাসি নহে।

বিনয়কেও এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এমন আঘাত করিল যে, সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনয়ের পক্ষে শশিমুখীকে বিবাহ করা যে কতখানি অসংগত তাহা এইরূপ ছোটোখাটো ব্যাপারেই ফুটিয়া উঠে। বিনয় যখন সম্মতি দিয়াছিল তখন সে কেবল গোরার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্বের কথাই চিন্তা করিয়াছিল, ব্যাপারটাকে কল্পনার দ্বারা অনুভব করে নাই। তা ছাড়া, আমাদের দেশে বিবাহটা যে প্রধানত ব্যক্তিগত নহে, তাহা পারিবারিক, এই কথা লইয়া বিনয় গৌরব করিয়া কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছে; নিজেও এ সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা বিতৃষ্ণাকে মনে স্থানও দেয় নাই। আজ শশিমুখী যে বিনয়কে দেখিয়া আপনার বর বলিয়া জিব কাটিয়া পলাইয়া গেল, ইহাতে শশিমুখীর সঙ্গে তাহার ভাবী সম্বন্ধের একটা চেহারা তার কাছে দেখা দিল। মুহূর্তের মধ্যেই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। গোরা যে তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাহাকে কতদূর পর্যন্ত লইয়া যাইতেছিল ইহা মনে করিয়া গোরার উপরে তাহার রাগ হইল, নিজের উপরে ধিক্‌কার জন্মিল, এবং আনন্দময়ী যে প্রথম হইতেই এই বিবাহে নিষেধ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম-দর্শিতায় তাঁহার প্রতি বিনয়ের মন বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী বিনয়ের মনের ভাবটা বুঝিলেন। তিনি অন্য দিকে তাহার মনকে ফিরাইবার জন্য বলিলেন, "কাল গোরার চিঠি পেয়েছি বিনয়।"

বিনয় একটু অন্যমনস্ক ভাবেই কহিল, "কী লিখেছে?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "নিজের খবর বড়ো-একটা কিছু দেয় নি। দেশের ছোটোলোকদের দুর্দশা দেখে দুঃখ করে লিখেছে। ঘোষপাড়া ব'লে কোন্‌-এক গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট কী-সব অন্যায় করেছে তারই বর্ণনা করেছে।"

গোরার প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজনা হইতেই অসহিষ্ণু হইয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, "গোরার ওই পরের দিকেই দৃষ্টি, আর আমরা সমাজের বুকের উপরে বসে প্রতিদিন যে-সব অত্যাচার করছি তা কেবলই মার্জনা করতে হবে আর বলতে হবে, এমন সৎকর্ম আর-কিছু হতে পারে না!"

হঠাৎ গোরার উপরে এইরূপ দোষারোপ করিয়া বিনয় যেন অন্য পক্ষ বলিয়া নিজেকে দাঁড় করাইল দেখিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন।

বিনয় কহিল, "মা, তুমি হাসছ, মনে করছ, হঠাৎ বিনয় এমন রাগ করে উঠল কেন। কেন রাগ হয় তোমাকে বলি। সুধীর সেদিন আমাকে তাদের নৈহাটি স্টেশনে তার এক বন্ধুর বাগানে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা শেয়ালদা ছাড়তেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। সোদপুর স্টেশনে যখন গাড়ি থামল দেখি, একটি সাহেবি-কাপড়-পরা বাঙালি নিজে মাথায় দিব্যি ছাতা দিয়ে তার স্ত্রীকে গাড়ি থেকে নাবালে। স্ত্রীর কোলে একটি শিশু ছেলে; গায়ের মোটা চাদরটা দিয়ে সেই ছেলেটিকে কোনোমতে ঢেকে খোলা স্টেশনের এক ধারে দাঁড়িয়ে সে বেচারি শীতে ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভিজতে লাগল— তার স্বামী জিনিসপত্র নিয়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁকডাক বাধিয়ে দিলে। আমার এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, সমস্ত বাংলাদেশে কি রৌদ্রে কি বৃষ্টিতে, কি ভদ্র কি অভদ্র, কোনো স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা নেই। যখন দেখলুম স্বামীটা নির্লজ্জভাবে মাথায় ছাতা দিয়েছে আর তার স্ত্রী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে নীরবে ভিজছে, এই ব্যবহারটাকে মনে মনেও নিন্দা করছে না এবং স্টেশনসুদ্ধ কোনো লোকের মনে এটা কিছুমাত্র অন্যায় বলে বোধ হচ্ছে না, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি— আমরা স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত সমাদর করি, তাহাদের লক্ষ্মী ব'লে দেবী ব'লে জানি, এ-সমস্ত অলীক কাব্যকথা আর কোনো দিন মুখেও উচ্চারণ করব না। আমরা দেশকে বলি মাতৃভূমি, কিন্তু দেশের সেই নারীমূর্তির মহিমা দেশের স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি প্রত্যক্ষ না করি, বুদ্ধিতে শক্তিতে কর্তব্যবোধের ঔদার্যে আমাদের মেয়েদের যদি পূর্ণ পরিণত সতেজ সরল ভাবে আমরা না দেখি, ঘরের মধ্যে দুর্বলতা

সংকীর্ণতা এবং অপরিণতি যদি দেখতে পাই, তা হলে কখনোই দেশের উপলব্ধি আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।”

নিজের উৎসাহে হঠাৎ লজ্জিত হইয়া বিনয় স্বাভাবিক স্বরে কহিল, “মা, তুমি ভাবছ, বিনয় মাঝে মাঝে এইরকম বড়ো বড়ো কথায় বক্তৃতা করে থাকে— আজও তাকে বক্তৃতায় পেয়েছে। অভ্যাসবশত আমার কথাগুলো বক্তৃতার মতো হয়ে পড়ে, আজ এ আমার কিন্তু বক্তৃতা নয়। দেশের মেয়েরা যে দেশের কতখানি আগে আমি তা ভালো করে বুঝতেই পারি নি, কখনো চিন্তাও করি নি। মা, আর বেশি বকব না। আমি বেশি কথা কই ব'লে আমার কথাকে কেউ আমারই মনের কথা বলে বিশ্বাস করে না। এবার থেকে কথা কমাব।”

বলিয়া বিনয় আর বিলম্ব না করিয়া উৎসাহদীপ্ত চিত্তে প্রস্থান করিল।

আনন্দময়ী মহিমকে ডাকাইয়া বলিলেন, “বাবা, বিনয়ের সঙ্গে আমাদের শশিমুখীর বিবাহ হবে না।”

মহিম। কেন ? তোমার অমত আছে ?

আনন্দময়ী। এ সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না বলেই আমার অমত, নইলে অমত করব কেন ?

মহিম। গোরা রাজি হয়েছে, বিনয়ও রাজি, তবে টিঁকবে না কেন ? অবশ্য, তুমি যদি মত না দাও তা হলে বিনয় এ কাজ করবে না, সে আমি জানি।

আনন্দময়ী। আমি বিনয়কে তোমার চেয়ে ভালো জানি।

মহিম। গোরার চেয়েও ?

আনন্দময়ী। হাঁ, গোরার চেয়েও ভালো জানি, সেইজন্যেই সকল দিক ভেবে আমি মত দিতে পারছি নে।

মহিম। আচ্ছা, গোরা ফিরে আসুক।

আনন্দময়ী। মহিম, আমার কথা শোনো। এ নিয়ে যদি বেশি পীড়াপীড়ি কর তা হলে শেষকালে একটা গোলমাল হবে। আমার ইচ্ছা নয় যে, গোরা

বিনয়কে এ নিয়ে কোনো কথা বলে।

"আচ্ছা, দেখা যাবে" বলিয়া মহিম মুখে একটা পান লইয়া রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

২৬

গোরা যখন ভ্রমণে বাহির হইল তখন তাহার সঙ্গে অবিনাশ মতিলাল বসন্ত এবং রমাপতি এই চারজন সঙ্গী ছিল। কিন্তু, গোরার নির্দয় উৎসাহের সঙ্গে তাহারা তাল রাখিতে পারিল না। অবিনাশ এবং বসন্ত অসুস্থ শরীরের ছুতা করিয়া চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। নিতান্তই গোরার প্রতি ভক্তিবশত মতিলাল ও রমাপতি তাহাকে একলা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু, তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না; কারণ, গোরা চলিয়াও শ্রান্ত হয় না, আবার কোথাও স্থির হইয়া বাস করিতেও তাহার বিরক্তি নাই। গ্রামের যে-কোনো গৃহস্থ গোরাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিয়া ঘরে রাখিয়াছে— তাহার বাড়িতে আহার ব্যবহারের যতই অসুবিধা হউক দিনের পর দিন সে কাটাইয়াছে। তাহার আলাপ শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রামের লোক তাহার চারি দিকে সমাগত হইত, তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না।

ভদ্রসমাজ শিক্ষিতসমাজ ও কলিকাতা-সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ গোরা তাহা এই প্রথম দেখিল। এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল, সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত, পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত, তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কার-মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন, তাহার মন যে কতই সুপ্ত,

প্রাণ যে কতই স্বল্প, চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ— তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনোমতেই কল্পনা করিতে পারিত না। গোরা গ্রামে বাস করিবার সময় একটা পাড়ায় আগুন লাগিয়াছিল। এত বড়ো একটা সংকটেও সকলে দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদের বিরুদ্ধে কাজ করিবার শক্তি যে তাহাদের কত অল্প তাহা দেখিয়া গোরা আশ্চর্য হইয়া গেল। সকলেই গোলমাল দৌড়াদৌড়ি কান্নাকাটি করিতে লাগিল, কিন্তু বিধিবদ্ধভাবে কিছুই করিতে পারিল না। সে পাড়ার নিকটে জলাশয় ছিল না। মেয়েরা দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া ঘরের কাজ চালায়; অথচ প্রতি দিনেরই সেই অসুবিধা লাঘব করিবার জন্য ঘরে একটা স্বল্পব্যয়ে কূপ খনন করিয়া রাখে, সংগতিপন্ন লোকেরও সে চিন্তাই ছিল না। পূর্বেও এ পাড়ায় মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়াছে; তাহাকে দৈবের উৎপাত বলিয়াই সকলে নিরুদ্যম হইয়া আছে, নিকটে কোনোপ্রকার জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের কোনোরূপ চেষ্টাই জন্মে নাই। পাড়ার নিতান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধেও যাহাদের বোধশক্তি এমন আশ্চর্য অসাড় তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের আলোচনা করা গোরার কাছে বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। সকলের চেয়ে গোরার কাছে আশ্চর্য এই লাগিল যে, মতিলাল ও রমাপতি এই-সমস্ত দৃশ্যে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না, বরঞ্চ গোরার ক্ষোভকে তাহারা অসংগত বলিয়াই মনে করিত। ছোটোলোকেরা তো এই রকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে, এই-সকল কষ্টকে তাহারা কষ্টই মনে করে না; ছোটোলোকদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ংকর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না, এই কথা আজ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া গোরার চিত্ত রাত্রিদিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিল।

মতিলাল বাড়ি হইতে পীড়ার সংবাদ পাইয়াছে বলিয়া বিদায় হইল;

গোরার সঙ্গে কেবল রমাপতি অবশিষ্ট রহিল।

উভয়ে চলিতে চলিতে এক জায়গায় নদীর চরে এক মুসলমানপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আতিথ্যগ্রহণের প্রত্যাশায় খুঁজিতে খুঁজিতে সমস্ত গ্রামের মধ্যে কেবল একটি ঘর মাত্র হিন্দু নাপিতের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই ব্রাহ্মণ তাহারই ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ নাপিত ও তাহার স্ত্রী একটি মুসলমানের ছেলেকে পালন করিতেছে। রমাপতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সে তো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গোরা নাপিতকে তাহার অনাচারের জন্য ভর্ৎসনা করাতে সে কহিল, "ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাত নেই।"

তখন রৌদ্র প্রখর হইয়াছে, বিস্তীর্ণ বালুচর, নদী বহুদূর। রমাপতি পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া কহিল, "হিন্দুর পানীয় জল পাই কোথায় ?"

নাপিতের ঘরে একটা কাঁচা কূপ আছে— কিন্তু, ভ্রষ্টাচারের সে কূপ হইতে রমাপতি জল খাইতে না পারিয়া মুখ বিমর্ষ করিয়া বসিয়া রহিল।

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছেলের কি মা-বাপ নাই ?"

নাপিত কহিল, "দুই আছে, কিন্তু না থাকারই মতো।"

গোরা কহিল, "সে কিরকম ?"

নাপিত যে ইতিহাসটা বলিল, তাহার মর্ম এই।—

যে জমিদারিতে ইহারা বাস করিতেছে তাহা নীলকর সাহেবদের ইজারা। চরে নীলের জমি লইয়া প্রজাদের সহিত নীলকুঠির বিরোধের অন্ত নাই। অন্য-সমস্ত প্রজা বশ মানিয়াছে, কেবল এই চর-ঘোষপুরের প্রজাদিগকে সাহেবরা শাসন করিয়া বাধ্য করিতে পারে নাই। এখানকার প্রজারা সমস্তই মুসলমান এবং ইহাদের প্রধান ফরুসর্দার কাহাকেও ভয় করে না। নীলকুঠির উৎপাত-উপলক্ষে দুইবার পুলিসকে ঠেঙাইয়া সে জেল খাটিয়া আসিয়াছে; তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে তাহার ঘরে ভাত নাই বলিলেই হয়, কিন্তু সে কিছুতেই দমিতে জানে না। এবারে নদীর কাঁচি চরে চাষ দিয়া এ গ্রামের লোকেরা কিছু বোরো ধান পাইয়াছিল— আজ মাস-

খানেক হইল, নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং আসিয়া লাঠিয়াল-সহ প্রজার ধান লুট করে। সেই উৎপাতের সময় ফরুসর্দার সাহেবের ডান হাতে এমন এক লাঠি বসাইয়াছিল যে, ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া তাহার সেই হাত কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এত বড়ো দুঃসাহসিক ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখনো হয় নাই। ইহার পর হইতে পুলিসের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মতো লাগিয়াছে— প্রজাদের কাহারও ঘরে কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না, ফরুসর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে, গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন; এমন-কি তাহার পরনের একখানিমাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না; তাহার একমাত্র বালক-পুত্র তমিজ নাপিতের স্ত্রীকে গ্রামসম্পর্কে মাসি বলিয়া ডাকিত, সে খাইতে পায় না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া পালন করিতেছে। নীলকুঠির একটা কাছারি ক্রোশ-দেড়েক তফাতে, দারোগা এখনো তাহার দলবল লইয়া সেখানে আছে, তদন্ত উপলক্ষে গ্রামে যে কখন আসে এবং কী করে তাহার ঠিকানা নাই। গতকল্য নাপিতের প্রতিবেশী বৃদ্ধ নাজিমের ঘরে পুলিসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নাজিমের এক যুবক শ্যালক, ভিন্ন এলেকা হইতে তাহার ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল— দারোগা নিতান্তই বিনা কারণে 'বেটা তো জোয়ান কম নয়। দেখেছ বেটার বুকের ছাতি!' বলিয়া হাতের লাঠিটা দিয়া তাহাকে এমন একটা খোঁচা মারিল যে, তাহার দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তাহার ভগিনী এই অত্যাচার দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেই সেই বৃদ্ধাকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। পূর্বে পুলিস এ পাড়ায় এমনতরো উপদ্রব করিতে সাহস করিত না, কিন্তু এখন পাড়ার বলিষ্ঠ যুবাপুরুষমাত্রই হয় গ্রেফ্‌তার নয় পলাতক হইয়াছে। সেই পলাতকদিগকে সন্ধানের উপলক্ষ করিয়াই পুলিস গ্রামকে এখনো শাসন করিতেছে। কবে এ গ্রহ কাটিয়া যাইবে তাহা কিছুই বলা যায় না।

গোরা তো উঠিতে চায় না, ও দিকে রমাপতির প্রাণ বাহির হইতেছে।

সে নাপিতের মুখের ইতিবৃত্ত শেষ না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "হিন্দুর পাড়া কত দূরে আছে ?"

নাপিত কহিল, "ক্রোশ-দেড়েক দূরে যে নীলকুঠির কাছারি, তার তহসিলদার ব্রাহ্মণ, নাম মাধব চাটুজ্জে।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "স্বভাবটা ?"

নাপিত কহিল, "যমদূত বললেই হয়। এত বড়ো নির্দয় অথচ কৌশলী লোক আর দেখা যায় না। এই যে-ক'দিন দারোগাকে ঘরে পুষছে তার সমস্ত খরচা আমাদেরই কাছ থেকে আদায় করবে— তাতে কিছু মুনফাও থাকবে।"

রমাপতি কহিল, "গৌরবাবু, চলুন, আর তো পারা যায় না।"

বিশেষত নাপিত-বউ যখন মুসলমান ছেলেটিকে তাহাদের প্রাঙ্গণের কুয়াটার কাছে দাঁড় করাইয়া ঘটিতে করিয়া জল তুলিয়া স্নান করাইয়া দিতে লাগিল তখন তাহার মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল এবং এ বাড়িতে বসিয়া থাকিতে তাহার প্রবৃত্তিই হইল না।

গোরা যাইবার সময় নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই উৎপাতের মধ্যে তুমি যে এ পাড়ায় এখনো টিঁকে আছ ? আর-কোথাও তোমার আত্মীয় কেউ নেই ?"

নাপিত কহিল, "অনেক দিন আছি, এদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আমি হিন্দু নাপিত, আমার জোতজমা বিশেষ কিছু নেই বলে কুঠির লোক আমার গায়ে হাত দেয় না। আজ এ পাড়ায় পুরুষ বলতে আর বড়ো-কেউ নেই, আমি যদি যাই তা হলে মেয়েগুলো ভয়েই মারা যাবে।"

গোরা কহিল, "আচ্ছা, খাওয়াদাওয়া করে আবার আমি আসব।"

দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণার সময় এই নীলকুঠির উৎপাতের সুদীর্ঘ বিবরণে রমাপতি গ্রামের লোকের উপরেই চটিয়া গেল। বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে চায়, ইহা গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্ধা ও নির্বুদ্ধিতার চরম বলিয়া তাহার কাছে মনে হইল। যথোচিত শাসনের দ্বারা ইহাদের এই ঔদ্ধত্য

চূর্ণ হইলেই যে ভালো হয়, ইহাতে তাহার সন্দেহ ছিল না। এই প্রকারের লক্ষ্মীছাড়া বেটাদের প্রতি পুলিসের উৎপাত ঘটিয়াই থাকে, এবং ঘটিতেই বাধ্য, এবং ইহারাই সেজন্য প্রধানত দায়ী— এইরূপ তাহার ধারণা। মনিবের সঙ্গে মিটমাট করিয়া লইলেই তো হয়, ফেসাদ বাধাইতে যায় কেন, তেজ এখন রহিল কোথায়। বস্তুত রমাপতির অন্তরের সহানুভূতি নীলকুঠির সাহেবের প্রতিই ছিল।

মধ্যাহ্নরৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া চলিতে চলিতে গোরা সমস্ত পথ একটি কথাও বলিল না। অবশেষে গাছপালার ভিতর হইতে কাছারিবাড়ির চালা যখন কিছুদূর হইতে দেখা গেল তখন হঠাৎ গোরা থামিয়া কহিল, "রমাপতি, তুমি খেতে যাও, আমি সেই নাপিতের বাড়ি চললুম।"

রমাপতি কহিল, "সে কী কথা! আপনি খাবেন না? চাটুজ্জের ওখানে খাওয়াদাওয়া করে তার পরে যাবেন।"

গোরা কহিল, "আমার কর্তব্য আমি করব, এখন তুমি খাওয়াদাওয়া সেরে কলকাতায় চলে যেয়ো— ওই ঘোষপুর চরে আমাকে বোধ হয় কিছু দিন থেকে যেতে হবে— তুমি সে পারবে না।"

রমাপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গোরার মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দু ওই ম্লেচ্ছের ঘরে বাস করিবার কথা কোন্ মুখে উচ্চারণ করিল তাই সে ভাবিয়া পাইল না। গোরা কি পান ভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রায়োপবেশনের সংকল্প করিয়াছে, তাই সে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু, তখন ভাবিবার সময় নহে, এক-এক মুহূর্ত তাহার কাছে এক-এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে; গোরার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়নের জন্য তাহাকে অধিক অনুরোধ করিতে হইল না। ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটি খর্ব ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্জের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে, এ কথা যতই

চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ-চোখ লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, 'পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা একি ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে, আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে! যাই হউক, এই আচারবিচারে ভালোমন্দের কথা পরে ভাবিব, কিন্তু এখন তো পারিলাম না।'

নাপিত গোরাকে একলা ফিরিতে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। গোরা প্রথমে আসিয়া নাপিতের ঘটি নিজের হাতে ভালো করিয়া মাজিয়া কূপ হইতে জল তুলিয়া খাইল, এবং কহিল, "ঘরে যদি কিছু চাল ডাল থাকে তো দাও, আমি রাঁধিয়া খাইব।"

নাপিত ব্যস্ত হইয়া রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিল। গোরা আহার সারিয়া কহিল, "আমি তোমার এখানে দু-চার দিন থাকব।"

নাপিত ভয় পাইয়া হাত জোড় করিয়া কহিল, "আপনি এই অধমের এখানে থাকবেন, তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর-কিছুই নেই। কিন্তু, দেখুন, আমাদের উপরে পুলিসের দৃষ্টি পড়েছে, আপনি থাকলে কী ফেসাদ ঘটবে তা বলা যায় না।"

গোরা কহিল, "আমি এখানে উপস্থিত থাকলে পুলিস কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে না। যদি করে আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

নাপিত কহিল, "দোহাই আপনার, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তা হলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। ও বেটারা ভাববে, আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করে দিয়েছি। এতদিন কোনোপ্রকারে টিঁকে ছিলুম, আর টিঁকতে পারব না। আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠতে হয় তা হলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে।"

গোরা চিরদিন শহরে থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে, নাপিত কেন যে এত ভয় পাইতেছে তাহা তাহার পক্ষে বুঝিতে পারাই শক্ত। সে জানিত, ন্যায়ের পক্ষে জোর করিয়া দাঁড়াইলেই অন্যায়ের প্রতিকার হয়। বিপন্ন গ্রামকে অসহায় রাখিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার কর্তব্যবুদ্ধি সম্মত হইল না। তখন নাপিত তাহার পায়ে ধরিয়া কহিল, "দেখুন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার পুণ্যবলে আমার বাড়িতে অতিথি হয়েছেন, আপনাকে যেতে বলছি এতে আমার অপরাধ হচ্ছে। কিন্তু, আমাদের প্রতি আপনার দয়া আছে জেনেই বলছি, আপনি আমার এই বাড়িতে বসে পুলিসের অত্যাচারে যদি কোনো বাধা দেন তা হলে আমাকে বড়োই বিপদে ফেলবেন।"

নাপিতের এই ভয়কে অমূলক কাপুরুষতা মনে করিয়া গোরা কিছু বিরক্ত হইয়াই অপরাহ্নে তাহার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল। এই ম্লেচ্ছাচারীর ঘরে আহারাদি করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনের মধ্যে একটা অপ্রসন্নতাও জন্মিতে লাগিল। ক্লান্তশরীরে এবং উত্ত্যক্তচিত্তে সন্ধ্যার সময়ে সে নীলকুঠির কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আহার সারিয়া রমাপতি কলিকাতায় রওনা হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই, তাই সেখানে তাহার দেখামাত্র পাওয়া গেল না। মাধব চাটুজ্জে বিশেষ খাতির করিয়া গোরাকে আতিথ্যে আহ্বান করিল। গোরা একেবারেই আগুন হইয়া উঠিয়া কহিল, "আপনার এখানে আমি জলগ্রহণও করব না।"

মাধব বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গোরা তাহাকে অন্যায়কারী অত্যাচারী বলিয়া কটূক্তি করিল, এবং আসন গ্রহণ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দারোগা তক্তপোশে বসিয়া তাকিয়া আশ্রয় করিয়া গুড়গুড়িতে তামাক টানিতেছিল; সে খাড়া হইয়া বসিল এবং রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়?"

গোরা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া কহিল, "তুমি দারোগা বুঝি? তুমি ঘোষপুরের চরে যে-সমস্ত উৎপাত করেছ আমি তার সমস্ত খবর নিয়েছি। এখনো যদি সাবধান না হও তা হলে—"

দারোগা। ফাঁসি দেবে নাকি? তাই তো, লোকটা কম নয় তো দেখছি। ভেবেছিলেম ভিক্ষে নিতে এসেছে, এ যে চোখ রাঙায়! ওরে তেওয়ারি!

মাধব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দারোগার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আরে কর কী— ভদ্রলোক— অপমান কোরো না।"

দারোগা গরম হইয়া কহিল, "কিসের ভদ্রলোক! উনি যে তোমাকে যা খুশি তাই বললেন সেটা বুঝি অপমান নয়!"

মাধব কহিল, "যা বলেছেন সে তো মিথ্যে বলেন নি, তা রাগ করলে চলবে কী করে? নীলকুঠির সাহেবের গোমস্তাগিরি করে খাই, তার চেয়ে আর তো কিছু বলবার দরকার করে না। রাগ কোরো না দাদা— তুমি যে পুলিসের দারোগা, তোমাকে যমের পেয়াদা বললে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে তো জানা কথা। কী করবে, তাকে তো খেতে হবে।"

বিনা প্রয়োজনে মাধবকে রাগ প্রকাশ করিতে কেহ কোনোদিন দেখে নাই। কোন্ মানুষের দ্বারা কখন কী কাজ পাওয়া যায়, অথবা বক্র হইলে কাহার দ্বারা কী অপকার হইতে পারে, তাহা বলা যায় কি? কাহারও অনিষ্ট বা অপমান সে খুব হিসাব করিয়াই করিত— রাগ করিয়া পরকে আঘাত করিবার ক্ষমতার বাজে খরচ করিত না।

দারোগা তখন গোরাকে কহিল, "দেখো বাপু, আমরা এখানে সরকারের কাজ করতে এসেছি— এতে যদি কোনো কথা বল বা গোলমাল কর তা হলে মুশকিলে পড়বে।"

গোরা কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাধব তাড়াতাড়ি তাহার পশ্চাতে গিয়া কহিল, "মশায়, যা বলেছেন সে কথাটা ঠিক— আমাদের এ কসাইয়ের কাজ— আর ওই-যে বেটা দারোগা দেখছেন ওর সঙ্গে এক বিছানায় বসলে পাপ হয়— ওকে দিয়ে কত যে দুষ্কর্ম করিয়েছি তা মুখে উচ্চারণ করতেও পারি নে। আর বেশি দিন নয়, বছর

দু-তিন কাজ করলেই মেয়ে-ক'টার বিয়ে দেবার সম্বল করে নিয়ে তার পরে স্ত্রী-পুরুষে কাশীবাসী হব। আর ভালো লাগে না মশায়— এক-এক সময় ইচ্ছা হয়, গলায় দড়ি দিয়ে মরি! যা হোক, আজ রাত্রে যাবেন কোথায়? এইখানেই আহারাদি করে শয়ন করবেন। ও দারোগা বেটার ছায়া মাড়াতেও হবে না, আপনার জন্যে সমস্ত আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।"

গোরার ক্ষুধা সাধারণের অপেক্ষা অধিক— আজ প্রাতে ভালো করিয়া খাওয়াও হয় নাই— কিন্তু তাহার সর্বশরীর যেন জ্বলিতেছিল— সে কোনোমতেই এখানে থাকিতে পারিল না; কহিল, "আমার বিশেষ কাজ আছে।"

মাধব কহিল, "তা রস্থন, একটা লণ্ঠন সঙ্গে দিই।"

গোরা তাহার কোনো জবাব না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মাধব ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "দাদা, ও লোকটা সদরে গেল। এইবেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা লোক পাঠাও।"

দারোগা কহিল, "কেন, কী করতে হবে?"

মাধব কহিল, "আর কিছু নয়, একবার কেবল জানিয়ে আস্থক, একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে সাক্ষী ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে।"

২৭

ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউন্‌লো সাহেব দিবাবসানে নদীর ধারের রাস্তায় পদব্রজে বেড়াইতেছেন, সঙ্গে হারানবাবু রহিয়াছেন। কিছু দূরে গাড়িতে তাঁহার মেম পরেশবাবুর মেয়েদের লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন।

ব্রাউন্‌লো সাহেব গার্ডন-পার্টিতে মাঝে মাঝে বাঙালি ভদ্রলোকদিগকে তাঁহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিতেন। জিলার এন্‌ট্রেন্স-স্কুলে প্রাইজ-বিতরণ উপলক্ষে তিনিই সভাপতির কাজ করিতেন। কোনো সম্পন্ন লোকের

বাড়িতে বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি গৃহকর্তার অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেন। এমন-কি, যাত্রাগানের মজলিশে আহূত হইয়া তিনি একটা বড়ো কেদারায় বসিয়া কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্যসহকারে গান শুনিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আদালতের গবর্মেণ্ট্ প্লীডারের বাড়িতে গত পূজার দিন যাত্রায় যে দুই ছোকরা ভিস্তি ও মেথ্রানি সাজিয়াছিল তাহাদের অভিনয়ে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধক্রমে একাধিক বার তাহাদের অংশ তাঁহার সম্মুখে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল।

তাঁহার স্ত্রী মিশনরির কন্যা ছিলেন। তাঁহার বাড়িতে মাঝে মাঝে মিশনরি মেয়েদের চা-পান-সভা বসিত। জেলায় তিনি একটি মেয়ে-ইস্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সেই স্কুলে ছাত্রীর অভাব না হয় সেজন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। পরেশবাবুর বাড়িতে মেয়েদের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষার চর্চা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন; দূরে থাকিলেও মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চালাইতেন ও ক্রিস্ট্মাসের সময় তাহাদিগকে ধর্মগ্রন্থ উপহার পাঠাইতেন।

মেলা বসিয়াছে। তদুপলক্ষে হারানবাবু সুধীর ও বিনয়ের সঙ্গে বরদাসুন্দরী ও মেয়েরা সকলেই আসিয়াছেন— তাঁহাদিগকে ইন্স্পেক্শন্-বাংলায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। পরেশবাবু এই-সমস্ত গোলমালের মধ্যে কোনোমতেই থাকিতে পারেন না, এইজন্য তিনি একলা কলিকাতাতেই রহিয়া গিয়াছেন। সুচরিতা তাঁহার সঙ্গরক্ষার জন্য তাঁহার কাছে থাকিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু পরেশ ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণে কর্তব্যপালনের জন্য সুচরিতাকে বিশেষ উপদেশ দিয়াই পাঠাইয়া দিলেন। আগামী পরশ্ব কমিশনর সাহেব ও সস্ত্রীক ছোটোলাটের সম্মুখে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে ডিনারের পরে ইভ্নিং পার্টিতে পরেশবাবুর মেয়েদের দ্বারা অভিনয় আবৃত্তি প্রভৃতি হইবার কথা স্থির হইয়াছে— সেজন্য ম্যাজিস্ট্রেটের অনেক ইংরেজ বন্ধু জেলা ও কলিকাতা হইতে আহূত হইয়াছেন। কয়েকজন বাছা বাছা

বাঙালি ভদ্রলোকেরও উপস্থিত হইবার আয়োজন হইয়াছে; তাঁহাদের জন্য বাগানে একটি তাঁবুতে ব্রাহ্মণ পাচক -কর্তৃক প্রস্তুত জলযোগেরও ব্যবস্থা হইবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

হারানবাবু অতি অল্পকালের মধ্যেই উচ্চভাবের আলাপে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। খৃস্টান ধর্মশাস্ত্রে হারান-বাবুর অসামান্য অভিজ্ঞতা দেখিয়া সাহেব আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। এবং খৃস্টানধর্মগ্রহণে তিনি অল্প একটুমাত্র বাধা কেন রাখিয়াছেন এই প্রশ্নও হারানবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

আজ অপরাহ্ণে নদীতীরের পথে হারানবাবুর সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী ও হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় গোরা "গুড্ ঈভ্নিং স্যর্" বলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

কাল সে ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া বুঝিয়াছে যে, সাহেবের চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইতে গেলে তাঁহার পেয়াদার মাশুল যোগাইতে হয়। এরূপ দণ্ড ও অপমান স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া আজ সাহেবের হাওয়া খাইবার অবকাশে সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। এই সাক্ষাৎকালে হারানবাবু ও গোরা উভয় পক্ষ হইতেই পরিচয়ের কোনো লক্ষণ প্রকাশ হইল না।

লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয় ফুটের চেয়ে লম্বা, হাড়-মোটা, মজবুত মানুষ তিনি বাংলাদেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালির মতো নহে। গায়ে একখানা খাকি রঙের পাঞ্জাবি জামা, ধুতি মোটা ও মলিন, হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধিয়াছে।

গোরা ম্যাজিস্ট্রেটকে কহিল, "আমি চর-ঘোষপুর হইতে আসিতেছি।"

ম্যাজিস্ট্রেট একপ্রকার বিস্ময়সূচক শিস দিলেন। ঘোষপুরের তদন্তকার্যে

একজন বিদেশী বাধা দিতে আসিয়াছে, সে সংবাদ তিনি গতকল্যই পাইয়াছিলেন। তবে এই লোকটাই সে। গোরাকে আপাদমস্তক তীক্ষ্ণভাবে একবার নিরীক্ষণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জাত?"

গোরা কহিল, "আমি বাঙালি ব্রাহ্মণ।"

সাহেব কহিলেন, "ও! খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার যোগ আছে বুঝি?"

গোরা কহিল, "না।"

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, "তবে ঘোষপুর-চরে তুমি কী করতে এসেছ?"

গোরা কহিল, "ভ্রমণ করতে করতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলুম। পুলিসের অত্যাচারে গ্রামের দুর্গতির চিহ্ন দেখে এবং আরও উপদ্রবের সম্ভাবনা আছে জেনে প্রতিকারের জন্য আপনার কাছে এসেছি।"

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, "চর-ঘোষপুরের লোকগুলো অত্যন্ত বদমায়েস সে কথা তুমি জান?"

গোরা কহিল, "তারা বদমায়েস নয়, তারা নির্ভীক স্বাধীনচেতা— তারা অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে পারে না।"

ম্যাজিস্ট্রেট চটিয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন, নব্য বাঙালি ইতিহাসের পুঁথি পড়িয়া কতকগুলা বুলি শিখিয়াছে— insufferable!

"এখানকার অবস্থা তুমি কিছুই জান না" বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট গোরাকে খুব একটা ধমক দিলেন।

"আপনি এখানকার অবস্থা আমার চেয়ে অনেক কম জানেন" গোরা মেঘমন্দ্র স্বরে জবাব করিল।

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, "আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি যদি ঘোষপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ কর তা হলে খুব সস্তায় নিষ্কৃতি পাবে না।"

গোরা কহিল, "আপনি যখন অত্যাচারের প্রতিবিধান করবেন না ব'লে

মনস্থির করেছেন এবং গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে আপনার ধারণা যখন বদ্ধমূল তখন আমার আর-কোনো উপায় নেই, আমি গ্রামের লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করব।"

ম্যাজিস্ট্রেট চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুতের মতো গোরার দিকে ফিরিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "কী! এত বড়ো স্পর্ধা!"

গোরা দ্বিতীয় কোনো কথা না বলিয়া ধীরগমনে চলিয়া গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, "হারানবাবু, আপনাদের দেশের লোকদের মধ্যে এ-সকল কিসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে?"

হারানবাবু কহিলেন, "লেখাপড়া তেমন গভীরভাবে হইতেছে না, বিশেষত দেশে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রনৈতিক শিক্ষা একেবারে নাই বলিয়াই এরূপ ঘটিতেছে। ইংরেজি বিদ্যার যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ সেটা গ্রহণ করিবার অধিকার ইহাদের হয় নাই। ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজত্ব যে ঈশ্বরের বিধান, এই অকৃতজ্ঞরা এখনো তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। তাহার একমাত্র কারণ, ইহারা কেবল পড়া মুখস্থ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের ধর্মবোধ নিতান্তই অপরিণত।"

ম্যাজিস্ট্রেট কহিলেন, "খৃস্টকে স্বীকার না করিলে ভারতবর্ষে এই ধর্মবোধ কখনোই পূর্ণতা লাভ করিবে না।"

হারানবাবু কহিলেন, "সে এক হিসাবে সত্য।"

এই বলিয়া খৃস্টকে স্বীকার করা সম্বন্ধে একজন খৃস্টানের সঙ্গে হারান-বাবুর মতের কোন্ অংশে কতটুকু ঐক্য এবং কোথায় অনৈক্য তাহাই লইয়া হারানবাবু ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সূক্ষ্মভাবে আলাপ করিয়া তাঁহাকে এই কথাপ্রসঙ্গে এতই নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, মেমসাহেব যখন পরেশ-বাবুর মেয়েদিগকে গাড়ি করিয়া ডাক-বাংলায় পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে তাঁহার স্বামীকে কহিলেন "হ্যারি, ঘরে ফিরিতে হইবে", তিনি চমকিয়া উঠিয়া ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন, "বাই জোর্ভ, আটটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট!" গাড়িতে উঠিবার সময় হারানবাবুর করনিপীড়ন করিয়া বিদায়-

সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন, "আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমার সন্ধ্যা খুব সুখে কাটিয়াছে।"

হারানবাবু ডাক-বাংলায় ফিরিয়া আসিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাঁহার আলাপের বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। কিন্তু, গোরার সহিত সাক্ষাতের কোনো উল্লেখমাত্র করিলেন না।

২৮

কোনোপ্রকার অপরাধ বিচার না করিয়া কেবলমাত্র গ্রামকে শাসন করিবার জন্য সাতচল্লিশ জন আসামীকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাতের পর গোরা উকিলের সন্ধানে বাহির হইল। কোনো লোকের কাছে খবর পাইল, সাতকড়ি হালদার এখানকার একজন ভালো উকিল। সাতকড়ির বাড়ি যাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, গোরা যে! তুমি এখানে!"

গোরা যা মনে করিয়াছিল তাই বটে— সাতকড়ি গোরার সহপাঠী। গোরা কহিল, "চর-ঘোষপুরের আসামিদিগকে জামিনে খালাস করিয়া তাহাদের মকদ্দমা চালাইতে হইবে।"

সাতকড়ি কহিল, "জামিন হবে কে?"

গোরা কহিল, "আমি হব।"

সাতকড়ি কহিল, "তুমি সাতচল্লিশ জনের জামিন হবে, তোমার এমন কী সাধ্য আছে?"

গোরা কহিল, "যদি মোক্তাররা মিলে জামিন হয় তার ফি আমি দেব।"

সাতকড়ি কহিল, "টাকা কম লাগবে না।"

পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের এজ্‌লাসে জামিন-খালাসের দরখাস্ত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট গতকল্যকার সেই মলিনবস্ত্রধারী পাগড়ি-পরা বীরমূর্তির দিকে একবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন।

চৌদ্দ বৎসরের ছেলে হইতে আশি বৎসরের বুড়া পর্যন্ত হাজতে পচিতে লাগিল।

গোরা ইহাদের হইয়া লড়িবার জন্য সাতকড়িকে অনুরোধ করিল। সাতকড়ি কহিল, "সাক্ষী পাবে কোথায়? যারা সাক্ষী হতে পারত তারা সবাই আসামী। তার পরে এই সাহেব-মারা মামলার তদন্তের চোটে এ অঞ্চলের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের ধারণা হয়েছে, ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোকের যোগ আছে; হয়তো-বা আমাকেও সন্দেহ করে, বলা যায় না। ইংরেজি কাগজগুলোতে ক্রমাগত লিখছে, দেশি লোক যদি এ-রকম স্পর্ধা পায় তা হলে অরক্ষিত অসহায় ইংরেজেরা আর মফস্বলে বাস করতেই পারবে না। ইতিমধ্যে দেশের লোক দেশে টিঁকতে পারছে না এমনি হয়েছে। অত্যাচার হচ্ছে জানি, কিন্তু কিছুই করবার জো নেই।"

গোরা গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন জো নেই?"

সাতকড়ি হাসিয়া কহিল, "তুমি ইস্কুলে যেমনটি ছিলে এখনো ঠিক তেমনিটি আছ দেখছি। জো নেই মানে, আমাদের ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে— রোজ উপার্জন না করলে অনেকগুলো লোককে উপবাস করতে হয়। পরের দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে মরতে রাজি হয় এমন লোক সংসারে বেশি নেই— বিশেষত যে দেশে সংসার জিনিসটি বড়ো ছোটোখাটো জিনিস নয়। যাদের উপর দশজন নির্ভর করে তারা সেই দশজন ছাড়া অন্য দশজনের দিকে তাকাবার অবকাশই পায় না।"

গোরা কহিল, "তা হলে এদের জন্যে কিছুই করবে না? হাইকোর্টে মোশন করে যদি—"

সাতকড়ি অধীর হইয়া কহিল, "আরে, ইংরেজ মেরেছে যে— সেটা দেখছ না! প্রত্যেক ইংরেজটিই যে রাজা— একটা ছোটো ইংরেজকে মারলে যে সেটা একটা ছোটোরকম রাজবিদ্রোহ। যেটাতে কিছু ফল হবে না সেটার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কোপানলে পড়ব, সে আমার দ্বারা হবে না।"

কলিকাতায় গিয়া সেখানকার কোনো উকিলের সাহায্যে কিছু সুবিধা হয় কি না তাহাই দেখিবার জন্য পরদিন সাড়ে দশটার গাড়িতে রওনা হইবার অভিপ্রায়ে গোরা যাত্রা করিয়াছে, এমন সময় বাধা পড়িয়া গেল।

এখানকার মেলা উপলক্ষেই কলিকাতার একদল ছাত্রের সহিত এখানকার স্থানীয় ছাত্রদলের ক্রিকেট-যুদ্ধ স্থির হইয়াছে। হাত পাকাইবার জন্য কলিকাতার ছেলেরা আপন দলের মধ্যেই খেলিতেছিল; ক্রিকেটের গোলা লাগিয়া একটি ছেলের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। মাঠের ধারে একটা বড়ো পুষ্করিণী ছিল— আহত ছেলেটিকে দুইটি ছাত্র ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর তীরে রাখিয়া চাদর ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া তাহার পা বাঁধিয়া দিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটা পাহারাওয়ালা আসিয়াই একেবারে একজন ছাত্রের ঘাড়ে হাত দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। পুষ্করিণীটি পানীয় জলের জন্য রিজার্ভ করা, ইহার জলে নামা নিষেধ, কলিকাতার ছাত্র তাহা জানিত না; জানিলেও অকস্মাৎ পাহারাওয়ালার কাছে এরূপ অপমান সহ্য করা তাহাদের অভ্যাস ছিল না, গায়েও জোর ছিল, তাই অপমানের যথোচিত প্রতিকার আরম্ভ করিয়া দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া চার-পাঁচজন কন্‌স্টেব্‌ল্ ছুটিয়া আসিল। ঠিক এমন সময়টিতেই সেখানে গোরা আসিয়া উপস্থিত। ছাত্রেরা গোরাকে চিনিত— গোরা তাহাদিগকে লইয়া অনেক দিন ক্রিকেট খেলাইয়াছে। গোরা যখন দেখিল ছাত্রদিগকে মারিতে মারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে সে সহিতে পারিল না; সে কহিল, "খবরদার! মারিস নে।" পাহারাওয়ালার দল তাহাকেও অশ্রাব্য গালি দিতেই গোরা ঘুষি ও লাথি মারিয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া তুলিল যে রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। এ দিকে দেখিতে দেখিতে ছাত্রের দল জুটিয়া গেল। গোরার উৎসাহ ও আদেশ পাইয়া তাহারা পুলিসকে আক্রমণ করিতেই পাহারাওয়ালার দল রণে ভঙ্গ দিল। দর্শকরূপে রাস্তার লোকে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল; কিন্তু বলা বাহুল্য, এই তামাশা গোরার পক্ষে নিতান্ত তামাশা হইল না।

বেলা যখন তিন-চারটে, ডাকবাংলায় বিনয় হারানবাবু এবং মেয়েরা রিহার্সালে প্রবৃত্ত আছে, এমন সময়ে বিনয়ের পরিচিত দুইজন ছাত্র আসিয়া খবর দিল গোরাকে এবং কয়জন ছাত্রকে পুলিসে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া হাজতে রাখিয়াছে— আগামী কাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে প্রথম এজলাসেই ইহার বিচার হইবে।

গোরা হাজতে! এ কথা শুনিয়া হারানবাবু ছাড়া আর-সকলেই একেবারে চমকিয়া উঠিল। বিনয় তখনই ছুটিয়া প্রথমে তাহাদের সহপাঠী সাতকড়ি হালদারের নিকট গিয়া তাহাকে সমস্ত জানাইল এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া হাজতে গেল।

সাতকড়ি তাহার পক্ষে ওকালতি ও তাহাকে এখনি জামিনে খালাসের চেষ্টা করিবার প্রস্তাব করিল। গোরা বলিল, "না, আমি উকিলও রাখব না, আমাকে জামিনে খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না।"

সে কী কথা! সাতকড়ি বিনয়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "দেখেছ! কে বলবে গোরা ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে! ওর বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক সেইরকমই আছে।"

গোরা কহিল, "দৈবাৎ আমার টাকা আছে, বন্ধু আছে ব'লেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে আমি খালাস পাব সে আমি চাই নে। আমাদের দেশের যে ধর্মনীতি তাতে আমরা জানি, সুবিচার করার গরজ রাজার; প্রজার প্রতি অবিচার রাজারই অধর্ম। কিন্তু, এ রাজ্যে উকিলের কড়ি না জোগাতে পেরে প্রজা যদি হাজতে পচে, জেলে মরে, রাজা মাথার উপরে থাকতে ন্যায়বিচার পয়সা দিয়ে কিনতে যদি সর্বস্বান্ত হতে হয়, তবে এমন বিচারের জন্য আমি সিকিপয়সা খরচ করতে চাই নে।"

সাতকড়ি কহিল, "কাজির আমলে যে ঘুষ দিতেই মাথা বিকিয়ে যেত।"

গোরা কহিল, "ঘুষ দেওয়া তো রাজার বিধান ছিল না। যে কাজি মন্দ ছিল সে ঘুষ নিত, এ আমলেও সেটা আছে। কিন্তু, এখন রাজদ্বারে বিচারের জন্যে দাঁড়াতে গেলেই বাদী হোক প্রতিবাদী হোক, দোষী হোক

নির্দোষ হোক, প্রজাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। যে পক্ষ নির্ধন, বিচারের লড়াইয়ে জিত-হার দুই তার পক্ষে সর্বনাশ। তার পরে রাজা যখন বাদী আর আমার মতো লোক প্রতিবাদী, তখন তাঁর পক্ষেই উকিল ব্যারিস্টার— আর আমি যদি জোটাতে পারলুম তো ভালো নইলে অদৃষ্টে যা থাকে! বিচারে যদি উকিলের সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে তবে সরকারি উকিল আছে কেন? যদি প্রয়োজন থাকে তো গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ কেন নিজের উকিল নিজে জোটাতে বাধ্য হবে? এ কি প্রজার সঙ্গে শত্রুতা? এ কিরকমের রাজধর্ম!"

সাতকড়ি কহিল, "ভাই, চট কেন? সিভিলিজেশন সস্তা জিনিস নয়। সূক্ষ্ম বিচার করতে গেলে সূক্ষ্ম আইন করতে হয়— সূক্ষ্ম আইন করতে গেলেই আইনের ব্যবসায়ী না হলে কাজ চলেই না, ব্যাবসা চালাতে গেলেই কেনাবেচা এসে পড়ে— অতএব সভ্যতার আদালত আপনিই বিচার-কেনাবেচার হাট হয়ে উঠবেই— যার টাকা নেই তার ঠকবার সম্ভাবনা থাকবেই। তুমি রাজা হলে কী করতে বল দেখি।"

গোরা কহিল, "যদি এমন আইন করতুম যে হাজার দেড়-হাজার টাকা বেতনের বিচারকের বুদ্ধিতেও তার রহস্য ভেদ হওয়া সম্ভব হত না, তা হলে হতভাগা বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের জন্য উকিল সরকারি খরচে নিযুক্ত করে দিতুম। বিচার ভালো হওয়ার খরচা প্রজার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সুবিচারের গৌরব করে পাঠান-মোগলদের গাল দিতুম না।"

সাতকড়ি কহিল, "বেশ কথা, সে শুভদিন যখন আসে নি— তুমি যখন রাজা হও নি— সম্প্রতি তুমি যখন সভ্য রাজার আদালতের আসামী, তখন তোমাকে হয় গাঁটের কড়ি খরচ করতে হবে নয় উকিল-বন্ধুর শরণাপন্ন হতে হবে, নয় তো তৃতীয় গতিটা সদ্‌গতি হবে না।"

গোরা জেদ করিয়া কহিল, "কোনো চেষ্টা না করে যে গতি হতে পারে আমার সেই গতিই হোক। এ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারও সেই গতি।"

বিনয় অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু গোরা তাহাতে কর্ণপাতমাত্র করিল না। সে বিনয়কে জিজ্ঞাসা কহিল, "তুমি হঠাৎ এখানে কী করে উপস্থিত হলে?"

বিনয়ের মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল। গোরা যদি আজ হাজতে না থাকিত তবে বিনয় হয়তো কিছু বিদ্রোহের স্বরেই তাহার এখানে উপস্থিতির কারণটা বলিয়া দিত। আজ স্পষ্ট উত্তরটা তাহার মুখে বাধিয়া গেল; কহিল, "আমার কথা পরে হবে— এখন তোমার—"

গোরা কহিল, "আমি তো আজ রাজার অতিথি। আমার জন্যে রাজা স্বয়ং ভাবছেন, তোমাদের আর-কারও ভাবতে হবে না।"

বিনয় জানিত গোরাকে টলানো সম্ভব নয়— অতএব, উকিল রাখার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইল। বলিল, "তুমি তো খেতে এখানে পারবে না জানি, বাইরে থেকে কিছু খাবার পাঠাবার জোগাড় করে দিই।"

গোরা অধীর হইয়া কহিল, "বিনয়, কেন তুমি বৃথা চেষ্টা করছ? বাইরে থেকে আমি কিছুই চাই নে। হাজতে সকলের ভাগ্যে যা জোটে আমি তার চেয়ে কিছু বেশি চাই নে।"

বিনয় ব্যথিত চিত্তে ডাক-বাংলায় ফিরিয়া আসিল। সুচরিতা রাস্তার দিকের একটা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া জানলা খুলিয়া বিনয়ের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। কোনোমতেই অন্য সকলের সঙ্গ এবং আলাপ সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

সুচরিতা যখন দেখিল বিনয় চিন্তিত বিমর্ষমুখে ডাক-বাংলার অভিমুখে আসিতেছে তখন আশঙ্কায় তাহার বুকের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। বহু চেষ্টায় সে নিজেকে শান্ত করিয়া একটা বই হাতে করিয়া বসিবার ঘরে আসিল। ললিতা সেলাই ভালোবাসে না, কিন্তু সে আজ চুপ করিয়া কোণে বসিয়া সেলাই করিতেছিল; লাবণ্য সুধীরকে লইয়া ইংরেজি বানানের খেলা খেলিতেছিল, লীলা ছিল দর্শক; হারানবাবু বরদাসুন্দরীর সঙ্গে আগামী কল্যকার উৎসবের কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

আজ প্রাতঃকালে পুলিসের সঙ্গে গোরার বিরোধের ইতিহাস বিনয় সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিল। সুচরিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল ; ললিতার কোল হইতে সেলাই পড়িয়া গেল এবং মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "আপনি কিছু ভাববেন না বিনয়বাবু— আজ সন্ধ্যাবেলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেমের কাছে গৌরমোহনবাবুর জন্যে আমি নিজে অনুরোধ করব।"

বিনয় কহিল, "না, আপনি তা করবেন না— গোরা যদি শুনতে পায় তা হলে জীবনে সে আমাকে আর ক্ষমা করবে না।"

সুধীর কহিল, "তাঁর ডিফেন্সের জন্যে তো কোনো বন্দোবস্ত করতে হবে।"

জামিন দিয়া খালাসের চেষ্টা এবং উকিল-নিয়োগ সম্বন্ধে গোরা যে-সকল আপত্তি করিয়াছিল বিনয় তাহা সমস্তই বলিল, শুনিয়া হারানবাবু অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, "এ-সমস্ত বাড়াবাড়ি।"

হারানবাবুর প্রতি ললিতার মনের ভাব যাই থাক্, সে এ-পর্যন্ত তাঁহাকে মান্য করিয়া আসিয়াছে, কখনো তাঁহার সঙ্গে তর্কে যোগ দেয় নাই— আজ সে তীব্রভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি নয়। গৌরবাবু যা করেছেন সে ঠিক করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জব্দ করবে আর আমরা নিজেরা নিজেকে রক্ষা করব! তাদের মোটা মাইনে জোগাবার জন্যে ট্যাক্স জোগাতে হবে, আবার তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে উকিল-ফি গাঁট থেকে দিতে হবে! এমন বিচার পাওয়ার চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো।"

ললিতাকে হারানবাবু এতটুকু দেখিয়াছেন— তাহার যে একটা মতামত আছে সে কথা তিনি কোনোদিন কল্পনাও করেন নাই। সেই ললিতার মুখের তীব্র ভাষা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন ; তাহাকে ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "তুমি এ-সব কথার কী বোঝ! যারা গোটাকতক বই মুখস্থ করে পাস ক'রে সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যাদের কোনো ধর্ম নেই, ধারণা নেই, তাদের মুখ থেকে দায়িত্বহীন উন্মত্ত প্রলাপ শুনে তোমাদের

মাথা ঘুরে যায়।”

এই বলিয়া গতকল্য সন্ধ্যার সময় গোরার সহিত ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষাৎ-বিবরণ এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের আলাপের কথা বিবৃত করিলেন। চর-ঘোষপুরের ব্যাপার বিনয়ের জানা ছিল না। শুনিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল; বুঝিল, ম্যাজিস্ট্রেট গোরাকে সহজে ক্ষমা করিবে না।

হারান যে উদ্দেশ্যে এই গল্পটা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি যে গোরার সহিত তাঁহার দেখা হওয়া সম্বন্ধে এতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে নীরব ছিলেন, তাহার ভিতরকার ক্ষুদ্রতা সুচরিতাকে আঘাত করিল এবং হারানবাবুর প্রত্যেক কথার মধ্যে গোরার প্রতি যে একটা ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রকাশ পাইল তাহাতে গোরার এই বিপদের দিনে তাঁহার প্রতি উপস্থিত প্রত্যেকেরই একটা অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিল। সুচরিতা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; কী একটা বলিবার জন্য তাহার আবেগ উপস্থিত হইল, কিন্তু সেটা সম্বরণ করিয়া সে বই খুলিয়া কম্পিত হস্তে পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। ললিতা উদ্ধতভাবে কহিল ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত হারানবাবুর মতের যতই মিল থাক্‌, “ঘোষপুরের ব্যাপারে গৌরমোহনবাবুর মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে।”

২৯

আজ ছোটোলাট আসিবেন বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক সাড়ে দশটায় আদালতে আসিয়া বিচারকার্য সকাল-সকাল শেষ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন।

সাতকড়িবাবু ইস্কুলের ছাত্রদের পক্ষ লইয়া সেই উপলক্ষে তাঁহার বন্ধুকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি গতিক দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, অপরাধ স্বীকার করাই এ-স্থলে ভালো চাল। ছেলেরা দুরন্ত হইয়াই থাকে, তাহারা অর্বাচীন নির্বোধ, ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ছাত্রদিগকে জেলে লইয়া গিয়া বয়স ও অপরাধের তারতম্য অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশ বেতের আদেশ করিয়া দিলেন। গোরার উকিল কেহ ছিল না। সে নিজের মামলা নিজে চালাইবার উপলক্ষে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন ও পুলিসের কর্মে বাধা দেওয়া অপরাধে তাহাকে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন এবং এইরূপ লঘুদণ্ডকে বিশেষ দয়া বলিয়া কীর্তন করিলেন।

সুধীর ও বিনয় আদালতে উপস্থিত ছিল। বিনয় গোরার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। তাহার যেন নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, সে তাড়াতাড়ি আদালত-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুধীর তাহাকে ডাক-বাংলায় ফিরিয়া গিয়া স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিল—সে শুনিল না, মাঠের রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সুধীরকে কহিল, "তুমি বাংলায় ফিরে যাও, কিছু ক্ষণ পরে আমি যাব।"

সুধীর চলিয়া গেল।

এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতে পারিল না। সূর্য মাথার উপর হইতে পশ্চিমের দিকে যখন হেলিয়াছে তখন একটা গাড়ি ঠিক তাহার সম্মুখে আসিয়া থামিল। বিনয় মুখ তুলিয়া দেখিল, সুধীর ও সুচরিতা গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার কাছে আসিতেছে। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। সুচরিতা কাছে আসিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে কহিল, "বিনয়বাবু, আসুন।"

বিনয়ের হঠাৎ চৈতন্য হইল যে, এই দৃশ্যে রাস্তার লোকে কৌতুক অনুভব করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। সমস্ত পথ কেহ কিছুই কথা কহিতে পারিল না।

ডাক-বাংলায় পৌঁছিয়া বিনয় দেখিল, সেখানে একটা লড়াই চলিতেছে। ললিতা বাঁকিয়া বসিয়াছে, সে কোনোমতেই আজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণে যোগ দিবে না। বরদাসুন্দরী বিষম সংকটে পড়িয়া গিয়াছেন। হারানবাবু

ললিতার মতো বালিকার এই অসংগত বিদ্রোহে ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বার বার বলিতেছেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের এ কিরূপ বিকার ঘটিয়াছে— তাহারা ডিসিপ্লিন মানিতে চাহে না। কেবল যে-সে লোকের সংসর্গে যাহা-তাহা আলোচনা করিয়াই এইরূপ ঘটিতেছে।

বিনয় আসিতেই ললিতা কহিল, "বিনয়বাবু, আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার কাছে ভারি অপরাধ করেছি; আপনি তখন যা বলেছিলেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি; আমরা বাইরের অবস্থা কিছুই জানি নে বলেই এত ভুল বুঝি। পানুবাবু বলেন ভারতবর্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের এই শাসন বিধাতার বিধান— তা যদি হয় তবে এই শাসনকে সমস্ত কায়মনোবাক্যে অভিশাপ দেবার ইচ্ছা জাগিয়ে দেওয়াও সেই বিধাতারই বিধান।"

হারানবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ললিতা, তুমি—"

ললিতা হারানবাবুর দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চুপ করুন। আপনাকে আমি কিছু বলছি নে। বিনয়বাবু, আপনি কারও অনুরোধ রাখবেন না। আজ কোনোমতেই অভিনয় হতেই পারে না।"

বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি ললিতার কথা চাপা দিয়া কহিলেন, "ললিতা, তুই তো আচ্ছা মেয়ে দেখছি। বিনয়বাবুকে আজ স্নান করতে, খেতে দিবি নে? বেলা দেড়টা বেজে গেছে তা জানিস? দেখ্ দেখি ওঁর মুখ শুকিয়ে কিরকম চেহারা হয়ে গেছে।"

বিনয় কহিল, "এখানে আমরা সেই ম্যাজিস্ট্রেটের অতিথি— এ বাড়িতে আমি স্নানাহার করতে পারব না।"

বরদাসুন্দরী বিনয়কে বিস্তর মিনতি করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। মেয়েরা সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি রাগিয়া বলিলেন, "তোদের সব হল কী! সুচি, তুমি বিনয়বাবুকে একটু বুঝিয়ে বলো-না। আমরা কথা দিয়েছি— লোকজন সব ডাকা হয়েছে— আজকের দিনটা কোনোমতে কাটিয়ে যেতে হবে— নইলে ওরা কী মনে করবে বলো দেখি। আর যে

ওদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না।"

সুচরিতা চুপ করিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় অদূরে নদীতে স্টীমারে চলিয়া গেল। এই স্টীমার আজ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই যাত্রী লইয়া কলিকাতায় রওনা হইবে— আগামী কাল আটটা আন্দাজ সময়ে সেখানে পৌঁছিবে।

হারানবাবু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিনয় ও গোরাকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। সুচরিতা তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া বেগে দ্বার ভেজাইয়া দিল। একটু পরেই ললিতা দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সুচরিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিছানার উপর পড়িয়া আছে।

ললিতা ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সুচরিতার পাশে বসিয়া তাহার মাথায় চুলের মধ্যে আঙুল বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে সুচরিতা যখন শান্ত হইল তখন জোর করিয়া তাহার মুখ হইতে বাহুর আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল, "দিদি, আমরা এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাই, আজ তো ম্যাজিস্ট্রেটের ওখানে যেতে পারব না।"

সুচরিতা অনেক ক্ষণ এ কথার কোনো উত্তর করিল না। ললিতা যখন বার বার বলিতে লাগিল তখন সে বিছানায় উঠিয়া বসিল— "সে কী করে হবে ভাই। আমার তো একেবারেই আসবার ইচ্ছা ছিল না— বাবা যখন পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন যে জন্যে এসেছি তা না সেরে যেতে পারব না।"

ললিতা কহিল, "বাবা তো এ-সব কথা জানেন না— জানলে কখনোই আমাদের থাকতে বলতেন না।"

সুচরিতা কহিল, "তা কী করে জানব ভাই।"

ললিতা। দিদি, তুই পারবি? কী করে যাবি বল্ দেখি। তার পরে আবার সাজগোজ করে স্টেজে দাঁড়িয়ে কবিতা আওড়াতে হবে। আমার

তো জিব ফেটে গিয়ে রক্ত পড়বে তবু কথা বের হবে না।

সুচরিতা কহিল, "সে তো জানি বোন। কিন্তু, নরকযন্ত্রণাও সইতে হয়। এখন আর কোনো উপায় নেই। আজকের দিন জীবনে আর কখনো ভুলতে পারব না।"

সুচরিতার এই বাধ্যতায় ললিতা রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে আসিয়া কহিল, "মা, তোমরা যাবে না ?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তুই কি পাগল হয়েছিস! রাত্তির নটার পর যেতে হবে।"

ললিতা কহিল, "আমি কলকাতায় যাবার কথা বলছি।"

বরদাসুন্দরী। শোনো একবার মেয়ের কথা শোনো !

ললিতা সুধীরকে কহিল, "সুধীরদা, তুমিও এখানে থাকবে ?"

গোরার শাস্তি সুধীরের মনকে বিকল করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু বড়ো বড়ো সাহেবের সম্মুখে নিজের বিদ্যা প্রকাশ করিবার প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে এমন সাধ্য তাহার ছিল না। সে অব্যক্তস্বরে কী-একটা বলিল— বোঝা গেল সে সংকোচ বোধ করিতেছে, কিন্তু সে থাকিয়াই যাইবে।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "গোলমালে বেলা হয়ে গেল। আর দেরি করলে চলবে না। এখন সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বিছানা থেকে কেউ উঠতে পারবে না— বিশ্রাম করতে হবে। নইলে ক্লান্ত হয়ে রাত্রে মুখ শুকিয়ে যাবে— দেখতে বিশ্রী হবে।"

এই বলিয়া তিনি জোর করিয়া সকলকে শয়নঘরে পুরিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন। সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল, কেবল সুচরিতার ঘুম হইল না এবং অন্য ঘরে ললিতা তাহার বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া রহিল।

স্টীমারে ঘন ঘন বাঁশি বাজিতে লাগিল।

স্টীমার যখন ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে, খালাসিরা সিঁড়ি তুলিবার

জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময় জাহাজের ডেকের উপর হইতে বিনয় দেখিল একজন ভদ্রস্ত্রীলোক জাহাজের অভিমুখে দ্রুতপদে আসিতেছে। তাহার বেশভূষা প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে ললিতা বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু বিনয় সহসা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে ললিতা নিকটে আসিতে আর সন্দেহ রহিল না। একবার মনে করিল, ললিতা তাহাকে ফিরাইতে আসিয়াছে, কিন্তু ললিতাই তো ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। ললিতা স্টীমারে উঠিয়া পড়িল; খালাসি সিঁড়ি তুলিয়া লইল। বিনয় শঙ্কিতচিত্তে উপরের ডেক হইতে নীচে নামিয়া ললিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ললিতা কহিল, "আমাকে উপরে নিয়ে চলুন।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "জাহাজ যে ছেড়ে দিচ্ছে।"

ললিতা কহিল, "সে আমি জানি।"

বলিয়া বিনয়ের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সম্মুখের সিঁড়ি বাহিয়া উপরের তলায় উঠিয়া গেল। স্টীমার বাঁশি ফুঁকিতে ফুঁকিতে ছাড়িয়া দিল।

বিনয় ললিতাকে ফার্স্ট্‌ক্লাসের ডেকে কেদারায় বসাইয়া নীরব প্রশ্নে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

ললিতা কহিল, "আমি কলকাতায় যাব— আমি কিছুতেই থাকতে পারলুম না।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁরা সকলে?"

ললিতা কহিল, "এখন পর্যন্ত কেউ জানেন না। আমি চিঠি রেখে এসেছি —পড়লেই জানতে পারবেন।"

ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সংকোচের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল, "কিন্তু—"

ললিতা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, "জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, এখন আর 'কিন্তু' নিয়ে কী হবে! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চুপ করে সহ্য করতে হবে সে আমি বুঝি নে। আমাদের পক্ষেও ন্যায়-অন্যায়

সম্ভব-অসম্ভব আছে। আজকের নিমন্ত্রণে গিয়ে অভিনয় করার চেয়ে আত্ম-হত্যা করা আমার পক্ষে সহজ।”

বিনয় বুঝিল, যা হইবার তা হইয়া গেছে, এখন এ কাজের ভালোমন্দ বিচার করিয়া মনকে পীড়িত করিয়া তোলায় কোনো ফল নাই।

কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল, “দেখুন, আপনার বন্ধু গৌরমোহনবাবুর প্রতি আমি মনে মনে বড়ো অবিচার করেছিলুম। জানি নে, প্রথম থেকেই কেন তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে, আমার মনটা তাঁর বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বড়ো বেশি জোর দিয়ে কথা কইতেন, আর আপনারা সকলেই তাতে যেন সায় দিয়ে যেতেন— তাই দেখে আমার একটা রাগ হতে থাকত। আমার স্বভাবই ওই— আমি যদি দেখি কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করছে, সে আমি একেবারেই সইতে পারি নে। কিন্তু গৌরমোহনবাবু জোর কেবল পরের উপরে নয়, সে তিনি নিজের উপরেও খাটান— এ সত্যিকার জোর— এরকম মানুষ আমি দেখি নি।”

এমনি করিয়া ললিতা বকিয়া যাইতে লাগিল। কেবল যে গোরা সম্বন্ধে সে অনুতাপ বোধ করিতেছিল বলিয়াই এ-সকল কথা বলিতেছিল তাহা নহে। আসলে, ঝোঁকের মাথায় যে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহার সংকোচ মনের ভিতর হইতে কেবলই মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছিল, কাজটা হয়তো ভালো হয় নাই, এই দ্বিধা জোর করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল; বিনয়ের সম্মুখে স্টীমারে এইরূপ একলা বসিয়া থাকা যে কত বড়ো কুণ্ঠার বিষয় তাহা সে পূর্বে মনেও করিতে পারে নাই; কিন্তু, লজ্জা প্রকাশ হইলেই জিনিসটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিবে, এইজন্য সে প্রাণপণে বকিয়া যাইতে লাগিল। বিনয়ের মুখে ভালো করিয়া কথা জোগাইতেছিল না। এক দিকে গোরার দুঃখ ও অপমান, অন্য দিকে সে যে এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি আমোদ করিতে আসিয়াছিল তাহার লজ্জা, তাহার উপরে ললিতার সম্বন্ধে তাহার এই অকস্মাৎ অবস্থাসংকট, সমস্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া বিনয়কে

বাক্যহীন করিয়া দিয়াছিল।

পূর্বে হইলে ললিতার এই দুঃসাহসিকতায় বিনয়ের মনে তিরস্কারের ভাব উদয় হইত— আজ তাহা কোনোমতেই হইল না। এমন-কি, তাহার মনে যে বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ছিল— ইহাতে আরও একটি আনন্দ এই ছিল, তাহাদের সমস্ত দলের মধ্যে গোরার অপমানের সামান্য প্রতিকারচেষ্টা কেবল বিনয় এবং ললিতাই করিয়াছে। এজন্য বিনয়কে বিশেষ কিছু দুঃখ পাইতে হইবে না, কিন্তু ললিতাকে নিজের কর্মফলে অনেক দিন ধরিয়া বিস্তর পীড়া ভোগ করিতে হইবে। অথচ এই ললিতাকে বিনয় বরাবর গোরার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিত। যতই ভাবিতে লাগিল ততই ললিতার এই পরিণামবিচারহীন সাহসে এবং অন্যায়ের প্রতি একান্ত ঘৃণায় তাহার প্রতি বিনয়ের ভক্তি জন্মিতে লাগিল। কেমন করিয়া কী বলিয়া যে সে এই ভক্তি প্রকাশ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। বিনয় বার বার ভাবিতে লাগিল, ললিতা যে তাহাকে এত পরমুখাপেক্ষী সাহসহীন বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে সে ঘৃণা যথার্থ। সে তো সমস্ত আত্মীয়বন্ধুর নিন্দা-প্রশংসা সবলে উপেক্ষা করিয়া এমন করিয়া কোনো বিষয়েই সাহসিক আচরণের দ্বারা নিজের মত প্রকাশ করিতে পারিত না। সে যে অনেক সময়েই গোরাকে কষ্ট দিবার ভয়ে অথবা পাছে গোরা তাহাকে দুর্বল মনে করে এই আশঙ্কায় নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে নাই, অনেক সময় সূক্ষ্ম যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া গোরার মতকে নিজের মত বলিয়াই নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আজ তাহা মনে মনে স্বীকার করিয়া ললিতাকে স্বাধীন বুদ্ধিশক্তিগুণে নিজের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিল। ললিতাকে সে যে পূর্বে অনেকবার মনে মনে নিন্দা করিয়াছে সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার লজ্জা বোধ হইল। এমন-কি, ললিতার কাছে তাহার ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা করিল— কিন্তু, কেমন করিয়া ক্ষমা চাহিবে ভাবিয়া পাইল না। ললিতার কমনীয় স্ত্রীমূর্তি আপন অন্তরের তেজে বিনয়ের চক্ষে আজ এমন একটি মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া দেখা দিল যে, নারীর এই অপূর্ব পরিচয়ে বিনয়

নিজের জীবনকে সার্থক বোধ করিল। সে নিজের সমস্ত অহংকার, সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমণ্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।

৩০

ললিতাকে সঙ্গে লইয়া বিনয় পরেশবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনের ভাবটা কী তাহা স্টীমারে উঠিবার পূর্বে পর্যন্ত বিনয় নিশ্চিত জানিত না। ললিতার সঙ্গে বিরোধেই তাহার মন ব্যাপৃত ছিল। কেমন করিয়া এই দুর্বশ মেয়েটির সঙ্গে কোনোমতে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে, কিছুকাল হইতে ইহাই তাহার প্রায় প্রতিদিনের চিন্তার বিষয় ছিল। বিনয়ের জীবনে স্ত্রীমাধুর্যের নির্মল দীপ্তি লইয়া সুচরিতাই প্রথম সন্ধ্যাতারাটির মতো উদিত হইয়াছিল। এই আবির্ভাবের অপরূপ আনন্দে বিনয়ের প্রকৃতিকে পরিপূর্ণতা দান করিয়া আছে, ইহাই বিনয় মনে মনে জানিত। কিন্তু, ইতিমধ্যে আরও যে তারা উঠিয়াছে এবং জ্যোতিরুৎসবের ভূমিকা করিয়া দিয়া প্রথম তারাটি যে কখন ধীরে ধীরে দিগন্তরালে অবতরণ করিতেছিল, বিনয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে নাই।

বিদ্রোহী ললিতা যেদিন স্টীমারে উঠিয়া আসিল সেদিন বিনয়ের মনে হইল, 'ললিতা এবং আমি একপক্ষ হইয়া সমস্ত সংসারের প্রতিকূলে যেন খাড়া হইয়াছি।' এই ঘটনায় ললিতা আর-সকলকে ছাড়িয়া তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ কথা বিনয় কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। যে-কোনো কারণে যে-কোনো উপলক্ষেই হউক, ললিতার পক্ষে বিনয় আজ অনেকের মধ্যে একজন মাত্র নহে— ললিতার পার্শ্বে সেই একাকী, সেই একমাত্র; সমস্ত আত্মীয়স্বজন দূরে, সেই নিকটে। এই নৈকট্যের পুলকপূর্ণ স্পন্দন বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘের মতো তাহার বুকের মধ্যে গুরুগুরু করিতে লাগিল। প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে ললিতা যখন ঘুমাইতে গেল তখন বিনয় তাহার স্বস্থানে শুইতে যাইতে পারিল না— সেই ক্যাবিনের বাহিরে ডেকে

সে জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্টীমারে ললিতার প্রতি কোনো উৎপাত ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু বিনয় তাহার অকস্মাৎ নূতনলব্ধ অধিকারটিকে পুরা অনুভব করিবার প্রলোভনে অপ্রয়োজনেও না খাটাইয়া থাকিতে পারিল না।

রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ-আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে— ইহার মাঝখানে ললিতা নিদ্রিত। আর কিছু নয়— এই সুন্দর, এই বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকেই ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এই নিদ্রাটুকুকে বিনয় মহামূল্য রত্নটির মতো রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। পিতামাতা ভাইভগিনী কেহই নাই, একটি অপরিচিত শয্যার উপর ললিতা আপন সুন্দর দেহখানি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে; নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন এই নিদ্রাকাব্যটুকুর ছন্দ পরিমাপ করিয়া অতি শান্তভাবে গতায়াত করিতেছে; সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্রস্ত হয় নাই, সেই নারীহৃদয়ের কল্যাণকোমলতায় মণ্ডিত হাত দুইখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানার উপরে পড়িয়া আছে; কুসুমসুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত রমণীয় গতিচেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সংগীতের মতো স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে— বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। শুক্তির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, গ্রহতারামণ্ডিত নিঃশব্দতিমিরবেষ্টিত এই আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার এই নিদ্রাটুকু— এই সুডোল সুন্দর সম্পূর্ণ বিশ্রামটুকু— জগতে তেমনি একটিমাত্র ঐশ্বর্য বলিয়া আজ বিনয়ের কাছে প্রতিভাত হইল। 'আমি জাগিয়া আছি' 'আমি জাগিয়া আছি'— এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃকুহর হইতে অভয়শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ-বাণীর সহিত মিলিত হইল।

এই কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আরও একটা কথা কেবলই বিনয়কে আঘাত

করিতেছিল— আজ রাত্রে গোরা জেলখানায়! আজ পর্যন্ত বিনয় গোরার সকল সুখদুঃখেই ভাগ লইয়া আসিয়াছে; এইবার প্রথম তাহার অন্যথা ঘটিল। বিনয় জানিত, গোরার মতো মানুষের পক্ষে জেলের শাসন কিছুই নহে; কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে বিনয়ের সঙ্গে গোরার কোনো যোগ ছিল না— গোরার জীবনের এই একটা প্রধান ঘটনা একেবারেই বিনয়ের-সংস্রব-ছাড়া। দুই বন্ধুর জীবনের ধারা এই-যে এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে— আবার যখন মিলিবে তখন কি এই বিচ্ছেদের শূন্যতা পূরণ হইতে পারিবে? বন্ধুত্বের সম্পূর্ণতা কি এবার ভঙ্গ হয় নাই? জীবনের এমন অখণ্ড, এমন দুর্লভ বন্ধুত্ব! আজ একই রাত্রে বিনয় তাহার এক দিকের শূন্যতা এবং আর-এক দিকের পূর্ণতাকে একসঙ্গে অনুভব করিয়া জীবনের সৃজনপ্রলয়ের সন্ধিকালে স্তব্ধ হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

গোরা যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল দৈবক্রমেই বিনয় তাহাতে যোগ দিতে পারে নাই অথবা গোরা যে জেলে গিয়াছে দৈবক্রমেই সেই কারাদুঃখের ভাগ লওয়া বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে— এ কথা যদি সত্য হইত তবে ইহাতে বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ন হইতে পারিত না। কিন্তু, গোরা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল এবং বিনয় অভিনয় করিতেছিল, ইহা আকস্মিক ব্যাপার নহে। বিনয়ের সমস্ত জীবনের ধারা এমন একটা পথে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ব-বন্ধুত্বের পথ নহে, সেই কারণেই এতদিন পরে এই বাহ্য বিচ্ছেদও সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু, আজ আর কোনো উপায় নাই— সত্যকে অস্বীকার করা আর চলে না; গোরার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এক পথ অনন্যমনে আশ্রয় করা বিনয়ের পক্ষে আজ আর সত্য নহে। কিন্তু, গোরা ও বিনয়ের চিরজীবনের ভালোবাসা কি এই পথভেদের দ্বারাই ভিন্ন হইবে? এই সংশয় বিনয়ের হৃদয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত করিল। সে জানিত, গোরা তাহার সমস্ত বন্ধুত্ব এবং সমস্ত কর্তব্যকে এক লক্ষ্যপথে না টানিয়া চলিতে পারে না। প্রচণ্ড গোরা! তাহার প্রবল ইচ্ছা! জীবনের সকল সম্বন্ধের

দ্বারা তাহার সেই এক ইচ্ছাকেই মহীয়সী করিয়া সে জয়যাত্রায় চলিবে— বিধাতা গোরার প্রকৃতিতে সেই রাজমহিমা অর্পণ করিয়াছেন।

ঠিকা গাড়ি পরেশবাবুর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নামিবার সময় ললিতার যে পা কাঁপিল এবং বাড়িতে প্রবেশ করিবার সময় সে যে জোর করিয়া নিজেকে একটু শক্ত করিয়া লইল, তাহা বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। ললিতা ঝোঁকের মাথায় এবার যে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অপরাধ যে কতখানি তাহার ওজন সে নিজে কিছুতেই আন্দাজ করিতে পারিতেছিল না। ললিতা জানিত, পরেশবাবু তাহাকে এমন কোনো কথাই বলিবেন না যাহাকে ঠিক ভর্ৎসনা বলা যাইতে পারে— কিন্তু, সেইজন্যই পরেশবাবুর চুপ করিয়া থাকাকেই সে সব চেয়ে ভয় করিত।

ললিতার এই সংকোচের ভাব লক্ষ্য করিয়া, বিনয় এরূপ স্থলে তাহার কী কর্তব্য ঠিকটি ভাবিয়া পাইল না। সে সঙ্গে থাকিলে ললিতার সংকোচের কারণ অধিক হইবে কি না তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে একটু দ্বিধার স্বরে ললিতাকে কহিল, "তবে এখন যাই।"

ললিতা তাড়াতাড়ি কহিল, "না, চলুন, বাবার কাছে চলুন।"

ললিতার এই ব্যগ্র অনুরোধে বিনয় মনে মনে আনন্দিত হইয়া উঠিল। বাড়িতে পৌঁছিয়া দিবার পর হইতেই তাহার যে কর্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই, এই একটা আকস্মিক ব্যাপারে ললিতার সঙ্গে তাহার জীবনের যে একটা বিশেষ গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেছে— তাহাই মনে করিয়া বিনয় ললিতার পার্শ্বে যেন একটু বিশেষ জোরের সঙ্গে দাঁড়াইল। তাহার প্রতি ললিতার এই নির্ভর-কল্পনা যেন একটি স্পর্শের মতো তাহার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ললিতা যেন তাহার ডান হাত চাপিয়া ধরিয়াছে। ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল, পরেশবাবু ললিতার এই অসামাজিক হঠকারিতায় রাগ করিবেন, ললিতাকে ভর্ৎসনা করিবেন, তখন বিনয় যথাসম্ভব সমস্ত

দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইবে, ভর্ৎসনার অংশ অসংকোচে গ্রহণ করিবে— বর্মের স্বরূপ হইয়া ললিতাকে সমস্ত আঘাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু, ললিতার ঠিক মনের ভাবটা বিনয় বুঝিতে পারে নাই। সে যে ভর্ৎসনার প্রতিরোধক-স্বরূপেই বিনয়কে ছাড়িতে চাহিল না তাহা নহে। আসল কথা, ললিতা কিছুই চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। সে যাহা করিয়াছে তাহার সমস্ত অংশই পরেশবাবু চক্ষে দেখিবেন এবং বিচারে যে ফল হয় তাহার সমস্তটাই ললিতা গ্রহণ করিবে, এইরূপ তাহার ভাব।

আজ সকাল হইতেই ললিতা বিনয়ের উপর মনে মনে রাগ করিয়া আছে। রাগটা যে অসংগত তাহা সে সম্পূর্ণ জানে— কিন্তু, অসংগত বলিয়া রাগটা কমে না, বরং বাড়ে।

স্টীমারে যত ক্ষণ ছিল ললিতার মনের ভাব অন্যরূপ ছিল। ছেলেবেলা হইতে সে কখনো রাগ করিয়া, কখনো জেদ করিয়া, একটা-না-একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এবারকার ব্যাপারটি গুরুতর। এই নিষিদ্ধ ব্যাপারে বিনয়ও তাহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়াতে সে এক দিকে সংকোচ এবং অন্য দিকে একটা নিগূঢ় হর্ষ অনুভব করিতেছিল। এই হর্ষ যেন নিষেধের সংঘাত দ্বারাই বেশি করিয়া মথিত হইয়া উঠিতেছিল। একজন বাহিরের পুরুষকে সে আজ এমন করিয়া আশ্রয় করিয়াছে, তাহার এত কাছে আসিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে আত্মীয়সমাজের কোনো আড়াল নাই, ইহাতে কতখানি কুণ্ঠার কারণ ছিল— কিন্তু, বিনয়ের স্বাভাবিক ভদ্রতা এমনি সংযমের সহিত একটি আব্রু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল যে, এই আশঙ্কাজনক অবস্থার মাঝখানে বিনয়ের সুকুমার শীলতার পরিচয় ললিতাকে ভারি একটা আনন্দ দান করিতেছিল। যে বিনয় তাহাদের বাড়িতে সকলের সঙ্গে সর্বদা আমোদ-কৌতুক করিত, যাহার কথার বিরাম ছিল না, বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গেও যাহার আত্মীয়তা অবারিত, এ সে বিনয় নহে। সতর্কতার দোহাই দিয়া যেখানে সে অনায়াসেই ললিতার সঙ্গ বেশি করিয়া লইতে পারিত সেখানে বিনয় এমন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল যে,

তাহাতেই ললিতা হৃদয়ের মধ্যে তাহাকে আরও নিকটে অনুভব করিতেছিল। রাত্রে স্টীমারের ক্যাবিনে নানা চিন্তায় তাহার ভালো ঘুম হইতেছিল না; ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে এক সময় মনে হইল, রাত্রি এতক্ষণে প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে ক্যাবিনের দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রিশেষের শিশিরার্দ্র অন্ধকার তখনো নদীর উপরকার মুক্ত আকাশ এবং তীরের বনশ্রেণীকে জড়াইয়া রহিয়াছে— এইমাত্র একটি শীতল বাতাস উঠিয়া নদীর জলে কলধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে, এবং নীচের তলায় এঞ্জিনের খালাসিরা কাজ আরম্ভ করিবে এমনতরো চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ললিতা ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াই দেখিল, অনতিদূরে বিনয় একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া বেতের চৌকির উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই ললিতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি বিনয় ওইখানেই বসিয়া পাহারা দিয়াছে! এত নিকটে, তবু এত দূরে! ডেক হইতে তখনই ললিতা কম্পিতপদে ক্যাবিনে আসিল; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেই হেমন্তের প্রত্যুষে সেই অন্ধকারজড়িত অপরিচিত নদীদৃশ্যের মধ্যে একাকী নিদ্রিত বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের দিক্‌প্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেষ্টন করিয়া তাহার চোখে পড়িল; একটি অনির্বচনীয় গাম্ভীর্যে ও মাধুর্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার পিতার কাছে সে যে দেবতার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে সেই দেবতা যেন দক্ষিণ হস্তে তাহাকে আজ স্পর্শ করিলেন এবং নদীর উপরে এই তরুপল্লবনিবিড় নিদ্রিত তীরে রাত্রির অন্ধকারের সহিত নবীন আলোকের যখন প্রথম নিগূঢ় সম্মিলন ঘটিতেছে, সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে পরিপূর্ণ নক্ষত্রসভায় কোন্‌ একটি দিব্যসংগীত অনাহত মহাবীণায় দুঃসহ আনন্দবেদনার মতো বাজিয়া উঠিল।

এমন সময় ঘুমের ঘোরে বিনয় হাতটা একটু নাড়িবা মাত্রই ললিতা তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার

হাতপায়ের তলদেশ শীতল হইয়া উঠিল, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত সে হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত করিতে পারিল না।

অন্ধকার দূর হইয়া গেল। স্টীমার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ললিতা মুখ-হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া রেল ধরিয়া দাঁড়াইল। বিনয়ও পূর্বেই জাহাজের বাঁশির আওয়াজে জাগিয়া, প্রস্তুত হইয়া, পূর্বতীরে প্রভাতের প্রথম অভ্যুদয় দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ললিতা বাহির হইয়া আসিবা মাত্র সে সংকুচিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই ললিতা ডাকিল, "বিনয়বাবু!"

বিনয় কাছে আসিতেই ললিতা কহিল, "আপনার বোধ হয় রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি।"

বিনয় কহিল, "মন্দ হয় নি।"

ইহার পরে দুইজনে আর কথা হইল না। শিশিরসিক্ত কাশবনের পরপ্রান্তে আসন্ন সূর্যোদয়ের স্বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহারা দুইজনে জীবনে এমন প্রভাত আর কোনো দিন দেখে নাই। আলোক তাহাদিগকে এমন করিয়া কখনো স্পর্শ করে নাই— আকাশ যে শূন্য নহে, তাহা যে বিস্ময়নীরব আনন্দে সৃষ্টির দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে, তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল। এই দুইজনের চিত্তে চেতনা এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে, সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সঙ্গে আজ যেন তাহাদের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইল। কেহ কোনো কথা কহিল না।

স্টীমার কলিকাতায় আসিল। বিনয় ঘাটে একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া ললিতাকে ভিতরে বসাইয়া, নিজে গাড়োয়ানের পাশে গিয়া বসিল। এই দিনের বেলাকার কলিকাতার পথে গাড়ি করিয়া চলিতে চলিতে কেন যে ললিতার মনে উল্‌টা হাওয়া বহিতে লাগিল তাহা কে বলিবে। এই সংকটের সময় বিনয় যে স্টীমারে ছিল, ললিতা যে বিনয়ের সঙ্গে এমন করিয়া জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, বিনয় যে অভিভাবকের মতো তাহাকে গাড়ি করিয়া বাড়ি লইয়া যাইতেছে, ইহার সমস্তই তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। ঘটনা-বশত

বিনয় যে তাহার উপরে একটা কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে, ইহা তাহার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। কেন এমন হইল? রাত্রের সেই সংগীত দিনের কর্মক্ষেত্রের সম্মুখে আসিয়া কেন এমন কঠোর স্বরে থামিয়া গেল?

তাই দ্বারের কাছে আসিয়া বিনয় যখন সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিল 'আমি তবে যাই', তখন ললিতার রাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিল, 'বিনয়বাবু মনে করিতেছেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত হইতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি।' এ সম্বন্ধে তাহার মনে যে লেশমাত্র সংকোচ নাই ইহাই বলের সহিত প্রমাণ করিবার এবং পিতার নিকট সমস্ত জিনিসটাকে সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করিবার জন্য সে বিনয়কে দ্বারের কাছ হইতে অপরাধীর ন্যায় বিদায় দিতে চাহিল না।

বিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধকে সে পূর্বের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে চায়— মাঝখানে কোনো কুণ্ঠা, কোনো মোহের জড়িমা রাখিয়া সে নিজেকে বিনয়ের কাছে খাটো করিতে চায় না।

৩১

বিনয় ও ললিতাকে দেখিবা মাত্র কোথা হইতে সতীশ ছুটিয়া আসিয়া, তাহাদের দুইজনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া উভয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "কই, বড়দিদি এলেন না?"

বিনয় পকেট চাপড়াইয়া এবং চারি দিকে চাহিয়া কহিল, "বড়দিদি! তাই তো, কী হল! হারিয়ে গেছেন।"

সতীশ বিনয়কে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "ইস্, তাই তো, কখ্খনো না। বলো না ললিতাদিদি।"

ললিতা কহিল, "বড়দিদি কাল আসবেন।"

বলিয়া পরেশবাবুর ঘরের দিকে চলিল।

সতীশ ললিতা ও বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "আমাদের বাড়ি

কে এসেছেন দেখবে চলো।"

ললিতা হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "তোর যে আসুক, এখন বিরক্ত করিস নে। এখন বাবার কাছে যাচ্ছি।"

সতীশ কহিল, "বাবা বেরিয়ে গেছেন, তাঁর আসতে দেরি হবে।"

শুনিয়া বিনয় এবং ললিতা উভয়েই ক্ষণকালের জন্য একটা আরাম বোধ করিল। ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কে এসেছে ?"

সতীশ কহিল, "বলব না। আচ্ছা, বিনয়বাবু, বলুন দেখি কে এসেছে। আপনি কখ্‌খনোই বলতে পারবেন না। কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না।"

বিনয় অত্যন্ত অসম্ভব ও অসংগত নাম করিতে লাগিল— কখনো বলিল নবাব সিরাজউদ্দৌলা, কখনো বলিল রাজা নবকৃষ্ণ, একবার নন্দকুমারেরও নাম করিল। এরূপ অতিথিসমাগম যে একেবারেই অসম্ভব, সতীশ তাহারই অকাট্য কারণ দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করিল। বিনয় হার মানিয়া নম্রস্বরে কহিল, "তা বটে, সিরাজউদ্দৌলার যে এ বাড়িতে আসার কতকগুলো গুরুতর অসুবিধা আছে সে কথা আমি এ-পর্যন্ত চিন্তা করে দেখি নি। যা হোক, তোমার দিদি তো আগে তদন্ত করে আসুন, তার পরে যদি প্রয়োজন হয় আমাকে ডাক দিলেই আমি যাব।"

সতীশ কহিল, "না, আপনারা দুজনেই আসুন।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্‌ ঘরে যেতে হবে ?"

সতীশ কহিল, "তেতালার ঘরে।"

তেতালার ছাদের কোণে একটি ছোটো ঘর আছে, তাহার দক্ষিণের দিকে রৌদ্রবৃষ্টি-নিবারণের জন্য একটি ঢালু টালির ছাদ। সতীশের অনুবর্তী দুইজনে সেখানে গিয়া দেখিল, ছোটো একটি আসন পাতিয়া সেই ছাদের নীচে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক চোখে চশমা দিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেছেন। তাঁহার চশমার এক দিককার ভাঙা দণ্ডে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ি তাঁহার কানে জড়ানো। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হইবে। মাথার সামনের দিকে চুল বিরল হইয়া আসিয়াছে কিন্তু গৌরবর্ণ মুখ পরিপক্ক ফলটির

মতো এখনো প্রায় নিটোল রহিয়াছে; দুই ভ্রূর মাঝে একটি উলকির দাগ— গায়ে অলংকার নাই, বিধবার বেশ। প্রথমে ললিতার দিকে চোখ পড়িতেই তাড়াতাড়ি চশমা খুলিয়া বই ফেলিয়া রাখিয়া বিশেষ একটা ঔৎসুক্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; পরক্ষণেই তাহার পশ্চাতে বিনয়কে দেখিয়া দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন। সতীশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মাসিমা, পালাচ্ছ কেন? এই আমাদের ললিতাদিদি, আর ইনি বিনয়বাবু। বড়দিদি কাল আসবেন।"

বিনয়বাবুর এই অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়ই যথেষ্ট হইল; ইতিপূর্বেই বিনয়বাবু সম্বন্ধে আলোচনা যে প্রচুর পরিমাণে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে সতীশের যে-কয়টি বলিবার বিষয় জমিয়াছে কোনো উপলক্ষ পাইলেই তাহা সতীশ বলে এবং হাতে রাখিয়া বলে না।

মাসিমা বলিতে যে এখানে কাহাকে বুঝায় তাহা না বুঝিতে পারিয়া ললিতা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয় এই প্রৌঢ়া রমণীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইতেই ললিতা তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

মাসিমা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে একটি মাদুর বাহির করিয়া পাতিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "বাবা, বোসো। মা, বোসো।"

বিনয় ও ললিতা বসিলে পর তিনি তাঁহার আসনে বসিলেন এবং সতীশ তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিল। তিনি সতীশকে ডান হাত দিয়া নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আমাকে তোমরা জান না, আমি সতীশের মাসি হই। সতীশের মা আমার আপন দিদি ছিলেন।"

এইটুকু পরিচয়ের মধ্যে বেশি কিছু কথা ছিল না, কিন্তু মাসিমার মুখে ও কণ্ঠস্বরে এমন একটি কী ছিল যাহাতে তাঁহার জীবনের সুগভীর শোকের অশ্রুমার্জিত পবিত্র একটি আভাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল। 'আমি সতীশের মাসি হই' বলিয়া তিনি যখন সতীশকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিলেন তখন এই রমণীর জীবনের ইতিহাস কিছুই না জানিয়াও বিনয়ের মন করুণায়

ব্যথিত হইয়া উঠিল। বিনয় বলিয়া উঠিল, "একলা সতীশের মাসিমা হলে চলবে না; তা হলে এতদিন পরে সতীশের সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। একে তো সতীশ আমাকে বিনয়বাবু বলে, দাদা বলে না, তার পরে মাসিমা থেকে বঞ্চিত করবে সে তো কোনোমতেই উচিত হবে না।"

মন বশ করিতে বিনয়ের বিলম্ব হইত না। এই প্রিয়দর্শন প্রিয়ভাষী যুবক দেখিতে দেখিতে মাসিমার মনে সতীশের সঙ্গে দখল ভাগ করিয়া লইল।

মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার মা কোথায়?"

বিনয় কহিল, "আমার নিজের মাকে অনেক দিন হল হারিয়েছি, কিন্তু, আমার মা নেই এমন কথা আমি মুখে আনতে পারব না।"

এই বলিয়া আনন্দময়ীর কথা স্মরণ করিবামাত্র তাহার দুই চক্ষু যেন ভাবের বাষ্পে আর্দ্র হইয়া আসিল।

দুই পক্ষে কথা খুব জমিয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে আজ যে নূতন পরিচয় সে কথা কিছুতেই মনে হইল না। সতীশ এই কথাবার্তার মাঝখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং ললিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

চেষ্টা করিলেও ললিতা নিজেকে সহজে যেন বাহির করিতে পারে না। প্রথম-পরিচয়ের বাধা ভাঙিতে তাহার অনেক সময় লাগে। তা ছাড়া, আজ তাহার মন ভালো ছিল না। বিনয় যে অনায়াসেই এই অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল, ইহা তাহার ভালো লাগিতেছিল না; ললিতার যে সংকট উপস্থিত হইয়াছে বিনয় তাহার গুরুত্ব মনের মধ্যে গ্রহণ না করিয়া যে এমন নিরুদ্‌বিগ্ন হইয়া আছে, ইহাতে বিনয়কে লঘুচিত্ত বলিয়া সে মনে মনে অপবাদ দিল। কিন্তু, মুখ গম্ভীর করিয়া বিষণ্ণভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই বিনয় যে ললিতার অসন্তোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইত তাহা নহে। তাহা হইলে নিশ্চয় ললিতা রাগিয়া মনে মনে এই কথা বলিত, 'আমার সঙ্গেই বাবার বোঝাপড়া; কিন্তু বিনয়বাবু এমন ভাব ধারণ করিতেছেন কেন, যেন উঁহার ঘাড়েই এই দায় পড়িয়াছে।' আসল কথা, কাল রাত্রে

যে আঘাতে সংগীত বাজিয়াছিল আজ দিনের বেলায় তাহাতে ব্যথাই বাজিতেছে— কিছুই ঠিকমত হইতেছে না। আজ তাই ললিতা প্রতি পদে বিনয়ের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়াই করিতেছে; বিনয়ের কোনো ব্যবহারেই এ ঝগড়া মিটিতে পারিত না— কোন্ মূলে সংশোধন হইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

হায় রে, হৃদয় লইয়াই যাহাদের কারবার সেই মেয়েদের ব্যবহারকে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া দোষ দিলে চলিবে কেন। যদি গোড়ায় ঠিক জায়গাটিতে ইহার প্রতিষ্ঠা থাকে তবে হৃদয় এমনি সহজে এমনি সুন্দর চলে যে, যুক্তিতর্ক হার মানিয়া মাথা হেঁট করিয়া থাকে, কিন্তু সেই গোড়ায় যদি লেশমাত্র বিপর্যয় ঘটে তবে বুদ্ধির সাধ্য কী যে কল ঠিক করিয়া দেয়— তখন রাগ-বিরাগ, হাসিকান্না, কী হইতে যে কী ঘটে তাহার হিসাব তলব করিতে যাওয়াই বৃথা।

এ দিকে বিনয়ের হৃদয়যন্ত্রটিও যে বেশ স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল তাহা নহে; তাহার অবস্থা যদি অবিকল পূর্বের মতো থাকিত তবে এই মুহূর্তেই সে ছুটিয়া আনন্দময়ীর কাছে যাইত। গোরার কারাদণ্ডের খবর বিনয় ছাড়া মাকে আর কে দিতে পারে? সে ছাড়া মায়ের সান্ত্বনাই বা আর কে আছে? এই বেদনার কথাটা বিনয়ের মনের তলায় বিষম একটা ভার হইয়া তাহাকে কেবলই পেষণ করিতেছিল— কিন্তু, ললিতাকে এখনি ছাড়িয়া চলিয়া যায় ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে আজ সেই যে ললিতার রক্ষক, ললিতা সম্বন্ধে পরেশবাবুর কাছে তাহার যদি কিছু কর্তব্য থাকে তাহা শেষ করিয়া তাহাকে যাইতে হইবে, এই কথা সে মনকে বুঝাইতেছিল। মন তাহা অতি সামান্য চেষ্টাতেই বুঝিয়া লইয়াছিল; তাহার প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতাই ছিল না। গোরা এবং আনন্দময়ীর জন্য বিনয়ের মনে যত বেদনাই থাক্, আজ ললিতার অতিসন্নিকট অস্তিত্ব তাহাকে এমন আনন্দ দিতে লাগিল— এমন একটা বিস্ফারতা, সমস্ত সংসারের মধ্যে এমন একটা বিশেষ গৌরব— নিজের সত্তার এমন একটা

বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে লাগিল যে, তাহার মনের বেদনাটা মনের নীচের তলাতেই রহিয়া গেল। ললিতার দিকে সে আজ চাহিতে পারিতেছিল না; কেবল ক্ষণে ক্ষণে চোখে আপনি যেটুকু পড়িতেছিল, ললিতার কাপড়ের একটুকু অংশ, কোলের উপর নিশ্চলভাবে স্থিত তাহার একখানি হাত— মুহূর্তের মধ্যে ইহাই তাহাকে পুলকিত করিতে লাগিল।

দেরি হইতে চলিল। পরেশবাবু এখনো তো আসিলেন না। উঠিবার জন্য ভিতর হইতে তাগিদ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল— তাহাকে কোনোমতে চাপা দিবার জন্য বিনয় সতীশের মাসির সঙ্গে একান্তমনে আলাপ করিতে থাকিল। অবশেষে ললিতার বিরক্তি আর বাঁধ মানিল না; সে বিনয়ের কথার মাঝখানে সহসা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি দেরি করছেন কার জন্যে? বাবা কখন আসবেন তার ঠিক নেই। আপনি গৌরবাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?"

বিনয় চমকিয়া উঠিল। ললিতার বিরক্তিস্বর বিনয়ের পক্ষে সুপরিচিত ছিল। সে ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া এক মুহূর্তে একেবারে উঠিয়া পড়িল— হঠাৎ গুণ ছিঁড়িয়া গেলে ধনুক যেমন সোজা হইয়া উঠে তেমনি করিয়া সে দাঁড়াইল। সে দেরি করিতেছিল কাহার জন্য! এখানে যে তাহার কোনো একান্ত প্রয়োজন ছিল এমন অহংকার তো আপনা হইতে বিনয়ের মনে আসে নাই, সে তো দ্বারের নিকট হইতেই বিদায় লইতেছিল, ললিতাই তো তাহাকে অনুরোধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল— অবশেষে ললিতার মুখে এই প্রশ্ন!

বিনয় এমনি হঠাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল যে, ললিতা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। দেখিল, বিনয়ের মুখের স্বাভাবিক সহাস্যতা একেবারে এক ফুৎকারে প্রদীপের আলোর মতো সম্পূর্ণ নিবিয়া গেছে। বিনয়ের এমন ব্যথিত মুখ, তাহার ভাবের এমন অকস্মাৎ পরিবর্তন, ললিতা আর-কখনো দেখে নাই। বিনয়ের দিকে চাহিয়াই তীব্র অনুতাপের জ্বালাময় কষাঘাত তৎক্ষণাৎ ললিতার হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর-এক

প্রান্তে উপরি উপরি বাজিতে লাগিল।

সতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিনয়ের হাত ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া মিনতির স্বরে কহিল, "বিনয়বাবু, বসুন, এখনি যাবেন না। আমাদের বাড়িতে আজ খেয়ে যান। মাসিমা, বিনয়বাবুকে খেতে বলো-না। ললিতাদিদি, কেন বিনয়বাবুকে যেতে বললে!"

বিনয় কহিল, "ভাই সতীশ, আজ না ভাই। মাসিমা যদি মনে রাখেন তবে আর-একদিন এসে প্রসাদ খাব। আজ দেরি হয়ে গেছে।"

কথাগুলো বিশেষ কিছু নয় কিন্তু কণ্ঠস্বরের মধ্যে অশ্রু আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তাহার করুণা সতীশের মাসিমার কানেও বাজিল। তিনি একবার বিনয়ের ও একবার ললিতার মুখের দিকে চকিতের মতো চাহিয়া লইলেন— বুঝিলেন, অদৃষ্টের একটা লীলা চলিতেছে।

অনতিবিলম্বে কোনো ছুতা করিয়া ললিতা উঠিয়া তাহার ঘরে গেল। কতদিন সে নিজেকে নিজে এমন করিয়া কাঁদাইয়াছে।

৩২

বিনয় তখনি আনন্দময়ীর বাড়ির দিকে চলিল। লজ্জায় বেদনায় মিশিয়া মনের মধ্যে ভারি একটা পীড়ন চলিতেছিল। এতক্ষণ কেন সে মার কাছে যায় নাই! কী ভুলই করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, তাহাকে ললিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সব প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া সে যে কলিকাতায় আসিয়াই আনন্দময়ীর কাছে ছুটিয়া যায় নাই, সেজন্য ঈশ্বর তাহাকে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন। অবশেষে আজ ললিতার মুখ হইতে এমন প্রশ্ন শুনিতে হইল, 'গৌরবাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?' কোনো এক মুহূর্তেও এমন বিভ্রম ঘটিতে পারে যখন গৌরবাবুর মার কথা বিনয়ের চেয়ে ললিতার মনে বড়ো হইয়া উঠে! ললিতা তাঁহাকে গৌরবাবুর মা বলিয়া জানে মাত্র, কিন্তু বিনয়ের কাছে তিনি যে জগতের সকল মায়ের একটিমাত্র প্রত্যক্ষ

প্রতিমা।

তখন আনন্দময়ী সদ্য স্নান করিয়া ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন ; বোধ করি বা মনে মনে জপ করিতেছিলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "মা!"

আনন্দময়ী তাহার অবলুণ্ঠিত মাথায় দুই হাত বুলাইয়া কহিলেন, "বিনয়!"

মার মতো এমন কণ্ঠস্বর কার আছে! সেই কণ্ঠস্বরেই বিনয়ের সমস্ত শরীরে যেন করুণার স্পর্শ বহিয়া গেল। সে অশ্রুজল কষ্টে রোধ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "মা, আমার দেরি হয়ে গেছে!"

আনন্দময়ী কহিলেন, "সব কথা শুনেছি বিনয়।"

বিনয় চকিত হইয়া কহিল, "সব কথাই শুনেছ!"

গোরা হাজত হইতেই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া উকিলবাবুর হাত দিয়া পাঠাইয়াছিল। সে যে জেলে যাইবে সে কথা সে নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল।

পত্রের শেষে ছিল—

'কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি একটুও কষ্ট পাইলে চলিবে না। তোমার দুঃখই আমার দণ্ড, আমাকে আর-কোনো দণ্ড ম্যাজিস্ট্রেটের দিবার সাধ্য নাই। একা তোমার ছেলের কথা ভাবিয়ো না মা। আরও অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে ; এই ইচ্ছা এবার যদি পূর্ণ হয় তুমি আমার জন্য ক্ষোভ করিয়ো না।

'মা, তোমার মনে আছে কি না জানি না, সেবার দুর্ভিক্ষের বছরে আমার রাস্তার ধারের ঘরের টেবিলে আমার টাকার থলিটা রাখিয়া আমি পাঁচ মিনিটের জন্য অন্য ঘরে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, থলিটা চুরি গিয়াছে। থলিতে আমার স্কলারশিপের জমানো পঁচাশি টাকা ছিল ; মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, আরও কিছু টাকা জমিলে তোমার পা ধোবার জলের জন্য একটি রুপার ঘটি তৈরি করাইয়া দিব। টাকা চুরি গেলে পর যখন

চোরের প্রতি ব্যর্থ রাগে জ্বলিয়া মরিতেছিলাম তখন ঈশ্বর আমার মনে হঠাৎ একটা সুবুদ্ধি দিলেন, আমি মনে মনে কহিলাম, যে ব্যক্তি আমার টাকা লইয়াছে আজ দুর্ভিক্ষের দিনে তাহাকেই আমি সে টাকা দান করিলাম। যেমনি বলা অমনি আমার মনের নিষ্ফল ক্ষোভ সমস্ত শান্ত হইয়া গেল। আজ আমার মনকে আমি তেমনি করিয়া বলাইয়াছি যে, আমি ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতেছি। আমার মনে কোনো কষ্ট নাই, কাহারও উপরে রাগ নাই। জেলে আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম। সেখানে আহারবিহারের কষ্ট আছে— কিন্তু, এবারে ভ্রমণের সময় নানা ঘরে আতিথ্য লইয়াছি ; সে-সকল জায়গাতে তো নিজের অভ্যাস ও আবশ্যক -মত আরাম পাই নাই। ইচ্ছা করিয়া যাহা গ্রহণ করি সে কষ্ট তো কষ্টই নয় ; জেলের আশ্রয় আজ আমি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করিব ; যতদিন আমি জেলে থাকিব এক দিনও কেহ আমাকে জোর করিয়া সেখানে রাখিবে না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

'পৃথিবীতে যখন আমরা ঘরে বসিয়া অনায়াসেই আহারবিহার করিতে-ছিলাম, বাহিরের আকাশ এবং আলোকে অবাধ সঞ্চরণের অধিকার যে কত বড়ো প্রকাণ্ড অধিকার তাহা অভ্যাসবশত অনুভবমাত্র করিতে পারিতেছিলাম না, সেই মুহূর্তেই পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনা দোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখি নাই— এবার আমি তাহাদের সমান দাগে দাগি হইয়া বাহির হইতে চাই ; পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভালোমানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই না।

'মা, এবার পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হইয়া আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। ঈশ্বর জানেন, পৃথিবীতে যাহারা বিচারের ভার লইয়াছে তাহারাই অধিকাংশ কৃপাপাত্র। যাহারা দণ্ড পায় না, দণ্ড দেয়, তাহাদেরই পাপের শাস্তি জেলের কয়েদিরা ভোগ করিতেছে ; অপরাধ গড়িয়া তুলিতেছে অনেকে মিলিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ইহারাই। যাহারা জেলের বাহিরে আরামে আছে,

সম্মানে আছে, তাহাদের পাপের ক্ষয় কবে কোথায় কেমন করিয়া হইবে তাহা জানি না। আমি সেই আরাম ও সম্মানকে ধিক্‌কার দিয়া মানুষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব— মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, তুমি চোখের জল ফেলিয়ো না। ভৃগুপদাঘাতের চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন ; জগতে ঔদ্ধত্য যেখানে যত অন্যায় আঘাত করিতেছে ভগবানের বুকের সেই চিহ্নকেই গাঢ়তর করিতেছে। সেই চিহ্ন যদি তাঁর অলংকার হয় তবে আমার ভাবনা কী, তোমারই বা দুঃখ কিসের ?'

এই চিঠি পাইয়া আনন্দময়ী মহিমকে গোরার কাছে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহিম বলিলেন, আপিস আছে, সাহেব কোনোমতেই ছুটি দিবে না। বলিয়া গোরার অবিবেচনা ও ঔদ্ধত্য লইয়া তাহাকে যথেষ্ট গালি দিতে লাগিলেন ; কহিলেন, 'উহার সম্পর্কে কোন্‌দিন আমার স্বুদ্ধ চাকরিটি যাইবে।' আনন্দময়ী কৃষ্ণদয়ালকে এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলা অনাবশ্যক বোধ করিলেন। গোরা সম্বন্ধে স্বামীর প্রতি তাঁহার একটি মর্মান্তিক অভিমান ছিল— তিনি জানিতেন, কৃষ্ণদয়াল গোরাকে হৃদয়ের মধ্যে পুত্রের স্থান দেন নাই— এমন-কি, গোরা সম্বন্ধে তাঁহার অন্তঃকরণে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল। গোরা আনন্দময়ীর দাম্পত্যসম্বন্ধকে বিন্ধ্যাচলের মতো বিভক্ত করিয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার এক পারে অতি সতর্ক শুদ্ধাচার লইয়া কৃষ্ণদয়াল একা, এবং তাহার অন্য পারে তাঁহার ম্লেচ্ছ গোরাকে লইয়া একাকিনী আনন্দময়ী। গোরার জীবনের ইতিহাস পৃথিবীতে যে দুজন জানে তাহাদের মাঝখানে যাতায়াতের পথ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই-সকল কারণে সংসারে গোরার প্রতি আনন্দময়ীর স্নেহ নিতান্তই তাঁহার একলার ধন ছিল। এই পরিবারে গোরার অনধিকারে অবস্থানকে তিনি সব দিক দিয়া যত হালকা করিয়া রাখা সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতেন। পাছে কেহ বলে 'তোমার গোরা হইতে এই ঘটিল', 'তোমার গোরার জন্য এই কথা শুনিতে হইল', অথবা 'তোমার গোরা আমাদের এই লোকসান করিয়া দিল', আনন্দময়ীর এই এক নিয়ত ভাবনা ছিল। গোরার সমস্ত দায়

যে তাঁহারই। আবার তাঁহার গোরাও তো সামান্য দুরন্ত গোরা নয়। যেখানে সে থাকে সেখানে তাহার অস্তিত্ব গোপন করিয়া রাখা তো সহজ ব্যাপার নহে। এই তাঁহার কোলের খেপা গোরাকে এই বিরুদ্ধ পরিবারের মাঝখানে এতদিন দিনরাত্রি তিনি সামলাইয়া এতবড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— অনেক কথা শুনিয়াছেন যাহার কোনো জবাব দেন নাই, অনেক দুঃখ সহিয়াছেন যাহার অংশ আর-কাহাকেও দিতে পারেন নাই।

আনন্দময়ী চুপ করিয়া জালনার কাছে বসিয়া রহিলেন; দেখিলেন, কৃষ্ণদয়াল প্রাতঃস্নান সারিয়া ললাটে বাহুতে বক্ষে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কাছে আনন্দময়ী যাইতে পারিলেন না। নিষেধ, নিষেধ, নিষেধ, সর্বত্রই নিষেধ। অবশেষে নিশ্বাস ফেলিয়া আনন্দময়ী উঠিয়া মহিমের ঘরে গেলেন। মহিম তখন মেঝের উপর বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন এবং তাঁহার ভৃত্য স্নানের পূর্বে তাঁহার গায়ে তেল মালিশ করিয়া দিতেছিল। আনন্দময়ী তাঁহাকে কহিলেন, "মহিম, তুমি আমার সঙ্গে একজন লোক দাও, আমি যাই গোরার কী হল দেখে আসি। সে জেলে যাবে বলে মনস্থির করে বসে আছে; যদি তার জেল হয় আমি কি তার আগে তাকে একবার দেখে আসতে পারব না?"

মহিমের বাহিরের ব্যবহার যেমনি হউক, গোরার প্রতি তাঁহার এক প্রকারের স্নেহ ছিল। তিনি মুখে গর্জন করিয়া গেলেন যে 'যাক লক্ষ্মীছাড়া জেলেই যাক— এতদিন যায় নি, এই আশ্চর্য'; এই বলিয়া পরক্ষণেই তাঁহাদের অনুগত পরান ঘোষালকে ডাকিয়া তাহার হাতে উকিল-খরচার কিছু টাকা দিয়া তখনি তাহাকে রওনা করিয়া দিলেন এবং আপিসে গিয়া সাহেবের কাছে ছুটি যদি পান এবং বউ যদি সম্মতি দেন তবে নিজেও সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন।

আনন্দময়ীও জানিতেন, মহিম গোরার জন্য কিছু না করিয়া কখনো থাকিতে পারিবেন না। মহিম যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছেন শুনিয়া তিনি

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি স্পষ্টই জানিতেন, গোরা যেখানে আছে সেই অপরিচিত স্থানে এই সংকটের সময় লোকের কৌতুক কৌতূহল ও আলোচনার মুখে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, এ পরিবারে এমন কেহই নাই। তিনি চোখের দৃষ্টিতে নিঃশব্দ বেদনার ছায়া লইয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। লছমিয়া যখন হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তাহাকে তিরস্কার করিয়া অন্য ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সমস্ত উদ্‌বেগ নিস্তব্ধভাবে পরিপাক করাই তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই তিনি শান্তভাবেই গ্রহণ করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের আক্ষেপ কেবল অন্তর্যামীরই গোচর ছিল।

বিনয় যে আনন্দময়ীকে কী বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু, আনন্দময়ী কাহারও সান্ত্বনাবাক্যের কোনো অপেক্ষা রাখিতেন না; তাঁহার যে দুঃখের কোনো প্রতিকার নাই সে দুঃখ লইয়া অন্য লোকে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসিলে তাঁহার প্রকৃতি সংকুচিত হইয়া উঠিত। তিনি আর-কোনো কথা উঠিতে না দিয়া বিনয়কে কহিলেন, "বিনু, এখনো তোমার স্নান হয় নি দেখছি— যাও, শীঘ্র নেয়ে এসো গে— অনেক বেলা হয়ে গেছে।"

বিনয় স্নান করিয়া আসিয়া যখন আহার করিতে বসিল তখন বিনয়ের পাশে গোরার স্থান শূন্য দেখিয়া আনন্দময়ীর বুকের মধ্যে হাহাকার উঠিল; গোরাকে আজ জেলের অন্ন খাইতে হইতেছে, সে অন্ন নির্মম শাসনের দ্বারা কটু, মায়ের সেবার দ্বারা মধুর নহে, এই কথা মনে করিয়া আনন্দময়ীকেও কোনো ছুতা করিয়া একবার উঠিয়া যাইতে হইল।

৩৩

বাড়ি আসিয়া অসময়ে ললিতাকে দেখিয়াই পরেশবাবু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার এই উদ্দাম মেয়েটি অভূতপূর্বরূপে একটা কিছু কাণ্ড বাধাইয়াছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, আমি চলে এসেছি। কোনোমতেই থাকতে পারলুম না।"

পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কী হয়েছে?"

ললিতা কহিল, "গৌরবাবুকে ম্যাজিস্ট্রেট জেলে দিয়েছে।"

গৌর ইহার মধ্যে কোথা হইতে আসিল, কী হইল, পরেশ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ললিতার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎক্ষণাৎ গোরার মার কথা মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন, একজন লোককে জেলে পাঠাইয়া কতকগুলি নিরপরাধ লোককে যে কিরূপ নিষ্ঠুর দণ্ড দেওয়া হয়, সে কথা যদি বিচারক অন্তঃকরণের মধ্যে অনুভব করিতে পারিতেন তবে মানুষকে জেলে পাঠানো এত সহজ অভ্যস্ত কাজের মতো কখনোই হইতে পারিত না। একজন চোরকে যে দণ্ড দেওয়া গোরাকেও সেই দণ্ড দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে যে সমান অনায়াসসাধ্য হইয়াছে এরূপ বর্বরতা নিতান্তই ধর্মবুদ্ধির অসাড়তা-বশত সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের দৌরাত্ম্য জগতের অন্য সমস্ত হিংস্রতার চেয়ে যে কত ভয়ানক— তাহার পশ্চাতে সমাজের শক্তি, রাজার শক্তি, দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে যে কিরূপ প্রচণ্ড প্রকাণ্ড করিয়া তুলিয়াছে, গোরার কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া তাহা তাঁহার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল।

পরেশবাবুকে এইরূপ চুপ করিয়া ভাবিতে দেখিয়া ললিতা উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বাবা, এ ভয়ানক অন্যায় নয়?"

পরেশবাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্তস্বরে কহিলেন, "গৌর যে কতখানি কী করেছে সে তো আমি ঠিক জানি নে; তবে এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি, গৌর তাঁর কর্তব্যবুদ্ধির প্রবলতার ঝোঁকে হয়তো হঠাৎ আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় যাকে ক্রাইম বলে তা যে গোরার পক্ষে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাতে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু, কী করবে মা— কালের ন্যায়বুদ্ধি এখনো সে পরিমাণে বিবেক

লাভ করে নি। এখনো অপরাধের যে দণ্ড ত্রুটিরও সেই দণ্ড; উভয়কেই একই জেলের একই ঘানি টানতে হয়। এরকম যে সম্ভব হয়েছে কোনো-একজন মানুষকে সেজন্য দোষ দেওয়া যায় না। সমস্ত মানুষের পাপ এজন্য দায়ী।"

হঠাৎ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "তুমি কার সঙ্গে এলে?"

ললিতা বিশেষ একটু জোর করিয়া যেন খাড়া হইয়া কহিল, "বিনয়বাবুর সঙ্গে।"

বাহিরে যতই জোর দেখাক তাহার ভিতরে দুর্বলতা ছিল। বিনয়বাবুর সঙ্গে আসিয়াছে এ কথাটা ললিতা বেশ সহজে বলিতে পারিল না— কোথা হইতে একটু লজ্জা আসিয়া পড়িল এবং সে লজ্জা মুখের ভাবে বাহির হইয়া পড়িতেছে মনে করিয়া তাহার লজ্জা আরও বাড়িয়া উঠিল।

পরেশবাবু এই খামখেয়ালি দুর্জয় মেয়েটিকে তাঁহার অন্যান্য সকল সন্তানের চেয়ে একটু বিশেষ স্নেহই করিতেন। ইহার ব্যবহার অন্যের কাছে নিন্দনীয় ছিল বলিয়াই, ললিতার আচরণের মধ্যে যে একটি সত্যপরতা আছে সেইটিকে তিনি বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, ললিতার যে দোষ সেইটেই বেশি করিয়া লোকের চোখে পড়িবে, কিন্তু ইহার যে গুণ তাহা যতই দুর্লভ হউক-না কেন লোকের কাছে আদর পাইবে না। পরেশবাবু সেই গুণটিকে যত্নপূর্বক সাবধানে আশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, ললিতার দুরন্ত প্রকৃতিকে দমন করিয়া সেই সঙ্গে তাহার ভিতরকার মহত্ত্বকেও দলিত করিতে তিনি চান নাই। তাঁহার অন্য দুইটি মেয়েকে দেখিবা মাত্রই সকলে সুন্দরী বলিয়া স্বীকার করে; তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল, তাহাদের মুখের গড়নেও খুঁত নাই— কিন্তু, ললিতার রঙ তাহাদের চেয়ে কালো, এবং তাহার মুখের কমনীয়তা সম্বন্ধে মতভেদ ঘটে। বরদাসুন্দরী সেইজন্য ললিতার পাত্র জোটা লইয়া সর্বদাই স্বামীর নিকট উদ্‌বেগ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু, পরেশবাবু ললিতার মুখে যে-একটি সৌন্দর্য দেখিতেন তাহা রঙের সৌন্দর্য নহে, গড়নের সৌন্দর্য নহে, তাহা অন্তরের গভীর সৌন্দর্য। তাহার মধ্যে কেবল লালিত্য

নহে, স্বাতন্ত্র্যের তেজ এবং শক্তির দৃঢ়তা আছে— সেই দৃঢ়তা সকলের মনোরম নহে। তাহা লোকবিশেষকে আকর্ষণ করে, কিন্তু অনেককেই দূরে ঠেলিয়া রাখে। সংসারে ললিতা প্রিয় হইবে না, কিন্তু খাঁটি হইবে, ইহাই জানিয়া পরেশবাবু কেমন একটু বেদনার সহিত ললিতাকে কাছে টানিয়া লইতেন— তাহাকে আর-কেহ ক্ষমা করিতেছে না জানিয়াই তাহাকে করুণার সহিত বিচার করিতেন।

যখন পরেশবাবু শুনিলেন, ললিতা একলা বিনয়ের সঙ্গে হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে তখন তিনি এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন, এজন্য ললিতাকে অনেক দিন ধরিয়া অনেক দুঃখ সহিতে হইবে, সে যেটুকু অপরাধ করিয়াছে লোকে তাহার চেয়ে বড়ো অপরাধের দণ্ড তাহার প্রতি বিধান করিবে। সেই কথাটা তিনি চুপ করিয়া ক্ষণকাল ভাবিতেছেন এমন সময় ললিতা বলিয়া উঠিল, "বাবা, আমি দোষ করেছি। কিন্তু, এবার আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের এমন সম্বন্ধ যে তাঁর আতিথ্যের মধ্যে কিছুই সম্মান নেই, কেবলই অনুগ্রহ মাত্র। সেটা সহ্য করেও কি আমার সেখানে থাকা উচিত ছিল ?"

পরেশবাবুর কাছে প্রশ্নটি সহজ বলিয়া বোধ হইল না। তিনি কোনো উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া একটু হাসিয়া ললিতার মাথায় দক্ষিণ হস্ত দিয়া মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন, "পাগলি !"

এই ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে সেদিন অপরাহ্নে পরেশবাবু যখন বাড়ির বাহিরে পায়চারি করিতেছিলেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরেশবাবু গোরার কারাদণ্ড সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন, কিন্তু ললিতার সঙ্গে স্টীমারে আসার কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন না। অন্ধকার হইয়া আসিলে কহিলেন, "চলো, বিনয়, ঘরে চলো।"

বিনয় কহিল, "না, আমি এখন বাসায় যাব।"

পরেশবাবু তাহাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না। বিনয় একবার

চকিতের মতো দোতলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

উপর হইতে ললিতা বিনয়কে দেখিতে পাইয়াছিল। যখন পরেশবাবু একলা ঘরে ঢুকিলেন তখন ললিতা মনে করিল, বিনয় হয়তো আর-একটু পরেই আসিবে। আর-একটু পরেও বিনয় আসিল না। তখন টেবিলের উপরকার ছুটো-একটা বই ও কাগজ-চাপা নাড়াচাড়া করিয়া ললিতা ঘর হইতে চলিয়া গেল। পরেশবাবু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন— তাহার বিষণ্ণ মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "ললিতা, আমাকে একটা ব্রহ্মসংগীত শোনাও।" বলিয়া বাতিটা আড়াল করিয়া দিলেন।

৩৪

পরদিনে বরদাসুন্দরী এবং তাঁহাদের দলের বাকি সকলে আসিয়া পৌঁছিলেন। হারানবাবু ললিতা সম্বন্ধে তাঁহার বিরক্তি সম্বরণ করিতে না পারিয়া বাসায় না গিয়া ইঁহাদের সঙ্গে একেবারে পরেশবাবুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরদাসুন্দরী ক্রোধে ও অভিমানে ললিতার দিকে না তাকাইয়া এবং তাহার সঙ্গে কোনো কথা না কহিয়া একেবারে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। লাবণ্য ও লীলাও ললিতার উপরে খুব রাগ করিয়া আসিয়াছিল। ললিতা এবং বিনয় চলিয়া আসাতে তাহাদের আবৃত্তি ও অভিনয় এমন অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের লজ্জার সীমা ছিল না। সুচরিতা হারানবাবুর ক্রুদ্ধ ও কটু উত্তেজনায়, বরদাসুন্দরীর অশ্রুমিশ্রিত আক্ষেপে, অথবা লাবণ্য-লীলার লজ্জিত নিরুৎসাহে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া ছিল— তাহার নির্দিষ্ট কাজটুকু সে কলের মতো করিয়া গিয়াছিল। আজও সে যন্ত্রচালিতের মতো সকলের পশ্চাতে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সুধীর লজ্জায় এবং অনুতাপে সংকুচিত হইয়া পরেশবাবুর বাড়ির দরজার কাছ হইতেই বাসায় চলিয়া গেল— লাবণ্য তাহাকে বাড়িতে আসিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য না

হইয়া তাহার প্রতি আড়ি করিল।

হারান পরেশবাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "একটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।"

পাশের ঘরে ললিতা ছিল, তাহার কানে কথাটা প্রবেশ করিবা মাত্র সে আসিয়া তাহার বাবার চৌকির পৃষ্ঠদেশে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল এবং হারানবাবুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পরেশবাবু কহিলেন, "আমি ললিতার কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ শুনেছি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আলোচনা করে কোনো ফল নেই।"

হারান শান্ত সংযত পরেশকে নিতান্ত দুর্বলস্বভাব বলিয়া মনে করিতেন। তাই কিছু অবজ্ঞার ভাবে কহিলেন, "ঘটনা তো হয়ে চুকে যায় কিন্তু চরিত্র যে থাকে, সেইজন্যেই যা হয়ে যায় তারও আলোচনার প্রয়োজন আছে। ললিতা আজ যে কাজটি করেছে তা কখনোই সম্ভব হত না যদি আপনার কাছে বরাবর প্রশ্রয় পেয়ে না আসত— আপনি ওর যে কতদূর অনিষ্ট করেছেন তা আজকের ব্যাপার সবটা শুনলে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।"

পরেশবাবু পিছন দিকে তাঁহার চৌকির গাত্রে একটা ঈষৎ আন্দোলন অনুভব করিয়া তাড়াতাড়ি ললিতাকে তাঁহার পাশে টানিয়া আনিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, এবং একটু হাসিয়া হারানকে কহিলেন, "পানুবাবু, যখন সময় আসবে তখন আপনি জানতে পারবেন, সন্তানকে মানুষ করতে স্নেহেরও প্রয়োজন হয়।"

ললিতা এক হাতে তাহার পিতার গলা বেড়িয়া ধরিয়া নত হইয়া তাঁহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, "বাবা, তোমার জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তুমি নাইতে যাও।"

পরেশবাবু হারানের প্রতি লক্ষ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আর-একটু পরে যাব— তেমন বেলা হয় নি।"

ললিতা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "না বাবা, তুমি স্নান করে এসো— তত ক্ষণ পানুবাবুর কাছে আমরা আছি।"

পরেশবাবু যখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন ললিতা একটা চৌকি অধিকার করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিল এবং হারানবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, "আপনি মনে করেন, সকলকেই আপনার সব কথা বলবার অধিকার আছে!"

ললিতাকে সুচরিতা চিনিত। অন্যদিন হইলে ললিতার এরূপ মূর্তি দেখিলে সে মনে মনে উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিত। আজ সে জানলার ধারের চৌকিতে বসিয়া একটা বই খুলিয়া চুপ করিয়া তাহার পাতার দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখাই সুচরিতার চিরদিনের স্বভাব ও অভ্যাস। এই কয়দিন ধরিয়া নানাপ্রকার আঘাতের বেদনা তাহার মনে যতই বেশি করিয়া সঞ্চিত হইতেছিল ততই সে আরও বেশি করিয়া নীরব হইয়া উঠিতেছিল। আজ তাহার এই নীরবতার ভার দুর্বিষহ হইয়াছে— এইজন্য ললিতা যখন হারানের নিকট তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে বসিল তখন সুচরিতার রুদ্ধ হৃদয়ের বেগ যেন মুক্তিলাভ করিবার অবসর পাইল।

ললিতা কহিল, "আমাদের সম্বন্ধে বাবার কী কর্তব্য, আপনি মনে করেন, বাবার চেয়ে আপনি তা ভালো বোঝেন! সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের আপনিই হচ্ছেন হেড্‌মাস্টার!"

ললিতার এইপ্রকার ঔদ্ধত্য দেখিয়া হারানবাবু প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। এইবার তিনি তাহাকে খুব একটা কড়া জবাব দিতে যাইতেছিলেন— ললিতা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে কহিল, "এতদিন আপনার শ্রেষ্ঠতা আমরা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আপনি যদি বাবার চেয়েও বড়ো হতে চান তা হলে এ বাড়িতে আপনাকে কেউ সহ্য করতে পারবে না— আমাদের বেয়ারাটা পর্যন্ত না।"

হারানবাবু বলিয়া উঠিলেন, "ললিতা, তুমি—"

ললিতা তাঁহাকে বাধা দিয়া তীব্রস্বরে কহিল, "চুপ করুন। আপনার কথা আমরা অনেক শুনেছি, আজ আমার কথাটা শুনুন। যদি বিশ্বাস না করেন তবে সুচিদিদিকে জিজ্ঞাসা করবেন— আপনি নিজেকে যত বড়ো

বলে কল্পনা করেন আমার বাবা তার চেয়ে অনেক বেশি বড়ো। এইবার আপনার যা-কিছু উপদেশ আমাকে দেবার আছে আপনি দিয়ে যান।"

হারানবাবুর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, "সুচরিতা!"

সুচরিতা বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিল। হারানবাবু কহিলেন, "তোমার সামনে ললিতা আমাকে অপমান করবে?"

সুচরিতা ধীরস্বরে কহিল, "আপনাকে অপমান করা ওর উদ্দেশ্য নয়—ললিতা বলতে চায় বাবাকে আপনি সম্মান করে চলবেন। তাঁর মতো সম্মানের যোগ্য আমরা তো কাউকেই জানি নে।"

একবার মনে হইল হারানবাবু এখনি চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তিনি উঠিলেন না। মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ বাড়িতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, ইহা তিনি যতই অনুভব করিতেছেন ততই তিনি এখানে আপন আসন দখল করিয়া বসিবার জন্য আরও বেশি পরিমাণে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছেন। ভুলিতেছেন যে, যে আশ্রয় জীর্ণ তাহাকে যতই জোরের সঙ্গে আঁকড়িয়া ধরা যায় তাহা ততই ভাঙিতে থাকে।

হারানবাবু রুষ্ট গাম্ভীর্যের সহিত চুপ করিয়া রহিলেন দেখিয়া ললিতা উঠিয়া গিয়া সুচরিতার পাশে বসিল এবং তাহার সহিত মৃদুস্বরে এমন করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল যেন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই।

ইতিমধ্যে সতীশ ঘরে ঢুকিয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "বড়দিদি, এসো।"

সুচরিতা কহিল, "কোথায় যেতে হবে?"

সতীশ কহিল, "এসো-না, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। ললিতা-দিদি, তুমি বলে দাও নি?"

ললিতা কহিল, "না।"

তাহার মাসির কথা ললিতা সুচরিতার কাছে ফাঁস করিয়া দিবে না,

সতীশের সঙ্গে এইরূপ কথা ছিল ; ললিতা আপন প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিল।

অতিথিকে ছাড়িয়া সুচরিতা যাইতে পারিল না ; কহিল, "বক্তিয়ার, আর-একটু পরে যাচ্ছি— বাবা আগে স্নান করে আসুন।"

সতীশ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কোনোমতে হারানবাবুকে বিলুপ্ত করিতে পারিলে সে চেষ্টার ত্রুটি করিত না। হারানবাবুকে সে অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া তাঁহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। হারানবাবু মাঝে মাঝে সতীশের স্বভাবসংশোধনের চেষ্টা করা ছাড়া তাহার সঙ্গে আর কোনোপ্রকার সংস্রব রাখেন নাই।

পরেশবাবু স্নান করিয়া আসিবা মাত্র সতীশ তাহার দুই দিদিকে টানিয়া লইয়া গেল।

হারান কহিলেন, "সুচরিতার সম্বন্ধে সেই-যে প্রস্তাবটা ছিল, আমি আর বিলম্ব করতে চাই নে। আমার ইচ্ছা, আসছে রবিবারেই সে কাজটা হয়ে যায়।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমার তাতে তো কোনো আপত্তি নেই— সুচরিতার মত হলেই হল।"

হারান। তাঁর তো মত পূর্বেই নেওয়া হয়েছে।

পরেশবাবু। আচ্ছা, তবে সেই কথাই রইল।

৩৫

সেদিন ললিতার নিকট হইতে আসিয়া বিনয়ের মনের মধ্যে কাঁটার মতো একটা সংশয় কেবলই ফিরিয়া ফিরিয়া বিঁধিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, 'পরেশবাবুর বাড়িতে আমার যাওয়াটা কেহ ইচ্ছা করে বা না-করে তাহা ঠিক না জানিয়া আমি গায়ে পড়িয়া সেখানে যাতায়াত করিতেছি। হয়তো সেটা উচিত নহে। হয়তো অনেক বার অসময়ে আমি ইঁহাদিগকে

অস্থির করিয়া তুলিয়াছি। ইহাদের সমাজের নিয়ম আমি জানি না; এ বাড়িতে আমার অধিকার যে কোন্ সীমা পর্যন্ত তাহা আমার কিছুই জানা নাই। আমি হয়তো মূঢ়ের মতো এমন জায়গায় প্রবেশ করিতেছি যেখানে আত্মীয় ছাড়া কাহারও গতিবিধি নিষেধ।'

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, ললিতা হয়তো আজ তাহার মুখের ভাবে এমন একটা কিছু দেখিতে পাইয়াছে যাহাতে সে অপমান বোধ করিয়াছে। ললিতার প্রতি বিনয়ের মনের ভাব যে কী এতদিন তাহা বিনয়ের কাছে স্পষ্ট ছিল না। আজ আর তাহা গোপন নাই। হৃদয়ের ভিতরকার এই নূতন অভিব্যক্তি লইয়া যে কী করিতে হইবে তাহা সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। বাহিরের সঙ্গে ইহার যোগ কী, সংসারের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কী, ইহা কি ললিতার প্রতি অসম্মান, ইহা কি পরেশবাবুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তাহা লইয়া সে সহস্রবার করিয়া তোলা-পাড়া করিতে লাগিল। ললিতার কাছে সে ধরা পড়িয়া গেছে এবং সেই-জন্যই ললিতা তাহার প্রতি রাগ করিয়াছে, এই কথা কল্পনা করিয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

পরেশবাবুর বাড়ি যাওয়া বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব হইল, এবং নিজের বাসার শূন্যতাও যেন একটা ভারের মতো হইয়া তাহাকে চাপিতে লাগিল। পরদিন ভোরের বেলাই সে আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "মা, কিছুদিন আমি তোমার এখানে থাকব।"

আনন্দময়ীকে গোরার বিচ্ছেদশোকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ও বিনয়ের মনের মধ্যে ছিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ীর হৃদয় বিগলিত হইল। কোনো কথা না বলিয়া তিনি সস্নেহে একবার বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বিনয় তাহার খাওয়াদাওয়া সেবাশুশ্রূষা লইয়া বহুবিধ আবদার জুড়িয়া দিল। এখানে তাহার যথোচিত যত্ন হইতেছে না বলিয়া সে মাঝে মাঝে আনন্দময়ীর সঙ্গে মিথ্যা কলহ করিতে লাগিল। সর্বদাই সে গোলমাল

বকাবকি করিয়া আনন্দময়ীকে ও নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। সন্ধ্যার সময় যখন মনকে বাঁধিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইত, তখন বিনয় উৎপাত করিয়া আনন্দময়ীকে তাঁহার সকল গৃহকর্ম হইতে ছিনাইয়া লইয়া ঘরের সম্মুখের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিত ; আনন্দময়ীকে তাঁহার ছেলেবেলার কথা, তাঁহার বাপের বাড়ির গল্প বলাইত— যখন তাঁহার বিবাহ হয় নাই, যখন তিনি তাঁহার অধ্যাপক পিতামহের টোলের ছাত্রদের অত্যন্ত আদরের শিশু ছিলেন, এবং পিতৃহীনা বালিকাকে সকলে মিলিয়া সকল বিষয়েই প্রশ্রয় দিত বলিয়া তাঁহার বিধবা মাতার বিশেষ উদ্‌বেগের কারণ ছিলেন, সেই-সকল দিনের কাহিনী। বিনয় বলিত, "মা, তুমি যে কোনোদিন আমাদের মা ছিলে না সে কথা মনে করলে আমার আশ্চর্য বোধ হয়। আমার বোধ হয়, টোলের ছেলেরা তোমাকে তাদের খুব ছোট্টো এতটুকু মা বলেই জানত। দাদামশায়কে বোধ হয় তুমিই মানুষ করবার ভার নিয়েছিলে।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাদুরের উপরে প্রসারিত আনন্দময়ীর দুই পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া বিনয় কহিল, "মা, ইচ্ছা করে আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি বিধাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিশু হয়ে তোমার ওই কোলে আশ্রয় গ্রহণ করি— কেবল তুমি, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর-কিছুই না থাকে।"

বিনয়ের কণ্ঠে হৃদয়ভারাক্রান্ত একটা ক্লান্তি এমন করিয়া প্রকাশ পাইল যে, আনন্দময়ী ব্যথার সঙ্গে বিস্ময় অনুভব করিলেন। তিনি বিনয়ের কাছে সরিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনু, পরেশ-বাবুদের বাড়ির সব খবর ভালো?"

এই প্রশ্নে হঠাৎ বিনয় লজ্জিত হইয়া চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, 'মার কাছে কিছুই লুকানো চলে না, মা আমার অন্তর্যামী।' কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "হাঁ. তাঁরা তো সকলেই ভালো আছেন।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "আমার বড়ো ইচ্ছা করে, পরেশবাবুর মেয়েদের সঙ্গে আমার চেনা-পরিচয় হয়। প্রথমে তো তাঁদের উপর গোরার মনের

ভাব ভালো ছিল না, কিন্তু ইদানীং তাকে সুদ্ধ যখন তাঁরা বশ করতে পেরেছেন তখন তাঁরা সামান্য লোক হবেন না।"

বিনয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, "আমারও অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে পরেশবাবুর মেয়েদের সঙ্গে যদি কোনোমতে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। পাছে গোরা কিছু মনে করে ব'লে আমি কোনো কথা বলি নি।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়ো মেয়েটির নাম কী?"

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে পরিচয় চলিতে চলিতে যখন ললিতার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল তখন বিনয় সেটাকে কোনোমতে সংক্ষেপে সারিয়া দিবার চেষ্টা করিল। আনন্দময়ী বাধা মানিলেন না। তিনি মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, "শুনেছি ললিতার খুব বুদ্ধি?"

বিনয় কহিল, "তুমি কার কাছে শুনলে?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কেন, তোমারই কাছে।"

পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের মনে কোনো-প্রকার সংকোচ ছিল না। সেই মোহমুক্ত অবস্থায় সে যে আনন্দময়ীর কাছে ললিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া অবাধে আলোচনা করিয়াছিল সে কথা তাহার মনেই ছিল না।

আনন্দময়ী সুনিপুণ মাঝির মতো সমস্ত বাধা বাঁচাইয়া ললিতার কথা এমন করিয়া চালনা করিয়া লইয়া গেলেন যে বিনয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয়ের ইতিহাসের প্রধান অংশগুলি প্রায় সমস্তই প্রকাশ হইল। গোরার কারাদণ্ডের ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া ললিতা যে স্টীমারে একাকিনী বিনয়ের সঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছে সে কথাও বিনয় আজ বলিয়া ফেলিল। বলিতে বলিতে তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল— যে অবসাদে সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া-ছিল তাহা কোথায় কাটিয়া গেল। সে-যে ললিতার মতো এমন একটি আশ্চর্য চরিত্রকে জানিয়াছে এবং এমন করিয়া তাহার কথা কহিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার কাছে একটা পরম লাভ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাত্রে যখন আহারের সংবাদ আসিল এবং কথা ভাঙিয়া গেল তখন হঠাৎ যেন স্বপ্ন

হইতে জাগিয়া বিনয় বুঝিতে পারিল, তাহার মনে যাহা-কিছু কথা ছিল আনন্দময়ীর কাছে তাহা সমস্তই বলা হইয়া গেছে। আনন্দময়ী এমন করিয়া সমস্ত শুনিলেন, এমন করিয়া সমস্ত গ্রহণ করিলেন যে, ইহার মধ্যে যে কিছু লজ্জা করিবার আছে তাহা বিনয়ের মনেই হইল না। আজ পর্যন্ত মার কাছে লুকাইবার কথা বিনয়ের কিছুই ছিল না— অতি তুচ্ছ কথাটিও সে তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত। কিন্তু, পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে আলাপ হইয়া অবধি কোথায় একটা বাধা পড়িয়াছিল। সেই বাধা বিনয়ের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় নাই। আজ ললিতার সম্বন্ধে তাহার মনের কথা সূক্ষ্মদর্শিনী আনন্দময়ীর কাছে এক রকম করিয়া সমস্ত প্রকাশ হইয়া গেছে, তাহা অনুভব করিয়া বিনয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মাতার কাছে তাহার জীবনের এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিবেদন করিতে না পারিলে কথাটা কোনোমতেই নির্মল হইয়া উঠিত না— ইহা তাহার চিন্তার মধ্যে কালির দাগ দিতে থাকিত।

রাত্রে আনন্দময়ী অনেক ক্ষণ এই কথা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলেন। গোরার জীবনে যে সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছিল পরেশবাবুর ঘরেই তাহার একটা মীমাংসা ঘটিতে পারে এই কথা মনে করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যেমন করিয়া হউক, মেয়েদের সঙ্গে একবার দেখা করিতে হইবে।

৩৬

শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ যেন একপ্রকার স্থির হইয়া গেছে এইভাবে মহিম এবং তাহার ঘরের লোকেরা চলিতেছিলেন। শশিমুখী তো বিনয়ের কাছেও আসিত না। শশিমুখীর মার সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় ছিল না বলিলেই হয়। তিনি যে ঠিক লাজুক ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের গোপনচারিণী ছিলেন। তাঁহার ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ। স্বামী ছাড়া তাঁহার আর-সমস্তই তালাচাবির মধ্যে। স্বামীও যে যথেষ্ট খোলা পাইতেন

তাহা নহে— স্ত্রীর শাসনে তাঁহার গতিবিধি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং তাঁহার সঞ্চরণক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। এইরূপ ঘের দিয়া লওয়ার স্বভাববশত শশিমুখীর মা লক্ষ্মীমণির জগৎটি সম্পূর্ণ তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল— সেখানে বাহিরের লোকের ভিতরে এবং ভিতরের লোকের বাহিরে যাওয়ার পথ অবারিত ছিল না। এমন-কি, গোরাও লক্ষ্মীমণির মহলে তেমন করিয়া আমল পাইত না। এই রাজ্যের বিধিব্যবস্থার মধ্যে কোনো দ্বৈধ ছিল না। কারণ, এখানকার বিধানকর্তাও লক্ষ্মীমণি এবং নিম্ন-আদালত হইতে আপিল-আদালত পর্যন্ত সমস্তই লক্ষ্মীমণি— একজিক্যুটিভ এবং জুডিশিয়ালে তো ভেদ ছিলই না, লেজিস্লেটিভও তাহার সহিত জোড়া ছিল। বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে মহিমকে খুব শক্ত লোক বলিয়াই মনে হইত, কিন্তু লক্ষ্মীমণির এলাকার মধ্যে তাঁহার নিজের ইচ্ছা খাটাইবার কোনো পথ ছিল না। সামান্য বিষয়েও না।

লক্ষ্মীমণি বিনয়কে আড়াল হইতে দেখিয়াছিলেন, পছন্দও করিয়াছিলেন। মহিম বিনয়ের বাল্যকাল হইতে গোরার বন্ধুরূপে তাহাকে এমন নিয়ত দেখিয়া আসিয়াছেন যে, অতিপরিচয়বশতই তিনি বিনয়কে নিজের কন্যার পাত্র বলিয়া দেখিতেই পান নাই। লক্ষ্মীমণি যখন বিনয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তখন সহধর্মিণীর বুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। লক্ষ্মীমণি পাকা করিয়াই স্থির করিয়া দিলেন যে, বিনয়ের সঙ্গেই তাঁহার কন্যার বিবাহ হইবে; এই প্রস্তাবের একটা মস্ত সুবিধার কথা তিনি তাঁহার স্বামীর মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন যে, বিনয় তাঁহাদের কাছ হইতে কোনো পণ দাবি করিতে পারিবে না।

বিনয়কে বাড়িতে পাইয়াও দুই-একদিন মহিম তাহাকে বিবাহের কথা বলিতে পারেন নাই। গোরার কারাবাস সম্বন্ধে তাহার মন বিষণ্ণ ছিল বলিয়া তিনি নিরস্ত ছিলেন।

আজ রবিবার ছিল। গৃহিণী মহিমের সাপ্তাহিক দিবানিদ্রাটি সম্পূর্ণ হইতে দিলেন না। বিনয় নূতন-প্রকাশিত বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' লইয়া

আনন্দময়ীকে শুনাইতেছিল— পানের ডিবা হাতে লইয়া সেইখানে আসিয়া মহিম তক্তপোশের উপরে ধীরে ধীরে বসিলেন।

প্রথমত বিনয়কে একটা পান দিয়া তিনি গোরার উচ্ছৃঙ্খল নির্বুদ্ধিতা লইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহার পরে তাহার খালাস হইতে আর-কয়দিন বাকি তাহা আলোচনা করিতে গিয়া অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, অঘ্রান মাসের প্রায় অর্ধেক হইয়া আসিয়াছে।

কহিলেন, "বিনয়, তুমি যে বলেছিলে, অঘ্রান মাসে তোমাদের বংশে বিবাহ নিষেধ আছে, সেটা কোনো কাজের কথা নয়। একে তো পাঁজি-পুঁথিতে নিষেধ ছাড়া কথাই নেই, তার উপরে যদি ঘরের শাস্ত্র বানাতে থাক তা হলে বংশরক্ষা হবে কী করে!"

বিনয়ের সংকট দেখিয়া আনন্দময়ী কহিলেন, "শশিমুখীকে এতটুকু-বেলা থেকে বিনয় দেখে আসছে— ওকে বিয়ে করার কথা ওর মনে লাগছে না; সেইজন্যেই অঘ্রান মাসের ছুতো করে বসে আছে।"

মহিম কহিলেন, "সে কথা তো গোড়ায় বললেই হত।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "নিজের মন বুঝতেও যে সময় লাগে। পাত্রের অভাব কী আছে মহিম! গোরা ফিরে আসুক, সে তো অনেক ভালো ছেলেকে জানে— সে একটা ঠিক করে দিতে পারবে।"

মহিম মুখ অন্ধকার করিয়া কহিলেন, "হুঁ!" খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তাহার পরে কহিলেন, "মা, তুমি যদি বিনয়ের মন ভাঙিয়ে না দিতে তা হলে ও এ কাজে আপত্তি করত না।"

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কী একটা বলিতে যাইতেছিল; আনন্দময়ী বাধা দিয়া কহিলেন, "তা, সত্য কথা বলছি মহিম, আমি ওকে উৎসাহ দিতে পারি নি। বিনয় ছেলেমানুষ, ও হয়তো না বুঝে একটা কাজ করে বসতেও পারত, কিন্তু শেষকালে ভালো হত না।"

আনন্দময়ী বিনয়কে আড়ালে রাখিয়া নিজের 'পরেই মহিমের রাগের ধাক্কাটা গ্রহণ করিলেন। বিনয় তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজের দুর্বলতায়

লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে নিজের অসম্মতি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে মহিম আর অপেক্ষা না করিয়া মনে মনে এই বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন যে, বিমাতা কখনো আপন হয় না।

মহিম যে এ কথা মনে করিতে পারেন এবং বিমাতা বলিয়া তিনি যে সংসারের বিচারক্ষেত্রে বরাবর আসামি-শ্রেণীতেই ভুক্ত আছেন, আনন্দময়ী তাহা জানিতেন। কিন্তু, লোকে কী মনে করিবে এ কথা ভাবিয়া চলা তাঁহার অভ্যাসই ছিল না। যেদিন তিনি গোরাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন সেইদিন হইতেই লোকের আচার, লোকের বিচার হইতে, তাঁহার প্রকৃতি একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া গেছে। সেদিন হইতে তিনি এমন-সকল আচরণ করিয়া আসিতেছেন যাহাতে লোকে তাঁহার নিন্দাই করে। তাঁহার জীবনের মর্মস্থানে যে একটি সত্যগোপন তাঁহাকে সর্বদা পীড়া দিতেছে লোকনিন্দাই তাঁহাকে সেই পীড়া হইতে কতকটা পরিমাণে মুক্তিদান করে। লোকে যখন তাঁহাকে খৃস্টান বলিত তিনি গোরাকে কোলে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, 'ভগবান জানেন খৃস্টান বলিলে আমার নিন্দা হয় না।' এমনি করিয়া ক্রমে সকল বিষয়েই লোকের কথা হইতে নিজের ব্যবহারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল। এইজন্য মহিম তাঁহাকে মনে মনে বা প্রকাশ্যে বিমাতা বলিয়া লাঞ্ছিত করিলেও তিনি নিজের পথ হইতে বিচলিত হইতেন না।

আনন্দময়ী কহিলেন, "বিনু, তুমি পরেশবাবুদের বাড়ি অনেক দিন যাও নি।"

বিনয় কহিল, "অনেক দিন আর কই হল?"

আনন্দময়ী। স্টীমার থেকে আসার পরদিন থেকে তো একবারও যাও নি।

সেও তো বেশিদিন নহে। কিন্তু, বিনয় জানিত, মাঝে পরেশবাবুর বাড়ি তাহার যাতায়াত এত বাড়িয়াছিল যে, আনন্দময়ীর পক্ষেও তাহার দর্শন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। সে হিসাবে পরেশবাবুর বাড়ি অনেক দিন যাওয়া

হয় নাই, এবং লোকের তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে বটে।

বিনয় নিজের ধুতির প্রান্ত হইতে একটা সুতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল, "মাজি, কাঁহাসে মায়ীলোক আয়া।"

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। কে আসিল, কোথা হইতে আসিল, খবর লইতে লইতেই সুচরিতা ও ললিতা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনয়ের ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া ঘটিল না; সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুজনে আনন্দময়ীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। ললিতা বিনয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিল না; সুচরিতা তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল, "ভালো আছেন?"

আনন্দময়ীর দিকে চাহিয়া সে কহিল, "আমরা পরেশবাবুর বাড়ি থেকে আসছি।"

আনন্দময়ী তাহাদিগকে আদর করিয়া বসাইয়া কহিলেন, "আমাকে সে পরিচয় দিতে হবে না। তোমাদের দেখি নি, মা, কিন্তু তোমাদের আপনার ঘরের ব'লেই জানি।"

দেখিতে দেখিতে কথা জমিয়া উঠিল। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া সুচরিতা তাহাকে আলাপের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল; মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অনেক দিন আমাদের ওখানে যান নি যে?"

বিনয় ললিতার দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া লইয়া কহিল, "ঘন ঘন বিরক্ত করলে পাছে আপনাদের স্নেহ হারাই, মনে এই ভয় হয়।"

সুচরিতা একটু হাসিয়া কহিল, "স্নেহও যে ঘন ঘন বিরক্তির অপেক্ষা রাখে সে আপনি জানেন না বুঝি?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা ও খুব জানে মা। কী বলব তোমাদের,

সমস্ত দিন ওর ফর্মাশে আর আবদারে আমার যদি একটু অবসর থাকে।"

এই বলিয়া স্নিগ্ধদৃষ্টি-দ্বারা বিনয়কে নিরীক্ষণ করিলেন।

বিনয় কহিল, "ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য দিয়েছেন, আমাকে দিয়ে তারই পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছেন।"

সুচরিতা ললিতাকে একটু ঠেলা দিয়া কহিল, "শুনছিস ভাই ললিতা? আমাদের পরীক্ষাটা বুঝি শেষ হয়ে গেল! পাস করতে পারি নি বুঝি?"

ললিতা এ কথায় কিছুমাত্র যোগ দিল না দেখিয়া আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "এবার আমাদের বিনু নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা করছেন। তোমাদের ও যে কী চক্ষে দেখেছে সে তো তোমরা জান না। সন্ধেবেলায় তোমাদের কথা ছাড়া কথা নেই। আর, পরেশবাবুর কথা উঠলে ও তো একেবারে গলে যায়।"

আনন্দময়ী ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন; সে খুব জোর করিয়া চোখ তুলিয়া রাখিল বটে, কিন্তু বৃথা লাল হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোমার বাবার জন্যে ও কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ওর দলের লোকেরা তো ওকে ব্রাহ্ম বলে জাতে ঠেলবার জো করেছে।— বিনু, অমন অস্থির হয়ে উঠলে চলবে না, বাছা, সত্যি কথাই বলছি। এতে লজ্জা করবারও তো কোনো কারণ দেখি নে। কী বল মা?"

এবার ললিতার মুখের দিকে চাহিতেই তাহার চোখ নামিয়া পড়িল। সুচরিতা কহিল, "বিনয়বাবু যে আমাদের আপনার লোক বলে জানেন সে আমরা খুব জানি— কিন্তু সে যে কেবল আমাদেরই গুণে তা নয়, সে ওঁর নিজের ক্ষমতা।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা ঠিক বলতে পারি নে মা। ওকে তো এতটুকুবেলা থেকে দেখছি, এতদিন ওর বন্ধুর মধ্যে এক আমার গোরাই ছিল। এমন-কি, আমি দেখেছি, ওদের নিজের দলের লোকের সঙ্গেও বিনয় মিলতে পারে না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ওর দুদিনের আলাপে এমন

হয়েছে যে আমরাও ওর আর নাগাল পাই নে। ভেবেছিলুম এই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আমাকেও ওরই দলে ভিড়তে হবে। তোমরা সকলকেই হার মানাবে।"

এই বলিয়া আনন্দময়ী একবার ললিতার ও একবার সুচরিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি-দ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

সুচরিতা বিনয়ের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া সদয়চিত্তে কহিল, "বিনয়বাবু, বাবা এসেছেন; তিনি বাইরে কৃষ্ণদয়ালবাবুর সঙ্গে কথা কচ্ছেন।"

শুনিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। তখন গোরা ও বিনয়ের অসামান্য বন্ধুত্ব লইয়া আনন্দময়ী আলোচনা করিতে লাগিলেন। শ্রোতা দুই জনে যে উদাসীন নহে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকি ছিল না। আনন্দময়ী জীবনে এই দুটি ছেলেকেই তাঁহার মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছেন; সংসারে ইহাদের চেয়ে বড়ো তাঁহার আর-কেহ ছিল না। বালিকার পূজার শিবের মতো ইহাদিগকে তিনি নিজের হাতেই গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ইহারাই তাঁহার সমস্ত আরাধনা গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার মুখে তাঁহার এই দুটি ক্রোড়দেবতার কাহিনী স্নেহরসে এমন মধুর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, সুচরিতা এবং ললিতা অতৃপ্তহৃদয়ে শুনিতে লাগিল। গোরা এবং বিনয়ের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, কিন্তু আনন্দময়ীর মতো এমন মায়ের এমন স্নেহের ভিতর দিয়া তাহাদের সঙ্গে যেন আর-একটু বিশেষ করিয়া, নূতন করিয়া পরিচয় হইল।

আনন্দময়ীর সঙ্গে আজ জানাশুনা হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি ললিতার রাগ আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। ললিতার মুখে উষ্ণবাক্য শুনিয়া আনন্দময়ী হাসিলেন। কহিলেন, "মা, গোরা আজ জেলখানায় এ দুঃখ যে আমাকে কিরকম বেজেছে তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু, সাহেবের উপর আমি রাগ করতে পারি নি। আমি তো গোরাকে জানি, সে যেটাকে ভালো বোঝে তার কাছে আইনকানুন কিছুই মানে না। যদি না মানে তবে যারা বিচারকর্তা তারা তো জেলে পাঠাবেই; তাতে তাদের দোষ দিতে যাব

কেন? গোরার কাজ গোরা করেছে, ওদের কর্তব্য ওরা করেছে— এতে যাদের দুঃখ পাবার তারা দুঃখ পাবেই। আমার গোরার চিঠি যদি পড়ে দেখ, মা, তা হলে বুঝতে পারবে, ও দুঃখকে ভয় করে নি, কারও উপর মিথ্যে রাগও করে নি— যাতে যা ফল হয় তা সমস্ত নিশ্চয় জেনেই কাজ করেছে।"

এই বলিয়া গোরার সযত্নরক্ষিত চিঠিখানি বাক্স হইতে বাহির করিয়া সুচরিতার হাতে দিলেন। কহিলেন, "মা, তুমি চেঁচিয়ে পড়ো, আমি আর-একবার শুনি।"

গোরার সেই আশ্চর্য চিঠিখানি পড়া হইয়া গেলে পর তিন জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার চোখের প্রান্ত আঁচল দিয়া মুছিলেন। সে যে চোখের জল তাহাতে শুধু মাতৃহৃদয়ের ব্যথা নহে, তাহার সঙ্গে আনন্দ এবং গৌরব মিশিয়া ছিল। তাঁহার গোরা কি যে-সে গোরা! ম্যাজিস্ট্রেট তাহার কসুর মাপ করিয়া তাহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিবেন, সে কি তেমনি গোরা! সে যে অপরাধ সমস্ত স্বীকার করিয়া জেলের দুঃখ ইচ্ছা করিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে। তাহার সে দুঃখের জন্য কাহারও সহিত কোনো কলহ করিবার নাই। গোরা তাহা অকাতরে বহন করিতেছে এবং আনন্দময়ীও ইহা সহ্য করিতে পারিবেন।

ললিতা আশ্চর্য হইয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্ম-পরিবারের সংস্কার ললিতার মনে খুব দৃঢ় ছিল। যে মেয়েরা আধুনিক প্রথায় শিক্ষা পায় নাই এবং যাহাদিগকে সে 'হিঁদুবাড়ির মেয়ে' বলিয়া জানিত, তাহাদের প্রতি ললিতার শ্রদ্ধা ছিল না। শিশুকালে বরদাসুন্দরী তাহাদের যে অপরাধের প্রতি লক্ষ করিয়া বলিতেন 'হিঁদুবাড়ির মেয়েরাও এমন কাজ করে না' সে অপরাধের জন্য ললিতা বরাবর একটু বিশেষ করিয়াই মাথা হেঁট করিয়াছে। আজ আনন্দময়ীর মুখের কয়টি কথা শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণ বার বার করিয়া বিস্ময় অনুভব করিতেছে। যেমন বল তেমনি শান্তি, তেমনি আশ্চর্য সদ্‌বিবেচনা। অসংযত হৃদয়াবেগের জন্য ললিতা নিজেকে

এই রমণীর কাছে খুবই খর্ব করিয়া অনুভব করিল। তাহার মনের ভিতরে আজ ভারী একটা ক্ষুব্ধতা ছিল, সেইজন্য সে বিনয়ের মুখের দিকে চায় নাই, তার সঙ্গে কথাও কয় নাই। কিন্তু আনন্দময়ীর স্নেহে করুণায় ও শান্তিতে মণ্ডিত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার বুকের ভিতরকার সমস্ত বিদ্রোহের তাপ যেন জুড়াইয়া গেল, চারি দিকের সকলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ সহজ হইয়া আসিল। ললিতা আনন্দময়ীকে কহিল, "গৌরবাবু যে এত শক্তি কোথা থেকে পেয়েছেন তা আপনাকে দেখে আজ বুঝতে পারলুম।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "ঠিক বোঝ নি। গোরা যদি আমার সাধারণ ছেলের মতো হত তা হলে আমি কোথা থেকে বল পেতুম? তা হলে কি তার দুঃখ আমি এমন করে সহ্য করতে পারতুম?"

ললিতার মনটা আজ কেন যে এতটা বিকল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একটু ইতিহাস বলা আবশ্যক।

এ কয়দিন প্রত্যহ সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই প্রথম কথা ললিতার মনে এই জাগিয়াছে যে, বিনয়বাবু আসিবেন না। অথচ সমস্ত দিনই তাহার মন এক মুহূর্তের জন্যও বিনয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণে ক্ষণে সে কেবলই মনে করিয়াছে, বিনয় হয়তো আসিয়াছে, হয়তো সে উপরে না আসিয়া নীচের ঘরে পরেশবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এইজন্য দিনের মধ্যে কতবার সে অকারণে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়াছে তাহার ঠিক নাই। অবশেষে দিন যখন অবসান হয়, রাত্রে যখন সে বিছানায় শুইতে যায় তখন সে নিজের মনখানা লইয়া কী যে করিবে ভাবিয়া পায় না। বুক ফাটিয়া কান্না আসে, সঙ্গে সঙ্গে রাগ হইতে থাকে; কাহার উপরে রাগ বুঝিয়া উঠাই শক্ত। রাগ বুঝি নিজের উপরেই। কেবলই মনে হয়, 'একী হইল! আমি বাঁচিব কী করিয়া! কোনো দিকে তাকাইয়া যে কোনো রাস্তা দেখিতে পাই না। এমন করিয়া কতদিন চলিবে!'

ললিতা জানে, বিনয় হিন্দু; কোনোমতেই বিনয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না। অথচ নিজের হৃদয়কে কোনোমতেই বশ মানাইতে না

পারিয়া লজ্জায় ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেছে। বিনয়ের হৃদয় যে তাহার প্রতি বিমুখ নহে, এ কথা সে বুঝিয়াছে; বুঝিয়াছে বলিয়াই নিজেকে সম্বরণ করা তাহার পক্ষে আজ এত কঠিন হইয়াছে। সেইজন্যই সে যখন উতলা হইয়া বিনয়ের আশাপথ চাহিয়া থাকে সেই সঙ্গেই তাহার মনের ভিতরে একটা ভয় হইতে থাকে, পাছে বিনয় আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া নিজের সঙ্গে টানাটানি করিতে করিতে আজ সকালে তাহার ধৈর্য আর বাঁধ মানিল না! তাহার মনে হইল, বিনয় না-আসাতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা কেবলই অশান্ত হইয়া উঠিতেছে; একবার দেখা হইলেই এই অস্থিরতা দূর হইয়া যাইবে।

সকালবেলা সে সতীশকে নিজের ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। সতীশ আজকাল মাসিকে পাইয়া বিনয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বচর্চার কথা এক রকম ভুলিয়াই ছিল। ললিতা তাহাকে কহিল, "বিনয়বাবুর সঙ্গে তোর বুঝি ঝগড়া হয়ে গেছে!"

সে এই অপবাদ সতেজে অস্বীকার করিল। ললিতা কহিল, "ভারী তো তোর বন্ধু। তুইই কেবল বিনয়বাবু-বিনয়বাবু করিস, তিনি তো ফিরেও তাকান না।"

সতীশ কহিল, "ইস, তাই তো! কখ্খনো না।"

পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সতীশকে নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার জন্য এমনি করিয়া বারম্বার গলার জোর প্রয়োগ করিতে হয়। আজ প্রমাণকে তাহার চেয়েও দৃঢ়তর করিবার জন্য সে তখনই বিনয়ের বাসায় ছুটিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তিনি যে বাড়িতে নেই, তাই জন্যে আসতে পারেন নি।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "এ ক'দিন আসেন নি কেন?"

সতীশ কহিল, "ক'দিনই যে ছিলেন না।"

তখন ললিতা সুচরিতার কাছে গিয়া কহিল, "দিদিভাই, গৌরবাবুর মায়ের কাছে আমাদের কিন্তু একবার যাওয়া উচিত।"

সুচরিতা কহিল, "তাঁদের সঙ্গে যে পরিচয় নেই।"

ললিতা কহিল, "বাঃ, গৌরবাবুর বাপ-যে বাবার ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন।"

সুচরিতার মনে পড়িয়া গেল ; কহিল, "হাঁ, তা বটে।"

সুচরিতাও অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল, "ললিতাভাই, তুমি যাও, বাবার কাছে বলো গে।"

ললিতা কহিল, "না, আমি বলতে পারব না, তুমি বলো গে।"

শেষকালে সুচরিতাই পরেশবাবুর কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, "ঠিক বটে, এতদিন আমাদের যাওয়া উচিত ছিল।"

আহারের পর যাওয়ার কথাটা যখনি স্থির হইয়া গেল তখনি ললিতার মন বাঁকিয়া উঠিল। তখন আবার কোথা হইতে অভিমান এবং সংশয় আসিয়া তাহাকে উল্‌টা দিকে টানিতে লাগিল। সুচরিতাকে গিয়া সে কহিল, "দিদি, তুমি বাবার সঙ্গে যাও। আমি যাব না।"

সুচরিতা কহিল, "সে কি হয়! তুই না গেলে আমি একলা যেতে পারব না। লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার— চল্‌ ভাই, গোল করিস নে।"

অনেক অনুনয়ে ললিতা গেল। কিন্তু বিনয়ের কাছে সে যে পরাস্ত হইয়াছে ; বিনয় অনায়াসেই তাহাদের বাড়ি না আসিয়া পারিল আর সে আজ বিনয়কে দেখিতে ছুটিয়াছে, এই পরাভবের অপমানে তাহার বিষম একটা রাগ হইতে লাগিল। বিনয়কে এখানে দেখিতে পাইবার আশাতেই আনন্দময়ীর বাড়ি আসিবার জন্য যে তাহার এতটা আগ্রহ জন্মিয়াছিল এই কথাটা সে মনে মনে একেবারে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নিজের সেই জিদ বজায় রাখিবার জন্য, না বিনয়ের দিকে তাকাইল, না তাহার নমস্কার ফিরাইয়া দিল, না তাহার সঙ্গে একটা কথা কহিল। বিনয় মনে করিল, ললিতার কাছে তাহার মনের গোপন কথাটা ধরা পড়িয়াছে বলিয়াই সে অবজ্ঞার দ্বারা তাহাকে এমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে। ললিতা যে তাহাকে ভালোবাসিতেও পারে, এ কথা অনুমান

করিবার উপযুক্ত আত্মাভিমান বিনয়ের ছিল না।

বিনয় আসিয়া সংকোচে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, "পরেশবাবু এখন বাড়ি যেতে চাচ্ছেন, এঁদের সকলকে খবর দিতে বললেন।"

ললিতা যাহাতে তাহাকে না দেখিতে পায় এমন করিয়াই বিনয় দাঁড়াইয়াছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "সে কি হয়! কিছু মিষ্টিমুখ না করে বুঝি যেতে পাবেন! আর বেশি দেরি হবে না। তুমি এখানে একটু বোসো বিনয়, আমি একবার দেখে আসি। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঘরের মধ্যে এসে বোসো।"

বিনয় ললিতার দিকে আড় করিয়া কোনোমতে দূরে এক জায়গায় বসিল। যেন বিনয়ের প্রতি তাহার ব্যবহারের কোনো বৈলক্ষণ্য হয় নাই এমনি সহজভাবে ললিতা কহিল, "বিনয়বাবু, আপনার বন্ধু সতীশকে আপনি একেবারে ত্যাগ করেছেন কি না জানবার জন্যে, সে আজ সকালে আপনার বাড়ি গিয়েছিল যে।"

হঠাৎ দৈববাণী হইলে মানুষ যেমন আশ্চর্য হইয়া যায় সেইরূপ বিস্ময়ে বিনয় চমকিয়া উঠিল। তাহার সেই চমকটা দেখা গেল-বলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যের সঙ্গে কোনো জবাব করিতে পারিল না; মুখ ও কর্ণমূল লাল করিয়া কহিল, "সতীশ গিয়েছিল না কি? আমি তো বাড়িতে ছিলুম না।"

ললিতার এই সামান্য একটা কথায় বিনয়ের মনে একটা অপরিমিত আনন্দ জন্মিল। এক মুহূর্তে বিশ্বজগতের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড সংশয় যেন নিশ্বাসরোধকর দুঃস্বপ্নের মতো দূর হইয়া গেল। যেন এইটুকু ছাড়া পৃথিবীতে তাহার কাছে প্রার্থনীয় আর-কিছু ছিল না। তার মন বলিতে লাগিল, 'বাঁচিলাম, বাঁচিলাম।'— ললিতা রাগ করে নাই, ললিতা তাহার প্রতি কোনো সন্দেহ করিতেছে না।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাধা কাটিয়া গেল। সুচরিতা হাসিয়া কহিল,

"বিনয়বাবু হঠাৎ আমাদের নখী দন্তী শৃঙ্গী অস্ত্রপাণি কিম্বা ঐরকম একটা কিছু ব'লে সন্দেহ করে বসেছেন !"

বিনয় কহিল, "পৃথিবীতে যারা মুখ ফুটে নালিশ করতে পারে না, চুপ করে থাকে, তারাই উল্‌টে আসামি হয়। দিদি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না— তুমি নিজে কত দূরে চলে গিয়েছ, এখন অন্যকে দূর বলে মনে করছ।"

বিনয় আজ প্রথম সুচরিতাকে দিদি বলিল। সুচরিতার কানে তাহা মিষ্ট লাগিল, বিনয়ের প্রতি প্রথম-পরিচয় হইতেই সুচরিতার যে-একটি সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল এই 'দিদি' সম্বোধন মাত্রেই তাহা যেন একটি স্নেহপূর্ণ বিশেষ আকার ধারণ করিল।

পরেশবাবু তাঁহার মেয়েদের লইয়া যখন বিদায় লইয়া গেলেন তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া গেছে। বিনয় আনন্দময়ীকে কহিল, "মা, আজ তোমাকে কোনো কাজ করতে দেব না। চলো উপরের ঘরে।"

বিনয় তাহার চিত্তের উদ্‌বেলতা সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। আনন্দময়ীকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া মেঝের উপরে নিজের হাতে মাদুর পাতিয়া তাঁহাকে বসাইল। আনন্দময়ী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনু, কী, তোর কথাটা কী ?"

বিনয় কহিল, "আমার কোনো কথা নেই, তুমি কথা বলো।"

পরেশবাবুর মেয়েদিগকে আনন্দময়ীর কেমন লাগিল সেই কথা শুনিবার জন্যই বিনয়ের মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "বেশ, এইজন্যে তুই বুঝি আমাকে ডেকে আনলি ! আমি বলি, বুঝি কোনো কথা আছে।"

বিনয় কহিল, "না ডেকে আনলে এমন সূর্যাস্তটি তো দেখতে পেতে না।"

সেদিন কলিকাতার ছাদগুলির উপরে অগ্রহায়ণের সূর্য মলিনভাবেই অস্ত যাইতেছিল, বর্ণচ্ছটার কোনো বৈচিত্র্য ছিল না, আকাশের প্রান্তে ধূমলবর্ণের বাষ্পের মধ্যে সোনার আভা অস্পষ্ট হইয়া জড়াইয়া ছিল। কিন্তু,

এই ম্লান সন্ধ্যার ধূসরতাও আজ বিনয়ের মনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, চারি দিক তাহাকে যেন নিবিড় করিয়া ঘিরিয়াছে, আকাশ তাহাকে যেন স্পর্শ করিতেছে।

আনন্দময়ী কহিলেন, "মেয়ে দুটি বড়ো লক্ষ্মী।"

বিনয় এই কথাটাকে থামিতে দিল না। নানা দিক দিয়া এই আলোচনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিল। পরেশবাবুর মেয়েদের সম্বন্ধে কত-দিনকার কত ছোটোখাটো ঘটনার কথা উঠিয়া পড়িল— তাহার অনেক-গুলিই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেই অগ্রহায়ণের ম্লানায়মান নিভৃত সন্ধ্যায় নিরালা ঘরে বিনয়ের উৎসাহ এবং আনন্দময়ীর ঔৎসুক্য -দ্বারা এই-সকল ক্ষুদ্র গৃহকোণের অখ্যাত ইতিহাসখণ্ড একটি গম্ভীর মহিমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী হঠাৎ এক সময়ে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সুচরিতার সঙ্গে যদি গোরার বিয়ে হতে পারে তো বড়ো খুশি হই।"

বিনয় লাফাইয়া উঠিল ; কহিল, "মা, এ কথা আমি অনেকবার ভেবেছি। ঠিক গোরার উপযুক্ত সঙ্গিনী।"

আনন্দময়ী। কিন্তু, হবে কি ?

বিনয়। কেন হবে না ? আমার মনে হয়, গোরা যে সুচরিতাকে পছন্দ করে না তা নয়।

গোরার মন যে কোনো এক জায়গায় আকৃষ্ট হইয়াছে আনন্দময়ীর কাছে তাহা অগোচর ছিল না। সে মেয়েটি যে সুচরিতা তাহাও তিনি বিনয়ের নানা কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আনন্দময়ী কহিলেন, "কিন্তু, সুচরিতা কি হিন্দুর ঘরে বিয়ে করবে ?"

বিনয় কহিল, "আচ্ছা মা, গোরা কি ব্রাহ্মর ঘরে বিয়ে করতে পারে না ? তোমার কি তাতে মত নেই ?"

আনন্দময়ী। আমার খুব মত আছে।

বিনয় পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আছে ?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "আছে বৈকি বিনু। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের

মিল নিয়েই বিয়ে— সে সময়ে কোন্ মন্তরটা পড়া হল তা নিয়ে কী আসে যায় বাবা। যেমন করে হোক ভগবানের নামটা নিলেই হল।"

বিনয়ের মনের ভিতর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে উৎসাহিত হইয়া কহিল, "মা, তোমার মুখে যখন এ-সব কথা শুনি আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। এমন ঔদার্য তুমি পেলে কোথা থেকে!"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "গোরার কাছ থেকে পেয়েছি!"

বিনয় কহিল, "গোরা তো এর উল্‌টো কথাই বলে।"

আনন্দময়ী। বললে কী হবে। আমার যা-কিছু শিক্ষা সব গোরা থেকেই হয়েছে। মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া করে মরে, তা যে কত মিথ্যে, সে কথা ভগবান গোরাকে যেদিন দিয়েছেন সেইদিনই বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা, ব্রাহ্মই বা কে আর হিন্দুই বা কে। মানুষের হৃদয়ের তো কোনো জাত নেই— সেইখানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন। তাঁকে ঠেলে দিয়ে মন্তর আর মতের উপরেই মেলাবার ভার দিলে চলে কি?"

বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, "মা, তোমার কথা আমার বড়ো মিষ্টি লাগল। আমার দিনটা আজ সার্থক হয়েছে।"

৩৭

সুচরিতার মাসি হরিমোহিনীকে লইয়া পরেশের পরিবারে একটা গুরুতর অশান্তি উপস্থিত হইল। তাহা বিবৃত করিয়া বলিবার পূর্বে হরিমোহিনী সুচরিতার কাছে নিজের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপ করিয়া নীচে লেখা গেল।—

আমি তোমার মায়ের চেয়ে দুই বছরের বড়ো ছিলাম। বাপের বাড়িতে আমাদের দুই জনের আদরের সীমা ছিল না। কেননা, তখন আমাদের ঘরে

কেবল আমরা দুই কন্যাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম— বাড়িতে আর শিশু কেহ ছিল না। কাকাদের আদরে আমাদের মাটিতে পা ফেলিবার অবকাশ ঘটিত না।

আমার বয়স যখন আট তখন পাল্‌সার বিখ্যাত রায়চৌধুরীদের ঘরে আমার বিবাহ হয়। তাঁহারা কুলেও যেমন ধনেও তেমন। কিন্তু, আমার ভাগ্যে সুখ ঘটিল না। বিবাহের সময় খরচপত্র লইয়া আমার শ্বশুরের সঙ্গে পিতার বিবাদ বাধিয়াছিল। আমার পিতৃগৃহের সেই অপরাধ আমার শ্বশুরবংশ অনেক দিন পর্যন্ত ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সকলেই বলিত, 'আমাদের ছেলের আবার বিয়ে দেব, দেখি ও মেয়েটার কী দশা হয়।' আমার দুর্দশা দেখিয়াই বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কখনো ধনীর ঘরে মেয়ে দিবেন না। তাই তোমার মাকে গরিবের ঘরেই দিয়াছিলেন।

বহু পরিবারের ঘর ছিল, আমাকে আট-নয় বৎসর বয়সের সময়েই রান্না করিতে হইত। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন লোক খাইত। সকলের পরিবেষণের পরে কোনোদিন শুধু ভাত, কোনোদিন বা ডাল-ভাত খাইয়াই কাটাইতে হইত। কোনোদিন বেলা দুইটার সময়ে, কোনোদিন বা একেবারে বেলা গেলে আহার করিতাম। আহার করিয়াই বৈকালের রান্না চড়াইতে যাইতে হইত। রাত এগারোটা-বারোটার সময় খাইবার অবকাশ ঘটিত। শুইবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। অন্তঃপুরে যাহার সঙ্গে যেদিন সুবিধা হইত তাহার সঙ্গেই শুইয়া পড়িতাম। কোনোদিন-বা পিঁড়ি পাতিয়া নিদ্রা দিতে হইত।

বাড়িতে আমার প্রতি সকলের যে অনাদর ছিল আমার স্বামীর মনও তাহাতে বিকৃত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি আমাকে দূরে দূরেই রাখিয়াছিলেন।

এমন সময়ে আমার বয়স যখন সতেরো তখন আমার কন্যা মনোরমা জন্মগ্রহণ করে। মেয়েকে জন্ম দেওয়াতে শ্বশুরকুলে আমার গঞ্জনা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। আমার সকল অনাদর, সকল লাঞ্ছনার মধ্যে এই

মেয়েটিই আমার একমাত্র সান্ত্বনা ও আনন্দ ছিল। মনোরমাকে তাহার বাপ এবং আর-কেহ তেমন করিয়া আদর করে নাই বলিয়াই, সে আমার প্রাণপণ আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

তিন বৎসর পরে যখন আমার একটি ছেলে হইল তখন হইতে আমার অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। তখন আমি বাড়ির গৃহিণী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হইলাম। আমার শাশুড়ি ছিলেন না— আমার শ্বশুরও মনোরমা জন্মিবার দুই বৎসর পরেই মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরেই বিষয় লইয়া দেবরদের সঙ্গে মকদ্দমা বাধিয়া গেল। অবশেষে মামলায় অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া আমরা পৃথক হইলাম।

মনোরমার বিবাহের সময় আসিল। পাছে তাহাকে দূরে লইয়া যায়, পাছে তাহাকে আর দেখিতে না পাই, এই ভয়ে পাল্‌সা হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ তফাতে সিমুলে গ্রামে তাহার বিবাহ দিলাম। ছেলেটিকে কার্তিকের মতো দেখিতে। যেমন রঙ তেমনি চেহারা— খাওয়াপরার সংগতিও তাহাদের ছিল।

একদিন আমার যেমন অনাদর ও কষ্ট গিয়াছে, কপাল ভাঙিবার পূর্বে বিধাতা কিছুদিনের জন্য আমাকে তেমনি সুখ দিয়াছিলেন। শেষাশেষি আমার স্বামী আমাকে বড়োই আদর ও শ্রদ্ধা করিতেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোনো কাজই করিতেন না। এত সৌভাগ্য আমার সহিবে কেন! কলেরা হইয়া চারি দিনের ব্যবধানে আমার ছেলে এবং স্বামী মারা গেলেন। যে দুঃখ কল্পনা করিলেও অসহ্য বোধ হয় তাহাও যে মানুষের সয়, ইহাই জানাইবার জন্য ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন।

ক্রমেই জামাইয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। সুন্দর ফুলের মধ্যে যে এমন কালসাপ লুকাইয়া থাকে তাহা কে মনে করিতে পারে! সে যে কুসংসর্গে পড়িয়া নেশা ধরিয়াছিল তাহা আমার মেয়েও কোনোদিন আমাকে বলে নাই। জামাই যখন-তখন আসিয়া নানা অভাব জানাইয়া আমার কাছে টাকা চাহিয়া লইয়া যাইত। সংসারে আমার তো আর-কাহারও জন্য টাকা

জমাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাই জামাই যখন আবদার করিয়া আমার কাছ হইতে কিছু চাহিত সে আমার ভালোই লাগিত। মাঝে-মাঝে আমার মেয়ে আমাকে বারণ করিত, আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিত, 'তুমি অমনি করিয়া উঁহাকে টাকা দিয়া উঁহার অভ্যাস খারাপ করিয়া দিতেছ— টাকা হাতে পাইলে উনি কোথায় যে কেমন করিয়া উড়াইয়া দেন তাহার ঠিকানা নাই।' আমি ভাবিতাম, তাহার স্বামী আমার কাছে এমন করিয়া টাকা লইলে তাহার শ্বশুরকুলের অগৌরব হইবে, এই ভয়েই বুঝি মনোরমা আমাকে টাকা দিতে নিষেধ করে।

তখন আমার এমন বুদ্ধি হইল আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া জামাইকে নেশার কড়ি জোগাইতে লাগিলাম। মনোরমা যখন তাহা জানিতে পারিল তখন সে একদিন আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া তাহার স্বামীর কলঙ্কের কথা সমস্ত জানাইয়া দিল। তখন আমি কপাল চাপড়াইয়া মরি। দুঃখের কথা কী আর বলিব, আমার একজন দেওরই কুসঙ্গ এবং কুবুদ্ধি দিয়া আমার জামাইয়ের মাথা খাইয়াছে।

টাকা দেওয়া যখন বন্ধ করিলাম এবং জামাই যখন সন্দেহ করিল যে, আমার মেয়েই আমাকে নিষেধ করিয়াছে তখন তাহার আর-কোনো আবরণ রহিল না। তখন সে এত অত্যাচার আরম্ভ করিল, আমার মেয়েকে পৃথিবীর লোকের সামনে এমন করিয়া অপমান করিতে লাগিল যে, তাহাই নিবারণ করিবার জন্য আবার আমি আমার মেয়েকে লুকাইয়া তাহাকে টাকা দিতে লাগিলাম। জানিতাম, আমি তাহাকে রসাতলে দিতেছি; কিন্তু, মনোরমাকে সে অসহ্য পীড়ন করিতেছে এ সংবাদ পাইলে আমি কোনোমতে স্থির থাকিতে পারিতাম না।

অবশেষে একদিন— সেদিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাঘ মাসের শেষাশেষি, সে বছর সকাল সকাল গরম পড়িয়াছে; আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, 'এরই মধ্যে আমাদের খিড়কির বাগানের গাছগুলি আমের বোলে ভরিয়া গেছে।' সেই মাঘের অপরাহ্ণে আমাদের দরজার কাছে

পালকি আসিয়া থামিল। দেখি, মনোরমা হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, 'কী মনু, তোদের খবর কী?' মনোরমা হাসিমুখে বলিল, 'খবর না থাকলে বুঝি মার বাড়িতে শুধু-শুধু আসতে নেই?'

আমার বেয়ান মন্দ লোক ছিলেন না। তিনি আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, বউমা পুত্রসম্ভাবিতা, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাহার মার কাছে থাকিলেই ভালো। আমি ভাবিলাম, সেই কথাটাই বুঝি সত্য। কিন্তু, জামাই যে এই অবস্থাতেই মনোরমাকে মারধোর করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বিপৎপাতের আশঙ্কাতেই বেয়ান তাঁহার পুত্রবধূকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। মনু এবং তাহার শাশুড়িতে মিলিয়া আমাকে এমনি করিয়া ভুলাইয়া রাখিল। মেয়েকে আমি নিজের হাতে তেল মাখাইয়া স্নান করাইতে চাহিলে, মনোরমা নানা ছুতায় কাটাইয়া দিত; তাহার কোমল অঙ্গে যে-সব আঘাতের দাগ পড়িয়াছিল সে তাহার মায়ের দৃষ্টির কাছেও প্রকাশ করিতে চাহে নাই।

জামাই মাঝে মাঝে আসিয়া মনোরমাকে বাড়ি ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য গোলমাল করিত। মেয়ে আমার কাছে থাকাতে টাকার আবদার করিতে তাহার ব্যাঘাত ঘটিত। ক্রমে সে বাধাও আর সে মানিল না। টাকার জন্য মনোরমার সামনেই আমার প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। মনোরমা জেদ করিয়া বলিত, 'কোনোমতেই টাকা দিতে পারিবে না।' কিন্তু, আমার বড়ো দুর্বল মন, পাছে জামাই আমার মেয়ের উপর অত্যন্ত বেশি বিরক্ত হইয়া উঠে এই ভয়ে আমি তাহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারিতাম না।

মনোরমা একদিন বলিল, 'মা, তোমার টাকাকড়ি সমস্ত আমিই রাখিব।' বলিয়া আমার চাবি ও বাক্স সব দখল করিয়া বসিল। জামাই আসিয়া যখন আমার কাছে টাকা পাইবার সুবিধা দেখিল না এবং যখন মনোরমাকে কিছুতেই নরম করিতে পারিল না তখন সুর ধরিল, 'মেজবউকে বাড়িতে লইয়া যাইব।' আমি মনোরমাকে বলিতাম, 'দে, মা, ওকে কিছু টাকা

দিয়েই বিদায় করে দে— নইলে ও কী ক'রে বসে কে জানে।' কিন্তু, আমার মনোরমা এক দিকে যেমন নরম আর-এক দিকে তেমনি শক্ত ছিল। সে বলিত, 'না, টাকা কোনোমতেই দেওয়া হবে না।'

জামাই একদিন আসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, 'কাল আমি বিকালবেলা পালকি পাঠিয়ে দেব। বউকে যদি ছেড়ে না দাও তবে ভালো হবে না, বলে রাখছি।'

পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে পালকি আসিলে আমি মনোরমাকে বলিলাম, 'মা, আর দেরি করে কাজ নেই, আবার আসছে হপ্তায় তোমাকে আনবার জন্য লোক পাঠাব।'

মনোরমা কহিল, 'আজ থাক্‌, আজ আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, মা, আর দু-দিন বাদে আসতে বোলো।'

আমি বলিলাম, 'মা, পালকি ফিরিয়ে দিলে কি আমার খেপা জামাই রক্ষা রাখবে ? কাজ নেই, মনু, তুমি আজই যাও।'

মনু বলিল, 'না, মা, আজ নয় ; আমার শ্বশুর কলকাতায় গিয়েছেন, ফাল্গুনের মাঝামাঝি তিনি ফিরে আসবেন— তখন আমি যাব।'

আমি তবু বলিলাম, 'না, কাজ নেই মা।'

তখন মনোরমা প্রস্তুত হইতে গেল। আমি তাহার শ্বশুরবাড়ির চাকর ও পালকির বেহারাদিগকে খাওয়াইবার আয়োজনে ব্যস্ত রহিলাম। যাইবার আগে একটু যে তাহার কাছে থাকিব, সেদিন যে একটু বিশেষ করিয়া তাহার যত্ন লইব, নিজের হাতে তাহাকে সাজাইয়া দিব, সে যে খাবার ভালোবাসে তাহাই তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া বিদায় দিব, এমন অবকাশ পাইলাম না। ঠিক পালকিতে উঠিবার আগে আমাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, 'মা, আমি তবে চলিলাম।'

সে যে সত্যই চলিল সে কি আমি জানিতাম! সে যাইতে চাহে নাই, আমি জোর করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছি— এই দুঃখে বুক আজ পর্যন্ত পুড়িতেছে ; সে আর-কিছুতেই শীতল হইল না।

সেই রাত্রেই গর্ভপাত হইয়া মনোরমার মৃত্যু হইল। এই খবর যখন পাইলাম তাহার পূর্বেই গোপনে তাড়াতাড়ি তাহার সৎকার শেষ হইয়া গেছে।

যাহার কিছু বলিবার নাই, করিবার নাই, ভাবিয়া যাহার কিনারা পাওয়া যায় না, কাঁদিয়া যাহার অন্ত হয় না, সেই দুঃখ যে কী দুঃখ তাহা তোমরা বুঝিবে না— সে বুঝিয়া কাজ নাই।

আমার তো সবই গেল, কিন্তু তবু আপদ চুকিল না। আমার স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই দেবররা আমার বিষয়ের প্রতি লোভ দিতেছিল। তাহারা জানিত, আমার মৃত্যুর পরে বিষয়সম্পত্তি সমুদয় তাহাদেরই হইবে ; কিন্তু ততদিন পর্যন্ত তাহাদের সবুর সহিতেছিল না। ইহাতে কাহারও দোষ দেওয়া চলে না ; সত্যই আমার মতো অভাগিনীর বাঁচিয়া থাকাই যে অপরাধ। সংসারে যাহাদের নানা প্রয়োজন আছে, আমার মতো প্রয়োজন-হীন লোক বিনা হেতুতে তাহাদের জায়গা জুড়িয়া বাঁচিয়া থাকিলে লোকে সহ্য করে কেমন করিয়া।

মনোরমা যতদিন বাঁচিয়া ছিল ততদিন আমি দেবরদের কোনো কথায় ভুলি নাই। আমার বিষয়ের অধিকার লইয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সঙ্গে লড়িয়াছি। আমি যতদিন বাঁচি মনোরমার জন্য টাকা সঞ্চয় করিয়া তাহাকে দিয়া যাইব, এই আমার পণ ছিল। আমি আমার কন্যার জন্য টাকা জমাইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহাই আমার দেবরদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহাদের মনে হইত, আমি তাহাদেরই ধন চুরি করিতেছি। নীলকান্ত বলিয়া কর্তার একজন পুরাতন বিশ্বাসী কর্মচারী ছিল, সেই আমার সহায় ছিল। আমি যদি বা আমার প্রাপ্য কিছু ছাড়িয়া দিয়া আপোষে নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতাম সে কোনোমতেই রাজি হইত না ; সে বলিত, 'আমাদের হকের এক পয়সা কে লয় দেখিব।' এই হকের লড়াইয়ের মাঝখানেই আমার কন্যার মৃত্যু হইল। তাহার পরদিনেই আমার মেঝো দেবর আসিয়া আমাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। বলিলেন, 'বউদিদি, ঈশ্বর তোমার যা অবস্থা করিলেন তাহাতে তোমার আর সংসারে থাকা

উচিত হয় না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাক তীর্থে গিয়া ধর্মকর্মে মন দাও, আমরা তোমার খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।'

আমি আমাদের গুরুঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। বলিলাম, 'ঠাকুর, অসহ্য দুঃখের হাত হইতে কী করিয়া বাঁচিব আমাকে বলিয়া দাও। উঠিতে বসিতে আমার কোথাও কোনো সান্ত্বনা নাই— আমি যেন বেড়া-আগুনের মধ্যে পড়িয়াছি; যেখানেই যাই, যেদিকেই ফিরি, কোথাও আমার যন্ত্রণার এতটুকু অবসানের পথ দেখিতে পাই না।'

গুরু আমাকে আমাদের ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, 'এই গোপী-বল্লভই তোমার স্বামী পুত্র কন্যা সবই। ইঁহার সেবা করিয়াই তোমার সমস্ত শূন্য পূর্ণ হইবে।'

আমি দিনরাত ঠাকুরঘরেই পড়িয়া রহিলাম। ঠাকুরকেই সমস্ত মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু, তিনি নিজে না লইলে আমি দিব কেমন করিয়া! তিনি লইলেন কই!

নীলকান্তকে ডাকিয়া কহিলাম, 'নীলুদাদা, আমার জীবনস্বত্ব আমি দেবরদেরই লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি। তাহারা খোরাকি বাবদ মাসে মাসে কিছু করিয়া টাকা দিবে।'

নীলকান্ত কহিল, 'সে কখনো হইতেই পারে না। তুমি মেয়েমানুষ, এ-সব কথায় থাকিয়ো না!'

আমি বলিলাম, 'আমার আর সম্পত্তিতে প্রয়োজন কী?'

নীলকান্ত কহিল, 'তা বলিলে কি হয়! আমাদের যা হক তা ছাড়িব কেন? এমন পাগলামি করিয়ো না।'

নীলকান্ত হকের চেয়ে বড়ো আর-কিছুই দেখিতে পায় না। আমি বড়ো মুশকিলেই পড়িলাম। বিষয়কর্ম আমার কাছে বিষের মতো ঠেকিতেছে; কিন্তু, জগতে আমার ওই একমাত্র বিশ্বাসী নীলকান্তই আছে, তাহার মনে আমি কষ্ট দিই কী করিয়া! সে যে বহু দুঃখে আমার ওই এক 'হক' বাঁচাইয়া আসিয়াছে।

শেষকালে একদিন নীলকান্তকে গোপন করিয়া একখানা কাগজে সহি দিলাম। তাহাতে কী যে লেখা ছিল তাহা ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম আমার সই করিতে ভয় কী, আমি এমন কী রাখিতে চাই যাহা আর-কেহ ঠকাইয়া লইলে সহ্য হইবে না। সবই তো আমার শ্বশুরের, তাঁহার ছেলেরা পাইবে পাক।

লেখাপড়া রেজেস্ট্রি হইয়া গেলে আমি নীলকান্তকে ডাকিয়া কহিলাম, 'নীলুদাদা, রাগ করিয়ো না, আমার যাহা-কিছু ছিল লিখিয়া পড়িয়া দিয়াছি। আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই।'

নীলকান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিল, 'অ্যাঁ, করিয়াছ কী!'

যখন দলিলের খসড়া পড়িয়া দেখিল সত্যই আমি আমার সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছি তখন নীলকান্তের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহার প্রভুর মৃত্যুর পর হইতে আমার ওই হক বাঁচানোই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাহার সমস্ত বুদ্ধি সমস্ত শক্তি ইহাতেই অবিশ্রাম নিযুক্ত ছিল। এ লইয়া মামলা-মকদ্দমা উকিলবাড়ি-হাঁটাহাঁটি, আইন খুঁজিয়া বাহির করা, ইহাতেই সে সুখ পাইয়াছে— এমন-কি, তাহার নিজের ঘরের কাজ দেখিবারও সময় ছিল না। সেই হক যখন নির্বোধ মেয়ে-মানুষের কলমের এক আঁচড়েই উড়িয়া গেল তখন নীলকান্তকে শান্ত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সে কহিল, 'যাক, এখানকার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ চুকিল, আমি চলিলাম।'

অবশেষে নীলুদাদা এমন করিয়া রাগ করিয়া আমার কাছ হইতে বিদায় হইয়া যাইবে, শ্বশুরবাড়ির ভাগ্যে এই কি আমার শেষ লিখন ছিল! আমি তাহাকে অনেক মিনতি করিয়া ডাকিয়া বলিলাম, 'দাদা, আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমার কিছু জমানো টাকা আছে, তাহা হইতে তোমাকে এই পাঁচ-শো টাকা দিতেছি— তোমার ছেলের বউ যেদিন আসিবে সেইদিন আমার আশীর্বাদ জানাইয়া এই টাকা হইতে তাহার গহনা গড়াইয়া দিয়ো।'

নীলকান্ত কহিল, 'আমার আর টাকায় প্রয়োজন নাই। আমার মনিবের সবই যখন গেল তখন ও পাঁচ-শো টাকা লইয়া আমার সুখ হইবে না। ও থাক্।'

এই বলিয়া আমার স্বামীর শেষ অকৃত্রিম বন্ধু আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আমি ঠাকুরঘরে আশ্রয় লইলাম। আমার দেবররা বলিল, 'তুমি তীর্থ-বাসে যাও।'

আমি কহিলাম, 'আমার শ্বশুরের ভিটাই আমার তীর্থ, আর আমার ঠাকুর যেখানে আছে সেখানেই আমার আশ্রয়।'

কিন্তু, আমি যে বাড়ির কোনো অংশ অধিকার করিয়া থাকি তাহাও তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইতে লাগিল। তাহারা ইতিমধ্যেই আমাদের বাড়িতে জিনিসপত্র আনিয়া কোন্ ঘর কে কী ভাবে ব্যবহার করিবে তাহা সমস্তই ঠিক করিয়া লইয়াছিল। শেষকালে তাহারা বলিল, 'তোমার ঠাকুর তুমি লইয়া যাইতে পারো, আমরা তাহাতে আপত্তি করিব না।'

যখন তাহাতেও আমি সংকোচ করিতে লাগিলাম তখন তাহারা কহিল, 'এখানে তোমার খাওয়াপরা চলিবে কী করিয়া?'

আমি বলিলাম, 'কেন, তোমরা যা খোরাকির বরাদ্দ করিয়াছ তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে।'

তাহারা কহিল, 'কই, খোরাকির তো কোনো কথা নাই।'

তাহার পর আমার ঠাকুর লইয়া আমার বিবাহের ঠিক চৌত্রিশ বৎসর পরে একদিন শ্বশুরবাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নীলুদাদার সন্ধান লইতে গিয়া শুনিলাম, তিনি আমার পূর্বেই বৃন্দাবনে চলিয়া গেছেন।

গ্রামের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আমি কাশীতে গেলাম। কিন্তু, পাপমনে কোথাও শান্তি পাইলাম না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ডাকিয়া বলি, 'ঠাকুর, আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে, আমার কাছে যেমন সত্য ছিল তুমি আমার কাছে তেমনি সত্য হয়ে ওঠো।' কিন্তু কই, তিনি তো আমার

প্রার্থনা শুনিলেন না। আমার বুক যে জুড়ায় না, আমার সমস্ত শরীর মন যে কাঁদিতে থাকে। বাপ রে বাপ, মানুষের প্রাণ কী কঠিন।

সেই আট বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছি, তাহার পরে এক দিনের জন্যও বাপের বাড়ি আসিতে পাই নাই। তোমার মায়ের বিবাহে উপস্থিত থাকিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কোনো ফল হয় নাই। তাহার পর বাবার চিঠিতে তোমাদের জন্মের সংবাদ পাইলাম, আমার বোনের মৃত্যু-সংবাদও পাইয়াছি। মায়ের-কোল-ছাড়া তোদের যে আমার কোলে টানিব, ঈশ্বর এ-পর্যন্ত এমন সুযোগ ঘটান নাই।

তীর্থে ঘুরিয়া যখন দেখিলাম মায়া এখনো মন ভরিয়া আছে, কোনো একটা বুকের জিনিসকে পাইবার জন্য বুকের তৃষ্ণা এখনো মরে নাই— তখন তোদের খোঁজ করিতে লাগিলাম। শুনিয়াছিলাম তোদের বাপ ধর্ম ছাড়িয়া সমাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তা, কী করিব। তোদের মা যে আমার এক মায়ের পেটের বোন।

কাশীতে এক ভদ্রলোকের কাছে তোমাদের খোঁজ পাইয়া এখানে আসিয়াছি। পরেশবাবু শুনিয়াছি ঠাকুর-দেবতা মানেন না, কিন্তু ঠাকুর যে উঁহার প্রতি প্রসন্ন সে উঁহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। পূজা পাইলেই ঠাকুর ভোলেন না, সে আমি খুব জানি— পরেশবাবু কেমন করিয়া তাঁহাকে বশ করিলেন সেই খবর আমি লইব। যাই হোক, বাছা, একলা থাকিবার সময় এখনো আমার হয় নাই— সে আমি পারি না— ঠাকুর যেদিন দয়া করেন করিবেন, কিন্তু তোমাদের কোলের কাছে না রাখিয়া আমি বাঁচিব না।

৩৮

পরেশ বরদাসুন্দরীর অনুপস্থিতিকালে হরিমোহিনীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ছাতের উপরকার নিভৃত ঘরে তাঁহাকে স্থান দিয়া, যাহাতে তাঁহার আচার রক্ষা করিয়া চলার কোনো বিঘ্ন না ঘটে তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া

দিয়াছিলেন।

বরদাসুন্দরী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে এই একটি অভাবনীয় প্রাদুর্ভাব দেখিয়া একেবারে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি পরেশকে খুব তীব্র স্বরেই কহিলেন, "এ আমি পারব না।"

পরেশ কহিলেন, "তুমি আমাদের সকলকেই সহ্য করতে পারছ, আর ওই একটি বিধবা অনাথাকে সইতে পারবে না?"

বরদাসুন্দরী জানিতেন, পরেশের কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই; সংসারে কিসে সুবিধা ঘটে বা অসুবিধা ঘটে সে সম্বন্ধে তিনি কোনোদিন বিবেচনা-মাত্র করেন না; হঠাৎ এক-একটা কাণ্ড করিয়া বসেন। তাহার পরে রাগই করো, বকো আর কাঁদো, একেবারে পাষাণের মূর্তির মতো স্থির হইয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে বলো। প্রয়োজন হইলে যাহার সঙ্গে ঝগড়া করাও অসম্ভব তাহার সঙ্গে ঘর করিতে কোন্ স্ত্রীলোকে পারে!

সুচরিতা মনোরমার প্রায় একবয়সী ছিল। হরিমোহিনীর মনে হইতে লাগিল সুচরিতাকে দেখিতেও যেন অনেকটা সেই মনোরমারই মতো; আর স্বভাবটিও তাহার সঙ্গে মিলিয়াছে। তেমনি শান্ত অথচ তেমনি দৃঢ়। হঠাৎ পিছন হইতে তাহাকে দেখিয়া এক-এক সময় হরিমোহিনীর বুকের ভিতরটা যেন চমকিয়া উঠে। এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে তিনি একলা বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছেন, এমন সময় সুচরিতা কাছে আসিলে চোখ বুজিয়া তাহাকে দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, "আহা, আমার মনে হচ্ছে যেন আমি তাকেই বুকের মধ্যে পেয়েছি। সে যেতে চায় নি আমি তাকে জোর করে বিদায় করে দিয়েছি, জগৎসংসারে কি কোনোদিন কোনোমতেই আমার সে শাস্তির অবসান হবে না! দণ্ড যা পাবার তা পেয়েছি— এবার সে এসেছে; এই-যে ফিরে এসেছে; তেমনি হাসিমুখ করে ফিরে এসেছে; এই-যে আমার মা, এই-যে আমার মণি, আমার ধন!"

এই বলিয়া সুচরিতার সমস্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহাকে চুমো খাইয়া

চোখের জলে ভাসিতে থাকেন; সুচরিতারও দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। সে তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিত, "মাসি, আমিও তো মায়ের আদর বেশিদিন ভোগ করতে পারি নি; আজ আবার সেই হারানো মা ফিরে এসেছেন। কতদিন কত দুঃখের সময় যখন ঈশ্বরকে ডাকবার শক্তি ছিল না, যখন মনের ভিতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল, তখন আমার মাকে ডেকেছি। সেই মা আজ আমার ডাক শুনে এসেছেন।"

হরিমোহিনী বলিতেন, "অমন করে বলিস নে, বলিস নে। তোর কথা শুনলে আমার এত আনন্দ হয় যে, আমার ভয় করতে থাকে। হে ঠাকুর, দৃষ্টি দিয়ো না ঠাকুর। আর মায়া করব না মনে করি— মনটাকে পাষাণ করেই থাকতে চাই, কিন্তু পারি নে যে। আমি বড়ো দুর্বল, আমাকে দয়া করো, আমাকে আর মেরো না। ওরে রাধারানী, যা, যা, আমার কাছ থেকে ছেড়ে যা। আমাকে আর জড়াস নে রে, জড়াস নে। ও আমার গোপীবল্লভ, আমার জীবননাথ, আমার গোপাল, আমার নীলমণি, আমাকে এ আবার কী বিপদে ফেলছ!"

সুচরিতা কহিত, "আমাকে তুমি জোর করে বিদায় করতে পারবে না মাসি। আমি তোমাকে কখনো ছাড়ব না— আমি বরাবর তোমার এই কাছেই রইলুম।"

বলিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া শিশুর মতো চুপ করিয়া থাকিত।

দুইদিনের মধ্যেই সুচরিতার সঙ্গে তাহার মাসির এমন একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়া গেল যে, ক্ষুদ্র কালের দ্বারা তাহার পরিমাপ হইতে পারে না।

বরদাসুন্দরী ইহাতেও বিরক্ত হইয়া গেলেন। 'মেয়েটার রকম দেখো। যেন আমরা কোনোদিন উহার কোনো আদরযত্ন করি নাই। বলি এতদিন মাসি ছিলেন কোথায়? ছোটোবেলা হইতে আমরা যে এত করিয়া মানুষ করিলাম, আর আজ মাসি বলিতেই একেবারে অজ্ঞান। আমি কর্তাকে বরাবর বলিয়া আসিয়াছি— ওই-যে সুচরিতাকে তোমরা সবাই ভালো ভালো কর, ও কেবল বাহিরে ভালোমানুষি করে, কিন্তু উহার মন পাবার

জো নাই। আমরা এতদিন উহার যা করিয়াছি সব বৃথাই হইয়াছে।'

পরেশ যে বরদাসুন্দরীর দরদ বুঝিবেন না, তাহা তিনি জানিতেন। শুধু তাই নহে, হরিমোহিনীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি যে পরেশের কাছে খাটো হইয়া যাইবেন ইহাতেও তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সেইজন্যই তাঁর রাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। পরেশ যাহাই বলুন, কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গেই যে বরদাসুন্দরীর মত মেলে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য তিনি দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমাজের প্রধান-অপ্রধান সকল লোকের কাছেই হরিমোহিনীর ব্যাপার লইয়া সমালোচনা জুড়িয়া দিলেন। হরিমোহিনীর হিঁদুয়ানি, তাঁহার ঠাকুরপূজা, বাড়িতে ছেলেমেয়ের কাছে তাঁহার কুদৃষ্টান্ত, ইহা লইয়া তাঁহার আক্ষেপ-অভিযোগের অন্ত রহিল না।

শুধু লোকের কাছে অভিযোগ নহে, বরদাসুন্দরী সকল প্রকারে হরিমোহিনীর অসুবিধা ঘটাইতে লাগিলেন। হরিমোহিনীর রন্ধনাদির জল তুলিয়া দিবার জন্য যে একজন গোয়ালা বেহারা ছিল তাহাকে তিনি ঠিক সময় বুঝিয়া অন্য কাজে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠিলে বলিতেন, 'কেন, রামদীন আছে তো।' রামদীন জাতে দোসাদ; তিনি জানিতেন, তাহার হাতের জল হরিমোহিনী ব্যবহার করিবেন না। সে কথা কেহ বলিলে বলিতেন, 'অত বাম্‌নাই করতে চান তো আমাদের ব্রাহ্মবাড়িতে এলেন কেন? আমাদের এখানে ও-সমস্ত জাতের বিচার করা চলবে না। আমি কোনোমতেই এতে প্রশ্রয় দেব না।' এইরূপ উপলক্ষে তাঁহার কর্তব্যবোধ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে সামাজিক শৈথিল্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে; এইজন্যই ব্রাহ্মসমাজ যথেষ্ট-পরিমাণে কাজ করিতে পারিতেছে না। তাঁহার সাধ্যমত তিনি এরূপ শৈথিল্যে যোগ দিতে পারিবেন না। না, কিছুতেই না। ইহাতে যদি কেহ তাঁহাকে ভুল বোঝে তবে সেও স্বীকার, যদি আত্মীয়েরাও বিরুদ্ধ হইয়া উঠে তবে সেও তিনি মাথা পাতিয়া লইবেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষেরা, যাঁহারা

কোনো মহৎ কর্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই যে নিন্দা ও বিরোধ সহ্য করিতে হইয়াছে সেই কথাই তিনি সকলকে স্মরণ করাইতে লাগিলেন।

কোনো অসুবিধায় হরিমোহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিত না। তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের চূড়ান্ত সীমায় উঠিবেন বলিয়াই যেন পণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে যে অসহ্য দুঃখ পাইয়াছেন বাহিরেও যেন তাহার সহিত ছন্দরক্ষা করিবার জন্য কঠোর আচারের দ্বারা অহরহ কষ্ট সৃজন করিয়া চলিতেছিলেন। এইরূপে দুঃখকে নিজের ইচ্ছার দ্বারা বরণ করিয়া তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইয়া তাহাকে বশ করিবার এই সাধনা।

হরিমোহিনী যখন দেখিলেন জলের অসুবিধা হইতেছে, তখন তিনি রন্ধন একেবারে ছাড়িয়াই দিলেন। তাঁহার ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া প্রসাদ-স্বরূপে দুধ এবং ফল খাইয়া কাটাইতে লাগিলেন। সুচরিতা ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইল। মাসি তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "মা, এ আমার বড়ো ভালো হয়েছে। এই আমার প্রয়োজন ছিল। এতে আমার কোনো কষ্ট নেই, আমার আনন্দই হয়।"

সুচরিতা কহিল, "মাসি, আমি যদি অন্য জাতের হাতে জল বা খাবার না খাই তা হলে তুমি আমাকে তোমার কাজ করতে দেবে?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "কেন, মা, তুমি যে ধর্ম মান সেই মতেই তুমি চলো— আমার জন্যে তোমাকে অন্য পথে যেতে হবে না। আমি তোমাকে কাছে পেয়েছি, বুকে রাখছি, প্রতিদিন দেখতে পাই, এই আমার আনন্দ। পরেশবাবু তোমার গুরু, তোমার বাপের মতো, তিনি তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তুমি সেই মেনে চলো— তাতেই ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর সমস্ত উপদ্রব এমন করিয়া সহিতে লাগিলেন যেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পরেশবাবু যখন প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন 'কেমন আছেন, কোনো অসুবিধা হইতেছে না তো?' তিনি বলিতেন, 'আমি খুব সুখে আছি।'

কিন্তু, বরদাসুন্দরীর সমস্ত অন্যায় সুচরিতাকে প্রতি মুহূর্তে জর্জরিত

করিতে লাগিল। সে তো নালিশ করিবার মেয়ে নয়; বিশেষত পরেশবাবুর কাছে বরদাসুন্দরীর ব্যবহারের কথা বলা তাহার দ্বারা কোনোমতেই ঘটিতে পারে না। সে নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল; এ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করিতেও তাহার অত্যন্ত সংকোচ বোধ হইত।

ইহার ফল হইল এই যে, সুচরিতা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবেই তাহার মাসির কাছে আসিয়া পড়িল। মাসির বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও আহার-পান সম্বন্ধে সে তাঁহারই সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া চলিতে লাগিল। শেষকালে সুচরিতার কষ্ট হইতেছে দেখিয়া, দায়ে পড়িয়া হরিমোহিনীকে পুনরায় রন্ধনাদিতে মন দিতে হইল। সুচরিতা কহিল, "মাসি, তুমি আমাকে যেমন করে থাকতে বল আমি তেমনি করেই থাকব, কিন্তু তোমার জল আমি নিজে তুলে দেব; সে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "মা, তুমি কিছু মনে কোরো না, কিন্তু ওই জলে যে আমার ঠাকুরের ভোগ হয়।"

সুচরিতা কহিল, "মাসি, তোমার ঠাকুরও কি জাত মানেন, তাঁকেও কি পাপ লাগে? তাঁরও কি সমাজ আছে নাকি?"

অবশেষে একদিন সুচরিতার নিষ্ঠার কাছে হরিমোহিনীকে হার মানিতে হইল। সুচরিতার সেবা তিনি সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করিলেন। সতীশও দিদির অনুকরণে 'মাসির রান্না খাইব' বলিয়া ধরিয়া পড়িল। এমনি করিয়া এই তিনটিতে মিলিয়া পরেশবাবুর ঘরের কোণে আর-একটি ছোটো সংসার জমিয়া উঠিল। কেবল ললিতা এই দুটি সংসারের মাঝখানে সেতুস্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। বরদাসুন্দরী তাঁহার আর-কোনো মেয়েকে এ দিকে ঘেঁষিতে দিতেন না, কিন্তু ললিতাকে নিষেধ করিয়া পারিয়া উঠিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

৩৯

বরদাসুন্দরী তাঁহার ব্রাহ্মিকাবন্ধুদিগকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহাদের ছাতের উপরেই সভা হইত। হরিমোহিনী তাঁহার স্বাভাবিক গ্রাম্য সরলতার সহিত মেয়েদের আদর-অভ্যর্থনা করিতেন, কিন্তু ইহারা যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে তাহা তাঁহার কাছে গোপন রহিল না। এমন-কি, হিন্দুদের সামাজিক আচার ব্যবহার লইয়া তাঁহার সমক্ষেই বরদাসুন্দরী তীব্র সমালোচনা উত্থাপিত করিতেন এবং অনেক রমণী হরিমোহিনীর প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়া সেই সমালোচনায় যোগ দিতেন।

সুচরিতা তাহার মাসির কাছে থাকিয়া এই-সমস্ত আক্রমণ নীরবে সহ্য করিত। কেবল, সেও যে তাহার মাসির দলে ইহাই সে যেন গায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত। যেদিন আহারের আয়োজন থাকিত সেদিন সুচরিতাকে সকলে খাইতে ডাকিলে সে বলিত, "না, আমি খাই নে।"

"সে কী! তুমি বুঝি আমাদের সঙ্গে বসে খাবে না!"

"না।"

বরদাসুন্দরী বলিতেন, "আজকাল সুচরিতা যে মস্ত হিঁদু হয়ে উঠেছেন তা বুঝি জান না? উনি যে আমাদের ছোঁওয়া খান না।"

"সুচরিতাও হিঁদু হয়ে উঠল! কালে কালে কতই যে দেখতে হবে তাই ভাবি।"

হরিমোহিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিতেন, "রাধারানী, মা, যাও মা। তুমি খেতে যাও মা।"

দলের লোকের কাছে যে সুচরিতা তাঁহার জন্য এমন করিয়া খোঁটা খাইতেছে ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুচরিতা অটল হইয়া থাকিত। একদিন কোনো ব্রাহ্ম মেয়ে কৌতূহলবশত হরিমোহিনীর ঘরের মধ্যে জুতা লইয়া প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সুচরিতা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ও ঘরে যেয়ো না।"

"কেন ?"

"ও ঘরে ওঁর ঠাকুর আছে।"

"ঠাকুর আছে! তুমি বুঝি রোজ ঠাকুরপুজো কর ?"

হরিমোহিনী বলিলেন, "হাঁ, মা, পুজো করি বৈকি।"

"ঠাকুরকে তোমার ভক্তি হয় ?"

"পোড়া কপাল আমার! ভক্তি আর কই হল। ভক্তি হলে তো বেঁচেই যেতুম।"

সেদিন ললিতা উপস্থিত ছিল। সে মুখ লাল করিয়া প্রশ্নকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাঁর উপাসনা কর তাঁকে ভক্তি কর ?"

"বাঃ, ভক্তি করি নে তো কী!"

ললিতা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "ভক্তি তো করই না, আর ভক্তি যে কর না সেটা তোমার জানাও নেই।"

সুচরিতা যাহাতে আচার-ব্যবহারে তাহার দল হইতে পৃথক না হয় সেজন্য হরিমোহিনী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

ইতিপূর্বে হারানবাবুতে বরদাসুন্দরীতে ভিতরে ভিতরে একটা বিরোধের ভাবই ছিল। বর্তমান ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে খুব মিল হইল। বরদাসুন্দরী কহিলেন, যিনি যাই বলুন-না কেন, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য যদি কাহারও দৃষ্টি থাকে তো সে পানুবাবুর। হারানবাবুও— ব্রাহ্ম-পরিবারকে সর্বপ্রকারে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার প্রতি বরদাসুন্দরীর একান্ত বেদনাপূর্ণ সচেতনতাকে ব্রাহ্মগৃহিণী-মাত্রেরই পক্ষে এইটি সুদৃষ্টান্ত বলিয়া সকলের কাছে প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই প্রশংসার মধ্যে পরেশবাবুর প্রতি বিশেষ একটু খোঁচা ছিল।

হারানবাবু একদিন পরেশবাবুর সম্মুখেই সুচরিতাকে কহিলেন, "শুনলুম নাকি আজকাল তুমি ঠাকুরের প্রসাদ খেতে আরম্ভ করেছ।"

সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু যেন সে কথাটা শুনিতেই পাইল

না এমনিভাবে টেবিলের উপরকার দোয়াতদানিতে কলমগুলা গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। পরেশবাবু একবার করুণনেত্রে সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া হারানবাবুকে কহিলেন, "পানুবাবু, আমরা যা-কিছু খাই সবই তো ঠাকুরের প্রসাদ।"

হারানবাবু কহিলেন, "কিন্তু, সুচরিতা যে আমাদের ঠাকুরকে পরিত্যাগ করবার উদ্‌যোগ করছেন।"

পরেশবাবু কহিলেন, "তাও যদি সম্ভব হয়, তবে তা নিয়ে উৎপাত করলে কি তার কোনো প্রতিকার হবে?"

হারানবাবু কহিলেন, "স্রোতে যে লোক ভেসে যাচ্ছে তাকে কি ডাঙায় তোলবার চেষ্টাও করতে হবে না?"

পরেশবাবু কহিলেন, "সকলে মিলে তার মাথার উপর ঢেলা ছুঁড়ে মারাকেই ডাঙায় তোলবার চেষ্টা বলা যায় না। পানুবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এতটুকুবেলা থেকেই সুচরিতাকে দেখে আসছি। ও যদি জলেই পড়ত তা হলে আমি আপনাদের সকলের আগেই জানতে পারতুম, এবং আমি উদাসীন থাকতুম না।"

হারানবাবু কহিলেন, "সুচরিতা তো এখানেই রয়েছেন। আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন-না। শুনতে পাই, উনি সকলের ছোঁওয়া খান না। সে কথা কি মিথ্যা?"

সুচরিতা দোয়াতদানের প্রতি অনাবশ্যক মনোযোগ দূর করিয়া কহিল, "বাবা জানেন, আমি সকলের ছোঁওয়া খাই নে। উনি যদি আমার এই আচরণ সহ্য করে থাকেন তা হলেই হল। আপনাদের যদি ভালো না লাগে আপনারা যত খুশি আমার নিন্দা করুন, কিন্তু বাবাকে বিরক্ত করছেন কেন? উনি আপনাদের কত ক্ষমা করে চলেন তা আপনারা জানেন? এ কি তারই প্রতিফল?"

হারানবাবু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, সুচরিতাও আজকাল কথা কহিতে শিখিয়াছে!

পরেশবাবু শান্তিপ্রিয় লোক; তিনি নিজের বা পরের সম্বন্ধে অধিক আলোচনা ভালোবাসেন না। এ-পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে তিনি কোনো কাজে কোনো প্রধান পদ গ্রহণ করেন নাই; নিজেকে কাহারও লক্ষগোচর না করিয়া নিভৃতে জীবন যাপন করিয়াছেন। হারানবাবু পরেশের এই ভাবকেই উৎসাহহীনতা ও ঔদাসীন্য বলিয়া গণ্য করিতেন; এমন-কি পরেশবাবুকে তিনি ইহা লইয়া ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। ইহার উত্তরে পরেশবাবু বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর, সচল এবং অচল এই দুই শ্রেণীর পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন; আমি নিতান্তই অচল। আমার মতো লোকের দ্বারা যে কাজ পাওয়া সম্ভব ঈশ্বর তাহা আদায় করিয়া লইবেন। যাহা সম্ভব নহে তাহার জন্য চঞ্চল হইয়া কোনো লাভ নাই। আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে; আমার কী শক্তি আছে আর কী নাই তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন আমাকে ঠেলাঠেলি করিয়া কোনো ফল পাওয়া যাইবে না।'

হারানবাবুর ধারণা ছিল, তিনি অসাড় হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারেন; জড়চিত্তকে কর্তব্যের পথে ঠেলিয়া দেওয়া এবং স্খলিত জীবনকে অনুতাপে বিগলিত করা তাঁহার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা। তাঁহার অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং একাগ্র শুভ-ইচ্ছাকে কেহই অধিক দিন প্রতিরোধ করিতে পারে না এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার সমাজের লোকের ব্যক্তিগত চরিত্রে যে-সকল ভালো পরিবর্তন ঘটিয়াছে তিনি নিজেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছেন। তাঁহার অলক্ষ্য প্রভাবও যে ভিতরে ভিতরে কাজ করে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। এ-পর্যন্ত সুচরিতাকে যখনই তাঁহার সম্মুখে কেহ বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছে তিনি এমন ভাব ধারণ করিয়াছেন, যেন সে প্রশংসা সম্পূর্ণই তাঁহার। তিনি উপদেশ দৃষ্টান্ত এবং সঙ্গতেজের দ্বারা সুচরিতার চরিত্রকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন যে এই সুচরিতার জীবনের দ্বারাই লোকসমাজে তাঁহার আশ্চর্য প্রভাব প্রমাণিত হইবে, এইরূপ তাঁহার আশা ছিল।

সেই সুচরিতার শোচনীয় পতনে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহার গর্ব

কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, তিনি সমস্ত দোষ চাপাইলেন পরেশবাবুর স্কন্ধে। পরেশবাবুকে লোকে বরাবর প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু হারানবাবু কখনো তাহাতে যোগ দেন নাই; ইহাতেও তাঁহার কতদূর প্রাজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এইবার সকলে বুঝিতে পারিবে, এইরূপ তিনি আশা করিতেছেন।

হারানবাবুর মতো লোক আর-সকলই সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু যাহাদিগকে বিশেষরূপে হিতপথে চালাইতে চেষ্টা করেন তাহারা যদি নিজের বুদ্ধি অনুসারে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে তবে সে অপরাধ তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। সহজে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য; যতই দেখেন তাঁহার উপদেশে ফল হইতেছে না ততই তাঁহার জেদ বাড়িয়া যাইতে থাকে, তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া বারম্বার আক্রমণ করিতে থাকেন। কল যেমন দম না ফুরাইলে থামিতে পারে না, তিনিও তেমনি কোনোমতেই নিজেকে সম্বরণ করিতে পারেন না; বিমুখ কর্ণের কাছে এক কথা সহস্রবার আবৃত্তি করিয়াও হার মানিতে চাহেন না।

ইহাতে সুচরিতা বড়ো কষ্ট পাইতে লাগিল— নিজের জন্য নহে, পরেশবাবুর জন্য। পরেশবাবু যে ব্রাহ্মসমাজের সকলের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছেন, এই অশান্তি নিবারণ করা যাইবে কী উপায়ে? অপর পক্ষে সুচরিতার মাসিও প্রতিদিন বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, তিনি একান্ত নম্র হইয়া নিজেকে যতই আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন ততই এই পরিবারের পক্ষে উপদ্রবস্বরূপ হইয়া উঠিতেছেন। এজন্য তাহার মাসির অত্যন্ত লজ্জা ও সংকোচ সুচরিতাকে প্রত্যহ দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সংকট হইতে উদ্ধারের যে পথ কোথায়, তাহা সুচরিতা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না।

এ দিকে সুচরিতার শীঘ্র বিবাহ দিয়া ফেলিবার জন্য বরদাসুন্দরী পরেশবাবুকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "সুচরিতার দায়িত্ব আর আমাদের বহন করা চলে না, সে এখন নিজের মতে চলতে

আরম্ভ করেছে। তার বিবাহের যদি দেরি থাকে তা হলে মেয়েদের নিয়ে আমি অন্য কোথাও যাব— সুচরিতার অদ্ভুত দৃষ্টান্ত মেয়েদের পক্ষে বড়োই অনিষ্টের কারণ হচ্ছে। দেখো, এর জন্যে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবেই। ললিতা আগে তো এরকম ছিল না; এখন ও যে আপন ইচ্ছামত যা খুশি একটা কাণ্ড করে বসে, কাকেও মানে না, তার মূলে কে? সেদিন যে ব্যাপারটা বাধিয়ে বসল, যার জন্য আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি, তুমি কি মনে কর তার মধ্যে সুচরিতার কোনো হাত ছিল না? তুমি নিজের মেয়ের চেয়ে সুচরিতাকে বরাবর বেশি ভালোবাস, তাতে আমি কোনোদিন কোনো কথা বলি নি; কিন্তু, আর চলে না সে আমি স্পষ্টই বলে রাখছি।"

সুচরিতার জন্য নহে, কিন্তু পারিবারিক অশান্তির জন্য পরেশবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বরদাসুন্দরী যে উপলক্ষটি পাইয়া বসিয়াছেন ইহা লইয়া তিনি যে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন এবং যতই দেখিবেন আন্দোলনে কোনো ফল হইতেছে না ততই দুর্বার হইয়া উঠিতে থাকিবেন ইহাতে তাঁহার কোনো সন্দেহ ছিল না। যদি সুচরিতার বিবাহ সত্বর সম্ভবপর হয় তবে বর্তমান অবস্থায় সুচরিতার পক্ষেও তাহা শান্তিজনক হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বরদাসুন্দরীকে বলিলেন, "পানুবাবু যদি সুচরিতাকে সম্মত করতে পারেন তা হলে আমি বিবাহ সম্বন্ধে কোনো আপত্তি করব না।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "আবার কতবার করে সম্মত করতে হবে! তুমি তো অবাক করলে। এত সাধাসাধিই বা কেন? পানুবাবুর মতো পাত্র উনি পাবেন কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করি। তুমি রাগ কর আর যাই কর, সত্যি কথা বলতে কী, সুচরিতা পানুবাবুর যোগ্য মেয়ে নয়।"

পরেশবাবু কহিলেন, "পানুবাবুর প্রতি সুচরিতার মনের ভাব যে কী তা আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। অতএব, তারা নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ কথাটা পরিষ্কার করে না নেবে ততক্ষণ আমি এ বিষয়ে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারব না।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "বুঝতে পার নি! এতদিন পরে স্বীকার করলে! ওই মেয়েটিকে বোঝা বড়ো সহজ নয়। ও বাইরে এক-রকম, ভিতরে এক-রকম।"

বরদাসুন্দরী হারানবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সেদিন কাগজে ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান দুর্গতির আলোচনা ছিল। তাহার মধ্যে পরেশবাবুর পরিবারের প্রতি এমনভাবে লক্ষ করা ছিল যে, কোনো নাম না থাকা সত্ত্বেও আক্রমণের বিষয় যে কে তাহা সকলের কাছেই বেশ স্পষ্ট হইয়াছিল এবং লেখক যে কে তাহাও লেখার ভঙ্গিতে অনুমান করা কঠিন হয় নাই। কাগজখানায় কোনোমতে চোখ বুলাইয়াই সুচরিতা তাহা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িতেছিল। ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কাগজের অংশগুলিকে যেন পরমাণুতে পরিণত করিবার জন্য তাহার রোখ চড়িয়া যাইতেছিল।

এমন সময় হারানবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া সুচরিতার পাশে একটা চৌকি টানিয়া বসিলেন। সুচরিতা একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না, সে যেমন কাগজ ছিঁড়িতেছিল তেমনি ছিঁড়িতেই লাগিল।

হারানবাবু কহিলেন, "সুচরিতা, আজ একটা গুরুতর কথা আছে। আমার কথায় একটু মন দিতে হবে।"

সুচরিতা কাগজ ছিঁড়িতেই লাগিল। নখে ছেঁড়া যখন অসম্ভব হইল তখন থলে হইতে কাঁচি বাহির করিয়া কাঁচিটা দিয়া কাটিতে লাগিল। ঠিক এই মুহূর্তে ললিতা ঘরে প্রবেশ করিল।

হারানবাবু কহিলেন, "ললিতা, সুচরিতার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

ললিতা ঘর হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সুচরিতা তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। ললিতা কহিল, "তোমার সঙ্গে পানুবাবুর যে কথা আছে।"

সুচরিতা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া ললিতার আঁচল চাপিয়াই রহিল; তখন ললিতা সুচরিতার আসনের এক পাশে বসিয়া পড়িল।

হারানবাবু কোনো বাধাতেই দমিবার পাত্র নহেন। তিনি আর ভূমিকামাত্র না করিয়া একেবারে কথাটা পাড়িয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমাদের বিবাহে আর বিলম্ব হওয়া উচিত মনে করি নে। পরেশবাবুকে জানিয়েছিলাম ; তিনি বললেন, তোমার সম্মতি পেলেই আর-কোনো বাধা থাকবে না। আমি স্থির করেছি, আগামী রবিবারের পরের রবিবারেই—"

সুচরিতা কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিল, "না।"

সুচরিতার মুখে এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট এবং উদ্ধত "না" শুনিয়া হারানবাবু থমকিয়া গেলেন। সুচরিতাকে তিনি অত্যন্ত বাধ্য বলিয়া জানিতেন। সে যে একমাত্র "না" বাণের দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবটিকে এক মুহূর্তে অর্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিবে ইহা তিনি মনেও করেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "না! না মানে কী? তুমি আরও দেরি করতে চাও?"

সুচরিতা কহিল, "না।"

হারানবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তবে?"

সুচরিতা মাথা নত করিয়া কহিল, "বিবাহে আমার মত নেই।"

হারানবাবু হতবুদ্ধির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মত নেই! তার মানে?"

ললিতা ঠোকর দিয়া কহিল, "পানুবাবু, আপনি আজ বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন নাকি?"

হারানবাবু কঠোর দৃষ্টির দ্বারা ললিতাকে আঘাত করিয়া কহিলেন, "বরঞ্চ মাতৃভাষা ভুলে গেছি এ কথা স্বীকার করা সহজ, কিন্তু যে মানুষের কথায় বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছি তাকে ভুল বুঝেছি এ কথা স্বীকার করা সহজ নয়।"

ললিতা কহিল, "মানুষকে বুঝতে সময় লাগে, আপনার সম্বন্ধেও হয়তো সে কথা খাটে।"

হারানবাবু কহিলেন, "প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আমার কথার বা মতের বা ব্যবহারের কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি— আমি আমাকে ভুল বোঝবার

কোনো উপলক্ষ কাউকে দিই নি, এ কথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি— সুচরিতাই বলুন আমি ঠিক বলছি কি না।"

ললিতা আবার কী একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল ; সুচরিতা তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, "আপনি ঠিক বলছেন। আপনাকে আমি কোনো দোষ দিতে চাই নে।"

হারানবাবু কহিলেন, "দোষ যদি না দেবে তবে আমার প্রতি অন্যায়ই বা করবে কেন ?"

সুচরিতা দৃঢ়স্বরে কহিল, "যদি একে অন্যায় বলেন তবে আমি অন্যায়ই করব— কিন্তু—"

বাহির হইতে ডাক আসিল, "দিদি, ঘরে আছেন ?"

সুচরিতা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আসুন, বিনয়বাবু, আসুন।"

"ভুল করছেন দিদি— বিনয়বাবু আসেন নি, আমি বিনয় মাত্র, আমাকে সমাদর করে লজ্জা দেবেন না"— বলিয়া বিনয় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হারানবাবুকে দেখিতে পাইল। হারানবাবুর মুখের অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "অনেক দিন আসি নি বলে রাগ করেছেন বুঝি !"

হারানবাবু পরিহাসে যোগ দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "রাগ করবারই কথা বটে। কিন্তু, আজ আপনি একটু অসময়ে এসেছেন— সুচরিতার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা হচ্ছিল।"

বিনয় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল ; কহিল, "ওই দেখুন, আমি কখন এলে যে অসময়ে আসা হয় না তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলুম না। এইজন্যই আসতে সাহসই হয় না।"

বলিয়া বিনয় বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

সুচরিতা কহিল, "বিনয়বাবু, যাবেন না। আমাদের যা কথা ছিল শেষ হয়ে গেছে। আপনি বসুন।"

বিনয় বুঝিতে পারিল, সে আসাতে সুচরিতা একটা বিশেষ সংকট হইতে

পরিত্রাণ পাইয়াছে। খুশি হইয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল এবং কহিল, "আমাকে প্রশ্রয় দিলে আমি কিছুতেই সামলাতে পারি নে। আমাকে বসতে বললে আমি বসবই এইরকম আমার স্বভাব। অতএব, দিদির প্রতি নিবেদন এই যে এ-সব কথা যেন বুঝেসুঝে বলেন, নইলে বিপদে পড়বেন।"

হারানবাবু কোনো কথা না বলিয়া আসন্ন ঝড়ের মতো স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি নীরবে প্রকাশ করিলেন, 'আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম— আমার যা কথা আছে তাহা শেষ পর্যন্ত বলিয়া তবে আমি উঠিব।'

দ্বারের বাহির হইতে বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ললিতার বুকের ভিতরকার সমস্ত রক্ত যেন চমক খাইয়া উঠিয়াছিল। সে বহুকষ্টে আপনার স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই পারিল না। বিনয় যখন ঘরে প্রবেশ করিল ললিতা বেশ সহজে তাহাদের পরিচিত বন্ধুর মতো তাহাকে কোনো কথা বলিতে পারিল না। কোন্ দিকে চাহিবে, নিজের হাতখানা লইয়া কী করিবে, সে যেন একটা ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িল। একবার উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুচরিতা কোনোমতেই তাহার কাপড় ছাড়িল না।

বিনয়ও যাহা কিছু কথাবার্তা সমস্ত সুচরিতার সঙ্গেই চালাইল— ললিতার নিকট কোনো কথা ফাঁদা তাহার মতো বাক্পটু লোকের কাছেও আজ শক্ত হইয়া উঠিল। এইজন্যই সে যেন ডবল জোরে সুচরিতার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল— কোথাও কোনো ফাঁক পড়িতে দিল না।

কিন্তু, হারানবাবুর কাছে ললিতা ও বিনয়ের এই নূতন সংকোচ অগোচর রহিল না। যে ললিতা তাঁহার সম্বন্ধে আজকাল এমন প্রখর ভাবে প্রগল্ভা হইয়া উঠিয়াছে সে আজ বিনয়ের কাছে এমন সংকুচিত ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকের সহিত কন্যাদের অবাধ পরিচয়ের অবকাশ দিয়া পরেশবাবু যে নিজের পরিবারকে কিরূপ কদাচারের মধ্যে লইয়া যাইতেছেন তাহা মনে করিয়া পরেশবাবুর

প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও বাড়িয়া উঠিল— এবং পরেশবাবুকে যেন একদিন এজন্য বিশেষ অনুতাপ করিতে হয় এই কামনা তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের মতো জাগিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ এইভাবে চলিলে পর স্পষ্টই বুঝা গেল, হারানবাবু উঠিবেন না। তখন সুচরিতা বিনয়কে কহিল, "মাসির সঙ্গে অনেক দিন আপনার দেখা হয় নি। তিনি আপনার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন। একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না?"

বিনয় চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মাসির কথা আমার মনে ছিল না, এমন অপবাদ আমাকে দেবেন না।"

সুচরিতা যখন বিনয়কে তাহার মাসির কাছে লইয়া গেল তখন ললিতা উঠিয়া কহিল, "পানুবাবু, আমার সঙ্গে আপনার বোধ হয় বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই।"

হারানবাবু কহিলেন, "না। তোমার বোধ হয় অন্যত্র বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি যেতে পারো।"

ললিতা কথাটার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ উদ্ধত ভাবে মাথা তুলিয়া ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করিয়া দিয়া কহিল, "বিনয়বাবু আজ অনেক দিন পরে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি। ততক্ষণ আপনি নিজের লেখা যদি পড়তে চান তা হলে— না, ওই যা, সে কাগজখানা দিদি দেখছি কুটি-কুটি করে ফেলেছেন। পরের লেখা যদি সহ্য করতে পারেন তা হলে এইগুলি দেখতে পারেন।"— বলিয়া কোণের টেবিল হইতে সযত্নরক্ষিত গোরার রচনাগুলি আনিয়া হারানবাবুর সম্মুখে রাখিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হরিমোহিনী বিনয়কে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। কেবল যে এই প্রিয়দর্শন যুবকের প্রতি স্নেহবশত তাহা নহে, এ বাড়িতে বাহিরের লোক যে-কেহ হরিমোহিনীর কাছে আসিয়াছে সকলেই তাঁহাকে যেন

কোনো-এক ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর মতো দেখিয়াছে। তাহারা কলিকাতার লোক, প্রায় সকলেই ইংরেজি ও বাংলা লেখাপড়ায় তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— তাহাদের দূরত্ব ও অবজ্ঞার আঘাতে তিনি অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া পড়িতেছিলেন। বিনয়কে তিনি আশ্রয়ের মতো অনুভব করিলেন। বিনয়ও কলিকাতার লোক, হরিমোহিনী শুনিয়াছেন লেখাপড়াতেও সে বড়ো কম নয়, অথচ এই বিনয় তাঁহাকে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা করে না, তাঁহাকে আপন লোকের মতো দেখে— ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মান একটা নির্ভর পাইল। বিশেষ করিয়া এইজন্যই অল্প পরিচয়েই বিনয় তাঁহার নিকট আত্মীয়ের স্থান লাভ করিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বিনয় তাঁহার বর্মের মতো হইয়া অন্য লোকের ঔদ্ধত্য হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে। এ বাড়িতে তিনি অত্যন্ত বেশি প্রকাশ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন— বিনয় যেন তাঁহার আবরণের মতো হইয়া তাঁহাকে আড়াল করিয়া রাখিবে।

হরিমোহিনীর কাছে বিনয় যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই ললিতা সেখানে কখনোই সহজে যাইত না, কিন্তু আজ হারানবাবুর গুপ্ত বিদ্রূপের আঘাতে সে সমস্ত সংকোচ ছিন্ন করিয়া যেন জোর করিয়া উপরের ঘরে গেল। শুধু গেল তাহা নহে, গিয়াই বিনয়ের সঙ্গে অজস্র কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের সভা খুব জমিয়া উঠিল ; এমন-কি, মাঝে মাঝে তাহাদের হাসির শব্দ নীচের ঘরে একাকী আসীন হারানবাবুর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বেশিক্ষণ একলা থাকিতে পারিলেন না, বরদাসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করিয়া মনের আক্ষেপ নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বরদাসুন্দরী শুনিলেন যে, সুচরিতা হারানবাবুর সঙ্গে বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। শুনিয়া তাঁহার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইল। তিনি কহিলেন, "পানুবাবু, আপনি ভালোমানুষি করলে চলবে না। ও যখন বার বার সম্মতি প্রকাশ করেছে এবং ব্রাহ্মসমাজ-সুদ্ধ সকলেই যখন এই বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে তখন ও আজ মাথা নাড়ল বলেই যে সমস্ত উল্‌টে যাবে এ কখনোই হতে দেওয়া চলবে না।

আপনার দাবি আপনি কিছুতেই ছাড়বেন না বলে রাখছি, দেখি ও কী করতে পারে।"

এ সম্বন্ধে হারানবাবুকে উৎসাহ দেওয়া বাহুল্য— তিনি তখন কাঠের মতন শক্ত হইয়া বসিয়া মাথা তুলিয়া মনে মনে বলিতেছিলেন, 'অন প্রিন্সিপ্‌ল্‌ এ দাবি ছাড়া চলিবে না। আমার পক্ষে সুচরিতাকে ত্যাগ করা বেশি কথা নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মাথা হেঁট করিয়া দিতে পারিব না।'

বিনয় হরিমোহিনীর সহিত আত্মীয়তাকে পাকা করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আহারের আবদার করিয়া বসিয়াছিল। হরিমোহিনী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া একটি ছোটো থালায় কিছু ভিজানো ছোলা, ছানা, মাখন, একটু চিনি, একটি কলা, এবং কাঁসার বাটিতে কিছু দুধ আনিয়া সযত্নে বিনয়ের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। বিনয় হাসিয়া কহিল, "অসময়ে ক্ষুধা জানাইয়া মাসিকে বিপদে ফেলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি ঠকিলাম।"

এই বলিয়া খুব আড়ম্বর করিয়া বিনয় আহারে বসিয়াছে, এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনয় তাহার থালার উপরে যথাসম্ভব নত হইয়া নমস্কারের চেষ্টা করিয়া কহিল, "অনেক ক্ষণ নীচে ছিলুম; আপনার সঙ্গে দেখা হল না।"

বরদাসুন্দরী তাহার কোনো উত্তর না করিয়া সুচরিতার প্রতি লক্ষ করিয়া কহিলেন, "এই-যে ইনি এখানে! আমি যা ঠাউরেছিলুম তাই! সভা বসেছে! আমোদ করছেন! এ দিকে বেচারা হারানবাবু সকাল থেকে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন, যেন তিনি ওঁর বাগানের মালী। ছেলেবেলা থেকে ওদের মানুষ করলুম— কই বাপু, এতদিন তো ওদের এরকম ব্যবহার কখনো দেখি নি। কে জানে আজকাল এ-সব শিক্ষা কোথা থেকে পাচ্ছে। আমাদের পরিবারে যা কখনো ঘটতে পারত না আজকাল তাই আরম্ভ হয়েছে— সমাজের লোকের কাছে যে আমাদের মুখ দেখাবার জো রইল না। এতদিন ধরে এত করে যা শেখানো গেল সে-সমস্তই দু-দিনে বিসর্জন দিলে। এ কী সব কাণ্ড!"

হরিমোহিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুচরিতাকে কহিলেন, "নীচে কেউ বসে আছেন, আমি তো জানতেম না। বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে তো। মা, যাও তুমি শীঘ্র যাও। আমি অপরাধ করে ফেলেছি।"

অপরাধ যে হরিমোহিনীর লেশমাত্র নহে, ইহাই বলিবার জন্য ললিতা মুহূর্তের মধ্যে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল। সুচরিতা গোপনে সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল এবং কোনো প্রতিবাদমাত্র না করিয়া নীচে চলিয়া গেল।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিনয় বরদাসুন্দরীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। বিনয় যে তাঁহাদের পরিবারের প্রভাবে পড়িয়া ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে এ সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। বিনয়কে তিনি যেন নিজের হাতে গড়িয়া তুলিতেছেন বলিয়া একটা বিশেষ গর্ব অনুভব করিতেছিলেন ; সে গর্ব তিনি তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কারও কারও কাছে প্রকাশও করিয়াছিলেন। সেই বিনয়কে আজ শত্রুপক্ষের শিবিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে যেন একটা দাহ উপস্থিত হইল এবং নিজের কন্যা ললিতাকে বিনয়ের পুনঃপতনের সহায়কারী দেখিয়া তাঁহার চিত্তজ্বালা যে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, "ললিতা, এখানে কি তোমার কোনো কাজ আছে?"

ললিতা কহিল, "হাঁ, বিনয়বাবু এসেছেন তাই—"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "বিনয়বাবু যাঁর কাছে এসেছেন তিনি ওঁর আতিথ্য করবেন, তুমি এখন নীচে এসো, কাজ আছে।"

ললিতা স্থির করিল, হারানবাবু নিশ্চয়ই বিনয় ও তাহার দুইজনের নাম লইয়া মাকে এমন-কিছু বলিয়াছেন যাহা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই। এই অনুমান করিয়া তাহার মন অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠিল। সে অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতার সহিত কহিল, "বিনয়বাবু অনেকদিন পরে এসেছেন, ওঁর সঙ্গে একটু গল্প করে নিয়ে তার পরে আমি যাচ্ছি।"

বরদাসুন্দরী ললিতার কথার স্বরে বুঝিলেন, জোর খাটিবে না।

হরিমোহিনীর সম্মুখেই পাছে তাঁহার পরাভব প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি আর কিছু না বলিয়া এবং বিনয়কে কোনোপ্রকার সম্ভাষণ না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ললিতা বিনয়ের সঙ্গে গল্প করিবার উৎসাহ তাহার মার কাছে প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে সে উৎসাহের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিন জনেই কেমন একপ্রকার কুণ্ঠিত হইয়া রহিল এবং অল্প ক্ষণ পরেই ললিতা উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এ বাড়িতে হরিমোহিনীর যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বিনয় স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। কথা পাড়িয়া ক্রমশ হরিমোহিনীর পূর্ব-ইতিহাস সমস্তই সে শুনিয়া লইল। সকল কথার শেষে হরিমোহিনী কহিলেন, "বাবা, আমার মতো অনাথার পক্ষে সংসার ঠিক স্থান নয়। কোনো তীর্থে গিয়ে দেবসেবায় মন দিতে পারলেই আমার পক্ষে ভালো হত। আমার অল্প যে-কটি টাকা বাকি রয়েছে তাতে আমার কিছুদিন চলে যেত, তার পরেও যদি বেঁচে থাকতুম তো পরের বাড়িতে রেঁধে খেয়েও আমার কোনোমতে দিন কেটে যেত। কাশীতে দেখে এলুম, এমন তো কত লোকের বেশ চলে যাচ্ছে। কিন্তু, আমি পাপিষ্ঠা বলে সে কোনোমতেই পেরে উঠলুম না। একলা থাকলেই আমার সমস্ত দুঃখের কথা আমাকে যেন ঘিরে বসে, ঠাকুরদেবতা কাউকে আমার কাছে আসতে দেয় না। ভয় হয় পাছে পাগল হয়ে যাই। যে মানুষ ডুবে মরছে তার পক্ষে ভেলা যেমন, রাধারানী আর সতীশ আমার পক্ষে তেমনি হয়ে উঠেছে— ওদের ছাড়বার কথা মনে করতে গেলেই দেখি আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। তাই আমার দিনরাত্রি ভয় হয়, ওদের ছাড়তেই হবে— নইলে সব খুইয়ে আবার এই কদিনের মধ্যে ওদের এত ভালোবাসতে গেলুম কী জন্যে। বাবা, তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, এদের দুটিকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পুজো আমি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি— এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর

তখনই কঠিন পাথর হয়ে যাবে।”

এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে হরিমোহিনী দুই চক্ষু মুছিলেন

৪০

সুচরিতা নীচের ঘরে আসিয়া হারানবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল; কহিল, “আপনার কী কথা আছে বলুন।”

হারানবাবু কহিলেন, “বোসো।”

সুচরিতা বসিল না, স্থির দাঁড়াইয়া রহিল।

হারানবাবু কহিলেন, “সুচরিতা, তুমি আমার প্রতি অন্যায় করছ।”

সুচরিতা কহিল, “আপনিও আমার প্রতি অন্যায় করছেন।”

হারানবাবু কহিলেন, “কেন, আমি তোমাকে যা কথা দিয়েছি এখনও তা—”

সুচরিতা মাঝখানে বাধা দিয়া কহিল, “ন্যায়-অন্যায় কি শুধু কেবল কথায়? সেই কথার উপর জোর দিয়ে আপনি কাজে আমার প্রতি অত্যাচার করতে চান? একটা সত্য কি সহস্র মিথ্যার চেয়ে বড়ো নয়? আমি যদি এক শো বার ভুল করে থাকি তবে কি আপনি জোর করে আমার সেই ভুলকেই অগ্রগণ্য করবেন? আজ আমার যখন সেই ভুল ভেঙেছে তখন আমি আমার আগেকার কোনো কথাকে স্বীকার করব না— করলে আমার অন্যায় হবে।”

সুচরিতার যে এমন পরিবর্তন কী করিয়া সম্ভব হইতে পারে তাহা হারানবাবু কোনোমতেই বুঝিতে পারিলেন না। তাহার স্বাভাবিক স্তব্ধতা ও নম্রতা আজ এমন করিয়া ভাঙিয়া গেছে, ইহা যে তাঁহারই দ্বারা ঘটিতে পারে তাহা অনুমান করিবার শক্তি ও বিনয় তাঁহার ছিল না। সুচরিতার নূতন সঙ্গীগুলির প্রতি মনে মনে দোষারোপ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কী ভুল করেছিলে?”

সুচরিতা কহিল, “সে কথা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? পূর্বে মত

ছিল, এখন আমার মত নেই— এই কি যথেষ্ট নয় ?"

হারানবাবু কহিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে। সমাজের লোকের কাছে তুমিই বা কী বলবে আমিই বা কী বলব ?"

সুচরিতা কহিল, "আমি কোনো কথাই বলব না। আপনি যদি বলতে ইচ্ছা করেন তবে বলবেন, সুচরিতার বয়স অল্প, ওর বুদ্ধি নেই, ওর মতি অস্থির। যেমন ইচ্ছা তেমনি বলবেন। কিন্তু, এ সম্বন্ধে এই আমাদের শেষ কথা হয়ে গেল।"

হারানবাবু কহিলেন, "শেষ কথা হতেই পারে না। পরেশবাবু যদি—"

বলিতে বলিতেই পরেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, "কী, পানুবাবু, আমার কথা কী বলছেন ?"

সুচরিতা তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। হারানবাবু ডাকিয়া কহিলেন, "সুচরিতা, যেয়ো না, পরেশবাবুর কাছে কথাটা হয়ে যাক।"

সুচরিতা ফিরিয়া দাঁড়াইল। হারানবাবু কহিলেন, "পরেশবাবু, এতদিন পরে আজ সুচরিতা বলছেন, বিবাহে ওঁর মত নেই। এতবড়ো গুরুতর বিষয় নিয়ে কি এতদিন ওঁর খেলা করা উচিত ছিল ? এই-যে কদর্য উপসর্গটা ঘটল, এজন্য কি আপনাকেও দায়ী হতে হবে না ?"

পরেশবাবু সুচরিতার মাথায় হাত বুলাইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "মা, তোমার এখানে থাকবার দরকার নেই, তুমি যাও।"

এই সামান্য কথাটুকু শুনিবা মাত্র এক মুহূর্তে অশ্রুজলে সুচরিতার দুই চোখ ভাসিয়া গেল এবং সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পরেশবাবু কহিলেন, "সুচরিতা যে নিজের মন ভালো করে না বুঝেই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল, এই সন্দেহ অনেক দিন থেকে আমার মনে উদয় হওয়াতেই সমাজের লোকের সামনে আপনাদের সম্বন্ধ পাকা করার বিষয়ে আমি আপনার অনুরোধ পালন করতে পারি নি।"

হারানবাবু কহিলেন, "সুচরিতা তখন নিজের মন ঠিক বুঝেই সম্মতি দিয়েছিল, এখনই না বুঝে অসম্মতি দিচ্ছে— এরকম সন্দেহ আপনার মনে

উদয় হচ্ছে না ?"

পরেশবাবু কহিলেন, "দুটোই হতে পারে, কিন্তু এরকম সন্দেহের স্থলে তো বিবাহ হতে পারে না।"

হারানবাবু কহিলেন, "আপনি সুচরিতাকে সৎপরামর্শ দেবেন না ?"

পরেশবাবু কহিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন, সুচরিতাকে আমি কখনো সাধ্যমত অসৎপরামর্শ দিতে পারি নে।"

হারানবাবু কহিলেন, "তাই যদি হত, তা হলে সুচরিতার এরকম পরিণাম কখনোই ঘটতে পারত না। আপনার পরিবারে আজকাল যে-সব ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে এ যে সমস্তই আপনার অবিবেচনার ফল, এ কথা আমি আপনাকে মুখের সামনেই বলছি।"

পরেশবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এ তো আপনি ঠিক কথাই বলছেন— আমার পরিবারের সমস্ত ফলাফলের দায়িত্ব আমি নেব না তো কে নেবে ?"

হারানবাবু কহিলেন, "এজন্যে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে— সে আমি বলে রাখছি।"

পরেশবাবু কহিলেন, "অনুতাপ তো ঈশ্বরের দয়া। অপরাধকেই ভয় করি, পানুবাবু, অনুতাপকে নয়।"

সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া পরেশবাবুর হাত ধরিয়া কহিল, "বাবা, তোমার উপাসনার সময় হয়েছে।"

পরেশবাবু কহিলেন, "পানুবাবু, তবে কি একটু বসবেন ?"

হারানবাবু কহিলেন, "না।" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

৪১

একই সময়ে নিজের অন্তরের সঙ্গে আবার নিজের বাহিরের সঙ্গে সুচরিতার যে সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহাকে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। গোরার প্রতি তাহার যে মনের ভাব এতদিন তাহার অলক্ষ্যে বল পাইয়া

উঠিয়াছিল এবং গোরার জেলে যাওয়ার পর হইতে যাহা তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট এবং দুর্নিবাররূপে দেখা দিয়াছে তাহা লইয়া সে যে কী করিবে, তাহার পরিণাম যে কী, তাহা সে কিছুই ভাবিয়া পায় না ; সে কথা কাহাকেও বলিতে পারে না, নিজের কাছে নিজে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। এই নিগূঢ় বেদনাটাকে লইয়া সে গোপনে বসিয়া নিজের সঙ্গে যে একটা বোঝা-পড়া করিয়া লইবে তাহার সে নিভৃত অবকাশটুকুও নাই— হারানবাবু তাহার দ্বারের কাছে তাঁহাদের সমস্ত সমাজকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন-কি ছাপার কাগজের ঢাকেও কাঠি পড়িবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহার উপরেও তাহার মাসির সমস্যা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে অতি সত্বর তাহার একটা কোনো মীমাংসা না করিলে একদিনও আর চলে না। সুচরিতা বুঝিয়াছে, এবার তাহার জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ আসিয়াছে, চিরপরিচিত পথে চিরাভ্যস্ত নিশ্চিন্তভাবে চলিবার দিনআরনাই।

এই তাহার সংকটের সময় তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল পরেশবাবু। তাঁহার কাছে সে পরামর্শ চাহে নাই, উপদেশ চাহে নাই—অনেক কথা ছিল যাহা পরেশবাবুর সম্মুখে সে উপস্থিত করিতে পারিত না এবং এমন অনেক কথা ছিল যাহা লজ্জাকর হীনতা-বশতই পরেশবাবুর কাছে প্রকাশের অযোগ্য। কেবল পরেশবাবুর জীবন, পরেশবাবুর সঙ্গমাত্র তাহাকে যেন নিঃশব্দে কোন্ পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করিয়া লইত।

এখন শীতের দিনে সন্ধ্যার সময় পরেশবাবু বাগানে যাইতেন না। বাড়ির পশ্চিম দিকের একটি ছোটো ঘরে মুক্ত দ্বারের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া তিনি উপাসনায় বসিতেন, তাঁহার শুক্লকেশমণ্ডিত শান্ত মুখের উপর সূর্যাস্তের আভা আসিয়া পড়িত। সেই সময়ে সুচরিতা নিঃশব্দপদে চুপ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত। নিজের অশান্ত ব্যথিত চিত্তটিকে সে যেন পরেশের উপাসনার গভীরতার মাঝখানে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। আজকাল উপাসনান্তে প্রায়ই পরেশ দেখিতে পাইতেন, তাঁহার এই কন্যাটি, এই ছাত্রীটি, স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছে। তখন তিনি একটি

অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক মাধুর্যের দ্বারা এই বালিকাটিকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া নিঃশব্দে ইহাকে আশীর্বাদ করিতেন।

ভূমার সহিত মিলনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া যাহা শ্রেয়তম এবং সত্যতম পরেশের চিত্ত সর্বদাই তাহার অভিমুখ ছিল। এইজন্য সংসার কোনোমতেই তাঁহার কাছে অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতে পারিত না। এইরূপে নিজের মধ্যে তিনি একটি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই মত বা আচরণ লইয়া তিনি অন্যের প্রতি কোনোপ্রকার জবর্দস্তি করিতে পারিতেন না। মঙ্গলের প্রতি নির্ভর এবং সংসারের প্রতি ধৈর্য তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ইহা তাঁহার এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, সাম্প্রদায়িক লোকের কাছে তিনি নিন্দিত হইতেন; কিন্তু নিন্দাকে তিনি এমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন যে হয়তো তাহা তাঁহাকে আঘাত করিত, কিন্তু তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া থাকিত না। তিনি মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবলই থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন, 'আমি আর-কাহারও হাত হইতে কিছুই লইব না, আমি তাঁহার হাত হইতেই সমস্ত লইব।'

পরেশের জীবনের এই গভীর নিস্তব্ধ শান্তির স্পর্শ লাভ করিবার জন্য আজকাল সুচরিতা নানা উপলক্ষেই তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অনভিজ্ঞ বালিকা-বয়সে তাহার বিরুদ্ধ হৃদয় এবং বিরুদ্ধ সংসার যখন তাহাকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে তখন সে বার বার কেবল মনে করিয়াছে, 'বাবার পা দুখানা মাথায় চাপিয়া ধরিয়া খানিক ক্ষণের জন্য যদি মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারি তবে আমার মন শান্তিতে ভরিয়া উঠে।'

এইরূপে সুচরিতা মনে ভাবিতেছিল সে মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিচলিত ধৈর্যের সহিত সমস্ত আঘাতকে ঠেকাইয়া রাখিবে, অবশেষে সমস্ত প্রতিকূলতা আপনি পরাস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিল না, তাহাকে অপরিচিত পথে বাহির হইতে হইল।

বরদাসুন্দরী যখন দেখিলেন, রাগ করিয়া, ভর্ৎসনা করিয়া সুচরিতাকে টলানো সম্ভব নহে এবং পরেশকেও সহায়রূপে পাইবার কোনো আশা নাই,

তখন হরিমোহিনীর প্রতি তাঁহার ক্রোধ অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহের মধ্যে হরিমোহিনীর অস্তিত্ব তাঁহাকে উঠিতে বসিতে যন্ত্রণা দিতে লাগিল।

সেদিন তাঁহার পিতার মৃত্যুদিনের বার্ষিক উপাসনা উপলক্ষে তিনি বিনয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উপাসনা সন্ধ্যার সময় হইবে, তৎপূর্বেই তিনি সভাগৃহ সাজাইয়া রাখিতেছিলেন; সুচরিতা এবং অন্য মেয়েরাও তাঁহার সহায়তা করিতেছিল।

এমন সময় তাঁহার চোখে পড়িল, বিনয় পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে হরিমোহিনীর নিকট যাইতেছে। মন যখন ভারাক্রান্ত থাকে তখন ক্ষুদ্র ঘটনাও বড়ো হইয়া উঠে। বিনয়ের এই উপরের ঘরে যাওয়া এক মুহূর্তে তাঁহার কাছে এমন অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তিনি ঘর সাজানো ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ হরিমোহিনীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বিনয় মাদুরে বসিয়া আত্মীয়ের ন্যায় বিশ্রব্ধভাবে হরিমোহিনীর সহিত কথা কহিতেছে।

বরদাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "দেখো, তুমি আমাদের এখানে যতদিন খুশি থাকো, আমি তোমাকে আদর যত্ন করেই রাখব। কিন্তু, আমি বলছি, তোমার ওই ঠাকুরকে এখানে রাখা চলবে না।"

হরিমোহিনী চিরকাল পাড়াগাঁয়েই থাকিতেন। ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে, তাহারা খৃস্টানেরই শাখাবিশেষ। সুতরাং তাহাদেরই সংস্রব সম্বন্ধে বিচার করিবার বিষয় আছে। কিন্তু, তাহারাও যে তাঁহার সম্বন্ধে সংকোচ অনুভব করিতে পারে, ইহা তিনি এই কয়দিনে ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছিলেন। কী করা কর্তব্য ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে আজ বরদাসুন্দরীর মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে, আর চিন্তা করিবার সময় নাই, যাহা হয় একটা কিছু স্থির করিতে হইবে। প্রথমে ভাবিলেন, কলিকাতায় একটা কোথাও বাসা লইয়া থাকিবেন, তাহা হইলে মাঝে মাঝে সুচরিতা ও সতীশকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু, তাঁহার

যে অল্প সম্বল তাহাতে কলিকাতার খরচ চলিবে না।

বরদাসুন্দরী অকস্মাৎ ঝড়ের মতো আসিয়া যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিনয় মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "আমি তীর্থে যাব, তোমরা কেউ আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে বাবা?"

বিনয় কহিল, "খুব পারব। কিন্তু, তার আয়োজন করতে তো দু-চার দিন দেরি হবে; ততদিন চলো, মাসি, তুমি আমার মার কাছে গিয়ে থাকবে।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "বাবা, আমার ভার বিষম ভার। বিধাতা আমার কপালের উপর কী বোঝা চাপিয়েছেন জানি নে, আমাকে কেউ বইতে পারে না। আমার শ্বশুরবাড়িতেও যখন আমার ভার সইল না তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু, বড়ো অবুঝ মন বাবা— বুক যে খালি হয়ে গেছে সেইটে ভরাবার জন্যে কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার পোড়া ভাগ্যও যে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আর থাক্‌, বাবা, আর-কারও বাড়িতে গিয়ে কাজ নেই— যিনি বিশ্বের বোঝা বন তাঁরই পাদপদ্মে এবার আমি আশ্রয় গ্রহণ করব— আর আমি পারি নে।"

বলিয়া বার বার করিয়া দুই চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিনয় কহিল, "সে বললে হবে না মাসি। আমার মার সঙ্গে অন্য-কারও তুলনা করলে চলবে না। যিনি নিজের জীবনের সমস্ত ভার ভগবানকে সমর্পণ করতে পেরেছেন তিনি অন্যের ভার বইতে ক্লেশ বোধ করেন না। যেমন আমার মা, আর যেমন এখানে দেখলেন পরেশবাবু। সে আমি শুনব না— একবার আমার তীর্থে তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসব, তার পরে তোমার তীর্থ আমি দেখতে যাব।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তাঁদের তা হলে তো একবার খবর দিয়ে—"

বিনয় কহিল, "আমরা গেলেই মা খবর পাবেন— সেইটেই হবে পাকা খবর।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তা হলে কাল সকালে—"

বিনয় কহিল, "দরকার কী। আজ রাত্রেই গেলে হবে।"

সন্ধ্যার সময় সুচরিতা আসিয়া কহিল, "বিনয়বাবু, মা আপনাকে ডাকতে পাঠালেন। উপাসনার সময় হয়েছে।"

বিনয় কহিল, "মাসির সঙ্গে কথা আছে, আজ আমি যেতে পারব না।"

আসল কথা, আজ বিনয় বরদাসুন্দরীর উপাসনার নিমন্ত্রণ কোনোমতে স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, সমস্তই বিড়ম্বনা।

হরিমোহিনী ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "বাবা বিনয়, যাও তুমি। আমার সঙ্গে কথাবার্তা সে পরে হবে। তোমাদের কাজকর্ম আগে হয়ে যাক, তার পরে তুমি এসো।"

সুচরিতা কহিল, "আপনি এলে কিন্তু ভালো হয়।"

বিনয় বুঝিল, সে সভাক্ষেত্রে না গেলে এই পরিবারে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাকে কিছু পরিমাণে আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। এইজন্য সে উপাসনাস্থলে গেল, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ ফললাভ হইল না।

উপাসনার পর আহার ছিল ; বিনয় কহিল, "আজ আমার ক্ষুধা নেই।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "ক্ষুধার অপরাধ নেই। আপনি তো উপরেই খাওয়া সেরে এসেছেন।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "হাঁ, লোভী লোকের এইরকম দশাই ঘটে। উপস্থিতের প্রলোভনে ভবিষ্যৎ খুইয়ে বসে।"

এই বলিয়া বিনয় প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপরে যাচ্ছেন বুঝি ?"

বিনয় সংক্ষেপে কেবল "হাঁ" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বারের কাছে সুচরিতা ছিল ; তাহাকে মৃদুস্বরে কহিল, "দিদি, একবার মাসির কাছে যাবেন, বিশেষ কথা আছে।"

ললিতা আতিথ্যে নিযুক্ত ছিল। এক সময় সে হারানবাবুর কাছে আসিতেই তিনি অকারণে বলিয়া উঠিলেন, "বিনয়বাবু তো এখানে নেই,

তিনি উপরে গিয়েছেন।”

শুনিয়াই ললিতা সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া অসংকোচে কহিল, “জানি। তিনি আমার সঙ্গে না দেখা করে যাবেন না। আমার এখানকার কাজ সারা হলেই উপরে যাব এখন।”

ললিতাকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত করিতে না পারিয়া হারানের অন্তররুদ্ধ দাহ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিনয় সুচরিতাকে হঠাৎ কী একটা বলিয়া গেল এবং সুচরিতা অনতিকাল পরেই তাহার অনুসরণ করিল, ইহাও হারানবাবুর লক্ষ এড়াইতে পারে নাই। তিনি আজ সুচরিতার সহিত আলাপের উপলক্ষ সন্ধান করিয়া বারম্বার অকৃতার্থ হইয়াছেন— দুই-একবার সুচরিতা তাঁহার সুস্পষ্ট আহ্বান এমন করিয়া এড়াইয়া গেছে যে সভাস্থ লোকের কাছে হারানবাবু নিজেকে অপদস্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মন সুস্থ ছিল না।

সুচরিতা উপরে গিয়া দেখিল, হরিমোহিনী তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া এমনভাবে বসিয়া আছেন যেন এখনই কোথায় যাইবেন। সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, “মাসি, এ কী!”

হরিমোহিনী তাহার কোনো উত্তর দিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কহিলেন, “সতীশ কোথায় আছে, তাকে একবার ডেকে দাও মা।”

সুচরিতা বিনয়ের মুখের দিকে চাহিতেই বিনয় কহিল, “এ বাড়িতে মাসি থাকলে সকলেরই অসুবিধে হয়, তাই আমি ওঁকে মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।”

হরিমোহিনী কহিলেন, “সেখান থেকে আমি তীর্থে যাব মনে করেছি। আমার মতো লোকের কারও বাড়িতে এরকম করে থাকা ভালো হয় না। চিরদিন লোকে আমাকে এমন করে সহ্যই বা করবে কেন!”

সুচরিতা নিজেই এ কথা কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছিল। এ বাড়িতে বাস করা যে তাহার মাসির পক্ষে অপমান তাহা সে অনুভব করিয়াছিল, সুতরাং সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। চুপ করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি হইয়াছে; ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই।

কলিকাতার হেমন্তের অস্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন। কাহাদের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তাহা সেই অন্ধকারে দেখা গেল না।

সিঁড়ি হইতেই সতীশের উচ্চকণ্ঠে 'মাসিমা' ধ্বনি শুনা গেল। "কী বাবা, এসো বাবা" বলিয়া হরিমোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন।

সুচরিতা কহিল, "মাসিমা, আজ রাত্রে কোথাও যাওয়া হতেই পারে না, কাল সকালে সমস্ত ঠিক করা যাবে। বাবাকে ভালো করে না বলে তুমি কী করে যেতে পারবে বলো। সে যে বড়ো অন্যায় হবে।"

বিনয় বরদাসুন্দরী কর্তৃক হরিমোহিনীর অপমানে উত্তেজিত হইয়া এ কথা ভাবে নাই। সে স্থির করিয়াছিল এক রাত্রিও মাসির এ বাড়িতে থাকা উচিত হইবে না— এবং আশ্রয়ের অভাবেই যে হরিমোহিনী সমস্ত সহ্য করিয়া এ বাড়িতে রহিয়াছেন, বরদাসুন্দরীর সেই ধারণা দূর করিবার জন্য বিনয় হরিমোহিনীকে এখান হইতে লইয়া যাইতে লেশমাত্র বিলম্ব করিতে চাহিতেছিল না। সুচরিতার কথা শুনিয়া বিনয়ের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, এ বাড়িতে বরদাসুন্দরীর সঙ্গেই যে হরিমোহিনীর একমাত্র এবং সর্বপ্রধান সম্বন্ধ তাহা নহে। যে ব্যক্তি অপমান করিয়াছে তাহাকেই বড়ো করিয়া দেখিতে হইবে আর যে লোক উদারভাবে আত্মীয়ের মতো আশ্রয় দিয়াছে তাহাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে, এ তো ঠিক নহে।

বিনয় বলিয়া উঠিল, "সে ঠিক কথা। পরেশবাবুকে না জানিয়ে কোনো-মতেই যাওয়া যায় না।"

সতীশ আসিয়াই কহিল, "মাসিমা, জান? রাশিয়ানরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে আসছে। ভারি মজা হবে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কার দলে?"

সতীশ কহিল, "আমি রাশিয়ানের দলে।"

বিনয় কহিল, "তা হলে রাশিয়ানের আর ভাবনা নেই।"

এইরূপে সতীশ মাসিমার সভা জমাইয়া তুলিতেই সুচরিতা আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

সুচরিতা জানিত, শুইতে যাইবার পূর্বে পরেশবাবু তাঁহার কোনো একটি প্রিয় বই খানিকটা করিয়া পড়িতেন। কতদিন এইরূপ সময়ে সুচরিতা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়াছে এবং সুচরিতার অনুরোধে পরেশবাবু তাহাকেও পড়িয়া শুনাইয়াছেন।

আজও তাঁহার নির্জন ঘরে পরেশবাবু আলোটি জ্বালাইয়া এমার্সনের গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। সুচরিতা ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। পরেশবাবু বইখানি রাখিয়া একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সুচরিতার সংকল্প ভঙ্গ হইল— সে সংসারের কোনো কথাই তুলিতে পারিল না। কহিল, "বাবা, আমাকে পড়ে শোনাও।"

পরেশবাবু তাহাকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেলে পড়া শেষ হইল। তখনও সুচরিতা নিদ্রার পূর্বে পরেশবাবুর মনে কোনোপ্রকার ক্ষোভ পাছে জন্মে এইজন্য কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল।

পরেশবাবু তাহাকে স্নেহস্বরে ডাকিলেন, "রাধে!"

সে তখন ফিরিয়া আসিল। পরেশবাবু কহিলেন, "তুমি তোমার মাসির কথা আমাকে বলতে এসেছিলে?"

পরেশবাবু তাহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন জানিয়া সুচরিতা বিস্মিত হইয়া বলিল, "হাঁ বাবা, কিন্তু আজ থাক্, কাল সকালে কথা হবে।"

পরেশবাবু কহিলেন, "বোসো।"

সুচরিতা বসিলে তিনি কহিলেন, "তোমার মাসির এখানে কষ্ট হচ্ছে, সে কথা আমি চিন্তা করেছি। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ লাবণ্যর মার সংস্কারে যে এত বেশি আঘাত দেবে, তা আমি আগে ঠিক জানতে পারি নি। যখন দেখছি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে তখন এ বাড়িতে তোমার মাসিকে রাখলে তিনি সংকুচিত হয়ে থাকবেন।"

সুচরিতা কহিল, "আমার মাসি এখান থেকে যাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছেন।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমি জানতুম যে তিনি যাবেন। তোমরা দুজনেই তাঁর একমাত্র আত্মীয়— তোমরা তাঁকে এমন অনাথার মতো বিদায় দিতে পারবে না, সেও আমি জানি। তাই আমি এ কয়দিন এ সম্বন্ধে ভাবছিলুম।"

তাহার মাসি কী সংকটে পড়িয়াছেন পরেশবাবু যে তাহা বুঝিয়াছেন ও তাহা লইয়া ভাবিতেছেন, এ কথা সুচরিতা একেবারেই অনুমান করে নাই। পাছে তিনি জানিতে পারিয়া বেদনা বোধ করেন এই ভয়ে সে এতদিন অত্যন্ত সাবধানে চলিতেছিল— আজ পরেশবাবুর কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গেল এবং তাহার চোখের পাতা ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।

পরেশবাবু কহিলেন, "তোমার মাসির জন্যে আমি একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছি।"

সুচরিতা কহিল, "কিন্তু, তিনি তো—"

পরেশবাবু। ভাড়া দিতে পারবেন না! ভাড়া তিনি কেন দেবেন? তুমি ভাড়া দেবে।

সুচরিতা অবাক হইয়া পরেশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পরেশবাবু হাসিয়া কহিলেন, "তোমারই বাড়িতে থাকতে দিয়ো, ভাড়া দিতে হবে না।"

সুচরিতা আরও বিস্মিত হইল। পরেশবাবু কহিলেন, "কলকাতায় তোমাদের দুটো বাড়ি আছে জান না! একটি তোমার, একটি সতীশের। মৃত্যুর সময়ে তোমার বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যান। আমি তাই খাটিয়ে বাড়িয়ে তুলে কলকাতায় দুটো বাড়ি কিনেছি। এতদিন তার ভাড়া পাচ্ছিলুম, তাও জমছিল। তোমার বাড়ির ভাড়াটে অল্পদিন হল উঠেও গেছে— সেখানে তোমার মাসির থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না।"

সুচরিতা কহিল, "সেখানে তিনি কি একলা থাকতে পারবেন?"

পরেশবাবু কহিলেন, "তোমরা তাঁর আপনার লোক থাকতে তাঁকে একলা থাকতে হবে কেন?"

সুচরিতা কহিল, "সেই কথাই তোমাকে বলবার জন্যে আজ এসেছিলুম।

মাসি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন; আমি ভাবছিলুম, আমি একলা কী করে তাঁকে যেতে দেব। তাই তোমার উপদেশ নেব বলে এসেছি। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমাদের বাসার গায়েই এই-যে গলি, এই গলির দুটো-তিনটে বাড়ির পরেই তোমার বাড়ি— ওই বারান্দায় দাঁড়ালে সে বাড়ি দেখা যায়। সেখানে তোমরা থাকলে নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে হবে না। আমি তোমাদের দেখতে-শুনতে পারব।"

সুচরিতার বুকের উপর হইতে একটা মস্ত পাথর নামিয়া গেল। 'বাবাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইব' এই চিন্তার সে কোনো অবধি পাইতেছিল না। কিন্তু, যাইতেই হইবে, ইহাও তাহার কাছে নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুচরিতা আবেগপরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া পরেশবাবুর কাছে বসিয়া রহিল। পরেশবাবুও স্তব্ধ হইয়া নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে নিজেকে গভীর-ভাবে নিহিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা তাঁহার শিষ্যা, তাঁহার কন্যা, তাঁহার সুহৃদ। সে তাঁহার জীবনের, এমন-কি, তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যেদিন সে নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার উপাসনার সহিত যোগ দিত সেদিন তাঁহার উপাসনা যেন বিশেষ পূর্ণতা লাভ করিত। প্রতিদিন সুচরিতার জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ স্নেহের দ্বারা গড়িতে গড়িতে তিনি নিজের জীবনকেও একটি বিশেষ পরিণতি দান করিতেছিলেন। সুচরিতা যেমন ভক্তি যেমন একান্ত নম্রতার সহিত তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এমন করিয়া আর-কেহ তাঁহার কাছে আসে নাই; ফুল যেমন করিয়া আকাশের দিকে তাকায় সে তেমনি করিয়া তাঁহার দিকে তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে উন্মুখ এবং উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। এমন একাগ্রভাবে কেহ কাছে আসিলে মানুষের দান করিবার শক্তি আপনি বাড়িয়া যায়— অন্তঃকরণ জলভারনম্র মেঘের মতো পরিপূর্ণতার দ্বারা নত হইয়া পড়ে। নিজের যাহা-কিছু সত্য, যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা কোনো অনুকূল চিত্তের নিকট প্রতিদিন দান করিবার সুযোগের মতো এমন শুভযোগ মানুষের কাছে আর-কিছু হইতেই পারে না।

সেই দুর্লভ সুযোগ সুচরিতা পরেশকে দিয়াছিল। এজন্য সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল। আজ সেই সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার বাহ্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে— ফলকে নিজের জীবন-রসে পরিপক্ব করিয়া তুলিয়া তাহাকে গাছের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এজন্য তিনি মনের মধ্যে যে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন সেই নিগূঢ় বেদনাটিকে তিনি অন্তর্যামীর নিকট নিবেদন করিয়া দিতেছিলেন। সুচরিতার পাথেয় সঞ্চয় হইয়াছে, এখন নিজের শক্তিতে প্রশস্ত পথে সুখে দুঃখে আঘাত-প্রতিঘাতে নূতন অভিজ্ঞতা-লাভের দিকে যে তাহার আহ্বান আসিয়াছে তাহার আয়োজন কিছুদিন হইতেই পরেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, 'বৎসে, যাত্রা করো— তোমার চিরজীবন যে কেবল আমার বুদ্ধি এবং আমার আশ্রয়ের দ্বারাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিব, এমন কখনোই হইতে পারিবে না— ঈশ্বর আমার নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া বিচিত্রের ভিতর দিয়া তোমাকে চরম পরিণামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান— তাঁহার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হউক।' এই বলিয়া আশৈশব-স্নেহ-পালিত সুচরিতাকে তিনি মনের মধ্যে নিজের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে পবিত্র উৎসর্গসামগ্রীর মতো তুলিয়া ধরিতেছিলেন। পরেশ বরদাসুন্দরীর প্রতি রাগ করেন নাই, নিজের সংসারের প্রতি মনকে কোনো-প্রকার বিরোধ অনুভব করিতে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি জানিতেন, সংকীর্ণ উপকূলের মাঝখানে নূতন বর্ষণের জলরাশি হঠাৎ আসিয়া পড়িলে অত্যন্ত একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়— তাহার একমাত্র প্রতিকার তাহাকে প্রশস্ত ক্ষেত্রে মুক্ত করিয়া দেওয়া। তিনি জানিতেন, অল্পদিনের মধ্যে সুচরিতাকে আশ্রয় করিয়া এই ছোটো পরিবারটির মধ্যে যে-সকল অপ্রত্যাশিত সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহা এখানকার বাঁধা সংস্কারকে পীড়িত করিতেছে; তাহাকে এখানে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া মুক্তিদান করিলেই, তবেই স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য ঘটিয়া সমস্ত শান্ত হইতে পারিবে। ইহা জানিয়া যাহাতে সহজে সেই শান্তি ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে নীরবে তাহারই আয়োজন করিতেছিলেন।

দুই জনে কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ঘড়িতে এগারোটা বাজিয়া গেল। তখন পরেশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়িবারান্দার ছাদে লইয়া গেলেন। সন্ধ্যাকাশের বাষ্প কাটিয়া গিয়া তখন নির্মল অন্ধকারের মধ্যে তারাগুলি দীপ্তি পাইতেছিল। সুচরিতাকে পাশে লইয়া পরেশ সেই নিস্তব্ধ রাত্রে প্রার্থনা করিলেন— 'সংসারের সমস্ত অসত্য কাটিয়া পরিপূর্ণ সত্য আমাদের জীবনের মাঝখানে নির্মল মূর্তিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠুন।'

৪২

পরদিন প্রাতে হরিমোহিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া পরেশকে প্রণাম করিতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া কহিলেন, "করেন কী!"

হরিমোহিনী অশ্রুনেত্রে কহিলেন, "আপনার ঋণ আমি কোনো জন্মে শোধ করতে পারব না। আমার মতো এতোবড়ো নিরুপায়ের তুমি উপায় করে দিয়েছ, এ তুমি ভিন্ন আর-কেউ করতে পারত না। ইচ্ছা করলেও আমার ভালো কেউ করতে পারে না, এ আমি দেখেছি— তোমার উপর ভগবানের খুব অনুগ্রহ আছে তাই তুমি আমার মতো লোকের উপরেও অনুগ্রহ করতে পেরেছ।"

পরেশবাবু অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, "আমি বিশেষ কিছুই করি নি— এ-সমস্ত রাধারানী—"

হরিমোহিনী বাধা দিয়া কহিলেন, "জানি জানি— কিন্তু, রাধারানীই যে তোমার— ও যা করে সে যে তোমারই করা। ওর যখন মা গেল, ওর বাপও রইল না, তখন ভেবেছিলুম মেয়েটা বড়ো দুর্ভাগিনী। কিন্তু, ওর দুঃখের কপালকে ভগবান যে এমন ধন্য করে তুলবেন তা কেমন করে জানব বলো। দেখো, ঘুরে ফিরে শেষে আজ তোমার দেখা যখন পেয়েছি তখন বেশ বুঝতে পেরেছি ভগবান আমাকেও দয়া করেছেন।"

"মাসি, মা এসেছেন তোমাকে নেবার জন্মে" বলিয়া বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুচরিতা উঠিয়া পড়িয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কোথায় তিনি ?"

বিনয় কহিল, "নীচে আপনার মার কাছে বসে আছেন।"

সুচরিতা তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল।

পরেশবাবু হরিমোহিনীকে কহিলেন, "আমি আপনার বাড়িতে জিনিস-পত্র সমস্ত গুছিয়ে দিয়ে আসি গে।"

পরেশবাবু চলিয়া গেলে বিস্মিত বিনয় কহিল, "মাসি, তোমার বাড়ির কথা তো জানতুম না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "আমিও যে জানতুম না বাবা। জানতেন কেবল পরেশবাবু। আমাদের রাধারানীর বাড়ি।"

বিনয় সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, "ভেবেছিলুম, পৃথিবীতে বিনয় একজন কারও একটা কোনো কাজে লাগবে। তাও ফসকে গেল। এ-পর্যন্ত মায়ের তো কিছুই করতে পারি নি, যা করবার সে তিনিই আমার করেন— মাসিরও কিছু করতে পারব না, তাঁর কাছ থেকেই আদায় করব। আমার ওই নেবারই কপাল, দেবার নয়।"

কিছু ক্ষণ পরে ললিতা ও সুচরিতার সঙ্গে আনন্দময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিমোহিনী অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিলেন, "ভগবান যখন দয়া করেন তখন আর কৃপণতা করেন না— দিদি, তোমাকেও আজ পেলুম।"

বলিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে আনিয়া মাদুরের 'পরে বসাইলেন।

হরিমোহিনী কহিলেন, "দিদি, তোমার কথা ছাড়া বিনয়ের মুখে আর-কোনো কথা নেই।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "ছেলেবেলা থেকেই ওর ওই রোগ, যে কথা ধরে সে কথা শীঘ্র ছাড়ে না। শীঘ্র মাসির পালাও শুরু হবে।"

বিনয় কহিল, "তা হবে, সে আমি আগে থাকতেই বলে রাখছি। আমার অনেক বয়সের মাসি, নিজে সংগ্রহ করেছি, এতদিন যে বঞ্চিত ছিলুম নানারকম করে সেটা পুষিয়ে নিতে হবে।"

আনন্দময়ী ললিতার দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আমাদের বিনয় ওর যা অভাব তা সংগ্রহ করতেও জানে, আর সংগ্রহ করে প্রাণমনে তার আদর করতেও জানে। তোমাদের ও যে কী চোখে দেখেছে সে আমিই জানি— যা কখনও ভাবতে পারত না তারই যেন হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়েছে। তোমাদের সঙ্গে ওদের জানাশোনা হওয়াতে আমি যে কত খুশি হয়েছি সে আর কী বলব মা। তোমাদের এই ঘরে যে এমন করে বিনয়ের মন বসেছে তাতে ওর' ভারি উপকার হয়েছে। সে কথা ও খুব বোঝে, আর স্বীকার করতেও ছাড়ে না।"

ললিতা একটা কিছু উত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াও কথা খুঁজিয়া পাইল না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সুচরিতা ললিতার বিপদ দেখিয়া কহিল, "সকল মানুষের ভিতরকার ভালোটি বিনয়বাবু দেখতে পান, এইজন্যই সকল মানুষের যেটুকু ভালো সেটুকু ওঁর ভোগে আসে। সে অনেকটা ওঁর গুণ।"

বিনয় কহিল, "মা, তুমি বিনয়কে যতবড়ো আলোচনার বিষয় বলে ঠিক করে রেখেছ সংসারে তার ততবড়ো গৌরব নেই। এ কথাটা তোমাকে বোঝাব মনে করি, নিতান্ত অহংকারবশতই পারি নে। কিন্তু, আর চলল না। মা, আর নয়, বিনয়ের কথা আজ এই পর্যন্ত।"

এমন সময় সতীশ তাহার অচিরজাত কুকুরশাবকটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিমোহিনী ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা সতীশ, লক্ষ্মী বাপ আমার, ও কুকুরটাকে নিয়ে যাও বাবা।"

সতীশ কহিল, "ও কিছু করবে না মাসি। ও তোমার ঘরে যাবে না। তুমি ওকে একটু আদর করো ও কিছু বলবে না।"

হরিমোহিনী সরিয়া গিয়া কহিলেন, "না বাবা, না, ওকে নিয়ে যাও।"

তখন আনন্দময়ী কুকুর-সুদ্ধ সতীশকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। কুকুরকে কোলের উপর লইয়া সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সতীশ না? আমাদের বিনয়ের বন্ধু?"

বিনয়ের বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয়কে সতীশ কিছুই অসংগত মনে করিত না ; সুতরাং সে অসংকোচে বলিল, "হাঁ।"

বলিয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "আমি যে বিনয়ের মা হই।"

কুকুরশাবক আনন্দময়ীর হাতের বালা চর্বণের চেষ্টা করিয়া আত্মবিনোদনে প্রবৃত্ত হইল। সুচরিতা কহিল, "বক্তিয়ার, মাকে প্রণাম কর্।"

সতীশ লজ্জিতভাবে কোনোমতে প্রণামটা সারিয়া লইল।

এমন সময়ে বরদাসুন্দরী উপরে আসিয়া হরিমোহিনীর দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাদের এখানে কিছু খাবেন ?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "খাওয়াছোঁওয়া নিয়ে আমি কিছু বাছবিচার করি নে। কিন্তু, আজকে থাক্— গোরা ফিরে আসুক, তার পরে খাব।"

আনন্দময়ী গোরার অসাক্ষাতে গোরার অপ্রিয় কোনো আচরণ করিতে পারিলেন না।

বরদাসুন্দরী বিনয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "এই-যে বিনয়বাবু এখানে ; আমি বলি, আপনি আসেন নি বুঝি।"

বিনয় তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমি যে এসেছি, সে বুঝি আপনাকে না জানিয়ে যাব ভেবেছেন ?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "কাল তো নিমন্ত্রণের খাওয়া ফাঁকি দিয়েছেন, আজ না হয় বিনা নিমন্ত্রণের খাওয়া খাবেন।"

বিনয় কহিল, "সেইটেতেই আমার লোভ বেশি। মাইনের চেয়ে উপরি-পাওনার টান বড়ো।"

হরিমোহিনী মনে মনে বিস্মিত হইলেন। বিনয় এ বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে— আনন্দময়ীও বাছবিচার করেন না। ইহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না। বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে হরিমোহিনী সসংকোচে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তোমার স্বামী কি—"

আনন্দময়ী কহিলেন, “আমার স্বামী খুব হিন্দু।”

হরিমোহিনী অবাক হইয়া রহিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, “বোন, যতদিন সমাজ আমার সকলের চেয়ে বড়ো ছিল ততদিন সমাজকেই মেনে চলতুম, কিন্তু একদিন ভগবান আমার ঘরে হঠাৎ এমন করে দেখা দিলেন যে আমাকে আর সমাজ মানতে দিলেন না। তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে নিয়েছেন, তখন আমি আর-কাকে ভয় করি।”

হরিমোহিনী এ কৈফিয়তের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, “তোমার স্বামী?”

আনন্দময়ী কহিলেন, “আমার স্বামী রাগ করেন।”

হরিমোহিনী। ছেলেরা?

আনন্দময়ী। ছেলেরাও খুশি নয়। কিন্তু তাদের খুশি করেই কি বাঁচব? বোন, আমার এ কথা কাউকে বোঝাবার নয়— যিনি সব জানেন তিনিই বুঝবেন।

বলিয়া আনন্দময়ী হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। হরিমোহিনী ভাবিলেন, হয়তো কোনো মিশনারির মেয়ে আসিয়া আনন্দময়ীকে খৃস্টানি ভজাইয়া গেছে। তাঁহার মনের মধ্যে অত্যন্ত একটা সংকোচ উপস্থিত হইল।

৪৩

পরেশবাবুর বাসার কাছেই সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বাস করিতে পাইবে, এই কথা শুনিয়া সুচরিতা অত্যন্ত আরামবোধ করিয়াছিল। কিন্তু, যখন তাঁহার নূতন বাড়ির গৃহসজ্জা সমাপ্ত এবং সেখানে উঠিয়া যাইবার সময় নিকটবর্তী হইল তখন সুচরিতার বুকের ভিতর যেন টানিয়া ধরিতে লাগিল। কাছে থাকা না-থাকা লইয়া কথা নয়, কিন্তু জীবনের সঙ্গে জীবনের যে সর্বাঙ্গীণ যোগ ছিল তাহাতে এত দিন পরে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবার কাল

আসিয়াছে ইহা আজ সুচরিতার কাছে যেন তাহার এক অংশের মৃত্যুর মতো বোধ হইতে লাগিল। এই পরিবারের মধ্যে সুচরিতার যেটুকু স্থান ছিল, তাহার যে-কিছু কাজ ছিল, প্রত্যেক চাকরটির সঙ্গেও তাহার যে সম্বন্ধ ছিল, সমস্তই সুচরিতার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল।

সুচরিতার যে নিজের কিছু সংগতি আছে এবং সেই সংগতির জোরে আজ সে অনায়াসেই স্বাধীন হইবার উপক্রম করিতেছে এই সংবাদে বরদাসুন্দরী বার বার করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, ইহাতে ভালোই হইল, এতদিন এত সাবধানে যে দায়িত্বভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু, মনে মনে সুচরিতার প্রতি তাঁহার যেন একটা অভিমানের ভাব জন্মিল; সুচরিতা যে তাঁহাদের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আজ নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে এ যেন তাহার একটা অপরাধ। তাঁহারা ছাড়া সুচরিতার অন্য কোনো গতি নাই ইহাই মনে করিয়া অনেক সময় সুচরিতাকে তিনি আপন পরিবারের একটা আপদ বলিয়া নিজের প্রতি করুণা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু সেই সুচরিতার ভার যখন লাঘব হইবার সংবাদ হঠাৎ পাইলেন তখন তো মনের মধ্যে কিছুমাত্র প্রসন্নতা অনুভব করিলেন না। তাঁহাদের আশ্রয় সুচরিতার পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে ইহাই জানিয়া সে যে গর্ব অনুভব করিতে পারে, তাঁহাদের আনুগত্যস্বীকারে বাধ্য না হইতে পারে, এই কথা মনে করিয়া তিনি আগে হইতেই তাহাকে অপরাধী করিতে লাগিলেন। এ কয়দিন বিশেষভাবে তাহার প্রতি দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিলেন। পূর্বে তাহাকে ঘরের কাজকর্মে যেমন করিয়া ডাকিতেন এখন তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাকে অস্বাভাবিক সম্ভ্রম দেখাইতে লাগিলেন। বিদায়ের পূর্বে সুচরিতা ব্যথিতচিত্তে বেশি করিয়াই বরদাসুন্দরীর গৃহকার্যে যোগ দিতে চেষ্টা করিতেছিল, নানা উপলক্ষে তাঁহার কাছে কাছে ফিরিতেছিল, কিন্তু বরদাসুন্দরী যেন পাছে তাহার অসম্মান ঘটে এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাহাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতেছিলেন। এতকাল যাঁহাকে মা বলিয়া যাঁহার কাছে সুচরিতা মানুষ হইয়াছে আজ বিদায়

লইবার সময়েও তিনি যে তাহার প্রতি চিত্তকে প্রতিকূল করিয়া রহিলেন, এই বেদনাই সুচরিতাকে সব চেয়ে বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল।

লাবণ্য ললিতা লীলা সুচরিতার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া তাহার নূতন বাড়ির ঘর সাজাইতে গেল, কিন্তু, সেই উৎসাহের ভিতরেও অব্যক্ত বেদনার অশ্রুজল প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল।

এতদিন পর্যন্ত সুচরিতা নানা ছুতা করিয়া পরেশবাবুর কত কী ছোটোখাটো কাজ করিয়া আসিয়াছে। হয়তো ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়াছে, টেবিলের উপর বই গুছাইয়াছে, নিজের হাতে বিছানা রৌদ্রে দিয়াছে, স্নানের সময় প্রত্যহ তাঁহাকে খবর দিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছে— এই-সমস্ত অভ্যস্ত কাজের কোনো গুরুত্বই প্রতিদিন কোনো পক্ষ অনুভব করে না। কিন্তু, এ-সকল অনাবশ্যক কাজও যখন বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হয় তখন এই-সকল ছোটোখাটো সেবা, যাহা একজনে না করিলে অনায়াসে আর-একজনে করিতে পারে, যাহা না করিলেও কাহারও বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না, এইগুলিই দুই পক্ষের চিত্তকে মথিত করিতে থাকে। সুচরিতা আজকাল যখন পরেশের ঘরের কোনো সামান্য কাজ করিতে আসে তখন সেই কাজটা পরেশের কাছে মস্ত হইয়া দেখা দেয় ও তাঁহার বক্ষের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস জমা হইয়া উঠে। এবং এই কাজ আজ বাদে কাল অন্যের হাতে সম্পন্ন হইতে থাকিবে এই কথা মনে করিয়া সুচরিতার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে।

যেদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সুচরিতাদের নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবার কথা সেদিন প্রাতঃকালে পরেশবাবু তাঁহার নিভৃত ঘরটিতে উপাসনা করিতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার আসনের সম্মুখদেশ ফুল দিয়া সাজাইয়া ঘরের এক প্রান্তে সুচরিতা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। লাবণ্য-লীলারাও উপাসনা-স্থলে আজ আসিবে এইরূপ তাহারা পরামর্শ করিয়াছিল, কিন্তু ললিতা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া আসিতে দেয় নাই। ললিতা জানিত, পরেশবাবুর নির্জন উপাসনায় যোগ দিয়া সুচরিতা যেন বিশেষভাবে তাঁহার আনন্দের অংশ

ও আশীর্বাদ লাভ করিত— আজ প্রাতঃকালে সেই আশীর্বাদ সঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য সুচরিতার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহাই অনুভব করিয়া ললিতা অদ্যকার উপাসনার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে দেয় নাই।

উপাসনা শেষ হইয়া গেলে, যখন সুচরিতার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল তখন পরেশবাবু কহিলেন, "মা, পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ো না, সম্মুখের পথে অগ্রসর হয়ে যাও— মনে সংকোচ রেখো না। যাই ঘটুক, যাই তোমার সম্মুখে উপস্থিত হোক, তার থেকে সম্পূর্ণ নিজের শক্তিতে ভালোকে গ্রহণ করবে এই পণ করে আনন্দের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই নিজের একমাত্র সহায় করো— তা হলে ভুলত্রুটি-ক্ষতির মধ্যে দিয়েও লাভের পথে চলতে পারবে— আর যদি নিজেকে আধাআধি ভাগ করো, কতক ঈশ্বরে কতক অন্যত্রে, তা হলে সমস্ত কঠিন হয়ে উঠবে। ঈশ্বর এই করুন, তোমার পক্ষে আমাদের ক্ষুদ্র আশ্রয়ের আর যেন প্রয়োজন না হয়।"

উপাসনার পরে উভয়ে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বসিবার ঘরে হারানবাবু অপেক্ষা করিয়া আছেন। সুচরিতা আজ কাহারও বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ-ভাব মনে রাখিবে না পণ করিয়া হারানবাবুকে নম্রভাবে নমস্কার করিল। হারানবাবু তৎক্ষণাৎ চৌকির উপরে নিজেকে শক্ত করিয়া তুলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সুচরিতা, এতদিন তুমি যে সত্যকে আশ্রয় করে ছিলে আজ তার থেকে পিছিয়ে পড়তে যাচ্ছ, আজ আমাদের শোকের দিন।"

সুচরিতা কোনো উত্তর করিল না— কিন্তু যে রাগিণী তাহার মনের মধ্যে আজ শান্তির সঙ্গে করুণা মিশাইয়া সংগীতে জমিয়া উঠিতেছিল তাহাতে একটা বেসুর আসিয়া পড়িল।

পরেশবাবু কহিলেন, "অন্তর্যামী জানেন কে এগোচ্ছে, কে পিছোচ্ছে, বাইরে থেকে বিচার করে আমরা বৃথা উদ্‌বিগ্ন হই।"

হারানবাবু কহিলেন, "তা হলে আপনি কি বলিতে চান আপনার মনে কোনো আশঙ্কা নেই? আর, আপনার অনুতাপেরও কোনো কারণ ঘটে নি?"

পরেশবাবু কহিলেন, "পানুবাবু, কাল্পনিক আশঙ্কাকে আমি মনে স্থান দিই নে এবং অনুতাপের কারণ ঘটেছে কি না তা তখনই বুঝব যখন অনুতাপ জন্মাবে।"

হারানবাবু কহিলেন, "এই-যে আপনার কন্যা ললিতা একলা বিনয়বাবুর সঙ্গে স্টিমারে করে চলে এলেন, এটাও কি কাল্পনিক ?"

সুচরিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। পরেশবাবু কহিলেন, "পানুবাবু, আপনার মন যে-কোনো কারণে হোক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এইজন্যে এখন এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করলে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে।"

হারানবাবু মাথা তুলিয়া বলিলেন, "আমি উত্তেজনার বেগে কোনো কথা বলি নে— আমি যা বলি সে সম্বন্ধে আমার দায়িত্ববোধ যথেষ্ট আছে ; সেজন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনাকে যা বলছি সে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলছি নে, আমি ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে বলছি— না বলা অন্যায় বলেই বলছি। আপনি যদি অন্ধ হয়ে না থাকতেন, তা হলে ওই-যে বিনয়বাবুর সঙ্গে ললিতা একলা চলে এল এই একটি ঘটনা থেকেই আপনি বুঝতে পারতেন আপনার এই পরিবার ব্রাহ্মসমাজের নোঙর ছিঁড়ে ভেসে চলে যাবার উপক্রম করছে। এতে যে শুধু আপনারই অনুতাপের কারণ ঘটবে তা নয়, এতে ব্রাহ্মসমাজেরও অগৌরবের কথা আছে।"

পরেশবাবু কহিলেন, "নিন্দা করতে গেলে বাইরে থেকে করা যায়, কিন্তু বিচার করতে গেলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। কেবল ঘটনা থেকে মানুষকে দোষী করবেন না।"

হারানবাবু কহিলেন, "ঘটনা শুধু-শুধু ঘটে না, তাকে আপনারা ভিতরের থেকেই ঘটিয়ে তুলেছেন। আপনি এমন-সব লোককে পরিবারের মধ্যে আত্মীয়ভাবে টানছেন যারা আপনার পরিবারকে আপনার আত্মীয়সমাজ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চায়। দূরেই তো নিয়ে গেল, সে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ?"

পরেশবাবু একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার দেখবার

প্রণালী মেলে না।”

হারানবাবু কহিলেন, “আপনার না মিলতে পারে। কিন্তু, আমি সুচরিতাকেই সাক্ষী মানছি, উনিই সত্য করে বলুন দেখি, ললিতার সঙ্গে বিনয়ের যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে সে কি শুধু বাইরের সম্বন্ধ? তাদের অন্তরকে কোনোখানেই স্পর্শ করে নি? না, সুচরিতা, তুমি চলে গেলে হবে না— এ কথার উত্তর দিতে হবে। এ গুরুতর কথা।”

সুচরিতা কঠোর হইয়া কহিল, “যতই গুরুতর হোক, এ কথায় আপনার কোনো অধিকার নেই।”

হারানবাবু কহিলেন, “অধিকার না থাকলে আমি যে শুধু চুপ করে থাকতুম তা নয়, চিন্তাও করতুম না। সমাজকে তোমরা গ্রাহ্য না করতে পার, কিন্তু যতদিন সমাজে আছ ততদিন সমাজ তোমাদের বিচার করতে বাধ্য।”

ললিতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, “সমাজ যদি আপনাকেই বিচারকপদে নিযুক্ত করে থাকেন তবে এ সমাজ থেকে নির্বাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়।”

হারানবাবু চৌকি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “ললিতা, তুমি এসেছ আমি খুশি হয়েছি। তোমার সম্বন্ধে যা নালিশ তোমার সামনেই তার বিচার হওয়া উচিত।”

ক্রোধে সুচরিতার মুখ চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; সে কহিল, “হারানবাবু, আপনার ঘরে গিয়ে আপনার বিচারশালা আহ্বান করুন। গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান করবেন, আপনার এ অধিকার আমরা কোনো-মতেই মানব না। আয় ভাই ললিতা।”

ললিতা এক পা নড়িল না; কহিল, “না, দিদি, আমি পালাব না। পানু-বাবুর যা-কিছু বলবার আছে সব আমি শুনে যেতে চাই। বলুন কী বলবেন, বলুন।”

হারানবাবু থমকিয়া গেলেন। পরেশবাবু কহিলেন, “মা ললিতা, আজ সুচরিতা আমাদের বাড়ি থেকে যাবে— আজ সকালে আমি কোনোরকম

অশান্তি ঘটতে দিতে পারব না। হারানবাবু, আমাদের যতই অপরাধ থাক্‌, তবু আজকের মতো আমাদের মাপ করতে হবে।”

হারান চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা যতই তাঁহাকে বর্জন করিতেছিল সুচরিতাকে ধরিয়া রাখিবার জেদ ততই তাঁহার বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, অসামান্য নৈতিক জোরের দ্বারা তিনি নিশ্চয়ই জিতিবেন। এখনও তিনি যে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু মাসির সঙ্গে সুচরিতা অন্য বাড়িতে গেলে সেখানে তাঁহার শক্তি প্রতিহত হইতে থাকিবে এই আশঙ্কায় তাঁহার মন ক্ষুব্ধ ছিল। এইজন্য আজ তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রগুলিকে শান দিয়া আনিয়াছিলেন। কোনোমতে আজ সকালবেলাকার মধ্যেই খুব কড়ারকম করিয়া বোঝাপড়া করিয়া লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। আজ সমস্ত সংকোচ তিনি দূর করিয়াই আসিয়াছিলেন— কিন্তু অপর পক্ষেও যে এমন করিয়া সংকোচ দূর করিতে পারে, ললিতা-সুচরিতাও যে হঠাৎ তূণ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দাঁড়াইবে, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার নৈতিক অগ্নিবাণ যখন তিনি মহাতেজে নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন অপর পক্ষের মাথা একেবারে হেঁট হইয়া যাইবে। ঠিক তেমনটি হইল না; অবসরও চলিয়া গেল। কিন্তু, হারানবাবু হার মানিবেন না। তিনি মনে মনে কহিলেন, সত্যের জয় হইবেই, অর্থাৎ হারানবাবুর জয় হইবেই। কিন্তু, জয় তো শুধু-শুধু হয় না। লড়াই করিতে হইবে। হারানবাবু কোমর বাঁধিয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

সুচরিতা কহিল, “মাসি, আজ আমি সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খাব— তুমি কিছু মনে করলে চলবে না।”

হরিমোহিনী চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, সুচরিতা সম্পূর্ণ ই তাঁহার হইয়াছে— বিশেষত নিজের সম্পত্তির জোরে স্বাধীন হইয়া সে স্বতন্ত্র ঘর করিতে চলিয়াছে— এখন হরমোহিনীকে আর-কোনো সংকোচ করিতে হইবে না, ষোলো-আনা নিজের মতো করিয়া চলিতে

পারিবেন। তাই আজ যখন সুচরিতা শুচিতা বিসর্জন করিয়া আবার সকলের সঙ্গে একত্রে অন্ন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিল তখন তাঁহার ভালো লাগিল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

সুচরিতা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল, "আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, এতে ঠাকুর খুশি হবেন। সেই আমার অন্তর্যামী ঠাকুর আমাকে সকলের সঙ্গে আজ একসঙ্গে খেতে বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা না মানলে তিনি রাগ করবেন। তাঁর রাগকে আমি তোমার রাগের চেয়ে ভয় করি।"

যতদিন হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর কাছে অপমানিত হইতেছিলেন ততদিন সুচরিতা তাঁহার অপমানের অংশ লইবার জন্য তাঁহার আচার গ্রহণ করিয়াছিল এবং আজ সেই অপমান হইতে যখন নিষ্কৃতির দিন উপস্থিত হইল তখন সুচরিতা যে আচার সম্বন্ধে স্বাধীন হইতে দ্বিধা বোধ করিবে না, হরিমোহিনী তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হরিমোহিনী সুচরিতাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়া লন নাই, বোঝাও তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল।

হরিমোহিনী সুচরিতাকে স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করিলেন না, কিন্তু মনে মনে রাগ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, 'মা গো, মানুষের ইহাতে যে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। ব্রাহ্মণের ঘরে তো জন্ম বটে।'

খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "একটা কথা বলি বাছা, যা করো তা করো, তোমাদের ওই বেহারাটার হাতে জল খেয়ো না।"

সুচরিতা কহিল, "কেন মাসি, ওই রামদীন বেহারাই তো তার নিজের গোরু দুইয়ে তোমাকে দুধ দিয়ে যায়।"

হরিমোহিনী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "অবাক করলি। দুধ আর জল এক হল!"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা মাসি, রামদীনের ছোঁওয়া জল আজ আমি খাব না। কিন্তু সতীশকে যদি তুমি বারণ কর তবে সে ঠিক তার উল্‌টো কাজটি করবে।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "সতীশের কথা আলাদা।"

হরিমোহিনী জানিতেন পুরুষমানুষের সম্বন্ধে নিয়মসংযমের ত্রুটি মাপ করিতেই হয়।

৪৪

হারানবাবু রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

আজ প্রায় পনেরো দিন হইয়া গিয়াছে, ললিতা স্টিমারে করিয়া বিনয়ের সঙ্গে আসিয়াছে। কথাটা দুই-এক জনের কানে গিয়াছে এবং অল্পে অল্পে ব্যাপ্ত হইবারও চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, সম্প্রতি দুই দিনের মধ্যেই এই সংবাদ শুকনো খড়ে আগুন লাগার মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মপরিবারের ধর্মনৈতিক জীবনের প্রতি লক্ষ রাখিয়া এই প্রকারের কদাচারকে যে দমন করা কর্তব্য, হারানবাবু তাহা অনেককেই বুঝাইয়াছেন। এ-সব কথা বুঝাইতেও বেশি কষ্ট পাইতে হয় না। যখন আমরা 'সত্যের অনুরোধে' 'কর্তব্যের অনুরোধে' পরের স্খলন লইয়া ঘৃণাপ্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হই, তখন সত্যের ও কর্তব্যের অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হয় না। এইজন্য ব্রাহ্মসমাজে হারানবাবু যখন 'অপ্রিয়' সত্য ঘোষণা ও 'কঠোর' কর্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন এতবড়ো অপ্রিয়তা ও কঠোরতার ভয়ে তাঁহার সঙ্গে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে অধিকাংশ লোক পরাঙ্মুখ হইল না। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী লোকেরা গাড়ি-পালকি ভাড়া করিয়া পরস্পরের বাড়ি গিয়া বলিয়া আসিলেন, আজকাল যখন এমন-সকল ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সঙ্গে, সুচরিতা যে হিন্দু হইয়াছে এবং হিন্দু মাসির ঘরে আশ্রয় লইয়া যাগযজ্ঞ তপজপ ও ঠাকুরসেবা লইয়া দিন যাপন করিতেছে, এ কথাও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

অনেক দিন হইতে ললিতার মনে একটা লড়াই চলিতেছিল। সে প্রতি

রাত্রে শুইতে যাইবার আগে বলিতেছিল 'কখনোই আমি হার মানিব না', এবং প্রতিদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় বসিয়া বলিয়াছে 'কোনোমতেই আমি হার মানিব না'। এই-যে বিনয়ের চিন্তা তাহার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, বিনয় নীচের ঘরে বসিয়া কথা কহিতেছে জানিতে পারিলে তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত উতলা হইয়া উঠিতেছে, বিনয় দুই দিন তাহাদের বাড়িতে না আসিলে অবরুদ্ধ অভিমানে তাহার মন নিপীড়িত হইতেছে, মাঝে মাঝে সতীশকে নানা উপলক্ষে বিনয়ের বাসায় যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে এবং সতীশ ফিরিয়া আসিলে বিনয় কী করিতেছিল— বিনয়ের সঙ্গে কী কথা হইল তাহার আদ্যোপান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা ললিতার পক্ষে যতই অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে ততই পরাভবের গ্লানিতে তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। বিনয় ও গোরার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে বাধা দেন নাই বলিয়া এক-একবার পরেশবাবুর প্রতি তাহার রাগও হইত। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সে লড়াই করিবে, মরিবে তবু হারিবে না, এই তাহার পণ ছিল। জীবন যে কেমন করিয়া কাটাইবে সে সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পনা তাহার মনের মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। য়ুরোপের লোকহিতৈষিণী রমণীদের জীবনচরিতে যে-সকল কীর্তিকাহিনী সে পাঠ করিয়াছিল সেইগুলি তাহার নিজের পক্ষে সাধ্য ও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

একদিন সে পরেশবাবুকে গিয়া কহিল, "বাবা, আমি কি কোনো মেয়ে-ইস্কুলে শেখাবার ভার নিতে পারি নে?"

পরেশবাবু তাঁহার মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ক্ষুধাতুর হৃদয়ের বেদনায় তাহার সকরুণ দুটি চক্ষু যেন কাঙাল হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "কেন পারবে না মা? কিন্তু তেমন মেয়ে-ইস্কুল কোথায়?"

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন মেয়ে-ইস্কুল বেশি ছিল না, সামান্য পাঠশালা ছিল এবং ভদ্রঘরের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীর কাজে তখন অগ্রসর হন নাই। ললিতা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "ইস্কুল নেই বাবা?"

পরেশবাবু কহিলেন, "কই, দেখি নে তো।"

ললিতা কহিল, "আচ্ছা, বাবা, মেয়ে-ইস্কুল কি একটা করা যায় না?"

পরেশবাবু কহিলেন, "অনেক খরচের কথা এবং অনেক লোকের সহায়তা চাই।"

ললিতা জানিত, সৎকর্মের সংকল্প জাগাইয়া তোলাই কঠিন, কিন্তু তাহা সাধন করিবার পথেও যে এত বাধা তাহা সে পূর্বে ভাবে নাই। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার এই প্রিয়তমা কন্যাটির হৃদয়ের ব্যথা কোন্‌খানে পরেশবাবু তাহাই বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিনয়ের সম্বন্ধে হারানবাবু সেদিন যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তাহাও তাঁহার মনে পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি অবিবেচনার কাজ করিয়াছি?' তাঁহার অন্য কোনো মেয়ে হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না; কিন্তু ললিতার জীবন যে ললিতার পক্ষে অত্যন্ত সত্য পদার্থ, সে তো আধাআধি কিছুই জানে না, সুখদুঃখ তাহার পক্ষে কিছু-সত্য কিছু-ফাঁকি নহে।

ললিতা প্রতিদিন নিজের জীবনের মধ্যে ব্যর্থ ধিক্‌কার বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে কেমন করিয়া! সে যে সম্মুখে কোথাও একটা প্রতিষ্ঠা, একটা মঙ্গলপরিণাম দেখিতে পাইতেছে না। এমনভাবে নিরুপায় ভাসিয়া চলিয়া যাওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে।

সেইদিনই মধ্যাহ্নে ললিতা সুচরিতার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে গৃহসজ্জা বিশেষ কিছুই নাই। মেঝের উপর একটি ঘরজোড়া শতরঞ্চ, তাহারই এক দিকে সুচরিতার বিছানা পাতা ও অন্য দিকে হরিমোহিনীর বিছানা। হরিমোহিনী খাটে শোন না বলিয়া সুচরিতাও তাঁহার সঙ্গে এক ঘরে নীচে বিছানা করিয়া শুইতেছে। দেয়ালে পরেশবাবুর একখানি ছবি টাঙানো। পাশের একটি ছোটো ঘরে সতীশের খাট পড়িয়াছে এবং এক ধারে একটি ছোটো টেবিলের উপর দোয়াত কলম খাতা বই স্লেট বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। সতীশ ইস্কুলে গিয়াছে। বাড়ি নিস্তব্ধ।

আহারান্তে হরিমোহিনী তাঁহার মাদুরের উপর শুইয়া নিদ্রার উপক্রম করিতেছেন, এবং সুচরিতা পিঠে মুক্ত চুল মেলিয়া দিয়া শতরঞ্চে বসিয়া কোলের উপর বালিশ লইয়া একমনে কী পড়িতেছে। সম্মুখে আরও কয়খানা বই পড়িয়া আছে।

ললিতাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুচরিতা যেন লজ্জিত হইয়া প্রথমটা বই বন্ধ করিল, পরক্ষণে লজ্জার দ্বারাই লজ্জাকে দমন করিয়া বই যেমন ছিল তেমনি রাখিল। এই বইগুলি গোরার রচনাবলী।

হরিমোহিনী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এসো, এসো, মা ললিতা এসো। তোমাদের বাড়ি ছেড়ে সুচরিতার মনের মধ্যে কেমন করছে সে আমি জানি। ওর মন খারাপ হলেই ওই বইগুলো নিয়ে পড়তে বসে। এখনই আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, তোমরা কেউ এলে ভালো হয়— অমনি তুমি এসে পড়েছ— অনেক দিন বাঁচবে মা।"

ললিতার মনে যে কথাটা ছিল সুচরিতার কাছে বসিয়া সে একেবারেই তাহা আরম্ভ করিয়া দিল। সে কহিল,"সুচিদিদি, আমাদের পাড়ায় মেয়েদের জন্যে যদি একটা ইস্কুল করা যায় তা হলে কেমন হয়?"

হরিমোহিনী অবাক্ হইয়া কহিলেন, "শোনো একবার কথা। তোমরা ইস্কুল করবে কী!"

সুচরিতা কহিল, "কেমন করে করা যাবে বল্। কে আমাদের সাহায্য করবে? বাবাকে বলেছিস কি?"

ললিতা কহিল, "আমরা দুজনে তো পড়াতে পারব। হয়তো বড়দিদিও রাজি হবে।"

সুচরিতা কহিল, "শুধু পড়ানো নিয়ে তো কথা নয়। কিরকম করে ইস্কুলের কাজ চালাতে হবে তার সব নিয়ম বেঁধে দেওয়া চাই— বাড়ি ঠিক করতে হবে, ছাত্রী সংগ্রহ করতে হবে, খরচ জোগাতে হবে। আমরা দুজন মেয়েমানুষ এর কী করতে পারি!"

ললিতা কহিল, "দিদি, ও কথা বললে চলবে না। মেয়েমানুষ হয়ে

জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে থাকব ? পৃথিবীর কোনো কাজেই লাগব না ?"

ললিতার কথাটার মধ্যে যে বেদনা ছিল সুচরিতার বুকের মধ্যে গিয়া তাহা বাজিয়া উঠিল। সে কোনো উত্তর না করিয়া ভাবিতে লাগিল।

ললিতা কহিল, "পাড়ায় তো অনেক মেয়ে আছে। আমরা যদি তাদের অমনি পড়াতে চাই বাপ-মা'রা তো খুশি হবে। তাদের যে-কজনকে পাই তোমার এই বাড়িতে এনে পড়ালেই হবে। এতে খরচ কিসের ?"

এ বাড়িতে রাজ্যের অপরিচিত ঘরের মেয়ে জড়ো করিয়া পড়াইবার প্রস্তাবে হরিমোহিনী উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি নিরিবিলি পূজা-অর্চনা লইয়া শুদ্ধ শুচি হইয়া থাকিতে চান, তাহার ব্যাঘাতের সম্ভাবনায় আপত্তি করিতে লাগিলেন।

সুচরিতা কহিল, "মাসি, তোমার ভয় নেই, যদি ছাত্রী জোটে তাদের নিয়ে আমাদের নীচের তলার ঘরেই কাজ চালাতে পারব ; তোমার উপরের ঘরে আমরা উৎপাত করতে আসব না। তা ভাই ললিতা, যদি ছাত্রী পাওয়া যায় তা হলে আমি রাজি আছি।"

ললিতা কহিল, "আচ্ছা, দেখাই যাক-না।"

হরিমোহিনী বার বার কহিতে লাগিলেন, "মা, সকল বিষয়েই তোমরা খৃস্টানের মতো হলে চলবে কেন ? গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ইস্কুলে পড়ায়, এ তো বাপের বয়সে শুনি নি।"

পরেশবাবুর ছাতের উপর হইতে আশপাশের বাড়ির ছাতে মেয়েদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় চলিত। এই পরিচয়ের একটা মস্ত কণ্টক ছিল, পাশের বাড়ির মেয়েরা এ বাড়ির মেয়েদের এত বয়সে এখনও বিবাহ হইল না বলিয়া প্রায়ই প্রশ্ন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিত। ললিতা এই কারণে এই ছাতের আলাপে পারতপক্ষে যোগ দিত না।

এই ছাতে ছাতে বন্ধুত্ব-বিস্তারে লাবণ্যই ছিল সকলের চেয়ে উৎসাহী। অন্য বাড়ির সাংসারিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না।

তাহার প্রতিবেশীদের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রধান ও অপ্রধান অনেক বিষয়ই দূর হইতে বায়ুযোগে তাহার নিকট আলোচিত হইত। চিরুনি হস্তে কেশ-সংস্কার করিতে করিতে মুক্ত আকাশতলে প্রায়ই তাহার অপরাহ্নসভা জমিত।

ললিতা তাহার সংকল্পিত মেয়ে-ইস্কুলের ছাত্রীসংগ্রহের ভার লাবণ্যের উপর অর্পণ করিল। লাবণ্য ছাতে ছাতে যখন এই প্রস্তাব ঘোষণা করিয়া দিল তখন অনেক মেয়েই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ললিতা খুশি হইয়া সুচরিতার বাড়ির একতলার ঘর ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, সাজাইয়া প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কিন্তু, তাহার ইস্কুলঘর শূন্যই রহিয়া গেল। বাড়ির কর্তারা তাঁহাদের মেয়েদের ভুলাইয়া পড়াইবার ছলে ব্রাহ্মবাড়িতে লইয়া যাইবার প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এমন-কি, এই উপলক্ষেই যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, পরেশবাবুর মেয়েদের সঙ্গে তাঁহাদের মেয়েদের আলাপ চলে, তখন তাহাতে বাধা দেওয়াই তাঁহারা কর্তব্য বোধ করিলেন। তাঁহাদের মেয়েদের ছাতে ওঠা বন্ধ হইবার জো হইল এবং ব্রাহ্ম প্রতিবেশীর মেয়েদের সাধু সংকল্পের প্রতি তাঁহারা সাধুভাষা প্রয়োগ করিলেন না। বেচারা লাবণ্য যথাসময়ে চিরুনি হাতে ছাতে উঠিয়া দেখে, পার্শ্ববর্তী ছাত-গুলিতে নবীনাদের পরিবর্তে প্রবীণাদের সমাগম হইতেছে এবং তাঁহাদের একজনের নিকট হইতেও সে সাদর সম্ভাষণ লাভ করিল না।

ললিতা ইহাতেও ক্ষান্ত হইল না। সে কহিল, অনেক গরিব ব্রাহ্ম মেয়ের বেথুন ইস্কুলে গিয়া পড়া দুঃসাধ্য, তাহাদের পড়াইবার ভার লইলে উপকার হইতে পারিবে।

এইরূপ ছাত্রী-সন্ধানে সে নিজেও লাগিল, সুধীরকেও লাগাইয়া দিল।

সেকালে পরেশবাবুর মেয়েদের পড়াশুনার খ্যাতি বহুদূরবিস্তৃত ছিল। এমন-কি, সে খ্যাতি সত্যকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এজন্য ইঁহারা মেয়েদের বিনা বেতনে পড়াইবার ভার লইবেন শুনিয়া অনেক পিতা-মাতাই খুশি হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে পাঁচ-ছয়টি মেয়ে লইয়া দুই-চার দিনেই ললিতার ইস্কুল বসিয়া গেল। পরেশবাবুর সঙ্গে এই ইস্কুলের কথা আলোচনা করিয়া ইহার নিয়ম বাঁধিয়া, ইহার আয়োজন করিয়া, সে নিজেকে এক মুহূর্ত সময় দিল না। এমন-কি, বৎসরের শেষে পরীক্ষা হইয়া গেলে মেয়েদের কিরূপ প্রাইজ দিতে হইবে তাহা লইয়া লাবণ্যের সঙ্গে ললিতার রীতিমত তর্ক বাধিয়া গেল— ললিতা যে বইগুলার কথা বলে লাবণ্যর তাহা পছন্দ হয় না, আবার লাবণ্যর সঙ্গে ললিতার পছন্দরও মিল হয় না। পরীক্ষা কে কে করিবে তাহা লইয়াও একটু তর্ক হইয়া গেল। লাবণ্য মোটের উপরে যদিও হারানবাবুকে দেখিতে পারিত না কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে সে অভিভূত ছিল। হারানবাবু তাহাদের বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অথবা শিক্ষা অথবা কোনো-একটা কাজে নিযুক্ত থাকিলে সেটা যে বিশেষ গৌরবের বিষয় হইবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু, ললিতা কথাটাকে একেবারেই উড়াইয়া দিল— হারানবাবুর সঙ্গে তাহাদের এ বিদ্যালয়ের কোনোপ্রকার সম্বন্ধই থাকিতে পারে না।

দুই-তিন দিনের মধ্যেই তাহার ছাত্রীর দল কমিতে কমিতে ক্লাস শূন্য হইয়া গেল। ললিতা তাহার নির্জন ক্লাসে বসিয়া পদশব্দ শুনিবা মাত্র ছাত্রী-সম্ভাবনায় সচকিত হইয়া উঠে, কিন্তু কেহই আসে না। এমন করিয়া দুই প্রহর যখন কাটিয়া গেল তখন সে বুঝিল, একটা কিছু গোল হইয়াছে।

নিকটে যে ছাত্রীটি ছিল ললিতা তাহার বাড়িতে গেল। ছাত্রী কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিল, “মা আমাকে যেতে দিচ্ছে না।” মা কহিলেন, অসুবিধা হয়। অসুবিধাটা যে কী তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। ললিতা অভিমানিনী মেয়ে; সে অন্য পক্ষে অনিচ্ছার লেশমাত্র লক্ষণ দেখিলে জেদ করিতে বা কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেই না।

সে কহিল, “যদি অসুবিধা হয় তা হলে কাজ কী!”

ললিতা ইহার পরে যে বাড়িতে গেল সেখানে স্পষ্ট কথাই শুনিতে পাইল। তাহারা কহিল, সুচরিতা আজকাল হিন্দু হইয়াছে, সে জাত মানে,

তাহার বাড়িতে ঠাকুরপূজা হয় ইত্যাদি।

ললিতা কহিল, "সেজন্য যদি আপত্তি থাকে তবে না হয় আমাদের বাড়িতে ইস্কুল বসবে।"

কিন্তু, ইহাতেও আপত্তির খণ্ডন হইল না, আরও একটা-কিছু বাকি আছে। ললিতা অন্য বাড়িতে না গিয়া সুধীরকে ডাকাইয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "সুধীর, কী হয়েছে সত্য করে বলো তো।"

সুধীর কহিল, "পানুবাবু তোমাদের এই ইস্কুলের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছেন।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দিদির বাড়িতে ঠাকুরপুজো হয় বলে ?"

সুধীর কহিল, "শুধু তাই নয়।"

ললিতা অধীর হইয়া কহিল, "আর কী, বলোই-না।"

সুধীর কহিল, "সে অনেক কথা।"

ললিতা কহিল, "আমারও অপরাধ আছে বুঝি ?"

সুধীর চুপ করিয়া রহিল। ললিতা মুখ লাল করিয়া বলিল, "এ আমার সেই স্টিমার-যাত্রার শাস্তি। যদি অবিবেচনার কাজ করেই থাকি তবে ভালো কাজ করে প্রায়শ্চিত্ত করার পথ আমাদের সমাজে একেবারেই বন্ধ বুঝি! আমার পক্ষে সমস্ত শুভকর্ম এ সমাজে নিষিদ্ধ ? আমার এবং আমাদের সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির এই প্রণালী তোমরা ঠিক করেছ ?"

সুধীর কথাটাকে একটু নরম করিবার জন্য কহিল, "ঠিক সেজন্যে নয়। বিনয়বাবুরা পাছে ক্রমে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন, ওঁরা সেই ভয় করেন।"

ললিতা একেবারে আগুন হইয়া কহিল, "সে ভয় না, সে ভাগ্য! যোগ্যতায় বিনয়বাবুর সঙ্গে তুলনা হয় এমন লোক ওঁদের মধ্যে কজন আছে!"

সুধীর ললিতার রাগ দেখিয়া সংকুচিত হইয়া কহিল, "সে তো ঠিক কথা। কিন্তু, বিনয়বাবু তো—"

ললিতা। ব্রাহ্মসমাজের লোক নন! সেইজন্যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁকে দণ্ড

দেবেন। এমন সমাজের জন্যে আমি গৌরব বোধ করি নে।

ছাত্রীদের সম্পূর্ণ তিরোধান দেখিয়া, সুচরিতা ব্যাপারখানা কী এবং কাহার দ্বারা ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে এ সম্বন্ধে কোনো কথাটি না কহিয়া, উপরের ঘরে সতীশকে তাহার আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।

সুধীরের সঙ্গে কথা কহিয়া ললিতা সুচরিতার কাছে গেল; কহিল, "শুনেছ?"

সুচরিতা একটু হাসিয়া কহিল, "শুনি নি, কিন্তু সব বুঝেছি।"

ললিতা কহিল, "এ-সব কি সহ্য করতে হবে?"

সুচরিতা ললিতার হাত ধরিয়া কহিল, "সহ্য করাতে তো অপমান নেই। বাবা কেমন করে সব সহ্য করেন দেখেছিস তো?"

ললিতা কহিল, "কিন্তু, সুচিদিদি, আমার অনেক সময় মনে হয়, সহ্য করার দ্বারা অন্যায়কে যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়। অন্যায়কে সহ্য না করাই হচ্ছে তার প্রতি উচিত ব্যবহার।"

সুচরিতা কহিল, "তুই কী করতে চাস ভাই, বল্!"

ললিতা কহিল, "তা আমি কিচ্ছু ভাবি নি— আমি কী করতে পারি তাও জানি নে— কিন্তু একটা-কিছু করতেই হবে। আমাদের মতো মেয়েমানুষের সঙ্গে এমন নীচভাবে যারা লেগেছে তারা নিজেদের যত বড়ো লোক মনে করুক তারা কাপুরুষ। কিন্তু তাদের কাছে আমি কোনোমতেই হার মানব না— কোনোমতেই না। এতে তারা যা করতে পারে করুক।"

বলিয়া ললিতা মাটিতে পদাঘাত করিল।

সুচরিতা কোনো উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ললিতার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে কহিল, "ললিতা, ভাই, একবার বাবার সঙ্গে কথা কয়ে দেখ্।"

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি এখনই তাঁর কাছেই যাচ্ছি।"

ললিতা তাহাদের বাড়ির দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, নতশিরে বিনয়

বাহির হইয়া আসিতেছে। ললিতাকে দেখিয়া বিনয় মুহূর্তের জন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল— ললিতার সঙ্গে দুই-একটা কথা কহিয়া লইবে কি না সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটা বিতর্ক উপস্থিত হইল, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া তাহাকে নমস্কার করিল ও মাথা হেঁট করিয়াই চলিয়া গেল।

ললিতাকে যেন অগ্নিতপ্ত শেলে বিদ্ধ করিল। সে দ্রুতপদে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই একেবারে তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মা তখন টেবিলের উপর একটা লম্বা সরু খাতা খুলিয়া হিসাবে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ললিতার মুখ দেখিয়াই বরদাসুন্দরী মনে শঙ্কা গণিলেন। তাড়াতাড়ি হিসাবের খাতাটার মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন ; যেন একটা কী অঙ্ক আছে যাহা এখনই মিলাইতে না পারিলে তাঁহার সংসার একেবারে ছারখার হইয়া যাইবে।

ললিতা চৌকি টানিয়া টেবিলের কাছে বসিল। তবু বরদাসুন্দরী মুখ তুলিলেন না। ললিতা কহিল, “মা!”

বরদাসুন্দরী কহিলেন, “রোস্ বাছা, আমি এই—”। বলিয়া খাতাটার প্রতি নিতান্ত ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

ললিতা কহিল, “আমি বেশিক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। একটা কথা জানতে চাই। বিনয়বাবু এসেছিলেন?”

বরদাসুন্দরী খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ।”

ললিতা। তাঁর সঙ্গে তোমার কী কথা হল?

“সে অনেক কথা।”

ললিতা। আমার সম্বন্ধে কথা হয়েছিল কি না?

বরদাসুন্দরী পলায়নের পন্থা না দেখিয়া কলম ফেলিয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিলেন, “তা বাছা, হয়েছিল। দেখলুম যে ক্রমেই বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে, সমাজের লোকে চার দিকেই নিন্দে করছে, তাই সাবধান করে

দিতে হল।"

লজ্জায় ললিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি বিনয়বাবুকে এখানে আসতে নিষেধ করেছেন?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তিনি বুঝি এ-সব কথা ভাবেন? যদি ভাবতেন তা হলে গোড়াতেই এ-সমস্ত হতে পারত না।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "পানুবাবু আমাদের এখানে আসতে পারবে?"

বরদাসুন্দরী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "শোনো একবার! পানুবাবু আসবেন না কেন?"

ললিতা। বিনয়বাবুই বা আসবেন না কেন?

বরদাসুন্দরী পুনরায় খাতা টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ললিতা, তোর সঙ্গে আমি পারি নে বাপু! যা এখন, আমাকে জ্বালাস নে— আমার অনেক কাজ আছে।"

ললিতা দুপুরবেলায় সুচরিতার বাড়িতে ইস্কুল করিতে যায়, এই অবকাশে বিনয়কে ডাকাইয়া আনিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার যাহা বক্তব্য বলিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, ললিতা টেরও পাইবে না। হঠাৎ চক্রান্ত এমন করিয়া ধরা পড়িল দেখিয়া, তিনি বিপদ বোধ করিলেন। বুঝিলেন, পরিণামে ইহার শান্তি নাই এবং সহজে ইহার নিষ্পত্তি হইবে না। নিজের কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর উপর তাঁহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল। এই অবোধ লোকটিকে লইয়া ঘরকর্না করা স্ত্রীলোকের পক্ষে কী বিড়ম্বনা!

ললিতা হৃদয়-ভরা প্রলয়ঝড় বহন করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নীচের ঘরে বসিয়া পরেশবাবু চিঠি লিখিতেছিলেন; সেখানে গিয়াই একেবারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, বিনয়বাবু কি আমাদের সঙ্গে মেশবার যোগ্য নন?"

প্রশ্ন শুনিয়াই পরেশবাবু অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পরিবার লইয়া সম্প্রতি তাঁহাদের সমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহা পরেশবাবুর অগোচর ছিল না। ইহা লইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট চিন্তা করিতেও

হইতেছে। বিনয়ের প্রতি ললিতার মনের ভাব সম্বন্ধে যদি তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত না হইত তবে তিনি বাহিরের কথায় কিছুমাত্র কান দিতেন না। কিন্তু, যদি বিনয়ের প্রতি ললিতার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে তবে সে স্থলে তাঁহার কর্তব্য কী, সে প্রশ্ন তিনি বারবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লওয়ার পর তাঁহার পরিবারে আবার এই একটা সংকটের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য এক দিকে একটা ভয় এবং কষ্ট তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করিতেছে, অন্য দিকে তাঁহার সমস্ত চিত্তশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বলিতেছে, 'ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের সময় যেমন একমাত্র ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, সত্যকেই সুখ সম্পত্তি সমাজ সকলের ঊর্ধ্বে স্বীকার করিয়া জীবন চিরদিনের মতো ধন্য হইয়াছে, এখনও যদি সেইরূপ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয় তবে তাঁহার দিকেই লক্ষ রাখিয়া উত্তীর্ণ হইব।'

ললিতার প্রশ্নের উত্তরে পরেশবাবু কহিলেন, "বিনয়কে আমি তো খুব ভালো বলেই জানি। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিও যেমন চরিত্রও তেমনি।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতা কহিল, "গৌরবাবুর মা এর মধ্যে দুদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। সুচিদিদিকে নিয়ে তাঁর ওখানে আজ একবার যাব?"

পরেশবাবু ক্ষণকালের জন্য উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, বর্তমান আলোচনার সময় এইরূপ যাতায়াতে তাঁহাদের নিন্দা আরও প্রশ্রয় পাইবে। কিন্তু, তাঁহার মন বলিয়া উঠিল, 'যত ক্ষণ ইহা অন্যায় নহে তত ক্ষণ আমি নিষেধ করিতে পারিব না।' কহিলেন, "আচ্ছা, যাও। আমার কাজ আছে, নইলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতুম।"

বিনয় যেখানে এই কয়দিন অতিথিরূপে ও বন্ধুরূপে এমন নিশ্চিন্তভাবে পদার্পণ করিয়াছিল তাহার তলদেশে সামাজিক আগ্নেয়গিরি এমন সচেষ্টভাবে উত্তপ্ত হইয়া আছে তাহা সে স্বপ্নেও জানিত না ; প্রথম যখন সে পরেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে মিশিতেছিল তখন তাহার মনে যথেষ্ট সংকোচ ছিল ; কোথায় কতদূর পর্যন্ত তাহার অধিকারের সীমা তাহা সে নিশ্চিত জানিত না বলিয়া সর্বদা ভয়ে ভয়ে চলিত। ক্রমে যখন তাহার ভয় ভাঙিয়া গেল, তখন কোথাও যে কিছুমাত্র বিপদের শঙ্কা আছে তাহা তাহার মনেও হয় নাই। আজ হঠাৎ যখন শুনিল, তাহার ব্যবহারে সমাজের লোকের নিকট ললিতাকে নিন্দিত হইতে হইতেছে, তখন তাহার মাথায় বজ্র পড়িল। বিশেষত সকলের চেয়ে তাহার ক্ষোভের কারণ হইল এইজন্য যে, ললিতার সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ের উত্তাপমাত্রা সাধারণ বন্ধুত্বের রেখা ছাড়াইয়া অনেক উর্ধ্বে উঠিয়াছিল তাহা সে নিজে জানিত এবং বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে পরস্পরের সমাজ এমন বিভিন্ন সেখানে এরূপ তাপাধিক্যকে সে মনে মনে অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিত। সে অনেকবার মনে করিয়াছে, এই পরিবারের বিশ্বস্ত অতিথিরূপে আসিয়া সে নিজের ঠিক স্থানটি রাখিতে পারে নাই— এক জায়গায় সে কপটতা করিতেছে, তাহার মনের ভাবটি এই পরিবারের লোকের কাছে ঠিকমত প্রকাশ পাইলে তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ হইবে।

এমন সময় যখন একদিন মধ্যাহ্নে বরদাসুন্দরী পত্র লিখিয়া বিনয়কে বিশেষ করিয়া ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিনয়বাবু, আপনি তো হিন্দু?' এবং বিনয় তাহা স্বীকার করিলে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন 'হিন্দুসমাজ আপনি তো ত্যাগ করিতে পারিবেন না?' এবং বিনয় তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব জানাইলে বরদাসুন্দরী যখন বলিয়া উঠিলেন 'তবে কেন আপনি'— তখন সেই 'তবে কেন'র কোনো উত্তর বিনয়ের মুখে জোগাইল না। সে

একেবারে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে যেন ধরা পড়িয়াছে, তাহার এমন একটা জিনিস এখানে সকলের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যাহা সে চন্দ্রসূর্যবায়ুর কাছেও গোপন করিতে চাহিয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, পরেশবাবু কী মনে করিতেছেন, ললিতা কী মনে করিতেছে, সুচরিতাই বা তাহাকে কী ভাবিতেছে! দেবদূতের কোন্ ভ্রমক্রমে এই-যে স্বর্গলোকে কিছুদিনের মতো তাহার স্থান হইয়াছিল, অনধিকার প্রবেশের সমস্ত লজ্জা মাথায় করিয়া লইয়া এখান হইতে আজ তাহাকে একেবারে নির্বাসিত হইতে হইবে।

তাহার পরে পরেশের দরজা পার হইয়াই প্রথমেই যেই সে ললিতাকে দেখিতে পাইল তাহার মনে হইল, 'ললিতার নিকট হইতে এই শেষ-বিদায়ের মুহূর্তে তাহার কাছে একটা মস্ত অপমান স্বীকার করিয়া লইয়া পূর্বপরিচয়ের একটা প্রলয়সমাধান করিয়া দিয়া যাই।' কিন্তু কী করিলে তাহা হয় ভাবিয়া পাইল না, তাই ললিতার মুখের দিকে না চাহিয়া নিঃশব্দে একটি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

এই তো সেদিন পর্যন্ত বিনয় পরেশের পরিবারের বাহিরেই ছিল ; আজও সেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু, এ কী প্রভেদ! সেই বাহির আজ এমন শূন্য কেন! তাহার পূর্বের জীবনে তো কোনো ক্ষতি হয় নাই ; তাহার গোরা, তাহার আনন্দময়ী তো আছে। কিন্তু, তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, মাছ যেন জল হইতে ডাঙায় উঠিয়াছে, যে দিকে ফিরিতেছে কোথাও সে যেন জীবনের অবলম্বন পাইতেছে না। এই হর্ম্যসংকুল শহরের জনাকীর্ণ রাজপথে বিনয় সর্বত্রই নিজের জীবনের একটা ছায়াময় পাণ্ডুবর্ণ সর্বনাশের চেহারা দেখিতে লাগিল। এই বিশ্বব্যাপী শুষ্কতায় শূন্যতায় সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। কেন এমন হইল, কখন এমন হইল, কী করিয়া এ সম্ভব হইল, এই কথাই সে একটা হৃদয়হীন নিরুত্তর শূন্যের কাছে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"বিনয়বাবু! বিনয়বাবু!"

বিনয় পিছন ফিরিয়া দেখিল, সতীশ। তাহাকে বিনয় আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। কহিল, "কী ভাই, কী বন্ধু!"

বিনয়ের কণ্ঠ যেন অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। পরেশবাবুর ঘরে এই বালকটিও যে কতখানি মাধুর্য মিশাইয়াছিল তাহা বিনয় আজ যেমন অনুভব করিল এমন বুঝি কোনোদিন করে নাই।

সতীশ কহিল, "আপনি আমাদের ওখানে কেন যান না? কাল আমাদের ওখানে লাবণ্যদিদি ললিতাদিদি খাবেন, মাসি আপনাকে নেমন্তন্ন করবার জন্যে পাঠিয়েছেন।"

বিনয় বুঝিল মাসি কোনো খবর রাখেন না; কহিল, "সতীশবাবু, মাসিকে আমার প্রণাম জানিয়ো— কিন্তু, আমি তো যেতে পারব না।"

সতীশ অনুনয়ের সহিত বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল, "কেন পারবেন না? আপনাকে যেতেই হবে, কিছুতেই ছাড়ব না।"

সতীশের এত অনুরোধের বিশেষ একটু কারণ ছিল। তাহার ইস্কুলে 'পশুর প্রতি ব্যবহার' সম্বন্ধে তাহাকে একটি রচনা লিখিতে দিয়াছিল— সেই রচনায় সে পঞ্চাশের মধ্যে বিয়াল্লিশ নম্বর পাইয়াছিল; তাহার ভারি ইচ্ছা, বিনয়কে সেই লেখাটা দেখায়। বিনয় যে খুব একজন বিদ্বান এবং সমজদার তাহা সে জানিত; সে নিশ্চয় ঠিক করিয়াছিল, বিনয়ের মতো রসজ্ঞ লোক তাহার লেখার ঠিক মূল্য বুঝিতে পারিবে। বিনয় যদি তাহার লেখার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে তাহা হইলে অরসিক লীলা সতীশের প্রতিভা সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে অশ্রদ্ধেয় হইবে। নিমন্ত্রণটা মাসিকে বলিয়া সে-ই ঘটাইয়াছিল; বিনয় যখন তাহার লেখার উপরে রায় প্রকাশ করিবে তখন তাহার দিদিরাও সেখানে উপস্থিত থাকে ইহাই তাহার ইচ্ছা।

বিনয় কোনোমতেই নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে পারিবে না শুনিয়া সতীশ অত্যন্ত মুষড়িয়া গেল।

বিনয় তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "সতীশবাবু, তুমি আমাদের বাড়ি চলো।"

সতীশের পকেটেই সেই লেখাটা ছিল, সুতরাং বিনয়ের আহ্বান সে অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। কবিযশঃপ্রার্থী বালক তাহাদের বিদ্যালয়ের আসন্ন পরীক্ষার সময়ে সময় নষ্ট করার অপরাধ স্বীকার করিয়াই বিনয়ের বাসায় গেল।

বিনয় যেন তাহাকে কোনোমতেই ছাড়িতে চাহিল না। তাহার লেখা তো শুনিলই, প্রশংসা যাহা করিল তাহাতে সমালোচকের অপ্রমত্ত নিরপেক্ষতা প্রকাশ পাইল না, তাহার উপরে বাজার হইতে জলখাবার কিনিয়া তাহাকে খাওয়াইল।

তাহার পরে সতীশকে তাহাদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দিয়া অনাবশ্যক ব্যাকুলতার সহিত কহিল, "সতীশবাবু, তবে আসি ভাই।"

সতীশ তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া কহিল, "না, আপনি আমাদের বাড়িতে আসুন।"

আজ এ অনুনয়ে কোনো ফল হইল না।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতে চলিতে বিনয় আনন্দময়ীর বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিল না। ছাতের উপরে যে ঘরে গোরা শুইত সেই নির্জন ঘরে প্রবেশ করিল। এই ঘরে তাহাদের বাল্যবন্ধুত্বের কত সুখময় দিন এবং কত সুখময় রাত্রি কাটিয়াছে— কত আনন্দালাপ, কত সংকল্প, কত গভীর বিষয়ের আলোচনা— কত প্রণয়কলহ এবং সে কলহের কত প্রীতিসুধাপূর্ণ অবসান! সেই তাহার পূর্বজীবনের মধ্যে বিনয় তেমনি করিয়া আপনাকে ভুলিয়া প্রবেশ করিতে চাহিল; কিন্তু মাঝখানের এই কয়দিনের নূতন পরিচয় পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে ঠিক সেই জায়গাটিতে ঢুকিতে দিল না। জীবনের কেন্দ্র যে কখন সরিয়া আসিয়াছে এবং কক্ষপথের যে কখন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা এতদিন বিনয় সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে নাই; আজ যখন কোনো সন্দেহ রহিল না তখন ভীত হইয়া উঠিল।

ছাতে কাপড় শুকাইতে দিয়াছিলেন, অপরাহ্ণে রৌদ্র পড়িয়া আসিলে

আনন্দময়ী যখন তুলিতে আসিলেন তখন গোরার ঘরে বিনয়কে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি তাহার পাশে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "বিনয়, কী হয়েছে বিনয়! তোর মুখ অমন সাদা হয়ে গেছে কেন?"

বিনয় উঠিয়া বসিল; কহিল, "মা, আমি পরেশবাবুদের বাড়িতে প্রথম যখন যাতায়াত করতে আরম্ভ করি গোরা রাগ করত। তার রাগকে আমি তখন অন্যায় মনে করতুম; কিন্তু, অন্যায় তার নয়, আমারই নির্বুদ্ধিতা।"

আনন্দময়ী একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, "তুই যে আমাদের খুব সুবুদ্ধি ছেলে তা আমি বলি নে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোর বুদ্ধির দোষ কিসে প্রকাশ পেলে?"

বিনয় কহিল, "মা, আমাদের সমাজ যে একেবারেই ভিন্ন, সে কথা আমি একেবারেই বিবেচনা করি নি। ওঁদের বন্ধুত্বে ব্যবহারে দৃষ্টান্তে আমার খুব আনন্দ এবং উপকার বোধ হচ্ছিল, তাতেই আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম; আর কোনো কথা যে চিন্তা করবার আছে এক মুহূর্তের জন্য সে আমার মনে উদয় হয় নি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোর কথা শুনে এখনও তো আমার মনে উদয় হচ্ছে না।"

বিনয় কহিল, "মা, তুমি জান না, সমাজে আমি তাঁদের সম্বন্ধে ভারি একটা অশান্তি জাগিয়ে দিয়েছি— লোকে এমন-সব নিন্দা করতে আরম্ভ করেছে যে আমি আর সেখানে—"

আনন্দময়ী কহিলেন, "গোরা একটা কথা বার বার বলে, সেটা আমার কাছে খুব খাঁটি মনে হয়। সে বলে, যেখানে ভিতরে কোথাও একটা অন্যায় আছে সেখানে বাইরে শান্তি থাকাটাই সকলের চেয়ে অমঙ্গল। ওঁদের সমাজে যদি অশান্তি জেগে থাকে তা হলে তোর অনুতাপ করবার কোনো দরকার দেখি নে, দেখবি তাতে ভালোই হবে। তোর নিজের ব্যবহারটা খাঁটি থাকলেই হল।"

ওইখানেই তো বিনয়ের মস্ত খটকা ছিল। তাহার নিজের ব্যবহারটা অনিন্দনীয় কি না সেইটে সে কোনোমতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ললিতা যখন ভিন্নসমাজভুক্ত, তাহার সঙ্গে বিবাহ যখন সম্ভবপর নহে, তখন তাহার প্রতি বিনয়ের অনুরাগটাই একটা গোপন পাপের মতো তাহাকে ক্লিষ্ট করিতেছিল এবং এই পাপের নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তকাল যে উপস্থিত হইয়াছে এই কথাই স্মরণ করিয়া সে পীড়িত হইতেছিল।

বিনয় হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "মা, শশিমুখীর সঙ্গে আমার বিবাহের যে প্রস্তাব হয়েছিল সেটা হয়ে চুকে গেলেই ভালো হত। আমার যেখানে ঠিক জায়গা সেইখানেই কোনোমতে আমার বদ্ধ হয়ে থাকা উচিত— এমন হওয়া উচিত যে, কিছুতেই সেখান থেকে আর নড়তে না পারি।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ, শশিমুখীকে তোর ঘরের বউ না ক'রে তোর ঘরের শিকল করতে চাস— শশীর কী সুখেরই কপাল!"

এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল, পরেশবাবুর বাড়ির দুই মেয়ে আসিয়াছেন। শুনিয়া বিনয়ের বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, বিনয়কে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য তাহারা আনন্দময়ীর কাছে নালিশ জানাইতে আসিয়াছে। সে একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "আমি যাই মা।"

আনন্দময়ী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "একেবারে বাড়ি ছেড়ে যাস নে বিনয়। নীচের ঘরে একটু অপেক্ষা কর্।"

নীচে যাইতে যাইতে বিনয় বার বার বলিতে লাগিল, 'এর তো কোনো দরকার ছিল না। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তো মরে গেলেও আর সেখানে যেতুম না। অপরাধের শাস্তি আগুনের মতো যখন একবার জ্বলে ওঠে তখন অপরাধী দগ্ধ হয়ে ম'লেও সেই শাস্তির আগুন যেন নিবতেই চায় না।'

একতলায় রাস্তার ধারে গোরার যে ঘর ছিল সেই ঘরে বিনয় যখন প্রবেশ করিতে যাইতেছে এমন সময় মহিম তাঁহার স্ফীত উদরটিকে চাপকানের

বোতাম-বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে দিতে আপিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "এই-যে, বিনয়! বেশ! আমি তোমাকে খুঁজছি।"

বলিয়া বিনয়কে গোরার ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া একটা চৌকিতে বসাইয়া নিজেও বসিলেন এবং পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া বিনয়কে একটি পান খাইতে দিলেন। "ওরে তামাক নিয়ে আয় রে" বলিয়া একটা হুংকার দিয়া তিনি একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বিষয়টার কী স্থির হল? আর তো—"

দেখিলেন, বিনয়ের ভাবখানা পূর্বের চেয়ে অনেকটা নরম। খুব যে একটা উৎসাহ তাহা নয় বটে, কিন্তু ফাঁকি দিয়া কোনোমতে কথাটাকে এড়াইবার চেষ্টাও দেখা যায় না। মহিম তখনই দিনক্ষণ একেবারে পাকা করিতে চান; বিনয় কহিল, "গোরা ফিরে আসুক-না।"

মহিম আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "সে তো আর দিন-কয়েক আছে। বিনয়, কিছু জলখাবার আনতে বলে দিই— কী বল? তোমার মুখ আজ ভারি শুকনো দেখাচ্ছে যে। কিছু অসুখবিসুখ করে নি তো?"

জলখাবারের দায় হইতে বিনয় নিষ্কৃতি লাভ করিলে, মহিম নিজের ক্ষুধানিবৃত্তির অভিপ্রায়ে বাড়ির ভিতরে গমন করিলেন। বিনয় গোরার টেবিলের উপর হইতে যে-কোনো একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল, তাহার পরে বই ফেলিয়া ঘরের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পায়চারি করিতে থাকিল।

বেহারা আসিয়া কহিল, "মা ডাকছেন।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে ডাকছেন?"

বেহারা কহিল, "আপনাকে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "আর-সকলে আছেন?"

বেহারা কহিল, "আছেন।"

পরীক্ষাঘরের মুখে ছাত্র যেমন করিয়া যায় বিনয় তেমনি করিয়া উপরে

চলিল। ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া একটু ইতস্তত করিতেই সুচরিতা পূর্বের মতোই তাহার সহজ সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "বিনয়বাবু, আসুন।"

সেই স্বর শুনিয়া বিনয়ের মনে হইল যেন সে একটা অপ্রত্যাশিত ধন পাইল।

বিনয় ঘরে ঢুকিলে সুচরিতা এবং ললিতা তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইল। সে যে কত অকস্মাৎ কী কঠিন আঘাত পাইয়াছে তাহা এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মুখে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। যে সরস শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া হঠাৎ কোথা হইতে পঙ্গপাল পড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, বিনয়ের নিত্য-সহাস্য মুখের সেই ক্ষেতের মতো চেহারা হইয়াছে। ললিতার মনে বেদনা এবং করুণার সঙ্গে একটু আনন্দের আভাসও দেখা দিল।

অন্য দিন হইলে ললিতা সহসা বিনয়ের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিত না; আজ যেমনি বিনয় ঘরে প্রবেশ করিল অমনি সে বলিয়া উঠিল, "বিনয়বাবু, আপনার সঙ্গে আমাদের একটা পরামর্শ আছে।"

বিনয়ের বুকে কে যেন হঠাৎ একটা শব্দভেদী আনন্দের বাণ ছুঁড়িয়া মারিল। সে উল্লাসে চকিত হইয়া উঠিল। তাহার বিবর্ণ ম্লান মুখে মুহূর্তেই দীপ্তির সঞ্চার হইল।

ললিতা কহিল, "আমরা কয় বোনে মিলে একটি ছোটোখাটো মেয়ে-ইস্কুল করতে চাই।"

বিনয় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "মেয়ে-ইস্কুল করা অনেক দিন থেকে আমার জীবনের একটা সংকল্প।"

ললিতা কহিল, "আপনাকে এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে হবে।"

বিনয় কহিল, "আমার দ্বারা যা হতে পারে তার কোনো ত্রুটি হবে না। আমাকে কী করতে হবে বলুন।"

ললিতা কহিল, "আমরা ব্রাহ্ম বলে হিন্দু অভিভাবকেরা আমাদের বিশ্বাস করে না। এ বিষয়ে আপনাকে চেষ্টা দেখতে হবে।"

বিনয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আপনি কিচ্ছু ভয় করবেন না—আমি পারব।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা, ও খুব পারবে। লোককে কথায় ভুলিয়ে বশ করতে ওর জুড়ি কেউ নেই।"

ললিতা কহিল, "বিদ্যালয়ের কাজকর্ম যে নিয়মে যে রকম করে চালানো উচিত— সময় ভাগ করা, ক্লাস ভাগ করা, বই ঠিক করে দেওয়া, এ-সমস্তই আপনাকে করে দিতে হবে।"

এ কাজটাও বিনয়ের পক্ষে শক্ত নহে; কিন্তু তাহার ধাঁধা লাগিয়া গেল— বরদাসুন্দরী তাঁহার মেয়েদের সহিত তাহাকে মিশিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন এবং সমাজে তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে, এ কথাটা কি ললিতা একেবারেই জানে না? এ স্থলে বিনয় যদি ললিতার অনুরোধ রাখিতে প্রতিশ্রুত হয় তবে সেটা অন্যায় এবং ললিতার পক্ষে অনিষ্টকর হইবে কি না এই প্রশ্ন তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। এ দিকে ললিতা যদি কোনো শুভকর্মে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে তবে সমস্ত চেষ্টা দিয়া সেই অনুরোধ পালন না করিবে এমন শক্তি বিনয়ের কোথায়?

এ পক্ষে সুচরিতাও আশ্চর্য হইয়া গেছে। সে স্বপ্নেও মনে করে নাই, ললিতা হঠাৎ এমন করিয়া বিনয়কে মেয়ে-ইস্কুলের জন্য অনুরোধ করিবে। একে তো বিনয়কে লইয়া যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পরে এ আবার কী কাণ্ড! ললিতা জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক এই ব্যাপারটি ঘটাইয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া সুচরিতা ভীত হইয়া উঠিল। ললিতার মনে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা সে বুঝিল, কিন্তু বেচারা বিনয়কে এই উৎপাতের মধ্যে জড়িত করা কি তাহার উচিত হইতেছে? সুচরিতা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ সম্বন্ধে একবার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে তো? মেয়ে-ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্টারি পদ পেলেন বলে বিনয়বাবু এখনই যেন খুব বেশি আশান্বিত হয়ে না ওঠেন।"

সুচরিতা কৌশলে প্রস্তাবটাকে যে বাধা দিল তাহা বিনয় বুঝিতে পারিল; ইহাতে তাহার মনে আরও খটকা বাজিল। বেশ বোঝা যাইতেছে, যে সংকট উপস্থিত হইয়াছে তাহা সুচরিতা জানে, সুতরাং নিশ্চয়ই তাহা ললিতার

অগোচর নহে, তবে ললিতা কেন— কিছুই স্পষ্ট হইল না।

ললিতা কহিল, "বাবাকে তো জিজ্ঞাসা করতেই হবে। বিনয়বাবু সম্মত আছেন জানতে পারলেই তাঁকে বলব। তিনি কখনোই আপত্তি করবেন না— তাঁকেও আমাদের এই বিদ্যালয়ের মধ্যে থাকতে হবে।"

আনন্দময়ীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনাকেও আমরা ছাড়ব না।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "আমি তোমাদের ইস্কুলের ঘর ঝাঁট দিয়ে আসতে পারব। তার বেশি কাজ আমার দ্বারা আর কী হবে।"

বিনয় কহিল, "তা হলেই যথেষ্ট হবে মা। বিদ্যালয় একেবারে নির্মল হয়ে উঠবে।"

সুচরিতা ও ললিতা বিদায় লইলে পর বিনয় একেবারে পদব্রজে ইডেন-গার্ডেন অভিমুখে চলিয়া গেল। মহিম আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া কহিলেন, "বিনয় তো দেখলুম, অনেকটা রাজি হয়ে এসেছে ; এখন যত শীঘ্র পারা যায় কাজটা সেরে ফেলাই ভালো, কী জানি আবার কখন মত বদলায়।"

আনন্দময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কী কথা! বিনয় আবার রাজি হল কখন? আমাকে তো কিছু বলে নি।"

মহিম কহিলেন, "আজই আমার সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়ে গেছে। সে বললে গোরা এলেই দিন স্থির করা যাবে।"

আনন্দময়ী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "মহিম, আমি তোমাকে বলছি, তুমি ঠিক বোঝ নি।"

মহিম কহিলেন, "আমার বুদ্ধি যতই মোটা হোক, সাদা কথা বোঝবার আমার বয়স হয়েছে এ নিশ্চয় জেনো।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "বাছা, আমার উপর তুমি রাগ করবে আমি জানি, কিন্তু আমি দেখছি এই নিয়ে একটা গোল বাধবে।"

মহিম মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "গোল বাধালেই গোল বাধে।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "মহিম, আমাকে তোমরা যা বল সমস্তই আমি সহ্য করব, কিন্তু যাতে কোনো অশান্তি ঘটতে পারে তাতে আমি যোগ

দিতে পারি নে— সে তোমাদেরই ভালোর জন্যে।"

মহিম নিষ্ঠুরভাবে কহিলেন, "আমাদের ভালোর কথা ভাববার ভার যদি আমাদেরই 'পরে দাও তা হলে তোমাকেও কোনো কথা শুনতে হয় না আর আমাদেরও হয়তো ভালোই হয়। বরঞ্চ শশিমুখীর বিয়েটা হয়ে গেলে তার পরে আমাদের ভালোর চিন্তা কোরো। কী বল?"

আনন্দময়ী ইহার পরে কোনো উত্তর না করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং মহিম পকেটের ডিবা হইতে একটি পান বাহির করিয়া চিবাইতে চিবাইতে চলিয়া গেলেন।

৪৬

ললিতা পরেশবাবুকে আসিয়া কহিল, "আমরা ব্রাহ্ম বলে কোনো হিন্দু মেয়ে আমাদের কাছে পড়তে আসতে চায় না— তাই মনে করছি, হিন্দুসমাজের কাউকে এর মধ্যে রাখলে কাজের সুবিধা হবে। কী বল, বাবা।"

পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিন্দুসমাজের কাউকে পাবে কোথায়?"

ললিতা খুব কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছিল বটে, তবু বিনয়ের নাম করিতে হঠাৎ তাহার সংকোচ উপস্থিত হইল; জোর করিয়া সংকোচ কাটাইয়া কহিল, "কেন, তা কি পাওয়া যাবে না? এই-যে বিনয়বাবু আছেন— কিম্বা—"

এই কিম্বাটা নিতান্তই একটা ব্যর্থ প্রয়োগ, অব্যয় পদের অপব্যয় মাত্র। ওটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

পরেশ কহিলেন, "বিনয়! বিনয় রাজি হবেন কেন?"

ললিতার অভিমানে আঘাত লাগিল। বিনয়বাবু রাজি হবেন না! ললিতা এটুকু বেশ বুঝিয়াছে, বিনয়বাবুকে রাজি করানো ললিতার পক্ষে অসাধ্য নহে। ললিতা কহিল, "তা, তিনি রাজি হতে পারেন।"

পরেশ একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "সব কথা বিবেচনা করে দেখলে কখনোই তিনি রাজি হবেন না।"

ললিতার কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল। সে নিজের আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা লইয়া নাড়িতে লাগিল। তাঁহার এই নিপীড়িতা কন্যার মুখের দিকে তাকাইয়া পরেশের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু, কোনো সান্ত্বনার বাক্য খুঁজিয়া পাইলেন না। কিছু ক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ললিতা মুখ তুলিয়া কহিল, "বাবা, তা হলে আমাদের এই ইস্কুলটা কোনোমতেই হতে পারবে না!"

পরেশ কহিলেন, "এখন হওয়ার অনেক বাধা দেখতে পাচ্ছি। চেষ্টা করতে গেলেই বিস্তর অপ্রিয় আলোচনাকে জাগিয়ে তোলা হবে।"

শেষকালে পানুবাবুরই জিত হইবে এবং অন্যায়ের কাছে নিঃশব্দে হার মানিতে হইবে, ললিতার পক্ষে এমন দুঃখ আর কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে তাহার বাপ ছাড়া আর-কাহারও শাসন সে এক মুহূর্ত বহন করিতে পারিত না। সে কোনো অপ্রিয়তাকে ডরায় না, কিন্তু অন্যায়কে কেমন করিয়া সহ্য করিবে? ধীরে ধীরে পরেশবাবুর কাছ হইতে সে উঠিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার নামে ডাকে একখানা চিঠি আসিয়াছে। হাতের অক্ষর দেখিয়া বুঝিল, তাহার বাল্যবন্ধু শৈলবালার লেখা। সে বিবাহিত, তাহার স্বামীর সঙ্গে বাঁকিপুরে থাকে। চিঠির মধ্যে ছিল—

'তোমাদের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া মন বড়ো খারাপ ছিল। অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি, চিঠি লিখিয়া সংবাদ লইব— সময় হইয়া উঠে নাই। কিন্তু, পরশু একজনের কাছ হইতে (তাহার নাম করিব না) যে খবর পাইলাম, শুনিয়া যেন বজ্রাঘাত হইল। এ যে সম্ভব হইতে পারে তাহা মনেও করিতে পারি না। কিন্তু, যিনি লিখিয়াছেন তাঁহাকে অবিশ্বাস করাও শক্ত। কোনো হিন্দু যুবকের সঙ্গে নাকি তোমার বিবাহের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্রোধে ললিতার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। তখনই সে চিঠির উত্তরে লিখিল—

'খবরটা সত্য কি না ইহা জানিবার জন্য তুমি যে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিয়া পাঠাইয়াছ, ইহাই আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হইতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজের লোক তোমাকে যে খবর দিয়াছে তাহার সত্যও কি যাচাই করিতে হইবে! এত অবিশ্বাস! তাহার পরে, কোনো হিন্দু যুবকের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে সংবাদ পাইয়া তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে, কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি, ব্রাহ্মসমাজে এমন সুবিখ্যাত সাধু যুবক আছেন যাহার সঙ্গে বিবাহের আশঙ্কা বজ্রাঘাতের তুল্য নিদারুণ এবং আমি এমন দুই-একটি হিন্দু যুবককে জানি যাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ যে-কোনো ব্রাহ্মকুমারীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। ইহার বেশি আর-একটি কথাও আমি তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।'

এ দিকে সেদিনকার মতো পরেশবাবুর কাজ বন্ধ হইয়া গেল। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন। তাহার পরে ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে সুচরিতার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরেশের চিন্তিত মুখ দেখিয়া সুচরিতার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কী লইয়া তাঁহার চিন্তা তাহাও সে জানে, এবং এই চিন্তা লইয়াই সুচরিতা কয়দিন উদ্‌বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

পরেশবাবু সুচরিতাকে লইয়া নিভৃত ঘরে বসিলেন এবং কহিলেন, "মা, ললিতা সম্বন্ধে ভাবনার সময় উপস্থিত হয়েছে।"

সুচরিতা পরেশবাবুর মুখে তাহার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "জানি বাবা।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমি সামাজিক নিন্দার কথা ভাবছি নে। আমি ভাবছি— আচ্ছা, ললিতা কি—"

পরেশের সংকোচ দেখিয়া সুচরিতা আপনিই কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। সে কহিল, "ললিতা বরাবর তার মনের কথা আমার কাছে খুলে বলে। কিন্তু, কিছুদিন থেকে সে আমার কাছে আর তেমন ক'রে ধরা দেয় না। আমি বেশ বুঝতে পারছি—"

পরেশ মাঝখান হইতে কহিলেন, "ললিতার মনে এমন কোনো ভাবের উদয় হয়েছে যেটা সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাচ্ছে না। আমি

ভেবে পাচ্ছি নে, কী করলে ওর ঠিক— তুমি কি বল বিনয়কে আমাদের পরিবারে যাতায়াত করতে দিয়ে ললিতার কোনো অনিষ্ট করা হয়েছে ?"

সুচরিতা কহিল, "বাবা, তুমি তো জান বিনয়বাবুর মধ্যে কোনো দোষ নেই— তাঁর নির্মল স্বভাব, তাঁর মতো স্বভাবতই ভদ্রলোক খুব অল্পই দেখা যায়।"

পরেশবাবু যেন একটা কোন্‌ নূতন তত্ত্ব লাভ করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক কথা বলেছ, রাধে, ঠিক কথা বলেছ। তিনি ভালো লোক কি না এইটেই দেখবার বিষয় ; অন্তর্যামী ঈশ্বরও তাই দেখেন। বিনয় যে ভালো লোক, সেখানে যে আমার ভুল হয় নি, সেজন্যে আমি তাঁকে বার বার প্রণাম করি।"

একটা জাল কাটিয়া গেল, পরেশবাবু যেন বাঁচিয়া গেলেন। পরেশবাবু তাঁহার দেবতার কাছে অন্যায় করেন নাই। ঈশ্বর যে তুলাদণ্ডে মানুষকে ওজন করেন সেই নিত্যধর্মের তুলাকেই তিনি মানিয়াছেন ; তাহার মধ্যে তিনি নিজের সমাজের তৈরি কোনো কৃত্রিম বাটখারা মিশান নাই বলিয়া তাঁহার মনে আর-কোনো গ্লানি রহিল না। এই অত্যন্ত সহজ কথাটা এতক্ষণ তিনি না বুঝিয়া কেন এমন পীড়া অনুভব করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার আশ্চর্য বোধ হইল। সুচরিতার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে আমার আজ একটা শিক্ষা হল মা।"

সুচরিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, "না না, কী বল বাবা!"

পরেশবাবু কহিলেন, "সম্প্রদায় এমন জিনিস যে, মানুষ যে মানুষ এই সকলের চেয়ে সহজ কথাটাই সে একেবারে ভুলিয়ে দেয়। মানুষ ব্রাহ্ম কি হিন্দু এই সমাজ-গড়া কথাটাকেই বিশ্বসত্যের চেয়ে বড়ো করে তুলে একটা পাক তৈরি করে— এতক্ষণ মিথ্যা তাতে ঘুরে মরছিলুম।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরেশ কহিলেন, "ললিতা তার মেয়ে-ইস্কুলের সংকল্প কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। সে এ সম্বন্ধে বিনয়ের সাহায্য নেবার

জন্যে আমার সম্মতি চায়।"

সুচরিতা কহিল, "না বাবা, এখন কিছুদিন থাক্।"

ললিতাকে তিনি নিষেধ করিবা মাত্র সে যে তাহার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সমস্ত বেগ দমন করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল, সেই ছবিটি পরেশের স্নেহপূর্ণ হৃদয়কে অত্যন্ত ক্লেশ দিতেছিল। তিনি জানিতেন, তাঁহার তেজস্বিনী কন্যার প্রতি সমাজ যে অন্যায় উৎপীড়ন করিতেছে সেই অন্যায়ে সে তেমন কষ্ট পায় নাই, যেমন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বাধা পাইয়া, বিশেষত পিতার নিকট হইতে বাধা পাইয়া। এইজন্য তিনি তাঁহার নিষেধ উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, "কেন রাধে, এখন থাকবে কেন?"

সুচরিতা কহিল, "নইলে মা ভারি বিরক্ত হয়ে উঠবেন।"

পরেশ ভাবিয়া দেখিলেন, সে কথা ঠিক।

সতীশ ঘরে ঢুকিয়া সুচরিতার কানে কানে কী কহিল। সুচরিতা কহিল, "না, ভাই বক্তিয়ার, এখন না। কাল হবে।"

সতীশ বিমর্ষ হইয়া কহিল, "কাল যে আমার ইস্কুল আছে।"

পরেশ স্নেহহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "কী সতীশ, কী চাই?"

সুচরিতা কহিল, "ওর একটা—"

সতীশ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুচরিতার মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "না না, বোলো না, বোলো না।"

পরেশবাবু কহিলেন, "যদি গোপন কথা হয় তা হলে সুচরিতা বলবে কেন?"

সুচরিতা কহিল, "না, বাবা, নিশ্চয় ওর ভারি ইচ্ছে যাতে এই গোপন কথাটা তোমার কানে ওঠে।"

সতীশ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ককৃখনো না, নিশ্চয় না।"

বলিয়া সে দৌড় দিল।

বিনয় তাহার যে রচনার এত প্রশংসা করিয়াছিল সেই রচনাটা সুচরিতাকে দেখাইবার কথা ছিল। বলা বাহুল্য, পরেশের সামনে সেই

কথাটা সুচরিতার কানে কানে স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যটা যে কী তাহা সুচরিতা ঠিক ঠাওরাইয়াছিল। এমন-সকল গভীর মনের অভিপ্রায় সংসারে যে এত সহজে ধরা পড়িয়া যায়, বেচারা সতীশের তাহা জানা ছিল না।

৪৭

চারি দিন পরে একখানি চিঠি হাতে করিয়া হারানবাবু বরদাসুন্দরীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজকাল পরেশবাবুর আশা তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হারানবাবু চিঠিখানি বরদাসুন্দরীর হাতে দিয়া কহিলেন, "আমি প্রথম হতেই আপনাদের সাবধান করে দিতে অনেক চেষ্টা করেছি। সেজন্যে আপনাদের অপ্রিয়ও হয়েছি। এখন এই চিঠি থেকেই বুঝতে পারবেন, ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা কতদূর এগিয়ে পড়েছে।"

শৈলবালাকে ললিতা যে চিঠি লিখিয়াছিল সেই চিঠিখানি বরদাসুন্দরী পাঠ করিলেন। কহিলেন, "কেমন করে জানব বলুন। কখনো যা মনেও করতে পারি নি তাই ঘটছে। এর জন্যে কিন্তু আমাকে দোষ দেবেন না, তা আমি বলে রাখছি। সুচরিতাকে যে আপনারা সকলে মিলে বড্ডো ভালো ভালো করে একেবারে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন— ব্রাহ্মসমাজে অমন মেয়ে আর হয় না— এখন আপনাদের ওই আদর্শ ব্রাহ্ম মেয়েটির কীর্তি সামলান। বিনয়-গৌরকে তো উনিই এ বাড়িতে এনেছেন। আমি তবু বিনয়কে অনেকটা আমাদের পথেই টেনে আনছিলুম, তার পরে কোথা থেকে উনি ওঁর এক মাসিকে এনে আমাদেরই ঘরে ঠাকুরপুজো শুরু করে দিলেন, বিনয়কেও এমনি বিগড়ে দিলেন যে, সে এখন আমাকে দেখলেই পালায়। এখন এ-সব যা-কিছু ঘটছে আপনাদের ওই সুচরিতাই এর গোড়ায়। ও মেয়ে যে কেমন মেয়ে সে আমি বরাবরই জানতুম; কিন্তু কখনও কোনো কথাটি কই নি, বরাবর ওকে এমন করেই মানুষ করে এসেছি যে কেউ টের পায় নি

ও আমার আপন মেয়ে নয়— আজ তার বেশ ফল পাওয়া গেল। এখন আমাকে এ চিঠি মিথ্যা দেখাচ্ছেন— আপনারা যা হয় করুন।"

হারানবাবু যে এক সময় বরদাসুন্দরীকে ভুল বুঝিয়াছিলেন, সে কথা আজ স্পষ্ট স্বীকার করিয়া অত্যন্ত উদারভাবে অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে পরেশবাবুকে ডাকিয়া আনা হইল।

"এই দেখো" বলিয়া বরদাসুন্দরী চিঠিখানা তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। পরেশবাবু দু-তিনবার চিঠিখানা পড়িয়া কহিলেন, "তা, কী হয়েছে!"

বরদাসুন্দরী উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "কী হয়েছে! আর কী হওয়া চাই! আর বাকি রইলই বা কী! ঠাকুরপুজো, জাত মেনে চলা, সবই হল ; এখন কেবল হিন্দুর ঘরে তোমার মেয়ের বিয়ে হলেই হয়। তার পরে তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুসমাজে ঢুকবে— আমি কিন্তু বলে রাখছি—"

পরেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। অন্তত এখনও বলবার সময় হয় নি। কথা হচ্ছে এই যে, তোমরা কেন ঠিক করে বসে আছ, হিন্দুর ঘরেই ললিতার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। এ চিঠিতে তো সেরকম কিছুই দেখছি নে।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "কী হলে যে তুমি দেখতে পাও সে তো আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলুম না। সময়মত যদি দেখতে পেতে তা হলে আজ এত কাণ্ড ঘটত না। চিঠিতে মানুষ এর চেয়ে আর কত খুলে লিখবে বলো তো।"

হারানবাবু কহিলেন, "আমার বোধ হয়, ললিতাকে এই চিঠিখানি দেখিয়ে তার অভিপ্রায় কী তাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। আপনারা যদি অনুমতি করেন তা হলে আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি।"

এমন সময় ললিতা ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বাবা, এই দেখো, ব্রাহ্মসমাজ থেকে আজকাল এইরকম অজানা চিঠি আসছে।"

পরেশ চিঠি পড়িয়া দেখিলেন। বিনয়ের সঙ্গে ললিতার বিবাহ যে গোপনে স্থির হইয়া গিয়াছে, পত্রলেখক তাহা নিশ্চিত ধরিয়া লইয়া নানা-

প্রকার ভর্ৎসনা ও উপদেশ -দ্বারা চিঠি পূর্ণ করিয়াছে। সেই সঙ্গে, বিনয়ের মৎলব যে ভালো নয়, সে যে দুই দিন পরেই তাহার ব্রাহ্ম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় হিন্দুঘরে বিবাহ করিবে, এ-সমস্ত আলোচনাও ছিল।

পরেশের পড়া হইলে পর হারান চিঠিখানি লইয়া পড়িলেন; কহিলেন, "ললিতা, এই চিঠি পড়ে তোমার রাগ হচ্ছে! কিন্তু এইরকম চিঠি লেখবার হেতু কি তুমিই ঘটাও নি? তুমি নিজের হাতে এই চিঠি কেমন করে লিখলে বলো দেখি।"

ললিতা মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "শৈলর সঙ্গে আপনার বুঝি এই সম্বন্ধে চিঠিপত্র চলছে?"

হারান তাহার স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করে শৈল তোমার এই চিঠি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।"

ললিতা শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এখন ব্রাহ্মসমাজ কী বলতে চান বলুন।"

হারান কহিলেন, "বিনয়বাবু ও তোমার সম্বন্ধে সমাজে এই-যে জনরব রাষ্ট্র হয়েছে এ আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারি নে, কিন্তু তবু তোমার মুখ থেকে আমি এর স্পষ্ট প্রতিবাদ শুনতে চাই।"

ললিতার দুই চক্ষু আগুনের মতো জ্বলিতে লাগিল; সে একটা চৌকির পিঠ কম্পিত হস্তে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কেন কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারেন না?"

পরেশ ললিতার পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ললিতা, এখন তোমার মন স্থির নেই, এ কথা পরে আমার সঙ্গে হবে— এখন থাক্।"

হারান কহিলেন, "পরেশবাবু, আপনি কথাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করবেন না।"

ললিতা পুনর্বার জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "চাপা দেবার চেষ্টা বাবা করবেন! আপনাদের মতো বাবা সত্যকে ভয় করেন না— সত্যকে বাবা ব্রাহ্মসমাজের চেয়েও বড়ো বলে জানেন। আমি আপনাকে বলছি, বিনয়বাবুর সঙ্গে

বিবাহকে আমি কিছুমাত্র অসম্ভব বা অন্যায় বলে মনে করি নে।"

হারান বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু তিনি কি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবেন স্থির হয়েছে?"

ললিতা কহিল, "কিছুই স্থির হয় নি, আর দীক্ষা গ্রহণ করতেই হবে এমনই বা কী কথা আছে?"

বরদাসুন্দরী এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নাই। তাঁর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, আজ যেন হারানবাবুর জিত হয় এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া পরেশবাবুকে অনুতাপ করিতে হয়। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; বলিয়া উঠিলেন, "ললিতা, তুই পাগল হয়েছিস না কি! বলছিস কী!"

ললিতা কহিল, "না মা, পাগলের কথা নয়— যা বলছি বিবেচনা করেই বলছি। আমাকে যে এমন করে চার দিক থেকে বাঁধতে আসবে, সে আমি সহ্য করতে পারব না— আমি হারানবাবুদের এই সমাজের থেকে মুক্ত হব।"

হারান কহিলেন, "উচ্ছৃঙ্খলতাকে তুমি মুক্তি বল!"

ললিতা কহিল, "না, নীচতার আক্রমণ থেকে, অসত্যের দাসত্ব থেকে মুক্তিকেই আমি মুক্তি বলি। যেখানে আমি কোনো অন্যায় কোনো অধর্ম দেখছি নে, সেখানে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে কেন স্পর্শ করবে, কেন বাধা দেবে?"

হারান স্পর্ধাপ্রকাশ-পূর্বক কহিলেন, "পরেশবাবু, এই দেখুন। আমি জানতুম, শেষকালে এরকম একটা কাণ্ড ঘটবে। আমি যতটা পেরেছি আপনাদের সাবধান করবার চেষ্টা করেছি, কোনো ফল হয় নি।"

ললিতা কহিল, "দেখুন পানুবাবু, আপনাকেও সাবধান করে দেবার একটা বিষয় আছে— আপনার চেয়ে যাঁরা সকল বিষয়েই বড়ো তাঁদের সাবধান করে দেবার অহংকার আপনি মনে রাখবেন না।"

এই কথা বলিয়াই ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "এ-সব কী কাণ্ড হচ্ছে! এখন কী করতে হবে পরামর্শ করো।"

পরেশবাবু কহিলেন, "যা কর্তব্য তাই পালন করতে হবে। কিন্তু

এরকম ক'রে গোলমাল ক'রে পরামর্শ ক'রে কর্তব্য স্থির হয় না। আমাকে একটু মাপ করতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাকে এখন কিছু বোলো না। আমি একটু একলা থাকতে চাই।"

৪৮

সুচরিতা ভাবিতে লাগিল, ললিতা একি কাণ্ড বাধাইয়া বসিল! কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতার গলা ধরিয়া কহিল, "আমার কিন্তু, ভাই, ভয় হচ্ছে।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের ভয়?"

সুচরিতা কহিল, "ব্রাহ্মসমাজে তো চারি দিকে হুলস্থুল পড়ে গেছে— কিন্তু, শেষকালে বিনয়বাবু যদি রাজি না হন।"

ললিতা মুখ নিচু করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "তিনি রাজি হবেনই।"

সুচরিতা কহিল, "তুই তো জানিস, পানুবাবু মাকে ওই আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে বিনয় কখনোই তাদের সমাজ পরিত্যাগ করে এই বিয়ে করতে রাজি হবে না। ললিতা, কেন তুই সব দিক না ভেবে পানুবাবুর কাছে কথাটা অমন করে বলে ফেললি!"

ললিতা কহিল, "বলেছি বলে আমার এখনও অনুতাপ হচ্ছে না। পানুবাবু মনে করেছিলেন, তিনি এবং তাঁর সমাজ আমাকে শিকারের জন্তুর মতো তাড়া করে একেবারে অতল সমুদ্রের ধার পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, এইখানে আমাকে ধরা দিতেই হবে। তিনি জানেন না, এই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে আমি ভয় করি নে, তাঁর শিকারি কুকুরের তাড়ায় তাঁর পিঞ্জরের মধ্যে ঢুকতেই আমার ভয়।"

সুচরিতা কহিল, "একবার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।"

ললিতা কহিল, "বাবা কখনো শিকারের দলে যোগ দেবেন না, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি। তিনি তো কোনোদিন আমাদের শিকলে বাঁধতে চান নি। তাঁর মতের সঙ্গে যখন কোনোদিন আমাদের কিছু অনৈক্য ঘটেছে,

তিনি কি কখনো একটুও রাগ প্রকাশ করেছেন? ব্রাহ্মসমাজের নামে তাড়া দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেছেন? এই নিয়ে মা কতদিন বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু বাবার কেবল একটিমাত্র এই ভয় ছিল পাছে আমরা নিজে চিন্তা করবার সাহস হারাই। এমন করে যখন তিনি আমাদের মানুষ করে তুলেছেন তখন শেষকালে কি তিনি পানুবাবুর মতো সমাজের জেল-দারোগার হাতে আমাকে সমর্পণ করে দেবেন?"

সুচরিতা কহিল, "আচ্ছা বেশ, বাবা যেন কোনো বাধা দিলেন না, তার পরে কী করা যাবে বল্।"

ললিতা কহিল, "তোমরা যদি কিছু না কর তা হলে আমি নিজে—"

সুচরিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "না না, তোকে কিছু করতে হবে না ভাই। আমি একটা উপায় করছি।"

সুচরিতা পরেশবাবুর কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এমন-সময় পরেশবাবু স্বয়ং সন্ধ্যাকালে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে পরেশবাবু প্রতিদিন তাঁহার বাড়ির বাগানে একলা মাথা নিচু করিয়া আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে পায়চারি করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার পবিত্র অন্ধকারটিকে ধীরে ধীরে মনের উপর বুলাইয়া কর্মের দিনের সমস্ত দাগগুলিকে যেন মুছিয়া ফেলেন এবং অন্তরের মধ্যে নির্মল শান্তি সঞ্চয় করিয়া রাত্রির বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন— আজ পরেশবাবু সেই তাঁহার সন্ধ্যার নিভৃত ধ্যানের শান্তিসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া যখন চিন্তিতমুখে সুচরিতার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন, যে শিশুর খেলা করা উচিত ছিল সেই শিশু পীড়িত হইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলে মার মনে যেমন ব্যথা বাজে, সুচরিতার স্নেহপূর্ণ চিত্ত তেমনি ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পরেশবাবু মৃদুস্বরে কহিলেন, "রাধে, সব শুনেছ তো?"

সুচরিতা কহিল, "হাঁ, বাবা, সব শুনেছি, কিন্তু তুমি অত ভাবছ কেন?"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমি তো আর-কিছু ভাবি নে, আমার ভাবনা এই যে, ললিতা যে ঝড়টা জাগিয়ে তুলেছে তার সমস্ত আঘাত সইতে

পারবে তো? উত্তেজনার মুখে অনেক সময় আমাদের মনে অন্ধ স্পর্ধা আসে, কিন্তু, একে একে যখন তার ফল ফলতে আরম্ভ হয় তখন তার ভার বহন করবার শক্তি চলে যায়। ললিতা কি সমস্ত ফলাফলের কথা বেশ ভালো ক'রে চিন্তা ক'রে যেটা তার পক্ষে শ্রেয় সেইটেই স্থির করেছে?"

সুচরিতা কহিল, "সমাজের তরফ থেকে কোনো উৎপীড়নে ললিতাকে কোনোদিন পরাস্ত করতে পারবে না, এ আমি তোমাকে জোর করে বলতে পারি।"

পরেশ কহিলেন, "আমি এই কথাটা খুব নিশ্চয় করে জানতে চাই যে, ললিতা কেবল রাগের মাথায় বিদ্রোহ করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে না।"

সুচরিতা মুখ নিচু করিয়া কহিল, "না বাবা, তা যদি হত তা হলে আমি তার কথায় একেবারে কানই দিতুম না। ওর মনের মধ্যে যে কথাটা গভীর ভাবে ছিল সেইটেই হঠাৎ ঘা খেয়ে একেবারে বেরিয়ে এসেছে। এখন একে কোনোরকমে চাপাচুপি দিতে গেলে ললিতার মতো মেয়ের পক্ষে ভালো হবে না। বাবা, বিনয়বাবু লোক তো খুব ভালো।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, বিনয় কি ব্রাহ্মসমাজে আসতে রাজি হবে?"

সুচরিতা কহিল, "তা ঠিক বলতে পারি নে। আচ্ছা বাবা, একবার গৌরবাবুর মার কাছে যাব?"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমিও ভাবছিলুম তুমি গেলে ভালো হয়।"

৪৯

আনন্দময়ীর বাড়ি হইতে রোজ সকালবেলায় বিনয় একবার বাসায় আসিত। আজ সকালে আসিয়া সে একখানি চিঠি পাইল। চিঠিতে কাহারও নাম নাই। ললিতাকে বিবাহ করিলে বিনয়ের পক্ষে কোনোমতেই তাহা সুখের হইতে পারে না এবং ললিতার পক্ষে তাহা অমঙ্গলের কারণ হইবে এই কথা লইয়া চিঠিতে দীর্ঘ উপদেশ আছে এবং সকলের শেষে আছে যে, এ সত্ত্বেও

যদি বিনয় ললিতাকে বিবাহ করিতে নিবৃত্ত না হয় তবে একটা কথা সে যেন চিন্তা করিয়া দেখে, ললিতার ফুস্‌ফুস্‌ দুর্বল, ডাক্তারেরা যক্ষ্মার সম্ভাবনা আশঙ্কা করেন।

বিনয় এরূপ চিঠি পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এমনতরো কথার যে মিথ্যা করিয়াও সৃষ্টি হইতে পারে, বিনয় কখনও তাহা মনে করে নাই। কারণ, সমাজের বাধায় ললিতার সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ যে কোনোক্রমে সম্ভব হইতে পারে না ইহা তো কাহারও কাছে অগোচর নাই। এইজন্যই তো ললিতার প্রতি তাহার হৃদয়ের অনুরাগকে এতদিন সে অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু, এমনতরো চিঠি যখন তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন সমাজের মধ্যে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সমাজের লোকের কাছে ললিতা যে কিরূপ অপমানিত হইতেছে তাহা চিন্তা করিয়া তাহার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার নামের সঙ্গে ললিতার নাম জড়িত হইয়া প্রকাশ্যভাবে লোকের মুখে সঞ্চরণ করিতেছে, ইহাতে সে অত্যন্ত লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া উঠিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে পরিচয়কে ললিতা অভিশাপ ও ধিক্‌কার দিতেছে। মনে হইতে লাগিল, তাহার দৃষ্টিমাত্রও ললিতা আর কোনোদিন সহ্য করিতে পারিবে না।

হায় রে, মানবহৃদয়! এই অত্যন্ত ধিক্‌কারের মধ্যেও বিনয়ের চিত্তের মধ্যে একটি নিবিড় গভীর সূক্ষ্ম ও তীব্র আনন্দ এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চরণ করিতেছিল, তাহাকে থামাইয়া রাখা যাইতেছিল না, সমস্ত লজ্জা সমস্ত অপমানকে সে অস্বীকার করিতেছিল। সেইটেকেই কোনোমতে কিছুমাত্র প্রশ্রয় না দিবার জন্য তাহার বারান্দায় সে দ্রুতবেগে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল— কিন্তু সকালবেলার আলোকের ভিতর দিয়া একটা মদিরতা তাহার মনে সঞ্চারিত হইল; রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছিল, তাহার সেই হাঁকের স্বরও তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর চাঞ্চল্য জাগাইল। বাহিরের লোকনিন্দাই যেন ললিতাকে বন্যার মতো

ভাসাইয়া বিনয়ের হৃদয়ের ডাঙার উপর তুলিয়া দিয়া গেল ; ললিতার এই সমাজ হইতে ভাসিয়া আসার মূর্তিটিকে সে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, 'ললিতা আমার, একলাই আমার।' অন্য কোনো দিন তাহার মন দুর্দাম হইয়া এত জোরে এ কথা বলিতে সাহস করে নাই ; আজ বাহিরে যখন এই ধ্বনিটা এমন করিয়া হঠাৎ উঠিল তখন বিনয় কোনোমতেই নিজের মনকে আর 'চুপ চুপ' বলিয়া থামাইয়া রাখিতে পারিল না।

বিনয় এমনি চঞ্চল হইয়া যখন বারান্দায় বেড়াইতেছে এমন সময় দেখিল, হারানবাবু রাস্তা দিয়া আসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল, তিনি তাহারই কাছে আসিতেছেন এবং অনামা চিঠিটার পশ্চাতে যে একটা বৃহৎ আলোড়ন আছে তাহাও নিশ্চয় জানিল।

অন্য দিনের মতো বিনয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিল না ; সে হারানবাবুকে চৌকিতে বসাইয়া নীরবে তাঁহার কথার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

হারানবাবু কহিলেন, "বিনয়বাবু, আপনি তো হিন্দু ?"

বিনয় কহিল, "হাঁ, হিন্দু বৈকি।"

হারানবাবু কহিলেন, "আমার এ প্রশ্নে রাগ করবেন না। অনেক সময় আমরা চারি দিকের অবস্থা বিবেচনা না করে অন্ধ হয়ে চলি— তাতে সংসারে দুঃখের সৃষ্টি করে। এমন স্থলে, আমরা কী, আমাদের সীমা কোথায়, আমাদের আচরণের ফল কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয়, এ-সমস্ত প্রশ্ন যদি কেউ উত্থাপন করে তবে তা অপ্রিয় হলেও তাকে বন্ধু বলে মনে জানবেন।"

বিনয় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "বৃথা আপনি এতটা ভূমিকা করছেন। অপ্রিয় প্রশ্নে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমি যে কোনোপ্রকার অত্যাচার করব, আমার সেরকম স্বভাব নয়। আপনি নিরাপদে আমাকে সকল প্রকার প্রশ্ন করতে পারেন।"

হারানবাবু কহিলেন, "আমি আপনার প্রতি ইচ্ছাকৃত কোনো অপরাধের দোষারোপ করতে চাই নে। কিন্তু, বিবেচনার ত্রুটির ফলও বিষময় হয়ে উঠতে পারে, এ কথা আপনাকে বলা বাহুল্য।"

বিনয় মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "যা বাহুল্য তা নাই বললেন— আসল কথাটা বলুন।"

হারানবাবু কহিলেন, "আপনি যখন হিন্দুসমাজে আছেন এবং সমাজ ছাড়াও যখন আপনার পক্ষে অসম্ভব তখন পরেশবাবুর পরিবারে কি আপনার এমনভাবে গতিবিধি করা উচিত যাতে সমাজে তাঁর মেয়েদের সম্বন্ধে কোনো কথা উঠতে পারে?"

বিনয় গম্ভীর হইয়া কিছু ক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, "দেখুন পানুবাবু, সমাজে লোকে কিসের থেকে কোন্ কথার সৃষ্টি করবে সেটা অনেকটা তাঁদের স্বভাবের উপর নির্ভর করে, তার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিতে পারি নে। পরেশবাবুর মেয়েদের সম্বন্ধেও যদি আপনাদের সমাজে কোনোপ্রকার আলোচনা ওঠা সম্ভব হয়, তবে তাঁদের তাতে লজ্জার বিষয় তেমন নেই যেমন আপনাদের সমাজের।"

হারানবাবু কহিলেন, "কোনো কুমারীকে তার মায়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করে যদি বাইরের পুরুষের সঙ্গে একলা এক জাহাজে ভ্রমণ করতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে সে সম্বন্ধে কোন্ সমাজের আলোচনা করবার অধিকার নেই জিজ্ঞাসা করি।"

বিনয় কহিল, "বাইরের ঘটনাকে ভিতরের অপরাধের সঙ্গে আপনারাও যদি এক আসন দান করেন, তবে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে আপনাদের ব্রাহ্ম-সমাজে আসবার কী দরকার ছিল? যাই হোক, পানুবাবু, এ-সমস্ত কথা নিয়ে তর্ক করবার কোনো দরকার দেখি নে। আমার পক্ষে কর্তব্য কী সে আমি চিন্তা করে স্থির করব, আপনি এ সম্বন্ধে আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবেন না।"

হারানবাবু কহিলেন, "আমি আপনাকে বেশি কিছু বলতে চাই নে,

আমার কেবল শেষ বলবার কথাটি এই, আপনাকে এখন দূরে থাকতে হবে। নইলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। আপনারা পরেশবাবুর পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে কেবল একটা অশান্তির সৃষ্টি করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে কী অনিষ্ট বিস্তার করেছেন তা আপনারা জানেন না।"

হারানবাবু চলিয়া গেলে বিনয়ের মনের মধ্যে একটা বেদনা শূলের মতো বিঁধিতে লাগিল। সরলহৃদয় উদারচিত্ত পরেশবাবু কত সমাদরের সহিত তাহাদের দুই জনকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছিলেন— বিনয় হয়তো না বুঝিয়া এই ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে আপন অধিকারের সীমা পদে পদে লঙ্ঘন করিতেছিল, তবু তাঁহার স্নেহ ও শ্রদ্ধা হইতে সে একদিনও বঞ্চিত হয় নাই— এই পরিবারের মধ্যে বিনয়ের প্রকৃতি এমন একটি গভীরতর আশ্রয় লাভ করিয়াছে যেমনটি সে আর-কোথাও পায় নাই, উঁহাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর বিনয় যেন নিজের একটি বিশেষ সত্তাকে উপলব্ধি করিয়াছে— এই-যে এত আদর, এত আনন্দ, এমন আশ্রয় যেখানে পাইয়াছে সেই পরিবারে বিনয়ের স্মৃতি চিরদিন কাঁটার মতো বিঁধিয়া থাকিবে! পরেশবাবুর মেয়েদের উপর সে একটা অপমানের কালিমা আনিয়া দিল! ললিতার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের উপরে সে এতবড়ো একটা লাঞ্ছনা আঁকিয়া দিল! ইহার কী প্রতীকার হইতে পারে! হায় রে হায়, সমাজ বলিয়া জিনিসটা সত্যের মধ্যে কতবড়ো একটা বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে! ললিতার সঙ্গে বিনয়ের মিলনের কোনো সত্য বাধা নাই। ললিতার সুখ ও মঙ্গলের জন্য বিনয় নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে কিরূপ প্রস্তুত আছে তাহা সেই দেবতাই জানেন যিনি উভয়ের অন্তর্যামী— তিনিই তো বিনয়কে প্রেমের আকর্ষণে ললিতার এত নিকটে আনিয়া দিয়াছেন, তাঁহার শাশ্বত ধর্মবিধিতে তো কোথাও বাধে নাই। তবে ব্রাহ্মসমাজের যে দেবতাকে পানুবাবুর মতো লোকে পূজা করেন তিনি কি আর-একজন কেহ! তিনি কি মানবচিত্তের অন্তরতর বিধাতা নন? ললিতার সঙ্গে তাহার মিলনের

মাঝখানে যদি কোনো নিষেধ করাল দন্ত মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যদি সে কেবল সমাজকেই মানে আর সর্বমানবের প্রভুর দোহাই না মানে, তবে তাহাই কি পাপ নিষেধ নহে? কিন্তু হায়, এ নিষেধ হয়তো ললিতার কাছেও বলবান। তা ছাড়া, ললিতা হয়তো বিনয়কে— কত সংশয় আছে। কোথায় ইহার মীমাংসা পাইবে।

৫০

যখন বিনয়ের বাসায় হারানবাবুর আবির্ভাব হইয়াছে সেই সময়েই অবিনাশ আনন্দময়ীর কাছে গিয়া খবর দিয়াছে যে, বিনয়ের সঙ্গে ললিতার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে।

আনন্দময়ী কহিলেন, "এ কথা কখনোই সত্য নয়।"

অবিনাশ কহিল, "কেন সত্য নয়? বিনয়ের পক্ষে এ কি অসম্ভব?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "সে আমি জানি নে, কিন্তু এতবড়ো কথাটা বিনয় কখনোই আমার কাছে লুকিয়ে রাখত না।"

অবিনাশ যে ব্রাহ্মসমাজের লোকের কাছেই এই সংবাদ শুনিয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য তাহা সে বার বার করিয়া বলিল। বিনয়ের যে এইরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিবেই অবিনাশ তাহা বহু পূর্বেই জানিত, এমন-কি গোরাকে এ সম্বন্ধে সে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল— ইহাই আনন্দময়ীর নিকট ঘোষণা করিয়া সে মহা আনন্দে নীচের তলায় মহিমের কাছে এই সংবাদ দিয়া গেল।

আজ বিনয় যখন আসিল তাহার মুখ দেখিয়াই আনন্দময়ী বুঝিলেন যে, তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে বিশেষ একটা ক্ষোভ জন্মিয়াছে। তাহাকে আহার করাইয়া নিজের ঘরের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিনয়, কী হয়েছে তোর বল্ তো।"

বিনয় কহিল, "মা, এই চিঠিখানা পড়ে দেখো।"

আনন্দময়ীর চিঠি পড়া হইলে বিনয় কহিল, "আজ সকালে পানুবাবু আমার বাসায় এসেছিলেন— তিনি আমাকে খুব ভর্ৎসনা করে গেলেন।"

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

বিনয় কহিল, "তিনি বলেন, আমার আচরণে তাঁদের সমাজে পরেশ-বাবুর মেয়েদের সম্বন্ধে নিন্দার কারণ ঘটেছে।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "লোকে বলছে, ললিতার সঙ্গে তোর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে— এতে আমি তো নিন্দার কোনো বিষয় দেখছি নে।"

বিনয় কহিল, "বিবাহ হবার জো থাকলে নিন্দার কোনো বিষয় থাকত না। কিন্তু, যেখানে তার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে এরকম গুজব রটানো কত বড়ো অন্যায়। বিশেষত ললিতার সম্বন্ধে এরকম রটনা করা অত্যন্ত কাপুরুষতা।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোর যদি কিছুমাত্র পৌরুষ থাকে, বিনু, তা হলে এই কাপুরুষতার হাত থেকে তুই অনায়াসেই ললিতাকে রক্ষা করতে পারিস।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেমন ক'রে মা!"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কেমন ক'রে কী! ললিতাকে বিয়ে ক'রে।"

বিনয় কহিল, "কী বল মা! তোমার বিনয়কে তুমি কী যে মনে কর তা তো বুঝতে পারি নে। তুমি ভাবছ, বিনয় যদি একবার কেবল বলে যে 'আমি বিয়ে করব' তা হলে জগতে তার উপরে আর-কোনো কথাই উঠতে পারে না ; কেবল আমার ইশারার অপেক্ষাতেই সমস্ত তাকিয়ে বসে আছে।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোর তো অতশত কথা ভাববার দরকার দেখি নে। তোর তরফ থেকে তুই যেটুকু করতে পারিস সেইটুকু করলেই চুকে গেল। তুই বলতে পারিস 'আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি'।"

বিনয় কহিল, "আমি এমন অসংগত কথা বললে সেটা ললিতার পক্ষে কি অপমানকর হবে না?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "অসংগত কেন বলছিস? তোদের বিবাহের গুজব যখন উঠে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই সেটা সংগত বলেই উঠেছে। আমি

তোকে বলছি, তোর কিছু সংকোচ করতে হবে না।"

বিনয় কহিল, "কিন্তু মা, গোরার কথাও তো ভাবতে হয়?"

আনন্দময়ী দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না, বাছা, এর মধ্যে গোরার কথা ভাববার কথাই নয়। আমি জানি সে রাগ করবে; আমি চাই নে যে, সে তোর উপরে রাগ করে। কিন্তু, কী করবি! ললিতার প্রতি যদি তোর শ্রদ্ধা থাকে তবে তার সম্বন্ধে চিরকাল সমাজে একটা অপমান থেকে যাবে, এ তো তুই ঘটতে দিতে পারিস নে।"

কিন্তু, এ যে বড়ো শক্ত কথা। কারাদণ্ডে দণ্ডিত যে গোরার প্রতি বিনয়ের প্রেম আরও যেন দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইতেছে তাহার জন্য সে এতবড়ো একটা আঘাত প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারে কি! তা ছাড়া, সংস্কার। সমাজকে বুদ্ধিতে লঙ্ঘন করা সহজ, কিন্তু কাজে লঙ্ঘন করিবার বেলায় ছোটোবড়ো কত জায়গায় টান পড়ে। একটা অপরিচিতের আতঙ্ক একটা অনভ্যস্তের প্রত্যাখ্যান বিনা যুক্তিতে কেবলই পিছনের দিকে ঠেলিতে থাকে।

বিনয় কহিল, "মা, তোমাকে যতই দেখছি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তোমার মন একেবারে এমন সাফ হল কী করে! তোমাকে কি পায়ে চলতে হয় না! ঈশ্বর তোমাকে কি পাখা দিয়েছেন! তোমার কোনো জায়গায় কিছু ঠেকে না?"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "ঈশ্বর আমার ঠেকাবার মতো কিছুই রাখেন নি। সমস্ত একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছেন।"

বিনয় কহিল, "কিন্তু, মা, আমি মুখে যাই বলি মনটাতে ঠেকে যে। এত যে বুঝিসুঝি, পড়িশুনি, তর্ক করি, হঠাৎ দেখতে পাই মনটা নিতান্ত মূর্খই রয়ে গেছে।"

এমন সময় মহিম ঘরে ঢুকিয়াই বিনয়কে ললিতা সম্বন্ধে এমন নিতান্ত রূঢ়রকম করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে তাহার হৃদয় সংকোচে পীড়িত হইয়া উঠিল। সে আত্মদমন করিয়া মুখ নিচু করিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। তখন মহিম

সকল পক্ষের প্রতি তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়া নিতান্ত অপমানকর কথা কতকগুলা বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বুঝাইয়া গেলেন, 'বিনয়কে এইরূপ ফাঁদে ফেলিয়া সর্বনাশ করিবার জন্যই পরেশবাবুর ঘরে একটা নির্লজ্জ আয়োজন চলিতেছিল, বিনয় নির্বোধ বলিয়াই এমন ফাঁদে সে আটকা পড়িয়াছে— ভোলাক্ দেখি ওরা গোরাকে, তবে তো বুঝি। সে বড়ো শক্ত জায়গা।'

বিনয় চারি দিকেই এইরূপ লাঞ্ছনার মূর্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আনন্দময়ী কহিলেন, "জানিস, বিনয়, তোর কী কর্তব্য ?"

বিনয় মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। আনন্দময়ী কহিলেন, "তোর উচিত একবার পরেশবাবুর কাছে যাওয়া। তাঁর সঙ্গে কথা হলেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

৫১

সুচরিতা হঠাৎ আনন্দময়ীকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি যে এখনই আপনার ওখানে যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছিলুম।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "তুমি যে প্রস্তুত হচ্ছিলে তা আমি জানতুম না, কিন্তু যেজন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে সেই খবরটা পেয়ে আমি থাকতে পারলুম না— চলে এলুম।"

আনন্দময়ী খবর পাইয়াছেন শুনিয়া সুচরিতা আশ্চর্য হইয়া গেল। আনন্দময়ী কহিলেন, "মা, বিনয়কে আমি আমার আপন ছেলের মতোই জানি। সেই বিনয়ের সম্পর্ক থেকেই, তোমাদের যখন নাও জেনেছি তখনই তোমাদের মনে মনে কত আশীর্বাদ করেছি। তোমাদের প্রতি কোনো অন্যায় হচ্ছে, এ কথা শুনে আমি স্থির থাকতে পারি কই। আমার দ্বারা তোমাদের কোনো উপকার হতে পারবে কি না তা তো জানি নে— কিন্তু, মনটা কেমন করে উঠল, তাই তোমাদের কাছে ছুটে এলুম। মা, বিনয়ের তরফে কি কোনো অন্যায় ঘটেছে ?"

সুচরিতা কহিল, "কিছুমাত্র না। যে কথাটা নিয়ে খুব বেশি আন্দোলন হচ্ছে ললিতাই তার জন্যে দায়ী। ললিতা যে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে স্টীমারে চলে যাবে, বিনয়বাবু তা কখনো কল্পনাও করেন নি। লোকে এমনভাবে কথা কচ্ছে যেন ওদের দুজনের মধ্যে গোপনে পরামর্শ হয়ে গিয়েছিল। আবার ললিতা এমনি তেজস্বিনী মেয়ে, সে যে প্রতিবাদ করবে কিম্বা কোনোরকমে বুঝিয়ে বলবে আসল ঘটনাটা কী ঘটেছিল, সে তার দ্বারা কোনোমতেই হবার জো নেই।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "এর তো একটা উপায় করতে হচ্ছে। এই-সব কথা শুনে অবধি বিনয়ের মনে তো কিছুমাত্র শান্তি নেই; সে তো নিজেকেই অপরাধী বলে ঠাউরে বসে আছে।"

সুচরিতা তাহার আরক্তিম মুখ একটুখানি নিচু করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন, বিনয়বাবু—"

আনন্দময়ী সংকোচপীড়িতা সুচরিতাকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিলেন, "দেখো, বাছা, আমি তোমাকে বলছি, ললিতার জন্যে বিনয়কে যা করতে বলবে সে তাই করবে। বিনয়কে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। ও যদি একবার আত্মসমর্পণ করল তবে ও আর কিছু হাতে রাখতে পারে না। সেইজন্যে আমাকে বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকতে হয়, ওর পাছে এমন জায়গায় মন যায় যেখান থেকে ওর কিছুই ফিরে পাবার কোনো আশা নেই।"

সুচরিতার মন হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল। সে কহিল, "ললিতার সম্মতির জন্যে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না, আমি তার মন জানি। কিন্তু, বিনয়বাবু কি তাঁর সমাজ পরিত্যাগ করতে রাজি হবেন?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "সমাজ হয়তো তাকে পরিত্যাগ করতে পারে, কিন্তু সে আগেভাগে গায়ে প'ড়ে সমাজ পরিত্যাগ করতে যাবে কেন মা? তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?"

সুচরিতা কহিল, "বলেন কী মা! বিনয়বাবু হিন্দুসমাজে থেকে ব্রাহ্ম-

ঘরের মেয়ে বিয়ে করবেন ?”

আনন্দময়ী কহিলেন, “সে যদি করতে রাজি হয় তাতে তোমাদের আপত্তি কী ?”

সুচরিতার অত্যন্ত গোল ঠেকিল ; সে কহিল, “সে কেমন করে সম্ভব হবে আমি তো বুঝতে পারছি নে।”

আনন্দময়ী কহিলেন, “আমার কাছে এ তো খুবই সহজ ঠেকছে মা। দেখো, আমার বাড়িতে যে নিয়ম চলে সে নিয়মে আমি চলতে পারি নে ; সেইজন্য আমাকে কত লোকে খৃস্টান বলে। কোনো ক্রিয়াকর্মের সময়ে আমি ইচ্ছা করেই তফাত হয়ে থাকি। তুমি শুনে হাসবে মা— গোরা আমার ঘরে জল খায় না। কিন্তু, তাই বলে আমি কেন বলতে যাব ‘এ ঘর আমার ঘর নয়— এ সমাজ আমার সমাজ নয়’ ? আমি তো বলতে পারিই নে ; সমস্ত গালমন্দ মাথায় করে নিয়েই আমি এই ঘর এই সমাজ নিয়ে আছি, তাতে তো আমার এমন কিছু বাধছে না। যদি এমন বাধে যে আর চলে না, তবে ঈশ্বর যে পথ দেখাবেন সেই পথ ধরব— কিন্তু শেষ পর্যন্তই যা আমার তাকে আমারই বলব, তারা যদি আমাকে স্বীকার না করে তবে সে তারা বুঝুক।”

সুচরিতার কাছে এখনো পরিষ্কার হইল না ; সে কহিল, “কিন্তু, দেখুন, ব্রাহ্মসমাজের যা মত বিনয়বাবুর যদি—”

আনন্দময়ী কহিলেন, “তার মতও তো সেইরকমই। ব্রাহ্মসমাজের মত তো একটা সৃষ্টিছাড়া মত নয়। তোমাদের কাগজে যে-সব উপদেশ বেরোয়, ও তো আমাকে প্রায়ই সেগুলি পড়ে শোনায় ; কোন্‌খানে তফাত বুঝতে তো পারি নে।”

এমন সময় ‘সুচিদিদি’ বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই আনন্দময়ীকে দেখিয়া ললিতা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে সুচরিতার মুখ দেখিয়াই বুঝিল, এতক্ষণ তাহারই কথা হইতেছিল। ঘর হইতে পালাইতে পারিলেই সে যেন রক্ষা পাইত, কিন্তু তখন আর পালাইবার উপায় ছিল না।

আনন্দময়ী বলিয়া উঠিলেন, "এসো, ললিতা মা, এসো।" বলিয়া ললিতার হাত ধরিয়া তাহাকে একটু বিশেষ কাছে টানিয়া লইয়া বসাইলেন, যেন ললিতা তাঁহার একটু বিশেষ আপন হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার পূর্বকথার অনুবৃত্তিস্বরূপ আনন্দময়ী সুচরিতাকে কহিলেন, "দেখো, মা, ভালোর সঙ্গে মন্দ মেলাই সব চেয়ে কঠিন, কিন্তু তবু পৃথিবীতে তাও মিলছে, আর তাতেও সুখে দুঃখে চলে যাচ্ছে— সব সময়ে তাতে মন্দই হয় তাও নয়, ভালোও হয়। এও যদি সম্ভব হল তবে কেবল মতের একটুখানি অমিল নিয়ে দুজন মানুষ যে কেন মিলতে পারবে না, আমি তো তা বুঝতেই পারি নে। মানুষের আসল মিল কি মতে ?"

সুচরিতা মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। আনন্দময়ী কহিলেন, "তোমাদের ব্রাহ্মসমাজও কি মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলতে দেবে না ? ঈশ্বর ভিতরে যাদের এক করেছেন তোমাদের সমাজ বাহির থেকে তাদের তফাত করে রাখবে ? মা, যে সমাজ ছোটো অমিলকে মানে না, বড়ো মিলে সবাইকে মিলিয়ে দেয়, সে সমাজ কি কোথাও নেই ? ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষ কি কেবল এমনি ঝগড়া করেই চলবে ? সমাজ জিনিসটা কি কেবল এই-জন্যেই হয়েছে ?"

আনন্দময়ী যে এই বিষয়টি লইয়া এত আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে কি কেবল ললিতার সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের বাধা দূর করিবার জন্যই ? সুচরিতার মনে এ সম্বন্ধে একটু দ্বিধার ভাব অনুভব করিয়া সেই দ্বিধাটুকু ভাঙিয়া দিবার জন্য তাঁহার সমস্ত মন যে উদ্যত হইয়া উঠিল, ইহার মধ্যে আর-একটা উদ্দেশ্য কি ছিল না ? সুচরিতা যদি এমন সংস্কারে জড়িত থাকে তবে সে যে কোনোমতেই চলিবে না। বিনয় ব্রাহ্ম না হইলে বিবাহ ঘটিতে পারিবে না এই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে বড়ো দুঃখের সময়েও এই কয়দিন আনন্দময়ী যে আশা গড়িয়া তুলিতেছিলেন সে যে ধূলিসাৎ হয়। আজই বিনয় এ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ; বলিয়াছিল, "মা, ব্রাহ্মসমাজে কি নাম লেখাতে হবে ? সেও স্বীকার করব ?"

আনন্দময়ী বলিয়াছিলেন, "না না, তার তো কোনো দরকার দেখি নে।"

বিনয় বলিল, "যদি তাঁরা পীড়াপীড়ি করেন।"

আনন্দময়ী অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিয়াছিলেন, "না, এখানে পীড়াপীড়ি খাটবে না।"

সুচরিতা আনন্দময়ীর আলোচনায় যোগ দিল না; সে চুপ করিয়াই রহিল। তিনি বুঝিলেন, সুচরিতার মন এখনো সায় দিতেছে না।

আনন্দময়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার মন যে সমাজের সমস্ত সংস্কার কাটাইয়াছে সে তো কেবল ওই গোরার স্নেহে। তবে কি গোরার 'পরে সুচরিতার মন পড়ে নাই? যদি পড়িত তবে তো এই ছোটো কথাটাই এত বড়ো হইয়া উঠিত না।'

আনন্দময়ীর মন একটুখানি বিমর্ষ হইয়া গেল। কারাগার হইতে গোরার বাহির হইতে আর দিন দুয়েক বাকি আছে মাত্র। তিনি মনে ভাবিতেছিলেন, তাহার জন্য একটা সুখের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। এবারে যেমন করিয়া হোক গোরাকে বাঁধিতেই হইবে, নহিলে সে যে কোথায় কী বিপদে পড়িবে তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু, গোরাকে বাঁধিয়া ফেলা তো যে-সে মেয়ের কর্ম নয়। এ দিকে, কোনো হিন্দুসমাজের মেয়ের সঙ্গে গোরার বিবাহ দেওয়া অন্যায় হইবে— সেইজন্য এতদিন নানা কন্যাদায়গ্রস্তের দরখাস্ত একেবারে নামঞ্জুর করিয়াছেন। গোরা বলে 'আমি বিবাহ করিব না'— তিনি মা হইয়া একদিনের জন্য প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাতে লোকে আশ্চর্য হইয়া যাইত। এবারে গোরার দুই-একটা লক্ষণ দেখিয়া তিনি মনে মনে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। সেইজন্যই সুচরিতার নীরব বিরুদ্ধতা তাঁহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। কিন্তু, তিনি সহজে হাল ছাড়িবার পাত্রী নন; মনে মনে কহিলেন, 'আচ্ছা, দেখা যাক।'

পরেশবাবু কহিলেন, "বিনয়, তুমি ললিতাকে একটা সংকট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে একটা দুঃসাহসিক কাজ করবে, এরকম আমি ইচ্ছা করি নে। সমাজের আলোচনার বেশি মূল্য নেই; আজ যা নিয়ে গোলমাল চলছে দু দিন বাদে তা কারও মনেও থাকবে না।"

ললিতার প্রতি কর্তব্য করিবার জন্যই যে বিনয় কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছিল, সে বিষয়ে বিনয়ের মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। সে জানিত, এরূপ বিবাহে সমাজে অসুবিধা ঘটিবে, এবং তাহার চেয়েও বেশি, গোরা বড়োই রাগ করিবে— কিন্তু কেবল কর্তব্যবুদ্ধির দোহাই দিয়া এই-সকল অপ্রিয় কল্পনাকে সে মন হইতে খেদাইয়া রাখিয়াছিল। এমন সময় পরেশবাবু হঠাৎ যখন সেই কর্তব্যবুদ্ধিকে একেবারে বরখাস্ত করিতে চাহিলেন তখন বিনয় তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না।

সে কহিল, "আপনাদের স্নেহঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারব না। আমাকে উপলক্ষ করে আপনাদের পরিবারে দু দিনের জন্যেও যদি লেশমাত্র অশান্তি ঘটে তবে সেও আমার পক্ষে অসহ্য।"

পরেশবাবু কহিলেন, "বিনয়, তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছ না। আমাদের প্রতি তোমার যে শ্রদ্ধা আছে তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু সেই শ্রদ্ধার কর্তব্য শোধ করবার জন্যেই যে তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছ এটা আমার কন্যার পক্ষে শ্রদ্ধেয় নয়। সেই-জন্যেই আমি তোমাকে বলছিলুম যে, সংকট এমন গুরুতর নয় যে এর জন্যে তোমার কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন আছে।"

যাক, বিনয় কর্তব্যদায় হইতে মুক্তি পাইল। কিন্তু, খাঁচার দ্বার খোলা পাইলে পাখি যেমন ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া যায় তেমন করিয়া তাহার মন তো নিষ্কৃতির অবারিত পথে দৌড় দিল না। এখনও সে যে নড়িতে চায়

না। কর্তব্যবুদ্ধিকে উপলক্ষ করিয়া সে যে অনেক দিনের সংযমের বাঁধকে অনাবশ্যক বলিয়া ভাঙিয়া দিয়া বসিয়া আছে। মন আগে যেখানে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াইত এবং অপরাধীর মতো সসংকোচে ফিরিয়া আসিত সেখানে সে যে ঘর জুড়িয়া বসিয়া লঙ্কাভাগ করিয়া লইয়াছে— এখন তাহাকে ফেরানো কঠিন। যে কর্তব্যবুদ্ধি তাহাকে হাতে ধরিয়া এ জায়গাটাতে আনিয়াছে সে যখন বলিতেছে 'আর দরকার নাই, চলো ভাই, ফিরি' মন বলে, 'তোমার দরকার না থাকে তুমি ফেরো— আমি এইখানেই রহিয়া গেলাম।'

পরেশ যখন কোথাও কোনো আড়াল রাখিতে দিলেন না তখন বিনয় বলিয়া উঠিল, "আমি যে কর্তব্যের অনুরোধে একটা কষ্ট স্বীকার করতে যাচ্ছি এমন কথা মনেও করবেন না। আপনারা যদি সম্মতি দেন তবে আমার পক্ষে এমন সৌভাগ্য আর-কিছুই হতে পারে না, কেবল আমার ভয় হয় পাছে—"

সত্যপ্রিয় পরেশবাবু অসংকোচে কহিলেন, "তুমি যা ভয় করছ তার কোনো হেতু নেই। আমি সুচরিতার কাছ থেকে শুনেছি, ললিতার মন তোমার প্রতি বিমুখ নয়।"

বিনয়ের মনের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ললিতার মনের একটি গূঢ় কথা সুচরিতার কাছে ব্যক্ত হইয়াছে। কবে ব্যক্ত হইল, কেমন করিয়া ব্যক্ত হইল! দুই সখীর কাছে এই-যে আভাসে অনুমানে একটা জানাজানি হইয়াছে, ইহার সুতীব্র রহস্যময় সুখ বিনয়কে যেন বিদ্ধ করিতে লাগিল।

বিনয় বলিয়া উঠিল, "আমাকে যদি আপনারা যোগ্য মনে করেন তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা আমার পক্ষে আর-কিছুই হতে পারে না।"

পরেশবাবু কহিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি একবার উপর থেকে আসি।"

তিনি বরদাসুন্দরীর মত লইতে গেলেন। বরদাসুন্দরী কহিলেন, "বিনয়কে তো দীক্ষা নিতে হবে।"

পরেশবাবু কহিলেন, "তা নিতে হবে বৈকি।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "সেটা আগে ঠিক করো। বিনয়কে এইখানেই ডাকাও-না।"

বিনয় উপরে আসিলে বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তা হলে দীক্ষার দিন তো একটা ঠিক করতে হয়।"

বিনয় কহিল, "দীক্ষার কি দরকার আছে ?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "দরকার নেই ? বল কী! নইলে ব্রাহ্মসমাজে তোমার বিবাহ হবে কী করে ?"

বিনয় চুপ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। বিনয় তাঁহার ঘরে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে শুনিয়াই পরেশবাবু ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে।

বিনয় কহিল, "ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের প্রতি আমার তো শ্রদ্ধা আছে এবং এ-পর্যন্ত আমার ব্যবহারেও তার অন্যথাচরণ হয় নি। তবে কি বিশেষ-ভাবে দীক্ষা নেওয়ার দরকার আছে ?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "যদি মতেই মিল থাকে তবে দীক্ষা নিতেই বা ক্ষতি কী ?"

বিনয় কহিল, "আমি যে হিন্দুসমাজের কেউ নই, এ কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তা হলে এ কথা নিয়ে আলোচনা করাই আপনার অন্যায় হয়েছে। আপনি কি আমাদের উপকার করার জন্যে দয়া করে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন ?"

বিনয় অত্যন্ত আঘাত পাইল ; দেখিল, তাহার প্রস্তাবটা ইঁহাদের পক্ষে সত্যিই অপমানজনক হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুকাল হইল সিভিল বিবাহের আইন পাস হইয়া গেছে। সে সময়ে গোরা ও বিনয় কাগজে ওই আইনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছে। আজ সেই সিভিল বিবাহ স্বীকার করিয়া বিনয় নিজেকে 'হিন্দু

নয়' বলিয়া ঘোষণা করিবে, এও তো বড়ো শক্ত কথা।

বিনয় হিন্দুসমাজে থাকিয়া ললিতাকে বিবাহ করিবে, এ প্রস্তাব পরেশ মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উভয়কে নমস্কার করিয়া কহিল, "আমাকে মাপ করবেন, আমি আর অপরাধ বাড়াব না।"

বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, সম্মুখের বারান্দায় এক কোণে একটি ছোটো ডেস্ক লইয়া ললিতা একলা বসিয়া চিঠি লিখিতেছে। পায়ের শব্দে চোখ তুলিয়া ললিতা বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল। সেই তাহার ক্ষণকালের দৃষ্টিটুকু বিনয়ের সমস্ত চিত্তকে এক মুহূর্তে মথিত করিয়া তুলিল। বিনয়ের সঙ্গে তো ললিতার নূতন পরিচয় নয়— কতবার সে তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার দৃষ্টির মধ্যে কী রহস্য প্রকাশ হইল! সুচরিতা ললিতার একটি মনের কথা জানিয়াছে— সেই মনের কথাটি আজ ললিতার কালো চোখের পল্লবের ছায়ায় করুণায় ভরিয়া উঠিয়া একখানি সজল স্নিগ্ধ মেঘের মতো বিনয়ের চোখে দেখা দিল। বিনয়েরও এক মুহূর্তের চাহনিতে তাহার হৃদয়ের বেদনা বিদ্যুতের মতো ছুটিয়া গেল ; সে ললিতাকে নমস্কার করিয়া বিনা সম্ভাষণে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

৫৩

গোরা জেল হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, পরেশবাবু এবং বিনয় দ্বারের বাহিরে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

এক মাস কিছু দীর্ঘকাল নহে। এক মাসের চেয়ে বেশিদিন গোঁরা আত্মীয়বন্ধুদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু জেলের এক মাস বিচ্ছেদ হইতে বাহির হইয়াই সে যখন পরেশ ও বিনয়কে দেখিল তখন তাহার মনে হইল, যেন পুরাতন বান্ধবদের পরিচিত সংসারে সে

পুনর্জন্ম লাভ করিল। সেই রাজপথে খোলা আকাশের নীচে প্রভাতের আলোকে পরেশের শান্ত স্নেহপূর্ণ স্বভাবসৌম্য মুখ দেখিয়া সে যেমন ভক্তির আনন্দে তাঁহার পায়ের ধুলা লইল, এমন আর-কোনোদিন করে নাই। পরেশ তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন।

বিনয়ের হাত ধরিয়া গোরা হাসিয়া কহিল, "বিনয়, ইস্কুল থেকে আরম্ভ করে একসঙ্গেই তোমার সঙ্গে সমস্ত শিক্ষা লাভ করে এসেছি, কিন্তু এই বিদ্যালয়টাতে তোমার চেয়ে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে নিয়েছি।"

বিনয় হাসিতেও পারিল না, কোনো কথাও বলিতে পারিল না। জেলখানার দুঃখরহস্যের ভিতর দিয়া তাহার বন্ধু তাহার কাছে বন্ধুর চেয়ে আরও যেন অনেক বড়ো হইয়া বাহির হইয়াছে। গভীর সম্ভ্রমে সে চুপ করিয়া রহিল। গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছেন?"

বিনয় কহিল, "মা ভালোই আছেন।"

পরেশবাবু কহিলেন, "এসো, বাবা, তোমার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করে আছে।"

তিন জনে যখন গাড়িতে উঠিতে যাইবেন এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবিনাশ আসিয়া উপস্থিত। তাহার পিছনে ছেলের দল।

অবিনাশকে দেখিয়াই গোরা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কিন্তু তৎপূর্বেই সে আসিয়া পথরোধ করিয়া কহিল, "গৌর-মোহনবাবু, একটু দাঁড়ান।"

বলিতে বলিতেই ছেলেরা চীৎকার-শব্দে গান ধরিল—

দুখ-নিশীথিনী হল আজি ভোর।
কাটিল কাটিল অধীনতা-ডোর।

গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে তাহার বজ্রস্বরে গর্জন করিয়া কহিল, "চুপ করো।"

ছেলেরা বিস্মিত হইয়া চুপ করিল। গোরা কহিল, "অবিনাশ, এ-সমস্ত ব্যাপার কী!"

অবিনাশ তাহার শালের ভিতর হইতে কলাপাতায় মোড়া একটা কুন্দফুলের মোটা গোড়েমালা বাহির করিল এবং তাহার অনুবর্তী একটি অল্পবয়স্ক ছেলে একখানি সোনার জলে ছাপানো কাগজ হইতে মিহিস্বরে দম-দেওয়া আর্গিনের মতো দ্রুতবেগে কারামুক্তির অভিনন্দন পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

অবিনাশের মালা সবলে প্রত্যাখ্যান করিয়া গোরা অবরুদ্ধ ক্রোধের কণ্ঠে কহিল, "এখন বুঝি তোমাদের অভিনয় শুরু হল! আজ রাস্তার ধারে আমাকে তোমাদের যাত্রার দলে সঙ সাজাবার জন্যে বুঝি এই এক মাস ধরে মহলা দিচ্ছিলে?"

অনেক দিন হইতে অবিনাশ এই প্ল্যান করিয়াছিল; সে ভাবিয়াছিল, ভারি একটা তাক লাগাইয়া দিবে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এরূপ উপদ্রব প্রচলিত ছিল না। অবিনাশ বিনয়কেও মন্ত্রণার মধ্যে লয় নাই; এই অপূর্ব ব্যাপারের সমস্ত বাহাদুরি সে নিজেই লইবে বলিয়া লুব্ধ হইয়া ছিল। এমন-কি, খবরের কাগজের জন্য ইহার বিবরণ সে নিজেই লিখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; ফিরিয়া গিয়াই তাহার দুই-একটা ফাঁক পূরণ করিয়া পাঠাইয়া দিবে স্থির ছিল।

গোরার তিরস্কারে অবিনাশ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "আপনি অন্যায় বলছেন। আপনি কারাবাসে যে দুঃখ ভোগ করেছেন আমরা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম সহ্য করি নি। এই এক-মাস-কাল প্রতিমুহূর্ত তুষানলে আমাদের বক্ষের পঞ্জর দগ্ধ হয়েছে।"

গোরা কহিল, "ভুল করছ অবিনাশ— একটু তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে তুষগুলো এখনো সমস্তই গোটা আছে, বক্ষের পঞ্জরেও মারাত্মক-রকম লোকসান হয় নি।"

অবিনাশ দমিল না; কহিল, "রাজপুরুষ আপনার অপমান করেছে, কিন্তু, আজ সমস্ত ভারতভূমির মুখপাত্র হয়ে আমরা এই সম্মানের মাল্য—"

গোরা বলিয়া উঠিল, "আর তো সহ্য হয় না।"

অবিনাশ ও তাহার দলকে এক পাশে সরাইয়া দিয়া গোরা কহিল, "পরেশবাবু, গাড়িতে উঠুন।"

পরেশবাবু গাড়িতে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। গোরা ও বিনয় তাঁহার অনুসরণ করিল।

স্টিমারযোগে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে গোরা বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। দেখিল বাহির-বাড়িতে তাহার দলের বিস্তর লোক জটলা করিয়াছে। কোনোক্রমে তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লইয়া গোরা অন্তঃপুরে আনন্দময়ীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি আজ সকাল-সকাল স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিলেন। গোরা আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেই আনন্দময়ীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এতদিন যে অশ্রু তিনি অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন আজ আর কোনোমতেই তাহা বাধা মানিল না।

কৃষ্ণদয়াল গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতেই গোরা তাঁহার সহিত দেখা করিল। দূর হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পাদস্পর্শ করিল না। কৃষ্ণদয়াল সসংকোচে দূরে আসনে বসিলেন। গোরা কহিল, "বাবা, আমি একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।"

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "তার তো কোনো প্রয়োজন দেখি নে।"

গোরা কহিল, "জেলে আমি আর-কোনো কষ্ট গণ্যই করি নি, কেবল নিজেকে অত্যন্ত অশুচি বলে মনে হত; সেই গ্লানি এখনো আমার যায় নি, প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।"

কৃষ্ণদয়াল ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না না, তোমার অত বাড়াবাড়ি করতে হবে না। আমি তো ওতে মত দিতে পারছি নে।"

গোরা কহিল, "আচ্ছা, আমি নাহয় এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত নেব।"

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "কোনো পণ্ডিতের মত নিতে হবে না। আমি তোমাকে বিধান দিচ্ছি, তোমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই।"

কৃষ্ণদয়ালের মতো অমন আচারশুচিবায়ুগ্রস্ত লোক গোরার পক্ষে কোনো-

প্রকার নিয়মসংযম যে কেন স্বীকার করিতে চান না— শুধু স্বীকার করেন না তা নয়, একেবারে তাহার বিরুদ্ধে জেদ ধরিয়া বসেন, আজ পর্যন্ত গোরা তাহার কোনো অর্থই বুঝিতে পারে নাই।

আনন্দময়ী আজ ভোজনস্থলে গোরার পাশেই বিনয়ের পাত করিয়াছিলেন। গোরা কহিল, "মা, বিনয়ের আসনটা একটু তফাত করে দাও।"

আনন্দময়ী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "কেন, বিনয়ের অপরাধ কী হল।"

গোরা কহিল, "বিনয়ের কিছু হয় নি, আমারই হয়েছে। আমি অশুদ্ধ আছি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা হোক, বিনয় অত শুদ্ধাশুদ্ধ মানে না।"

গোরা কহিল, "বিনয় মানে না, আমি মানি।"

আহারের পর দুই বন্ধু যখন তাহাদের উপরের তলের নিভৃত ঘরে গিয়া বসিল তখন তাহারা কেহ কোনো কথা খুঁজিয়া পাইল না। এই এক মাসের মধ্যে বিনয়ের কাছে যে একটিমাত্র কথা সকলের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে সেটা আজ কেমন করিয়া যে গোরার কাছে পাড়িবে তাহা সে ভাবিয়াই পাইতেছিল না। পরেশবাবুর বাড়ির লোকদের সম্বন্ধে গোরার মনেও একটা জিজ্ঞাসা জাগিতেছিল, কিন্তু সে কিছুই বলিল না। বিনয় কথাটা পাড়িবে বলিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। অবশ্য বাড়ির মেয়েরা সকলে কেমন আছেন সে কথা গোরা পরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু সে তো কেবল ভদ্রতার প্রশ্ন। তাহারা সকলে ভালো আছে, এইটুকু খবরের চেয়েও আরও বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য তাহার মনের মধ্যে ঔৎসুক্য ছিল।

এমন সময় মহিম ঘরের মধ্যে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া সিঁড়ি উঠার শ্রমে কিছু ক্ষণ হাঁপাইয়া লইলেন। তাহার পরে কহিলেন, "বিনয়, এতদিন তো গোরার জন্যে অপেক্ষা করা গেল। এখন আর তো কোনো কথা নেই। এবার দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলা যাক।' কী বল, গোরা? বুঝেছ তো, কী কথাটা হচ্ছে?"

গোরা কোনো কথা না বলিয়া একটুখানি হাসিল।

মহিম কহিলেন, "হাসছ যে? তুমি ভাবছ, আজও দাদা সে কথাটা ভোলে নি। কিন্তু, কন্যাটি তো স্বপ্ন নয়— স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, সে একটি সত্য পদার্থ— ভোলবার জো কী। হাসি নয়, গোরা, এবারে যা হয় ঠিক করে ফেলো।"

গোরা কহিল, "ঠিক করবার কর্তা যিনি তিনি তো স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন।"

মহিম কহিলেন, "সর্বনাশ! ওঁর নিজের ঠিক নেই, উনি ঠিক করবেন! তুমি এসেছ, এখন তোমার উপরেই সমস্ত ভার।"

আজ বিনয় গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের ছলেও সে কোনো কথা বলিবার চেষ্টা করিল না।

গোরা বুঝিল, একটা গোল আছে; সে কহিল, "নিমন্ত্রণ করতে যাবার ভার নিতে পারি, মিঠাই ফরমাশ দেবারও ভার নেওয়া যায়, পরিবেষণ করতেও রাজি আছি, কিন্তু বিনয় যে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবেনই সে ভার আমি নিতে পারব না। যাঁর নির্বন্ধে সংসারে এই-সমস্ত কাজ হয় তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ চেনাশোনা নেই; বরাবর আমি তাঁকে দূরে থেকেই নমস্কার করেছি।"

মহিম কহিলেন, "তুমি দূরে থাকলেই যে তিনিও দূরে থাকেন তা মনেও কোরো না। হঠাৎ কবে চমক লাগাবেন কিছু বলা যায় না। তোমার সম্বন্ধে তাঁর মৎলব কী তা ঠিক বলতে পারছি নে, কিন্তু এঁর সম্বন্ধে ভারি গোল ঠেকছে। একলা প্রজাপতি-ঠাকুরের উপরেই সব বরাত না দিয়ে তুমি যদি নিজেও উদ্‌যোগী না হও তা হলে হয়তো অনুতাপ করতে হবে, এ আমি বলে রাখছি।"

গোরা কহিল, "যে ভার আমার নয় সে ভার না নিয়ে অনুতাপ করতে রাজি আছি, কিন্তু নিয়ে অনুতাপ করা আরও শক্ত। সেইটে থেকে রক্ষা পেতে চাই।"

মহিম কহিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলে জাত কুল মান সমস্ত খোওয়াবে, আর

তুমি বসে থেকে দেখবে ? দেশের লোকের হিঁদুয়ানি রক্ষার জন্যে তোমার আহারনিদ্রা বন্ধ, এ দিকে নিজের পরম বন্ধুই যদি জাত ভাসিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মর ঘরে বিয়ে করে বসে তা হলে মানুষের কাছে যে মুখ দেখাতে পারবে না। বিনয়, তুমি বোধ হয় রাগ করছ, কিন্তু ঢের লোক তোমার অসাক্ষাতেই এই-সব কথা গোরাকে বলত— তারা বলবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছে— আমি সামনেই বলে গেলুম— তাতে সকল পক্ষে ভালোই হবে। গুজবটা যদি মিথ্যাই হয় তা হলে সে কথা বললেই চুকে যাবে, যদি সত্যি হয় তা হলে বোঝাপড়া করে নাও।"

মহিম উঠিয়া চলিয়া গেলেন, বিনয় তখনো কোনো কথা কহিল না। গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "কী বিনয়, ব্যাপারটা কী ?"

বিনয় কহিল, "শুধু কেবল গোটাকতক খবর দিয়ে অবস্থাটা ঠিক বোঝানো ভারি শক্ত ; তাই মনে করেছিলুম, আস্তে আস্তে তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। কিন্তু, পৃথিবীতে আমাদের সুবিধামত ধীরেসুস্থে কিছুই ঘটতে চায় না ; ঘটনাগুলোও শিকারি বাঘের মতো প্রথমটা গুঁড়ি মেরে মেরে নিঃশব্দে চলে, তার পরে হঠাৎ এক সময় ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে এসে পড়ে ; আবার তার সংবাদও আগুনের মতো প্রথমটা চাপা থাকে, তার পরে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন তাকে আর সামলানো যায় না। সেইজন্যেই এক-এক সময় মনে হয়, কর্মমাত্রই ত্যাগ করে একেবারে স্থাণু হয়ে বসে থাকাই মানুষের পক্ষে মুক্তি।"

গোরা হাসিয়া কহিল, "তুমি একলা স্থাণু হয়ে বসে থাকলেই বা মুক্তি কোথায় ? সেই সঙ্গে জগৎসুদ্ধ যদি স্থাণু হয়ে না ওঠে তা হলে তোমাকে স্থির থাকতে দেবে কেন ? সে আরও উল্‌টো বিপদ হবে। জগৎ যখন কাজ করছে তখন তুমিও যদি কাজ না কর তা হলে যে কেবলই ঠকবে। সেইজন্যে এইটে দেখতে হবে, ঘটনা যেন তোমার সতর্কতাকে ডিঙিয়ে না যায়— এটা না হয় যে, আর-সমস্তই চলছে কেবল তুমিই প্রস্তুত নেই।"

বিনয় কহিল, "ওই কথাটাই ঠিক। আমিই প্রস্তুত থাকি নে।

এবারেও আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কোন্ দিক দিয়ে কী ঘটছে তা বুঝতেই পারি নি। কিন্তু, যখন ঘটে উঠল তখন তার দায়িত্ব তো গ্রহণ করতেই হবে। যেটা গোড়াতে না ঘটলেই ভালো ছিল সেটাকে আজ অপ্রিয় হলেও তো অস্বীকার করা যায় না।"

গোরা কহিল, "ঘটনাটা কী না জেনে সেটার সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।"

বিনয় খাড়া হইয়া বসিয়া বলিয়া ফেলিল, "অনিবার্য ঘটনাক্রমে ললিতার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, তাকে যদি আমি বিবাহ না করি তবে চিরজীবন সমাজে তাকে অন্যায় এবং অমূলক অপমান সহ্য করতে হবে।"

গোরা কহিল, "কী রকমটা দাঁড়িয়েছে শুনি।"

বিনয় কহিল, "সে অনেক কথা। সে ক্রমে তোমাকে বলব, কিন্তু ওটুকু তুমি মেনেই নাও।"

গোরা কহিল, "আচ্ছা, মেনেই নিচ্ছি। ও সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ঘটনা যদি অনিবার্য হয় তার দুঃখও অনিবার্য। সমাজে যদি ললিতাকে অপমান ভোগ করতেই হয় তো তার উপায় নেই।"

বিনয় কহিল, "কিন্তু, সেটা নিবারণ করা তো আমার হাতে আছে।"

গোরা কহিল, "যদি থাকে তো ভালোই। কিন্তু, গায়ের জোরে সে কথা বললে তো হবে না! অভাবে পড়লে চুরি করা, খুন করাও তো মানুষের হাতে আছে, কিন্তু সেটা কি সত্যি আছে? ললিতাকে বিবাহ করে তুমি ললিতার প্রতি কর্তব্য করতে চাও, কিন্তু সেইটেই কি তোমার চরম কর্তব্য? সমাজের প্রতি কর্তব্য নেই?"

সমাজের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করিয়াই বিনয় ব্রাহ্মবিবাহে সম্মত হয় নাই, সে কথা সে বলিল না; তাহার তর্ক চড়িয়া উঠিল। সে কহিল, "ওই জায়গায় তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার মিল হবে না। আমি তো ব্যক্তির দিকে টেনে সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলছি নে। আমি বলছি, ব্যক্তি এবং সমাজ

দুইয়ের উপরেই একটি ধর্ম আছে— সেইটের উপরে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। যেমন ব্যক্তিকে বাঁচানোই আমার চরম কর্তব্য নয় তেমনি সমাজকে বাঁচানোও আমার চরম কর্তব্য নয়, একমাত্র ধর্মকে বাঁচানোই আমার চরম শ্রেয়।"

গোরা কহিল, "ব্যক্তিও নেই, সমাজও নেই, অথচ ধর্ম আছে, এমন ধর্মকে আমি মানি নে।"

বিনয়ের রোখ চড়িয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি মানি। ব্যক্তি ও সমাজের ভিত্তির উপরে ধর্ম নয়, ধর্মের ভিত্তির উপরেই ব্যক্তি ও সমাজ। সমাজ যেটাকে চায় সেইটেকেই যদি ধর্ম বলে মানতে হয় তা হলে সমাজেরই মাথা খাওয়া হয়। সমাজ যদি আমার কোনো ন্যায়সংগত ধর্ম-সংগত স্বাধীনতায় বাধা দেয় তা হলে সেই অসংগত বাধা লঙ্ঘন করলেই সমাজের প্রতি কর্তব্য করা হয়। ললিতাকে বিবাহ করা যদি আমার অন্যায় না হয়, এমন-কি উচিত হয়, তবে সমাজ প্রতিকূল বলেই তার থেকে নিরস্ত হওয়া আমার পক্ষে অধর্ম হবে।"

গোরা কহিল, "ন্যায় অন্যায় কি একলা তোমার মধ্যেই বদ্ধ? এই বিবাহের দ্বারা তোমার ভাবী সন্তানদের তুমি কোথায় দাঁড় করাচ্ছ সে কথা ভাববে না?"

বিনয় কহিল, "সেই রকম করে ভাবতে গিয়েই তো মানুষ সামাজিক অন্যায়কে চিরস্থায়ী করে তোলে। সাহেব-মনিবের লাথি খেয়ে যে কেরানি অপমান চিরদিন বহন করে তাকে তুমি দোষ দাও কেন? সেও তো তার সন্তানদের কথাই ভাবে।"

গোরার সঙ্গে তর্কে বিনয় যে জায়গায় আসিয়া পৌঁছিল পূর্বে সেখানে সে ছিল না। একটু আগেই সমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনাতেই তাহার সমস্ত চিত্ত সংকুচিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সে নিজের সঙ্গে কোনোপ্রকার তর্কই করে নাই এবং গোরার সঙ্গে তর্ক যদি উঠিয়া না পড়িত তবে বিনয়ের মন আপন চিরন্তন সংস্কার অনুসারে উপস্থিত প্রবৃত্তির উল্‌টা দিকেই চলিত। কিন্তু, তর্ক করিতে করিতে তাহার প্রবৃত্তি কর্তব্যবুদ্ধিকে আপনার সহায়

করিয়া লইয়া প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

গোরার সঙ্গে খুব তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপ আলোচনায় গোরা প্রায়ই যুক্তিপ্রয়োগের দিকে যায় না, সে খুব জোরের সঙ্গে আপনার মত বলে। তেমন জোর অল্প লোকেরই দেখা যায়। এই জোরের দ্বারাই আজ সে বিনয়ের সব কথা ঠেলিয়া ভূমিসাৎ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আজ সে বাধা পাইতে লাগিল। যতদিন এক দিকে গোরা, আর-এক দিকে বিনয়ের মত মাত্র ছিল, ততদিন বিনয় হার মানিয়াছে— কিন্তু আজ দুই দিকেই দুই বাস্তব মানুষ; গোরা আজ বায়ুবাণের দ্বারা বায়ুবাণকে ঠেকাইতেছিল না, আজ বাণ যেখানে আসিয়া বাজিতেছিল সেখানে বেদনা-পূর্ণ মানুষের হৃদয়।

শেষকালে গোরা কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে চাই নে। এর মধ্যে তর্কের কথা বেশি কিছু নেই, এর মধ্যে হৃদয় দিয়ে একটি বোঝবার কথা আছে। ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করে তুমি দেশের সর্ব-সাধারণের সঙ্গে নিজেকে যে পৃথক করে ফেলতে চাও সেইটেই আমার কাছে অত্যন্ত বেদনার বিষয়। এ কাজ তুমি পারো, আমি কিছুতেই পারি নে— এই-খানেই তোমাতে আমাতে প্রভেদ— জ্ঞানে নয়, বুদ্ধিতে নয়। আমার প্রেম যেখানে তোমার প্রেম সেখানে নেই। তুমি যেখানে ছুরি মেরে নিজেকে মুক্ত করতে চাচ্ছ সেখানে তোমার দরদ কিছুই নেই। আমার সেখানে নাড়ীর টান। আমি আমার ভারতবর্ষকে চাই— তাকে তুমি যত দোষ দাও, যত গাল দাও, আমি তাকেই চাই; তার চেয়ে বড়ো করে আমি আপনাকে কিম্বা অন্য কোনো মানুষকেই চাই নে। আমি লেশমাত্র এমন কোনো কাজ করতে চাই নে যাতে আমার ভারতবর্ষের সঙ্গে চুলমাত্র বিচ্ছেদ ঘটে।"

বিনয় কী একটা উত্তর দিবার উপক্রম করিতেই গোরা কহিল, "না, বিনয়, তুমি বৃথা আমার সঙ্গে তর্ক করছ। সমস্ত পৃথিবী যে ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করেছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই— আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই

কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ। তুমি এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও তবে আমার সঙ্গেও ভিন্ন হবে।"

এই বলিয়া গোরা উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাতে বেড়াইতে লাগিল। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বেহারা আসিয়া গোরাকে খবর দিল অনেকগুলি বাবু তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। পলায়নের একটা উপলক্ষ পাইয়া গোরা আরাম বোধ করিল; সে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্যান্য নানা লোকের মধ্যে অবিনাশও আসিয়াছে। গোরা স্থির করিয়াছিল অবিনাশ রাগ করিয়াছে। কিন্তু, রাগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে আরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যে তাহার গতকল্যকার প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার সকলের কাছে বর্ণনা করিতেছিল। সে কহিল, "গৌরমোহনবাবুর প্রতি আমার ভক্তি অনেক বেড়ে গেছে; এতদিন আমি জানতুম উনি অসামান্য লোক, কিন্তু কাল জানতে পেরেছি উনি মহাপুরুষ। আমরা কাল ওঁকে সম্মান দেখাতে গিয়েছিলুম; উনি যেরকম প্রকাশ্যভাবে সেই সম্মানকে উপেক্ষা করলেন সেরকম আজকালকার দিনে কজন লোক পারে! এ কি সাধারণ কথা!"

একে গোরার মন বিকল হইয়া ছিল, তাহার উপরে অবিনাশের এই উচ্ছ্বাসে তাহার গা জ্বলিতে লাগিল; সে অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, "দেখো, অবিনাশ, তোমরা ভক্তির দ্বারাই মানুষকে অপমান কর— রাস্তার ধারে আমাকে নিয়ে তোমরা সঙের নাচন নাচাতে চাও, সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারি এতটুকু লজ্জাশরম তোমরা আমার কাছে প্রত্যাশা কর না! একেই তোমরা বল মহাপুরুষের লক্ষণ! আমাদের এই দেশটাকে কি তোমরা কেবলমাত্র একটা যাত্রার দল বলে ঠিক করে রেখেছ? সকলেই প্যালা নেবার জন্যে কেবল নেচে বেড়াচ্ছে! কেউ এতটুকু সত্য কাজ করছে না! সঙ্গে যোগ দিতে চাও ভালো, ঝগড়া করতে চাও সেও ভালো, কিন্তু দোহাই তোমাদের, অমন করে বাহবা দিয়ো না।"

অবিনাশের ভক্তি আরও চড়িতে লাগিল। সে সহাস্যমুখে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া গোরার বাক্যগুলির চমৎকারিতার প্রতি সকলের মন আকর্ষণ করিবার ভাব দেখাইল। কহিল, "আশীর্বাদ করুন, আপনার মতো ওইরকম নিষ্কামভাবে ভারতবর্ষের সনাতন গৌরব রক্ষার জন্যে আমরা জীবন সমর্পণ করতে পারি।"

এই বলিয়া পায়ের ধুলা লইবার জন্য অবিনাশ হস্ত প্রসারণ করিতেই গোরা সরিয়া গেল।

অবিনাশ কহিল, "গৌরমোহনবাবু, আপনি তো আমাদের কাছ থেকে কোনো সম্মান নেবেন না। কিন্তু, আমাদের আনন্দ দিতে বিমুখ হলেও চলবে না। আপনাকে নিয়ে একদিন আমরা সকলে মিলে আহার করব, এই আমরা পরামর্শ করেছি— এটিতে আপনাকে সম্মতি দিতেই হবে।"

গোরা কহিল, "আমি প্রায়শ্চিত্ত না করে তোমাদের সকলের সঙ্গে খেতে বসতে পারব না।"

প্রায়শ্চিত্ত! অবিনাশের দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "এ কথা আমাদের কারও মনেও উদয় হয় নি, কিন্তু হিন্দুধর্মের কোনো বিধান গৌরমোহনবাবুকে কিছুতে এড়াতে পারবে না।"

সকলে কহিল, তা বেশ কথা। প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষেই সকলে একত্রে আহার করা যাইবে। সেদিন দেশের বড়ো বড়ো অধ্যাপক-পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে; হিন্দুধর্ম যে আজও কিরূপ সজীব আছে তাহা গৌরমোহনবাবুর এই প্রায়শ্চিত্তের নিমন্ত্রণে প্রচার হইবে।

প্রায়শ্চিত্তসভা কবে কোথায় আহূত হইবে সে প্রশ্নও উঠিল। গোরা কহিল, এ বাড়িতে সুবিধা হইবে না। একজন ভক্ত তাহার গঙ্গার ধারের বাগানে এই ক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রস্তাব করিল। ইহার খরচও দলের লোকে সকলে মিলিয়া বহন করিবে স্থির হইয়া গেল।

বিদায়গ্রহণের সময় অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতার ছাঁদে হাত নাড়িয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "গৌরমোহনবাবু বিরক্ত হতে পারেন,

কিন্তু আজ আমার হৃদয় যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন এ কথা না বলেও আমি থাকতে পারছি নে, বেদ-উদ্ধারের জন্য আমাদের এই পুণ্যভূমিতে অবতার জন্মগ্রহণ করেছিলেন— তেমনি হিন্দুধর্মকে উদ্ধার করবার জন্যেই আজ আমরা এই অবতারকে পেয়েছি। পৃথিবীতে কেবল আমাদের দেশেই ষড়্‌ঋতু আছে, আমাদের এই দেশেই কালে কালে অবতার জন্মেছেন এবং আরও জন্মাবেন। আমরা ধন্য যে সেই সত্য আমাদের কাছে প্রমাণ হয়ে গেল। বলো ভাই, গৌরমোহনের জয়!"

অবিনাশের বাগ্মিতায় বিচলিত হইয়া সকলে মিলিয়া গৌরমোহনের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। গোরা মর্মান্তিক পীড়া পাইয়া সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

আজ জেলখানা হইতে মুক্তির দিনে প্রবল একটা অবসাদ গোরার মনকে আক্রমণ করিল। নূতন উৎসাহে দেশের জন্য কাজ করিবে বলিয়া গোরা জেলের অবরোধে অনেক দিন কল্পনা করিয়াছে। আজ সে নিজেকে কেবল এই প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'হায়, আমার দেশ কোথায়! দেশ কি কেবল আমার একলার কাছে! আমার জীবনের সমস্ত সংকল্প যাহার সঙ্গে আলোচনা করিলাম সেই আমার আশৈশবের বন্ধু আজ এতদিন পরে কেবল একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার উপলক্ষে তাহার দেশের সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে এক মুহূর্তে এমন নির্মমভাবে পৃথক হইতে প্রস্তুত হইল। আর, যাহাদিগকে সকলে আমার দলের লোক বলে, এতদিন তাহাদিগকে এত বুঝানোর পরও তাহারা আজ এই স্থির করিল যে, আমি কেবল হিঁদুয়ানি উদ্ধার করিবার জন্য অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি কেবল মূর্তিমান শাস্ত্রের বচন! আর, ভারতবর্ষ কোনোখানেই স্থান পাইল না! ষড়্‌ঋতু! ভারতবর্ষে ষড়্‌ঋতু আছে! সেই ষড়্‌ঋতুর ষড়যন্ত্রে যদি অবিনাশের মতো এমন ফল ফলিয়া থাকে তবে দুই-চারিটা ঋতু কম থাকিলে ক্ষতি ছিল না।'

বেহারা আসিয়া খবর দিল, মা গোরাকে ডাকিতেছেন। গোরা যেন

হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, 'মা ডাকিতেছেন।' এই খবরটাকে সে যেন একটা নূতন অর্থ দিয়া শুনিল। সে কহিল, 'আর যাই হউক, আমার মা আছেন। এবং তিনিই আমাকে ডাকিতেছেন। তিনিই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলাইয়া দিবেন; কাহারও সঙ্গে তিনি কোনো বিচ্ছেদ রাখিবেন না; আমি দেখিব যাহারা আমার আপন তাহারা তাঁহার ঘরে বসিয়া আছে। জেলের মধ্যে মা আমাকে ডাকিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার দেখা পাইয়াছি; জেলের বাহিরেও মা আমাকে ডাকিতেছেন, সেখানে আমি তাঁহাকে দেখিতে যাত্রা করিলাম।' এই বলিয়া গোরা সেই শীতমধ্যাহ্নের আকাশের দিকে বাহিরে চাহিয়া দেখিল। এক দিকে বিনয় ও আর-এক দিকে অবিনাশের তরফ হইতে যে বিরোধের সুর উঠিয়াছিল তাহা যৎসামান্য হইয়া কাটিয়া গেল। এই মধ্যাহ্নসূর্যের আলোকে ভারতবর্ষ যেন তাহার বাহু উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। তাহার আসমুদ্রবিস্তৃত নদী পর্বত লোকালয় গোরার চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল; অন্তরের দিক হইতে একটি মুক্ত নির্মল আলোক আসিয়া এই ভারতবর্ষকে সর্বত্র যেন জ্যোতির্ময় করিয়া দেখাইল। গোরার বক্ষ ভরিয়া উঠিল, তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে লাগিল, তাহার মনের কোথাও লেশমাত্র নৈরাশ্য রহিল না; ভারতবর্ষের যে কাজ অন্তহীন, যে কাজের ফল বহুদূরে, তাহার জন্য তাহার প্রকৃতি আনন্দের সহিত প্রস্তুত হইল; ভারতবর্ষের যে মহিমা সে ধ্যানে দেখিয়াছে তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া তাহার কিছুমাত্র ক্ষোভ রহিল না। সে মনে মনে বার বার করিয়া বলিল, 'মা আমাকে ডাকিতেছেন— চলিলাম যেখানে অন্নপূর্ণা, যেখানে জগদ্ধাত্রী বসিয়া আছেন, সেই সুদূর কালেই অথচ এই নিমেষেই, সেই মৃত্যুর পরপ্রান্তেই অথচ এই জীবনের মধ্যেই—সেই যে মহামহিমান্বিত ভবিষ্যৎ আজ আমার এই দীনহীন বর্তমানকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে— আমি চলিলাম সেইখানেই—সেই অতি-দূরে সেই অতিনিকটে মা আমাকে ডাকিতেছেন।' এই আনন্দের মধ্যে গোরা যেন বিনয় এবং অবিনাশেরও সঙ্গ পাইল— তাহারাও তাহার পর হইয়া

রহিল না— অন্তকার সমস্ত ছোটো বিরোধগুলি একটা প্রকাণ্ড চরিতার্থতায় কোথায় মিলাইয়া গেল।

গোরা যখন আনন্দময়ীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন তাহার মুখ আনন্দের আভায় দীপ্যমান, তখন তাহার চক্ষু যেন সম্মুখস্থিত সমস্ত পদার্থের পশ্চাতে আর-একটি কোন্ অপরূপ মূর্তি দেখিতেছে। প্রথমেই হঠাৎ আসিয়া সে যেন ভালো করিয়া চিনিতে পারিল না, ঘরে তার মার কাছে কে বসিয়া আছে।

সুচরিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গোরাকে নমস্কার করিল। গোরা কহিল, "এই-যে আপনি এসেছেন, বসুন।"

গোরা এমন করিয়া বলিল 'আপনি এসেছেন,' যেন সুচরিতার আসা একটা সাধারণ ঘটনার মধ্যে নয়, এ যেন একটা বিশেষ আবির্ভাব।

একদিন সুচরিতার সংস্রব হইতে গোরা পলায়ন করিয়াছিল। যতদিন পর্যন্ত সে নানা কষ্ট এবং কাজ লইয়া ভ্রমণ করিতেছিল ততদিন সুচরিতার কথা মন থেকে অনেকটা দূরে রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু জেলের অবরোধের মধ্যে সুচরিতার স্মৃতিকে সে কোনোমতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। এমন এক দিন ছিল যখন ভারতবর্ষে যে স্ত্রীলোক আছে সে কথা গোরার মনে উদয়ই হয় নাই। এই সত্যটি এতকাল পরে সে সুচরিতার মধ্যে নূতন আবিষ্কার করিল; একেবারে এক মুহূর্তে এতবড়ো একটা পুরাতন এবং প্রকাণ্ড কথাকে হঠাৎ গ্রহণ করিয়া তাহার সমগ্র বলিষ্ঠ প্রকৃতি ইহার আঘাতে কম্পিত হইয়া উঠিল। জেলের মধ্যে বাহিরের সূর্যালোক এবং মুক্ত বাতাসের জগৎ যখন তাহার মনের মধ্যে বেদনা সঞ্চার করিত তখন সেই জগৎটিকে কেবল সে নিজের কর্মক্ষেত্র এবং কেবল সেটাকে পুরুষসমাজ বলিয়া দেখিত না— যেমন করিয়াই সে ধ্যান করিত বাহিরের এই সুন্দর জগৎ-সংসারে সে কেবল দুটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখ দেখিতে পাইত, সূর্যচন্দ্রতারার আলোক বিশেষ করিয়া তাহাদেরই মুখের উপর পড়িত, স্নিগ্ধ নীলিমামণ্ডিত আকাশ তাহাদেরই মুখকে বেষ্টন করিয়া থাকিত— একটি মুখ তাহার আজন্ম-

পরিচিত মাতার, বুদ্ধিতে উদ্‌ভাসিত আর-একটি নম্র স্নুন্দর মুখের সঙ্গে তাহার নূতন পরিচয়।

জেলের নিরানন্দ সংকীর্ণতার মধ্যে গোরা এই মুখের স্মৃতির সঙ্গে বিরোধ করিতে পারে নাই। এই ধ্যানের পুলকটুকু তাহার জেলখানার মধ্যে একটি গভীরতর মুক্তিকে আনিয়া দিত। জেলখানার কঠিন স্থূল বন্ধন তাহার কাছে যেন ছায়াময় মিথ্যা স্বপ্নের মতো হইয়া যাইত। তাহার স্পন্দিত হৃদয়ের অতীন্দ্রিয় তরঙ্গগুলি জেলের সমস্ত প্রাচীর অবাধে ভেদ করিয়া, আকাশে মিশিয়া, সেখানকার পুষ্পপল্লবে হিল্লোলিত এবং সংসার-কর্মক্ষেত্রে লীলায়িত হইতে থাকিত।

গোরা মনে করিয়াছিল, কল্পনামূর্তিকে ভয় করিবার কোনো কারণ নাই। এইজন্য এই এক-মাস-কাল ইহাকে একেবারেই সে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। গোরা জানিত, ভয় করিবার বিষয় কেবলমাত্র বাস্তব পদার্থ।

জেল হইতে বাহির হইবা মাত্র গোরা যখন পরেশবাবুকে দেখিল তখন তাহার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে কেবল পরেশবাবুকে দেখার আনন্দ তাহা নহে, তাহার সঙ্গে গোরার এই কয়দিনের সঙ্গিনী কল্পনাও যে কতটা নিজের মায়া মিশ্রিত করিয়াছিল তাহা প্রথমটা গোরা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু, ক্রমেই বুঝিল। স্টিমারে আসিতে আসিতে সে স্পষ্টই অনুভব করিল, পরেশবাবু যে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন সে কেবল তাঁহার নিজগুণে নহে।

এতদিন পরে গোরা আবার কোমর বাঁধিল। বলিল, 'হার মানিব না।' স্টিমারে বসিয়া বসিয়া, আবার দূরে যাইবে, কোনো প্রকার সূক্ষ্ম বন্ধনেও সে নিজের মনকে বাঁধিতে দিবে না, এই সংকল্প মনে আঁটিল।

এমন সময় বিনয়ের সঙ্গে তাহার তর্ক বাধিয়া গেল। বিচ্ছেদের পর বন্ধুর সঙ্গে এই প্রথম মিলনেই তর্ক এমন প্রবল হইত না। কিন্তু, আজ এই তর্কের মধ্যে তাহার নিজের সঙ্গেও তর্ক ছিল। এই তর্ক-উপলক্ষে নিজের প্রতিষ্ঠাভূমিকে গোরা নিজের কাছেও স্পষ্ট করিয়া লইতেছিল। এইজন্যই

গোরা আজ এত বিশেষ জোর দিয়া কথা বলিতেছিল, সেই জোরটুকুতে তার নিজেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যখন তাহার আজিকার এই জোর বিনয়ের মনে বিরুদ্ধ জোরকেই উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিল, যখন সে মনে মনে গোরার কথাকে কেবলই খণ্ডন করিতেছিল এবং গোরার নির্বন্ধকে অন্যায় গোঁড়ামি বলিয়া যখন তাহার সমস্ত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, তখন বিনয় কল্পনাও করে নাই যে, গোরা নিজেকেই যদি আঘাত না করিত তবে আজ তাহার আঘাত হয়তো এত প্রবল হইত না।

বিনয়ের সঙ্গে তর্কের পর গোরা ঠিক করিল, 'যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে গেলে চলিবে না। আমি যদি নিজের প্রাণের ভয়ে বিনয়কে ফেলিয়া যাই, তবে বিনয় রক্ষা পাইবে না।'

৫৪

গোরার মন তখন ভাবে আবিষ্ট ছিল— সুচরিতাকে সে তখন একটি ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া দেখিতেছিল না, তাহাকে একটি ভাব বলিয়া দেখিতেছিল। ভারতের নারীপ্রকৃতি সুচরিতা-মূর্তিতে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। ভারতে গৃহকে পুণ্যে সৌন্দর্যে ও প্রেমে মধুর ও পবিত্র করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। যে লক্ষ্মী ভারতের শিশুকে মানুষ করেন, রোগীকে সেবা করেন, তাপীকে সান্ত্বনা দেন, তুচ্ছকেও প্রেমের গৌরবে প্রতিষ্ঠাদান করেন— যিনি দুঃখে দুর্গতিতেও আমাদের দীনতমকে ত্যাগ করেন নাই, অবজ্ঞা করেন নাই— যিনি আমাদের পূজার্হ হইয়াও আমাদের অযোগ্যতমকেও একমনে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহার নিপুণ সুন্দর হাত-দুইখানি আমাদের কাজে উৎসর্গ করা এবং যাঁহার চিরসহিষ্ণু ক্ষমাপূর্ণ প্রেম অক্ষয় দানরূপে আমরা ঈশ্বরের কাছ হইতে লাভ করিয়াছি, সেই লক্ষ্মীরই একটি প্রকাশকে গোরা তাহার মাতার পার্শ্বে প্রত্যক্ষ আসীন দেখিয়া গভীর আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই লক্ষ্মীর দিকে

আমরা তাকাই নাই, ইঁহাকেই আমরা সকলের পিছনে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলাম, আমাদের এমন দুর্গতির লক্ষণ আর-কিছুই নাই। গোরার তখন মনে হইল, দেশ বলিতেই ইনি, সমস্ত ভারতের মর্মস্থানে প্রাণের নিকেতনে শতদল পদ্মের উপর ইনি বসিয়া আছেন, আমরাই ইঁহার সেবক। দেশের দুর্গতিতে ইঁহারই অবমাননা— সেই অবমাননায় উদাসীন আছি বলিয়াই আমাদের পৌরুষ আজ লজ্জিত।

গোরা নিজের মনে নিজে আশ্চর্য হইয়া গেছে। যতদিন ভারতবর্ষের নারী তাহার অনুভবগোচর ছিল না ততদিন ভারতবর্ষকে সে যে কিরূপ অসম্পূর্ণ করিয়া উপলব্ধি করিতেছিল ইতিপূর্বে তাহা সে জানিতই না। গোরার কাছে নারী যখন অত্যন্ত ছায়াময় ছিল তখন দেশ সম্বন্ধে তাহার যে কর্তব্যবোধ ছিল তাহাতে কী একটা অভাব ছিল। যেন শক্তি ছিল কিন্তু তাহাতে প্রাণ ছিল না, যেন পেশী ছিল কিন্তু স্নায়ু ছিল না। গোরা এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিল যে, নারীকে যতই আমরা দূর করিয়া, ক্ষুদ্র করিয়া জানিয়াছি, আমাদের পৌরুষও ততই শীর্ণ হইয়া মরিয়াছে।

তাই গোরা যখন সুচরিতাকে কহিল 'আপনি এসেছেন', তখন সেটা কেবল একটা প্রচলিত শিষ্টসম্ভাষণরূপে তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই— তাহার জীবনের একটি নূতনলব্ধ আনন্দ ও বিস্ময় এই অভিবাদনের মধ্যে পূর্ণ হইয়া ছিল।

.কারাবাসের কিছু কিছু চিহ্ন গোরার শরীরে ছিল। পূর্বের চেয়ে সে অনেকটা রোগা হইয়া গেছে। জেলের অন্নে তাহার অশ্রদ্ধা ও অরুচি থাকাতে এই এক-মাস-কাল সে প্রায় উপবাস করিয়া ছিল। তাহার উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণও পূর্বের চেয়ে কিছু ম্লান হইয়াছে। তাহার চুল অত্যন্ত ছোটো করিয়া ছাঁটা হওয়াতে মুখের কৃশতা আরও বেশি করিয়া দেখা যাইতেছে।

গোরার দেহের এই শীর্ণতাই সুচরিতার মনে বিশেষ করিয়া একটি বেদনাপূর্ণ সম্ভ্রম জাগাইয়া দিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রণাম করিয়া গোরার পায়ের ধুলা গ্রহণ করে। যে উদ্দীপ্ত আগুনের ধোঁওয়া এবং

কাঠ আর দেখা যায় না, গোরা সেই বিশুদ্ধ অগ্নিশিখাটির মতো তাহার কাছে প্রকাশ পাইল। একটি করুণামিশ্রিত ভক্তির আবেগে সুচরিতার বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না।

আনন্দময়ী কহিলেন, "আমার মেয়ে থাকলে যে কী সুখ হত এবার তা বুঝতে পেরেছি গোরা। তুই যে কটা দিন ছিলি নে, সুচরিতা যে আমাকে কত সান্ত্বনা দিয়েছে সে আর আমি কী বলব। আমার সঙ্গে তো এঁদের পূর্বে পরিচয় ছিল না— কিন্তু দুঃখের সময় পৃথিবীর অনেক বড়ো জিনিস, অনেক ভালো জিনিসের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, দুঃখের এই একটি গৌরব এবার বুঝেছি। দুঃখের সান্ত্বনা যে ঈশ্বর কোথায় কত জায়গায় রেখেছেন তা সব সময় জানতে পারি নে বলেই আমরা কষ্ট পাই। মা, তুমি লজ্জা করছ, কিন্তু তুমি আমার দুঃসময়ে আমাকে কত সুখ দিয়েছ সে কথা আমি তোমার সামনে না বলেই বা বাঁচি কী করে।"

গোরা গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে সুচরিতার লজ্জিত মুখের দিকে একবার চাহিয়া আনন্দময়ীকে কহিল, "মা, তোমার দুঃখের দিনে উনি তোমার দুঃখের ভাগ নিতে এসেছিলেন, আবার আজ তোমার সুখের দিনেও তোমার সুখকে বাড়াবার জন্যে এসেছেন— হৃদয় যাঁদের বড়ো তাঁদেরই এইরকম অকারণ সৌহৃদ্য।"

বিনয় সুচরিতার সংকোচ দেখিয়া কহিল, "দিদি, চোর ধরা পড়ে গেলে চতুর্দিক থেকে শাস্তি পায়। আজ তুমি এঁদের সকলের কাছেই ধরা পড়ে গেছ, তারই ফল ভোগ করছ। এখন পালাবে কোথায়! আমি তোমাকে অনেক দিন থেকেই চিনি। কিন্তু কারও কাছে কিছু ফাঁস করি নি, চুপ করে বসে আছি— মনে মনে জানি বেশিদিন কিছুই চাপা থাকে না।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "তুমি চুপ করে আছ বৈকি। তুমি চুপ করে থাকবার ছেলে কিনা। যেদিন থেকে ও তোমাদের জেনেছে সেইদিন থেকে তোমাদের গুণগান করে করে ওর আর আশ কিছুতেই মিটছে না।"

বিনয় কহিল, "শুনে রাখো দিদি। আমি যে গুণগ্রাহী এবং আমি যে

অকৃতজ্ঞ নই, তার সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির।"

সুচরিতা কহিল, "ওতে কেবল আপনারই গুণের পরিচয় দিচ্ছেন।"

বিনয় কহিল, "আমার গুণের পরিচয় কিন্তু আমার কাছে কিছু পাবেন না। পেতে চান তো মার কাছে আসবেন, স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, ওঁর মুখে যখন শুনি আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। মা যদি আমার জীবনচরিত লেখেন তা হলে আমি সকাল-সকাল মরতে রাজি আছি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "শুনছ একবার ছেলের কথা!"

গোরা কহিল, "বিনয়, তোমার বাপ-মা সার্থক তোমার নাম রেখেছিলেন।"

বিনয় কহিল, "আমার কাছে বোধ হয় তাঁরা আর-কোনো গুণ প্রত্যাশা করেন নি বলেই বিনয় গুণটির জন্যে দোহাই পেড়ে গিয়েছেন, নইলে সংসারে হাস্যাস্পদ হতে হত।"

এমনি করিয়া প্রথম আলাপের সংকোচ কাটিয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় সুচরিতা বিনয়কে বলিল, "আপনি একবার আমাদের ও দিকে যাবেন না?"

সুচরিতা বিনয়কে যাইতে বলিল, গোরাকে বলিতে পারিল না। গোরা তাহার ঠিক অর্থটা বুঝিল না, তাহার মনের মধ্যে একটা আঘাত বাজিল। বিনয় যে সহজেই সকলের মাঝখানে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারে আর গোরা তাহা পারে না, এজন্য গোরা ইতিপূর্বে কোনোদিন কিছুমাত্র খেদ অনুভব করে নাই— আজ নিজের প্রকৃতির এই অভাবকে অভাব বলিয়া বুঝিল।

৫৫

ললিতার সঙ্গে তাহার বিবাহপ্রসঙ্গ আলোচনা করিবার জন্যই যে সুচরিতা বিনয়কে ডাকিয়া গেল, বিনয় তাহা বুঝিয়াছিল। এই প্রস্তাবটিকে সে শেষ

করিয়া দিয়াছে বলিয়াই তো ব্যাপারটা শেষ হইয়া যায় নাই। তাহার যত ক্ষণ আয়ু আছে তত ক্ষণ কোনো পক্ষের নিষ্কৃতি থাকিতে পারে না।

এতদিন বিনয়ের সকলের চেয়ে বড়ো ভাবনা ছিল, 'গোরাকে আঘাত দিব কী করিয়া।' গোরা বলিতে শুধু যে গোরা মানুষটি তাহা নহে; গোরা যে ভাব, যে বিশ্বাস, যে জীবনকে আশ্রয় করিয়া আছে সেটাও বটে। ইহারই সঙ্গে বরাবর নিজেকে মিলাইয়া চলাই বিনয়ের অভ্যাসের এবং আনন্দের বিষয় ছিল; ইহার সঙ্গে কোনোপ্রকার বিরোধ যেন তাহার নিজেরই সঙ্গে বিরোধ।

কিন্তু, সেই আঘাতের প্রথম সংকোচটা কাটিয়া গেছে। ললিতার প্রসঙ্গ লইয়া গোরার সঙ্গে একটা স্পষ্ট কথা হইয়া যাওয়াতে বিনয় জোর পাইল। ফোড়া কাটাইবার পূর্বে রোগীর ভয় ও ভাবনার অবধি ছিল না; কিন্তু অস্ত্র যখন পড়িল তখন রোগী দেখিল বেদনা আছে বটে কিন্তু আরামও আছে এবং জিনিসটাকে কল্পনায় যত সাংঘাতিক বলিয়া মনে হইয়াছিল ততটাও নহে।

এত ক্ষণ বিনয় নিজের মনের সঙ্গে তর্কও করিতে পারিতেছিল না, এখন তাহার তর্কের দ্বারও খুলিয়া গেল। এখন মনে মনে গোরার সঙ্গে তাহার উত্তরপ্রত্যুত্তর চলিতে লাগিল। গোরার দিক হইতে যে-সকল যুক্তিপ্রয়োগ সম্ভব সেইগুলি মনের মধ্যে উত্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে নানা দিক হইতে খণ্ডন করিতে লাগিল। যদি গোরার সঙ্গে মুখে মুখে সমস্ত তর্ক চলিতে পারিত তাহা হইলে উত্তেজনা যেমন জাগিত তেমনি নিবৃত্তি হইয়াও যাইত; কিন্তু, বিনয় দেখিল, এ বিষয়ে গোরা শেষ পর্যন্ত তর্ক করিবে না। ইহাতেও বিনয়ের মনে একটা উত্তাপ জাগিল; সে ভাবিল, 'গোরা বুঝিবে না, বুঝাইবে না, কেবলই জোর করিবে। জোর! জোরের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারিব না।' বিনয় কহিল, 'যাহাই ঘটুক, আমি সত্যের পক্ষে।' এই বলিয়া 'সত্য' বলিয়া একটি শব্দকে দুই হাতে সে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিল। গোরার প্রতিকূলে একটি খুব প্রবল পক্ষকে দাঁড় করানো দরকার;

এইজন্য, সত্যই যে বিনয়ের চরম অবলম্বন ইহাই সে বার বার করিয়া নিজের মনকে বলিতে লাগিল। এমন-কি, সত্যকেই সে যে আশ্রয় করিতে পারিয়াছে ইহাই মনে করিয়া নিজের প্রতি তাহার ভারি একটা শ্রদ্ধা জন্মিল। এইজন্য বিনয় অপরাহ্ণে সুচরিতার বাড়ির দিকে যখন গেল তখন বেশ একটু মাথা তুলিয়া গেল। সত্যের দিকেই ঝুঁকিয়াছে বলিয়া তাহার এত জোর না ঝোঁকটা আর-কিছুর দিকে, সে কথা বিনয়ের বুঝিবার অবস্থা ছিল না।

হরিমোহিনী তখন রন্ধনের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন। বিনয় সেখানে রন্ধনশালার দ্বারে ব্রাহ্মণতনয়ের মধ্যাহ্নভোজনের দাবি মঞ্জুর করাইয়া উপরে চলিয়া গেল।

সুচরিতা একটা সেলাইয়ের কাজ লইয়া সেই দিকে চোখ নামাইয়া অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে আলোচ্য কথাটা পাড়িল। কহিল, "দেখুন, বিনয়বাবু, ভিতরকার বাধা যেখানে নেই সেখানে বাইরের প্রতিকূলতাকে কি মেনে চলতে হবে?"

গোরার সঙ্গে যখন তর্ক হইয়াছিল তখন বিনয় বিরুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। আবার সুচরিতার সঙ্গে যখন আলোচনা হইতে লাগিল তখনও সে উল্‌টা পক্ষের যুক্তি প্রয়োগ করিল। তখন গোরার সঙ্গে তাহার যে কোনো মতবিরোধ আছে এমন কথা কে মনে করিতে পারিবে।

বিনয় কহিল, "দিদি, বাইরের বাধাকে তোমরাও তো খাটো করে দেখছ না।"

সুচরিতা কহিল, "তার কারণ আছে বিনয়বাবু। আমাদের বাধাটা ঠিক বাইরের বাধা নয়। আমাদের সমাজ যে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, আপনি যে সমাজে আছেন সেখানে আপনার বন্ধন কেবলমাত্র সামাজিক বন্ধন। এইজন্যে যদি ললিতাকে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে যেতে হয় তার সেটাতে যত গুরুতর ক্ষতি, আপনার সমাজত্যাগে আপনার ততটা ক্ষতি নয়।"

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত সাধনার জিনিস, তাহাকে কোনো সমাজের সঙ্গে

জড়িত করা উচিত নহে, এই বলিয়া বিনয় তর্ক করিতে লাগিল।

এমন সময় সতীশ একখানি চিঠি ও একটি ইংরাজি কাগজ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বিনয়কে দেখিয়া সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল; শুক্রবারকে কোনো উপায়ে রবিবার করিয়া তুলিবার জন্য তাহার মন ব্যস্ত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিনয়ে এবং সতীশে মিলিয়া সভা জমিয়া গেল। এ দিকে ললিতার চিঠি এবং তৎসহ প্রেরিত কাগজখানি সুচরিতা পড়িতে লাগিল।

এই ব্রাহ্ম কাগজটিতে একটি খবর ছিল যে, কোনো বিখ্যাত ব্রাহ্মপরিবারে হিন্দুসমাজের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটিবার যে আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা হিন্দু-যুবকের অসম্মতি-বশত কাটিয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে উক্ত হিন্দুযুবকের নিষ্ঠার সহিত তুলনা করিয়া ব্রাহ্মপরিবারের শোচনীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করা হইয়াছে।

সুচরিতা মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক বিনয়ের সহিত ললিতার বিবাহ ঘটাইতেই হইবে। কিন্তু সে তো এই যুবকের সঙ্গে তর্ক করিয়া হইবে না। ললিতাকে সুচরিতা তাহার বাড়িতে আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিল; তাহাতে বলিল না যে, বিনয় এখানে আছে।

কোনো পঞ্জিকাতেই কোনো গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশে শুক্রবারে রবিবার পড়িবার ব্যবস্থা না থাকায় সতীশকে ইস্কুলে যাইতে প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিতে হইল। সুচরিতাও স্নান করিতে যাইতে হইবে বলিয়া কিছু ক্ষণের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল।

তর্কের উত্তেজনা যখন কাটিয়া গেল তখন সুচরিতার সেই একলা ঘরটিতে বসিয়া বিনয়ের ভিতরকার যুবাপুরুষটি জাগিয়া উঠিল। বেলা তখন নয়টা— সাড়ে-নয়টা। গলির ভিতরে জনকোলাহল নাই। সুচরিতার লিখিবার টেবিলের উপর একটি ছোটো ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিয়া চলিতেছে। ঘরের একটি প্রভাব বিনয়কে আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল। চারি দিকের ছোটোখাটো গৃহসজ্জাগুলি বিনয়ের সঙ্গে যেন আলাপ জুড়িয়া দিল।

টেবিলের উপরকার পারিপাট্য, সেলাইয়ের কাজ-করা চৌকি-ঢাকাটি, চৌকির নীচে পাদস্থানের কাছে বিছানো একটা হরিণের চামড়া, দেয়ালে ঝোলানো দুটি-চারটি ছবি, পশ্চাতে লাল সালু দিয়া মোড়া বই-সাজানো বইয়ের ছোটো শেল্‌ফ্‌টি, সমস্তই বিনয়ের চিত্তের মধ্যে একটি গভীরতর সুর বাজাইয়া তুলিতে লাগিল। এই ঘরের ভিতরটিতে একটি কী সুন্দর রহস্য সঞ্চিত হইয়া আছে। এই ঘরে নির্জন মধ্যাহ্নে সখীতে সখীতে যে-সকল মনের কথা আলোচনা হইয়া গেছে তাহাদের সলজ্জ সুন্দর সত্তা এখনও যেন ইতস্তত প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; কথা আলোচনা করিবার সময় কোন্‌খানে কে বসিয়াছিল, কেমন করিয়া বসিয়াছিল, তাহা বিনয় কল্পনায় দেখিতে লাগিল। ওই-যে সেদিন বিনয় পরেশবাবুর কাছে শুনিয়াছিল 'আমি সুচরিতার কাছে শুনিয়াছি ললিতার মন তোমার প্রতি বিমুখ নহে', এই কথাটিকে সে নানা ভাবে নানা রূপে নানা প্রকার ছবির মতো করিয়া দেখিতে পাইল। একটা অনির্বচনীয় আবেগ বিনয়ের মনের মধ্যে অত্যন্ত করুণ উদাস রাগিণীর মতো বাজিতে লাগিল। যে-সব জিনিসকে এমনতরো নিবিড় গভীর রূপে মনের গোপনতার মধ্যে ভাষাহীন আভাসের মতো পাওয়া যায় তাহাদিগকে কোনোমতে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া, অর্থাৎ বিনয় কবি নয়, চিত্রকর নয় বলিয়া, তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যেন কী-একটা করিতে পারিলে বাঁচে অথচ সেটা করিবার কোনো উপায় নাই, এমনি তাহার মনে হইতে লাগিল। যে-একটা পর্দা তাহার সম্মুখে ঝুলিতেছে, যাহা অতি নিকটে তাহাকে নিরতিশয় দূর করিয়া রাখিয়াছে, সেই পর্দাটাকে কি এই মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার শক্তি বিনয়ের নাই!

হরিমোহিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনয় এখন কিছু জল খাইবে কি না। বিনয় কহিল, "না।"

তখন হরিমোহিনী আসিয়া ঘরে বসিলেন।

হরিমোহিনী যতদিন পরেশবাবুর বাড়িতে ছিলেন ততদিন বিনয়ের প্রতি

তাঁহার খুব একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু, যখন হইতে সুচরিতাকে লইয়া তাঁহার স্বতন্ত্র ঘরকন্না হইয়াছে তখন হইতে ইহাদের যাতায়াত তাঁহার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আজকাল আচারে বিচারে সুচরিতা যে সম্পূর্ণ তাঁহাকে মানিয়া চলে না, এইসকল লোকের সঙ্গদোষকেই তিনি তাঁহার কারণ বলিয়া ঠিক করিয়াছিলেন। যদিও তিনি জানিতেন বিনয় ব্রাহ্ম নহে, তবু বিনয়ের মনের মধ্যে যে কোনো হিন্দুসংস্কারের দৃঢ়তা নাই তাহা তিনি স্পষ্ট অনুভব করিতেন। তাই এখন তিনি পূর্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত এই ব্রাহ্মণতনয়কে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুরের প্রসাদের অপব্যয় করিতেন না।

আজ প্রসঙ্গক্রমে হরিমোহিনী বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বাবা, তুমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু সন্ধ্যা-অর্চনা কিছুই কর না?"

বিনয় কহিল, "মাসি, দিনরাত্রি পড়া মুখস্থ করে করে গায়ত্রী সন্ধ্যা সমস্তই ভুলে গেছি।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "পরেশবাবুও তো লেখাপড়া শিখেছেন। উনি তো নিজের ধর্ম মেনে সকালে সন্ধ্যায় একটা কিছু করেন।"

বিনয় কহিল, "মাসি, উনি যা করেন তা কেবল মন্ত্র মুখস্থ করে করা যায় না। ওঁর মতো যদি কখনও হই তবে ওঁর মতো চলব।"

হরিমোহিনী কিছু তীব্রস্বরে কহিলেন, "ততদিন নাহয় বাপ-পিতামহর মতোই চলো-না। না এদিক না ওদিক কি ভালো? মানুষের একটা তো ধর্মের পরিচয় আছে। না রাম না গঙ্গা— মা গো, এ কেমনতরো!"

এমন সময় ললিতা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিনয়কে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। হরিমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "রাধারানী নাইতে গেছে।"

ললিতা অনাবশ্যক জবাবদিহির স্বরূপ কহিল, "দিদি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তত ক্ষণ বোসো-না, এখনই এল ব'লে।"

ললিতার প্রতিও হরিমোহিনীর মন অনুকূল ছিল না। হরিমোহিনী

এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান। পরেশবাবুর অন্য মেয়েরা এখানে তেমন ঘন ঘন আসে না, একমাত্র ললিতাই যখন-তখন আসিয়া সুচরিতাকে লইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে, সেটা হরিমোহিনীর ভালো লাগে না। প্রায় তিনি উভয়ের আলাপে ভঙ্গ দিয়া সুচরিতাকে কোনো-একটা কাজে ডাকিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন; অথবা, আজকাল পূর্বের মতো সুচরিতার পড়াশুনা অব্যাঘাতে চলিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন। অথচ, সুচরিতা যখন পড়াশুনায় মন দেয় তখন অধিক পড়াশুনা যে মেয়েদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অনিষ্টকর সে কথাও বলিতে ছাড়েন না। আসল কথা, তিনি যেমন করিয়া সুচরিতাকে অত্যন্ত ঘিরিয়া লইতে চান কিছুতেই তাহা পারিতেছেন না বলিয়া কখনও বা সুচরিতার সঙ্গীদের প্রতি কখনও বা তাহার শিক্ষার প্রতি কেবলই দোষারোপ করিতেছেন।

ললিতা ও বিনয়কে লইয়া বসিয়া থাকা যে হরিমোহিনীর পক্ষে সুখকর তাহা নহে, তথাপি তাহাদের উভয়ের প্রতি রাগ করিয়াই তিনি বসিয়া রহিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিনয় ও ললিতার মাঝখানে একটি রহস্যময় সম্বন্ধ ছিল। তাই তিনি মনে মনে কহিলেন, 'তোমাদের সমাজে যেমন বিধিই থাক্‌, আমার এ বাড়িতে এই-সমস্ত নির্লজ্জ মেলামেশা, এই-সব খৃস্টানি কাণ্ড ঘটিতে দিব না।'

এ দিকে ললিতার মনেও একটা বিরোধের ভাব কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাল সুচরিতার সঙ্গে আনন্দময়ীর বাড়িতে যাইতে সেও সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যাইতে পারিল না। গোরার প্রতি ললিতার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বিরুদ্ধতাও অত্যন্ত তীব্র। গোরা যে সর্বপ্রকারে তাহার প্রতিকূল, এ কথা সে কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারে না। এমন-কি, যেদিন গোরা কারামুক্ত হইয়াছে সেইদিন হইতে বিনয়ের প্রতিও তাহার মনোভাবের একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কয়েক দিন পূর্বেও, বিনয়ের প্রতি যে তাহার একটা জোর দখল আছে এ কথা সে খুব

স্পর্ধা করিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু, গোরার প্রভাবকে বিনয় কোনো-মতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না ইহা কল্পনামাত্র করিয়াই সে বিনয়ের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

ললিতাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিবা মাত্র বিনয়ের মনের মধ্যে একটা আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। ললিতা সম্বন্ধে বিনয় কোনোমতেই সহজ ভাব রক্ষা করিতে পারে না। যখন হইতে তাহাদের দুই জনের বিবাহ-সম্ভাবনার জনশ্রুতি সমাজে রটিয়া গেছে তখন হইতে ললিতাকে দেখিবা মাত্র বিনয়ের মন বৈদ্যুতচঞ্চল চুম্বকশলার মতো স্পন্দিত হইতে থাকে।

ঘরে বিনয়কে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সুচরিতার প্রতি ললিতার রাগ হইল। সে বুঝিল, অনিচ্ছুক বিনয়ের মনকে অনুকূল করিবার জন্যই সুচরিতা তাহাকে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে এবং এই বাঁকাকে সোজা করিবার জন্যই ললিতাকে আজ ডাক পড়িয়াছে।

সে হরিমোহিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "দিদিকে বোলো এখন আমি থাকতে পারছি নে। আর-এক সময় আমি আসব।"

এই বলিয়া বিনয়ের প্রতি কটাক্ষপাতমাত্র না করিয়া দ্রুত বেগে সে চলিয়া গেল। তখন বিনয়ের কাছে হরিমোহিনীর আর বসিয়া থাকা অনাবশ্যক হওয়াতে তিনিও গৃহকার্য উপলক্ষে উঠিয়া গেলেন।

ললিতার এই চাপা আগুনের মতো মুখের ভাব বিনয়ের কাছে অপরিচিত ছিল না। কিন্তু অনেক দিন এমন চেহারা সে দেখে নাই। সেই-যে এক সময়ে বিনয়ের সম্বন্ধে ললিতা তাহার অগ্নিবাণ উদ্যত করিয়াই ছিল সেই দুর্দিন একেবারে কাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই বিনয় নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, আজ দেখিল সেই পুরাতন বাণ অস্ত্রশালা হইতে আবার বাহির হইয়াছে। তাহাতে একটুও মরিচার চিহ্ন পড়ে নাই। রাগ সহ্য করা যায়, কিন্তু ঘৃণা সহ্য করা বিনয়ের মতো লোকের পক্ষে বড়ো কঠিন। ললিতা একদিন তাহাকে গোরা-গ্রহের উপগ্রহমাত্র মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরূপ তীব্র অবজ্ঞা অনুভব করিয়াছিল তাহা বিনয়ের মনে পড়িল। আজও বিনয়ের দ্বিধায় বিনয়

ললিতার কাছে যে কাপুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে এই কল্পনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার কর্তব্যবুদ্ধির সংকোচকে ললিতা ভীরুতা বলিয়া মনে করিবে, অথচ এ সম্বন্ধে নিজের হইয়া দুটো কথা বলিবারও সুযোগ তাহার ঘটিবে না, ইহা বিনয়ের কাছে অসহ্য বোধ হইল। বিনয়কে তর্ক করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে বিনয়ের পক্ষে গুরুতর শাস্তি হয়। কারণ, বিনয় জানে সে তর্ক করিতে পারে, কথা গুছাইয়া বলিতে এবং কোনো-একটা পক্ষ সমর্থন করিতে তাহার অসামান্য ক্ষমতা। কিন্তু ললিতা যখন তাহার সঙ্গে লড়াই করিয়াছে তখন তাহাকে কোনোদিন যুক্তি প্রয়োগ করিবার অবকাশ দেয় নাই, আজও সে অবকাশ তাহার ঘটিবে না।

সেই খবরের কাগজখানা পড়িয়া ছিল। বিনয় চঞ্চলতার আক্ষেপে সেটা টানিয়া লইয়া হঠাৎ দেখিল, এক জায়গায় পেন্‌সিলের দাগ দিয়া চিহ্নিত। পড়িল, এবং বুঝিল এই আলোচনা এবং নীতি-উপদেশ তাহাদের দুই জনকেই উপলক্ষ করিয়া। ললিতা তাহার সমাজের লোকের কাছে প্রতিদিন যে কিরূপ অপমানিত হইতেছে তাহা বিনয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। অথচ এই অবমাননা হইতে বিনয় তাহাকে রক্ষা করিবার কোনো চেষ্টা করিতেছে না, কেবল সমাজতত্ত্ব লইয়া সূক্ষ্ম তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতে ললিতার মতো তেজস্বিনী রমণীর কাছে সে যে অবজ্ঞাভাজন হইবে তাহা বিনয়ের কাছে সমুচিত বলিয়াই বোধ হইল। সমাজকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে ললিতার যে কিরূপ সাহস তাহা স্মরণ করিয়া এবং এই দৃপ্ত নারীর সঙ্গে নিজের তুলনা করিয়া সে লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল।

স্নান সারিয়া এবং সতীশকে আহার করাইয়া ইস্কুলে পাঠাইয়া সুচরিতা যখন বিনয়ের কাছে আসিল তখন বিনয় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। সুচরিতা পূর্বপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। বিনয় অন্ন আহার করিতে বসিল কিন্তু তৎপূর্বে গণ্ডূষ করিল না।

হরিমোহিনী কহিলেন, "আচ্ছা বাছা, তুমি তো হিঁদুয়ানির কিছুই মান না— তা হলে তুমি ব্রাহ্ম হলেই বা দোষ কী ছিল?"

বিনয় মনে মনে কিছু আহত হইয়া কহিল, "হিঁদুয়ানিকে যেদিন কেবল ছোঁওয়া-খাওয়ার নিরর্থক নিয়ম বলেই জানব সেদিন ব্রাহ্ম বলো, খৃস্টান বলো, মুসলমান বলো, যা হয় একটা-কিছু হব। এখনো হিঁদুয়ানির উপর তত অশ্রদ্ধা হয় নি।"

বিনয় যখন সুচরিতার বাড়ি হইতে বাহির হইল তখন তাহার মন অত্যন্ত বিকল হইয়া ছিল। সে যেন চারি দিক হইতেই ধাক্কা খাইয়া একটা আশ্রয়হীন শূন্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। গোরার পাশে সে আপনার পুরাতন স্থানটি অধিকার করিতে পারিতেছে না, ললিতাও তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে— এমন-কি, হরিমোহিনীর সঙ্গেও তাহার হৃদ্যতার সম্বন্ধ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে; এক সময় বরদাসুন্দরী তাহাকে আন্তরিক স্নেহ করিয়াছেন, পরেশবাবু এখনো তাহাকে স্নেহ করেন, কিন্তু স্নেহের পরিবর্তে সে তাঁহাদের ঘরে এমন অশান্তি আনিয়াছে যে সেখানেও তাহার আজ আর স্থান নাই। যাহাদিগকে ভালোবাসে তাহাদের শ্রদ্ধা ও আদরের জন্য বিনয় চিরদিন কাঙাল, নানাপ্রকারে তাহাদের সৌহৃদ্য আকর্ষণ করিবার শক্তিও তাহার যথেষ্ট আছে। সেই বিনয় আজ অকস্মাৎ তাহার স্নেহপ্রীতির চিরাভ্যস্ত কক্ষপথ হইতে এমন করিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল কেন, এই কথাই সে নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিল। এই-যে সুচরিতার বাড়ি হইতে বাহির হইল, এখন কোথায় যাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। এক সময় ছিল যখন কোনো চিন্তা না করিয়া সহজেই সে গোরার বাড়ির পথে চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ সেখানে যাওয়া তাহার পক্ষে পূর্বের ন্যায় তেমন স্বাভাবিক নহে; যদি যায় তবে গোরার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইবে— সে নীরবতা অত্যন্ত দুঃসহ। এ দিকে পরেশবাবুর বাড়িও তাহার পক্ষে সুগম নহে।

'কেন যে এমন একটা অস্বাভাবিক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম' ইহাই চিন্তা করিতে করিতে মাথা হেঁট করিয়া বিনয় ধীরপদে রাস্তা দিয়া চলিতে

লাগিল। হেদুয়া পুষ্করিণীর কাছে আসিয়া সেখানে একটা গাছের তলায় সে বসিয়া পড়িল। এ-পর্যন্ত তাহার জীবনে ছোটোবড়ো যে-কোনো সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া, তর্ক করিয়া, তাহার মীমাংসা করিয়া লইয়াছে; আজ সে পন্থা নাই, আজ তাহাকে একলাই ভাবিতে হইবে।

বিনয়ের আত্মবিশ্লেষণশক্তির অভাব নাই। বাহিরের ঘটনার উপরেই সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিজে নিষ্কৃতি লওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। তাই সে একলা বসিয়া বসিয়া নিজেকেই দায়িক করিল। বিনয় মনে মনে কহিল, 'জিনিসটিও রাখিব মূল্যটিও দিব না এমন চতুরতা পৃথিবীতে খাটে না। একটা-কিছু বাছিয়া লইতে গেলেই অন্যটাকে ত্যাগ করিতেই হয়। যে লোক কোনোটাকেই মনস্থির করিয়া ছাড়িতে পারে না, তাহারই আমার দশা হয়, সমস্তই তাহাকে খেদাইয়া দেয়। পৃথিবীতে যাহারা নিজের জীবনের পথ জোরের সঙ্গে বাছিয়া লইতে পারিয়াছে তাহারাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে। যে হতভাগা এ পথও ভালোবাসে ও পথও ভালোবাসে, কোনোটা হইতেই নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারে না, সে গম্যস্থান হইতেই বঞ্চিত হয়— সে কেবল পথের কুকুরের মতোই ঘুরিয়া বেড়ায়।'

ব্যাধি নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু নিরূপণ হইলেই যে তাহার প্রতিকার করা সহজ হয় তাহা নহে। বিনয়ের বুঝিবার শক্তি খুব তীক্ষ্ণ, করিবার শক্তিরই অভাব; এইজন্য এ-পর্যন্ত সে নিজের চেয়ে প্রবল ইচ্ছাশক্তি -সম্পন্ন বন্ধুর প্রতিই নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। অবশেষে অত্যন্ত সংকটের সময় আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছে, ইচ্ছাশক্তি নিজের না থাকিলেও ছোটোখাটো প্রয়োজনে ধারে-বরাতে কাজ চালাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু আসল দরকারের বেলায় পরের তহবিল লইয়া কোনোমতেই কারবার চলে না।

সূর্য হেলিয়া পড়িতেই যেখানে ছায়া ছিল সেখানে রৌদ্র আসিয়া পড়িল। তখন তরুতল ছাড়িয়া আবার রাস্তায় বাহির হইল। কিছু দূরে যাইতেই হঠাৎ শুনিল, "বিনয়বাবু! বিনয়বাবু!" পরক্ষণেই সতীশ আসিয়া তাহার হাত

ধরিল। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া সতীশ তখন বাড়ি ফিরিতেছিল।

সতীশ কহিল, "চলুন, বিনয়বাবু, আমার সঙ্গে বাড়ি চলুন।"

বিনয় কহিল, "সে কি হয় সতীশবাবু!"

সতীশ কহিল, "কেন হবে না?"

বিনয় কহিল, "এত ঘন ঘন গেলে তোমার বাড়ির লোকে আমাকে সহ্য করতে পারবে কেন?"

সতীশ বিনয়ের এই যুক্তিকে একেবারে প্রতিবাদের অযোগ্য জ্ঞান করিয়া কেবল কহিল, "না, চলুন।"

তাহাদের পরিবারের সঙ্গে বিনয়ের যে সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধে যে কতবড়ো একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা বালক কিছুই জানে না, সে কেবল বিনয়কে ভালোবাসে, এই কথা মনে করিয়া বিনয়ের হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইল। পরেশবাবুর পরিবার তাহার কাছে যে-একটি স্বর্গলোক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল এই বালকটিতেই আনন্দের সম্পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ আছে; এই প্রলয়ের দিনে তাহার চিত্তে কোনো সংশয়ের মেঘ ছায়া ফেলে নাই, কোনো সমাজের আঘাত ভাঙন ধরাইতে চেষ্টা করে নাই। সতীশের গলা ধরিয়া বিনয় কহিল, "চলো ভাই, তোমাকে তোমাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিই।"

সতীশের জীবনে শিশুকাল হইতে সুচরিতা ও ললিতার যে স্নেহ ও আদর সঞ্চিত হইয়া আছে সতীশকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া বিনয় যেন সেই মাধুর্যের স্পর্শ লাভ করিল।

সমস্ত পথ সতীশ যে বহুতর অপ্রাসঙ্গিক কথা অনর্গল বকিয়া গেল তাহা বিনয়ের কানে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। বালকের চিত্তের সরলতার সংস্রবে তাহার নিজের জীবনের জটিল সমস্যাকে কিছু ক্ষণের জন্য সে একেবারে ভুলিয়া থাকিতে পারিল।

পরেশবাবুর বাড়ির সম্মুখ দিয়াই সুচরিতার বাড়ি যাইতে হয়। পরেশ-বাবুর একতলার বসিবার ঘর রাস্তা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই

ঘরের সম্মুখে আসিতেই বিনয় সে দিকে একবার মুখ না তুলিয়া থাকিতে পারিল না; দেখিল তাঁহার টেবিলের সম্মুখে পরেশবাবু বসিয়া আছেন, কোনো কথা কহিতেছেন কি না বুঝা গেল না; আর ললিতা রাস্তার দিকে পিঠ করিয়া পরেশবাবুর চৌকির কাছে একটি ছোটো বেতের মোড়ার উপর ছাত্রীটির মতো নিস্তব্ধ হইয়া আছে।

সুচরিতার বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে ক্ষোভে ললিতার হৃদয়কে অসহ্যরূপে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল সে তাহা নিবৃত্ত করিবার আর-কোনো উপায়ই জানিত না, সে তাই আস্তে আস্তে পরেশবাবুর কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। পরেশবাবুর মধ্যে এমনি একটি শান্তির আদর্শ ছিল যে, অসহিষ্ণু ললিতা নিজের চাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন, "কী ললিতা?" ললিতা কহিত, "কিছু নয় বাবা। তোমার এই ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা।"

আজ ললিতা আহত হৃদয়টি লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে, তাহা পরেশবাবু স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মধ্যেও একটি বেদনা প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তাই তিনি ধীরে ধীরে এমন একটি কথা পাড়িয়াছিলেন যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছ সুখদুঃখের ভারকে একেবারে হালকা করিয়া দিতে পারে।

পিতা ও কন্যার এই বিশুদ্ধ আলোচনার দৃশ্যটি দেখিয়া মুহূর্তের জন্য বিনয়ের গতিরোধ হইয়া গেল— সতীশ কী বলিতেছিল তাহা তাহার কানে গেল না। সতীশ তখন তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এক দল বাঘকে অনেক দিন ধরিয়া শিক্ষা দিয়া স্বপক্ষের সৈন্যদলের প্রথম সারে রাখিয়া যুদ্ধ করিলে তাহাতে জয়ের সম্ভাবনা কিরূপ, ইহাই তাহার প্রশ্ন ছিল। এতক্ষণ তাহাদের প্রশ্নোত্তর অবাধে চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ এইবার বাধা পাইয়া সতীশ বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পরে বিনয়ের দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া পরেশবাবুর ঘরের দিকে চাহিয়াই সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ললিতাদিদি, ললিতাদিদি, এই দেখো

আমি বিনয়বাবুকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছি।"

বিনয় লজ্জায় ঘামিয়া উঠিল ; ঘরের মধ্যে এক মুহূর্তে ললিতা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, পরেশবাবু রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন— সবসুদ্ধ একটা কাণ্ড হইয়া গেল।

তখন বিনয় সতীশকে বিদায় করিয়া পরেশবাবুর বাড়িতে উঠিল। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ললিতা চলিয়া গেছে। তাহাকে সকলেই শান্তিভঙ্গকারী দস্যুর মতো দেখিতেছে এই মনে করিয়া সে সংকুচিত হইয়া চৌকিতে বসিল।

শারীরিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ শিষ্টালাপ শেষ হইতেই বিনয় একেবারেই আরম্ভ করিল, "আমি যখন হিন্দুসমাজের আচার-বিচারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানি নে এবং প্রতিদিনই তা লঙ্ঘন করে থাকি তখন ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। আপনার কাছ থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করি, এই আমার বাসনা।"

এই বাসনা এই সংকল্প আর পনেরো মিনিট পূর্বেও বিনয়ের মনে স্পষ্ট আকারে ছিল না। পরেশবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "ভালো করে সকল কথা চিন্তা করে দেখেছ তো ?"

বিনয় কহিল, "এর মধ্যে আর তো কিছু চিন্তা করবার নেই, কেবল ন্যায়-অন্যায়টাই ভেবে দেখবার বিষয়। সেটা খুব সাদা কথা। আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তাতে কেবল আচার-বিচারকেই অলঙ্ঘনীয় ধর্ম বলে আমি কোনোমতেই অকপটচিত্তে মানতে পারি নে। সেইজন্যেই আমার ব্যবহারে পদে পদে নানা অসংগতি প্রকাশ পায়, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে হিঁদুয়ানিকে আশ্রয় করে আছে তাদের সঙ্গে জড়িত থেকে আমি তাদের কেবল আঘাতই দিই। এটা যে আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হচ্ছে তাতে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এমন স্থলে আর-কোনো কথা চিন্তা না করে এই অন্যায় পরিহার করবার জন্যেই আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। নইলে নিজের প্রতি সম্মান রাখতে পারব না।"

পরেশবাবুকে বুঝাইবার জন্য এত কথার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু এ-সব কথা নিজেকেই জোর দিবার জন্য। সে যে একটা ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধের মধ্যেই পড়িয়া গেছে এবং এই যুদ্ধে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়ের পক্ষেই তাহাকে জয়ী হইতে হইবে, এই কথা বলিয়া তাহার বক্ষ প্রসারিত হইয়া উঠিল। মনুষ্যত্বের মর্যাদা তো রাখিতে হইবে।

পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তোমার মতের ঐক্য আছে তো?"

বিনয় একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনাকে সত্য কথা বলি, আগে মনে করতুম আমার বুঝি একটা-কিছু ধর্মবিশ্বাস আছে— তা নিয়ে অনেক লোকের সঙ্গে অনেক ঝগড়াও করেছি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জেনেছি ধর্মবিশ্বাস আমার জীবনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে নি। এটুকু যে বুঝেছি সে আপনাকে দেখে। ধর্মে আমার জীবনের কোনো সত্য প্রয়োজন ঘটে নি এবং তার প্রতি আমার সত্য বিশ্বাস জন্মে নি বলেই আমি কল্পনা এবং যুক্তিকৌশল দিয়ে এতদিন আমাদের সমাজের প্রচলিত ধর্মকে নানাপ্রকার সূক্ষ্মব্যাখ্যা-দ্বারা কেবলমাত্র তর্কনৈপুণ্যে পরিণত করেছি। কোন্ ধর্ম যে সত্য তা ভাববার আমার কোনো দরকারই হয় না; যে ধর্মকে সত্য বললে আমার জিত হয় আমি তাকেই সত্য বলে প্রমাণ করে বেড়িয়েছি। যতই প্রমাণ করা শক্ত হয়েছে ততই প্রমাণ করে অহংকার বোধ করেছি। কোনোদিন আমার মনে ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে কি না তা আজও আমি বলতে পারি নে, কিন্তু অনুকূল অবস্থা এবং দৃষ্টান্তের মধ্যে পড়লে সে দিকে আমার অগ্রসর হবার সম্ভাবনা আছে এ কথা নিশ্চিত। অন্তত যে জিনিস ভিতরে ভিতরে আমার বুদ্ধিকে পীড়িত করে চিরজীবন তারই জয়পতাকা বহন করে বেড়াবার হীনতা থেকে উদ্ধার পাব।"

পরেশবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতেই বিনয় নিজের বর্তমান অবস্থার অনুকূল যুক্তিগুলিকে আকার দান করিয়া তুলিতে লাগিল। এমনি উৎসাহের সঙ্গে করিতে লাগিল যেন অনেক দিনের তর্কবিতর্কের পর সে এই স্থির

সিদ্ধান্তে আসিয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

তবু পরেশবাবু তাহাকে আরও কিছুদিন সময় লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। তাহাতে বিনয় ভাবিল, তাহার দৃঢ়তার উপর পরেশবাবুর বুঝি সংশয় আছে। সুতরাং তাহার জেদ ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মন যে একটি নিঃসন্দিগ্ধ ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিছুতেই তাহার আর কিছুমাত্র হেলিবার টলিবার সম্ভাবনা নাই, ইহাই বার বার করিয়া জানাইল। উভয় পক্ষ হইতেই ললিতার সঙ্গে বিবাহের কোনো প্রসঙ্গই উঠিল না।

এমন সময় গৃহকর্ম উপলক্ষে বরদাসুন্দরী সেখানে প্রবেশ করিলেন। যেন বিনয় ঘরে নাই, এমনি ভাবে কাজ সারিয়া তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। বিনয় মনে করিয়াছিল, পরেশবাবু এখনই বরদাসুন্দরীকে ডাকিয়া বিনয়ের নূতন খবরটি তাঁহাকে জানাইবেন। কিন্তু পরেশবাবু কিছুই বলিলেন না। বস্তুত এখনো বলিবার সময় হইয়াছে বলিয়া তিনি মনেই করেন নাই। এ কথাটি সকলের কাছেই গোপন রাখিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বরদাসুন্দরী বিনয়ের প্রতি যখন সুস্পষ্ট অবজ্ঞা ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন বিনয় আর থাকিতে পারিল না। সে গমনোন্মুখ বরদাসুন্দরীর পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল, "আমি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নেবার প্রস্তাব নিয়ে আজ আপনাদের কাছে এসেছি। আমি অযোগ্য কিন্তু আপনারা আমাকে যোগ্য করে নেবেন, এই আমার ভরসা।"

শুনিয়া বিস্মিত বরদাসুন্দরী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া বসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরেশবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন।

পরেশ কহিলেন, "বিনয় দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করছেন।"

শুনিয়া বরদাসুন্দরীর মনে একটা জয়লাভের গর্ব উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ আনন্দ হইল না কেন। তাঁহার ভিতরে ভিতরে ভারি একটা ইচ্ছা হইয়াছিল, এবার যেন পরেশবাবুর রীতিমত একটা শিক্ষা হয়। তাঁহার

স্বামীকে প্রচুর অনুতাপ করিতে হইবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী তিনি খুব জোরের সঙ্গে বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেইজন্য সামাজিক আন্দোলনে পরেশবাবু যথেষ্ট বিচলিত হইতেছিলেন না দেখিয়া বরদাসুন্দরী মনে মনে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন; হেনকালে সমস্ত সংকটের এমন সুচারুরূপে মীমাংসা হইয়া যাইবে ইহা বরদাসুন্দরীর কাছে বিশুদ্ধ প্রীতিকর হয় নাই। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "এই দীক্ষার প্রস্তাবটা আর-কিছুদিন আগে যদি হত তা হলে আমাদের এত অপমান এত দুঃখ পেতে হত না।"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমাদের দুঃখকষ্ট-অপমানের তো কোনো কথা হচ্ছে না, বিনয় দীক্ষা নিতে চাচ্ছেন।"

বরদাসুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, "শুধু দীক্ষা?"

বিনয় কহিল, "অন্তর্যামী জানেন আপনাদের দুঃখ-অপমান সমস্তই আমার।"

পরেশ কহিলেন, "দেখো বিনয়, তুমি ধর্মে দীক্ষা নিতে যে চাচ্ছ সেটাকে একটা অবান্তর বিষয় কোরো না। আমি তোমাকে পূর্বেও একদিন বলেছি, আমরা একটা কোনো সামাজিক সংকটে পড়েছি কল্পনা করে তুমি কোনো গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হোয়ো না।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "সে তো ঠিক কথা। কিন্তু তাও বলি, আমাদের সকলকে জালে জড়িয়ে ফেলে চুপ করে বসে থাকাও ওঁর কর্তব্য নয়।"

পরেশবাবু কহিলেন, "চুপ করে না থেকে চঞ্চল হয়ে উঠলে জালে আরও বেশি করে গ্রন্থি পড়ে। কিছু-একটা করাকেই যে কর্তব্য বলে তা নয়, অনেক সময়ে কিছু না করাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো কর্তব্য।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "তা হবে, আমি মূর্খ মানুষ, সব কথা ভালো বুঝতে পারি নে। এখন কী স্থির হল সেই কথাটা জেনে যেতে চাই—আমার অনেক কাজ আছে।"

বিনয় কহিল, "পরশু রবিবারেই আমি দীক্ষা গ্রহণ করব। আমার

ইচ্ছা যদি পরেশবাবু—"

পরেশবাবু কহিলেন, "যে দীক্ষার কোনো ফল আমার পরিবার আশা করতে পারে সে দীক্ষা আমার দ্বারা হতে পারবে না। ব্রাহ্মসমাজে তোমাকে আবেদন করতে হবে।"

বিনয়ের মন তৎক্ষণাৎ সংকুচিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজে দস্তুরমত দীক্ষার জন্য আবেদন করার মতো মনের অবস্থা তো তাহার নহে— বিশেষত ললিতাকে লইয়া যে ব্রাহ্মসমাজে তাহার সম্বন্ধে এত আলোচনা হইয়া গেছে। কোন্ লজ্জায় কী ভাষায় সে চিঠি লিখিবে! সে চিঠি যখন ব্রাহ্ম-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে তখন সে কেমন করিয়া মাথা তুলিবে! সে চিঠি গোরা পড়িবে, আনন্দময়ী পড়িবেন। সে চিঠির সঙ্গে আর তো কোনো ইতিহাস থাকিবে না— তাহাতে কেবল এই কথাটুকুই প্রকাশ পাইবে যে, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য বিনয়ের চিত্ত অকস্মাৎ পিপাসু হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা তো এতখানি সত্য নহে— তাহাকে আরও কিছুর সঙ্গে জড়িত করিয়া না দেখিলে তাহার তো লজ্জারক্ষার আবরণটুকু থাকে না।

বিনয়কে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বরদাসুন্দরী ভয় পাইলেন। তিনি কহিলেন, "উনি ব্রাহ্মসমাজের তো কাউকে চেনেন না, আমরাই সব বন্দোবস্ত করে দেব। আমি আজ এখনই পানুবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আর তো সময় নেই, পরশু যে রবিবার।"

এমন সময় দেখা গেল, সুধীর ঘরের সামনে দিয়া উপরের তলায় যাইতেছে। বরদাসুন্দরী তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুধীর, বিনয় পরশু আমাদের সমাজে দীক্ষা নেবেন।"

সুধীর অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। সুধীর মনে মনে বিনয়ের একজন বিশেষ ভক্ত ছিল; বিনয়কে ব্রাহ্মসমাজে পাওয়া যাইবে শুনিয়া তাহার ভারি উৎসাহ হইল। বিনয় যেরকম চমৎকার ইংরেজি লিখিতে পারে, তাহার যেরকম বিদ্যাবুদ্ধি, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দেওয়াই তাহার পক্ষে অত্যন্ত অসংগত বলিয়া সুধীরের বোধ হইত। বিনয়ের মতো লোক

যে কোনোমতেই ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে থাকিতে পারে না, ইহারই প্রমাণ পাইয়া তাহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কিন্তু পরশু রবিবারের মধ্যেই কি হয়ে উঠবে? অনেকেই খবর জানতে পারবে না।"

সুধীরের ইচ্ছা, বিনয়ের এই দীক্ষাকে একটা দৃষ্টান্তের মতো সর্বসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করা হয়।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "না না, এই রবিবারেই হয়ে যাবে। সুধীর, তুমি দৌড়ে যাও, পানুবাবুকে শীঘ্র ডেকে আনো।"

যে হতভাগ্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা সুধীর ব্রাহ্মসমাজকে অজেয়শক্তিশালী বলিয়া সর্বত্র প্রচার করিবার কল্পনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার চিত্ত তখন সংকুচিত হইয়া একেবারে বিন্দুবৎ হইয়া আসিয়াছিল। যে জিনিসটা মনে মনে কেবল তর্কে যুক্তিতে বিশেষ কিছুই নহে তাহারই বাহ্য চেহারাটা দেখিয়া বিনয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

পানুবাবুকে ডাক পড়িতেই বিনয় উঠিয়া পড়িল। বরদাসুন্দরী কহিলেন, "একটু বোসো, পানুবাবু এখনই আসবেন, দেরি হবে না।"

বিনয় কহিল, "না। আমাকে মাপ করবেন।"

সে এই বেষ্টন হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ফাঁকায় সকল কথা ভালো করিয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইলে বাঁচে।

বিনয় উঠিতেই পরেশবাবু উঠিলেন এবং তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, "বিনয়, তাড়াতাড়ি কিছু কোরো না— শান্ত হয়ে স্থির হয়ে সকল কথা চিন্তা করে দেখো। নিজের মন সম্পূর্ণ না বুঝে জীবনের এত বড়ো একটা ব্যাপারে প্রবৃত্ত হোয়ো না।"

বরদাসুন্দরী তাঁহার স্বামীর প্রতি মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "গোড়ায় কেউ ভেবেচিন্তে কাজ করে না, অনর্থ বাধিয়ে বসে, তার পর যখন একেবারে দম আটকে আসে তখন বলেন, 'বসে বসে ভাবো।' তোমরা স্থির হয়ে বসে ভাবতে পারো, কিন্তু আমাদের যে প্রাণ বেরিয়ে গেল।"

বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুধীর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। রীতিমত আহারে বসিয়া খাইবার পূর্বেই চাখিবার ইচ্ছা যেমন, সুধীরের সেইরূপ চঞ্চলতা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা এখনই বিনয়কে বন্ধুসমাজে ধরিয়া লইয়া গিয়া সুসংবাদ দিয়া আনন্দ-উৎসব আরম্ভ করিয়া দেয়, কিন্তু সুধীরের এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অভিঘাতে বিনয়ের মন আরও দমিয়া যাইতে লাগিল। সুধীর যখন প্রস্তাব করিল "বিনয়বাবু, আসুন-না আমরা দুজনে মিলেই পানুবাবুর কাছে যাই", তখন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া জোর করিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া বিনয় চলিয়া গেল।

কিছু দূরে যাইতেই দেখিল, অবিনাশ তাহার দলের দুই-একজন লোকের সঙ্গে হন হন করিয়া কোথায় চলিয়াছে। বিনয়কে দেখিয়াই অবিনাশ কহিল, "এই-যে বিনয়বাবু, বেশ হয়েছে। চলুন আমাদের সঙ্গে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

অবিনাশ কহিল, "কাশিপুরের বাগান ঠিক করতে যাচ্ছি। সেইখানে গৌরমোহনবাবুর প্রায়শ্চিত্তের সভা বসবে।"

বিনয় কহিল, "না, আমার এখন যাবার জো নেই।"

অবিনাশ কহিল, "সে কী কথা! আপনারা কি বুঝতে পারছেন এটা কত বড়ো একটা ব্যাপার হচ্ছে! নইলে গৌরমোহনবাবু কি এমন একটা অনাবশ্যক প্রস্তাব করতেন! এখনকার দিনে হিন্দুসমাজকে নিজের জোর প্রকাশ করতে হবে। এই গৌরমোহনবাবুর প্রায়শ্চিত্তে দেশের লোকের মনে কি একটা কম আন্দোলন হবে! আমরা দেশবিদেশ থেকে বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করে আনব। এতে সমস্ত হিন্দুসমাজের উপরে খুব একটা কাজ হবে। লোকে বুঝতে পারবে, এখনো আমরা বেঁচে আছি। বুঝতে পারবে, হিন্দুসমাজ মরবার নয়।"

অবিনাশের আকর্ষণ এড়াইয়া বিনয় চলিয়া গেল।

৫৬

হারানবাবুকে যখন বরদাসুন্দরী ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন তখন তিনি কিছু ক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং কহিলেন, "এ সম্বন্ধে একবার ললিতার সঙ্গে আলোচনা করে দেখা কর্তব্য।"

ললিতা আসিলে হারানবাবু তাঁহার গাম্ভীর্যের মাত্রা শেষ সপ্তক পর্যন্ত চড়াইয়া কহিলেন, "দেখো ললিতা, তোমার জীবনে খুব একটা দায়িত্বের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। এক দিকে তোমার ধর্ম, আর-এক দিকে তোমার প্রবৃত্তি, এর মধ্যে তোমাকে পথ নির্বাচন করে নিতে হবে।"

এই বলিয়া একটু থামিয়া হারানবাবু ললিতার মুখের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। হারানবাবু জানিতেন, তাঁহার এই ন্যায়াগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে ভীরুতা কম্পিত হয়, কপটতা ভস্মীভূত হইয়া যায়— তাঁহার এই তেজোময় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ব্রাহ্মসমাজের একটি মূল্যবান সম্পত্তি।

ললিতা কোনো কথা বলিল না, চুপ করিয়া রহিল।

হারানবাবু কহিলেন, "তুমি বোধ হয় শুনেছ, তোমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করে অথবা যে কারণেই হোক, বিনয়বাবু অবশেষে আমাদের সমাজে দীক্ষা নিতে রাজি হয়েছেন।"

ললিতা এ সংবাদ পূর্বে শুনে নাই, শুনিয়া তাহার মনে কী ভাব হইল তাহাও প্রকাশ করিল না। তাহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

হারানবাবু কহিলেন, "নিশ্চয়ই পরেশবাবু বিনয়ের এই বাধ্যতায় খুবই খুশি হয়েছেন। কিন্তু, এতে যথার্থ খুশি হবার কোনো বিষয় আছে কি না সে কথা তোমাকেই স্থির করতে হবে। সেইজন্য আজ আমি তোমাকে ব্রাহ্মসমাজের নামে অনুরোধ করছি, নিজের উন্মত্ত প্রবৃত্তিকে এক পাশে

সরিয়ে রাখো এবং কেবলমাত্র ধর্মের দিকে দৃষ্টি রক্ষা করে নিজের হৃদয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, এতে খুশি হবার কি যথার্থ কারণ আছে।"

ললিতা এখনো চুপ করিয়া রহিল। হারানবাবু মনে করিলেন, খুব কাজ হইতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "দীক্ষা! দীক্ষা যে জীবনের কি পবিত্র মুহূর্ত সে কি আজ আমাকে বলতে হবে! সেই দীক্ষাকে কলুষিত করবে! সুখ সুবিধা বা আসক্তির আকর্ষণে আমরা ব্রাহ্মসমাজে অসত্যকে পথ ছেড়ে দেব— কপটতাকে আদর করে আহ্বান করে আনব! বলো ললিতা, তোমার জীবনের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এই দুর্গতির ইতিহাস কি চিরদিনের জন্যে জড়িত হয়ে থাকবে।"

এখনো ললিতা কোনো কথা বলিল না, চৌকির হাতটা মুঠা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। হারানবাবু কহিলেন, "আসক্তির ছিদ্র দিয়ে দুর্বলতা যে মানুষকে কিরকম দুর্নিবারভাবে আক্রমণ করে তা অনেক দেখেছি, এবং মানুষের দুর্বলতাকে যে কিরকম করে ক্ষমা করতে হয় তাও আমি জানি, কিন্তু যে দুর্বলতা কেবল নিজের জীবনকে নয়, শতসহস্র লোকের জীবনের আশ্রয়কে একেবারে ভিত্তিতে গিয়ে আঘাত করে, তুমিই বলো, ললিতা, তাকে কি এক মুহূর্তের জন্য ক্ষমা করা যায়। তাকে ক্ষমা করবার অধিকার কি ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন?"

ললিতা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "না, না, পানুবাবু, আপনি ক্ষমা করবেন না। আপনার আক্রমণই পৃথিবীসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে— আপনার ক্ষমা বোধ হয় সকলের পক্ষে একেবারে অসহ্য হবে।"

এই বলিয়া ঘর ছাড়িয়া ললিতা চলিয়া গেল।

বরদাসুন্দরী হারানবাবুর কথায় উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি কোনোমতেই এখন বিনয়কে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তিনি হারানবাবুর কাছে অনেক ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিয়া, অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তাঁহার মুশকিল হইল এই যে, পরেশবাবুকেও তিনি নিজের পক্ষে পাইলেন না, আবার হারানবাবুকেও না। এমন অভাবনীয় অবস্থা কেহ

কখনো কল্পনাও করিতে পারিত না। হারানবাবুর সম্বন্ধে পুনরায় বরদাসুন্দরীর মত পরিবর্তন করিবার সময় আসিল।

যতক্ষণ দীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারটা বিনয় ঝাপসা করিয়া দেখিতেছিল ততক্ষণ খুব জোরের সঙ্গেই সে আপনার সংকল্প প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল এজন্য ব্রাহ্মসমাজে তাহাকে আবেদন করিতে হইবে এবং হারানবাবুর সঙ্গে এ লইয়া পরামর্শ চলিবে, তখন এই অনাবৃত প্রকাশ্যতার বিভীষিকা তাহাকে একান্ত কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। কোথায় গিয়া কাহার সঙ্গে সে যে পরামর্শ করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না, এমন-কি আনন্দময়ীর কাছে যাওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবার মতো শক্তিও তাহার ছিল না। তাই সে আপনার জনহীন বাসার মধ্যে গিয়া উপরের ঘরে তক্তপোশের উপর শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার ঘরে চাকর বাতি আনিতেই তাহাকে বারণ করিবে মনে করিতেছে এমন সময়ে বিনয় নীচে হইতে আহ্বান শুনিল, "বিনয়বাবু! বিনয়বাবু!"

বিনয় যেন বাঁচিয়া গেল। সে যেন মরুভূমিতে তৃষ্ণার জল পাইল। এই মুহূর্তে একমাত্র সতীশ ছাড়া আর-কেহই তাহাকে আরাম দিতে পারিত না। বিনয়ের নির্জীবতা ছুটিয়া গেল। "কী ভাই সতীশ" বলিয়া সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া জুতা পায়ে না দিয়াই দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দেখিল, তাহার ছোটো উঠানটিতে সিঁড়ির সামনেই সতীশের সঙ্গে বরদাসুন্দরী দাঁড়াইয়া আছেন; আবার সেই সমস্যা, সেই লড়াই। শশব্যস্ত হইয়া বিনয় সতীশ ও বরদাসুন্দরীকে উপরের ঘরে লইয়া গেল।

বরদাসুন্দরী সতীশকে কহিলেন, "সতীশ, যা তুই ওই বারান্দায় গিয়ে একটু বোস্ গে যা।"

সতীশের এই নিরানন্দ নির্বাসনদণ্ডে ব্যথিত হইয়া বিনয় তাহাকে কতকগুলা ছবির বই বাহির করিয়া দিয়া পাশের ঘরে আলো জ্বালিয়া

বসাইয়া দিল।

বরদাসুন্দরী যখন বলিলেন "বিনয়, তুমি তো ব্রাহ্মসমাজের কাউকে জান না ; আমার হাতে একখানা চিঠি লিখে দাও, আমি কাল সকালেই নিজে গিয়ে সম্পাদক-মহাশয়কে দিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেব, যাতে পরশু রবিবারেই তোমার দীক্ষা হয়ে যায়— তোমাকে আর-কিছুই ভাবতে হবে না"— তখন বিনয় কোনো কথাই বলিতে পারিল না। সে তাঁহার আদেশ অনুসারে একখানি চিঠি লিখিয়া বরদাসুন্দরীর হাতে দিয়া দিল। যাহা হউক একটা কোনো পথে এমন করিয়া বাহির হইয়া পড়া তাহার দরকার হইয়াছিল যে, ফিরিবার বা দ্বিধা করিবার কোনো উপায়মাত্র না থাকে।

ললিতার সঙ্গে বিবাহের কথাটাও বরদাসুন্দরী একটুখানি পাড়িয়া রাখিলেন।

বরদাসুন্দরী চলিয়া গেলে বিনয়ের মনে ভারি একটা যেন বিতৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল। এমন-কি, ললিতার স্মৃতিও তাহার মনের মধ্যে কেমন একটু বেসুরে বাজিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন বরদাসুন্দরীর এই অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে ললিতারও একটা কোথাও যোগ আছে। নিজের প্রতি শ্রদ্ধাহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই প্রতি তাহার শ্রদ্ধা যেন নামিয়া পড়িতে লাগিল।

বরদাসুন্দরী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াই মনে করিলেন, ললিতাকে তিনি আজ খুশি করিয়া দিবেন। ললিতা যে বিনয়কে ভালোবাসে তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্যই তাহাদের বিবাহ লইয়া সমাজে গোল বাধিয়াছিল। তখন তিনি নিজে ছাড়া আর-সকলকেই এজন্য অপরাধী করিয়াছিলেন। ললিতার সঙ্গে কয়দিন তিনি কথাবার্তা এক-রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেইজন্য আজ যখন একটা কিনারা হইল সেটা যে অনেকটা তাঁহার জন্যই হইল এই গৌরবটুকু ললিতার কাছে প্রকাশ করিয়া তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ললিতার বাপ তো সমস্ত মাটি করিয়াই দিয়াছিলেন। ললিতা নিজেও তো বিনয়কে সিধা করিতে

পারে নাই। পানুবাবুর কাছ হইতেও তো কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। একলা বরদাসুন্দরী সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন। হাঁ, হাঁ! এক জন মেয়েমানুষ যাহা পারে পাঁচ জন পুরুষে তাহা পারে না।

বরদাসুন্দরী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন ললিতা আজ সকাল সকাল শুইতে গেছে, তাহার শরীর তেমন ভালো নাই। তিনি মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, 'শরীর ভালো করিয়া দিতেছি।'

একটা বাতি হাতে করিয়া তাহার অন্ধকার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ললিতা বিছানায় এখনো শোয় নাই একটা কেদারায় হেলান দিয়া পড়িয়া আছে।

ললিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা কহিল, "মা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

তাহার স্বরের মধ্যে একটা তীব্রতা ছিল। সে খবর পাইয়াছিল তিনি সতীশকে লইয়া বিনয়ের বাসায় গিয়াছিলেন।

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "আমি বিনয়ের ওখানে গিয়েছিলেম।"

"কেন?"

কেন! বরদাসুন্দরীর মনে মনে একটু রাগ হইল। 'ললিতা মনে করে আমি কেবল ওর শত্রুতাই করিতেছি! অকৃতজ্ঞ!'

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "এই দেখো কেন।" বলিয়া বিনয়ের সেই চিঠিখানা ললিতার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলেন। সে চিঠি পড়িয়া ললিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বরদাসুন্দরী নিজের কৃতিত্ব-প্রচারের জন্য কিছু অত্যুক্তি করিয়াই জানাইলেন যে, এ চিঠি কি বিনয়ের হাত হইতে সহজে বাহির হইতে পারিত। তিনি জাঁক করিয়া বলিতে পারেন, এ কাজ আর-কোনো লোকেরই সাধ্যের মধ্যেই ছিল না।

ললিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তাহার কেদারায় শুইয়া পড়িল। বরদাসুন্দরী মনে করিলেন, তাঁহার সম্মুখে প্রবল হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিতে ললিতা লজ্জা করিতেছে। ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় চিঠিখানি লইয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইবার সময় দেখিলেন, সে চিঠি কে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে।

৫৭

অপরাহ্নে সুচরিতা পরেশবাবুর কাছে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল একজন বাবু আসিয়াছেন।

"কে বাবু? বিনয়বাবু?"

বেহারা কহিল, "না, খুব গৌরবর্ণ, লম্বা একটি বাবু।"

সুচরিতা চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবুকে উপরের ঘরে এনে বসাও।"

আজ সুচরিতা কী কাপড় পরিয়াছে ও কেমন করিয়া পরিয়াছে এত ক্ষণ তাহা চিন্তাও করে নাই। এখন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাপড়খানা কিছুতেই তাহার পছন্দ হইল না। তখন বদলাইবার সময় ছিল না। কম্পিত হস্তে কাপড়ের আঁচলে, চুলে, একটু-আধটু পারিপাট্য সাধন করিয়া স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড লইয়া সুচরিতা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার টেবিলের উপর গোরার রচনাবলী পড়িয়া ছিল, সে কথা তাহার মনেই ছিল না। ঠিক সেই টেবিলের সম্মুখেই চৌকিতে গোরা বসিয়া আছে। বইগুলি নির্লজ্জভাবে ঠিক গোরার চোখের উপরে পড়িয়া আছে— সেগুলি ঢাকা দিবার বা সরাইবার কোনো উপায়মাত্র নাই।

"মাসিমা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেক দিন থেকে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁকে খবর দিই গে।" বলিয়া সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়াই চলিয়া গেল— সে একলা গোরার সঙ্গে আলাপ করিবার মতো জোর পাইল না।

কিছু ক্ষণ পরে সুচরিতা হরিমোহিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। কিছুকাল হইতে হরিমোহিনী বিনয়ের কাছ হইতে গোরার মত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা এবং তাহার জীবনের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। প্রায় মাঝে মাঝে তাঁহার অনুরোধে সুচরিতা মধ্যাহ্নে তাঁহাকে গোরার লেখা পড়িয়া

শুনাইয়াছে। যদিও সে-সব লেখা তিনি যে সমস্তই ঠিক বুঝিতে পারিতেন তাহা নহে এবং তাহাতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণেরই সুবিধা করিয়া দিত, তবু এটুকু মোটামুটি বুঝিতে পারিতেন যে, শাস্ত্র ও লোকাচারের পক্ষ লইয়া গোরা এখনকার কালের আচারহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে। আধুনিক ইংরেজি-শেখা ছেলের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য এবং ইহা অপেক্ষা গুণের কথা আর কী হইতে পারে! ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে প্রথম যখন বিনয়কে দেখিয়াছিলেন তখন বিনয়ই তাঁহাকে যথেষ্ট তৃপ্তিদান করিয়াছিল। কিন্তু, ক্রমে সেটুকু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার পর নিজের বাড়িতে যখন তিনি বিনয়কে দেখিতে লাগিলেন তখন তাহার আচারের ছিদ্রগুলিই তাঁহাকে বেশি করিয়া বাজিতে লাগিল। বিনয়ের উপর তিনি অনেকটা নির্ভর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার প্রতি ধিক্‌কার তাঁহার প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। সেই জন্যই অত্যন্ত উৎসুকচিত্তে তিনি গোরার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

গোরার দিকে নেত্রপাত করিয়াই হরিমোহিনী একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই তো ব্রাহ্মণ বটে! যেন একেবারে হোমের আগুন। যেন শুভ্রকায় মহাদেব। তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তির সঞ্চার হইল যে, গোরা যখন তাঁহাকে প্রণাম করিল তখন সে প্রণাম গ্রহণ করিতে হরিমোহিনী কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

হরিমোহিনী কহিলেন, "তোমার কথা অনেক শুনেছি বাবা। তুমিই গৌর? গৌরই বটে। ওই-যে কীর্তনের গান শুনেছি—

চাঁদের অমিয়া-সনে চন্দন বাঁটিয়া গো
কে মাজিল গোরার দেহখানি—

আজ তাই চক্ষে দেখলুম। কোন্ প্রাণে তোমাকে জেলে দিয়েছিল আমি সেই কথাই ভাবি।"

গোরা হাসিয়া কহিল, "আপনারা যদি ম্যাজিস্ট্রেট হতেন তা হলে জেল-খানায় ইঁদুর-বাদুড়ের বাসা হত।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "না বাবা, পৃথিবীতে চোর-জুয়াচোরের অভাব

কী ? ম্যাজিস্ট্রেটের কি চোখ ছিল না ! তুমি যে যে-সে কেউ নও, তুমি যে ভগবানের লোক, সে তো মুখের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়। জেলখানা আছে বলেই কি জেলে দিতে হবে ! বাপ রে ! এ কেমন বিচার !"

গোরা কহিল, "মানুষের মুখের দিকে তাকালে পাছে ভগবানের রূপ চোখে পড়ে তাই ম্যাজিস্ট্রেট কেবল আইনের বইয়ের দিকে তাকিয়ে কাজ করে। নইলে মানুষকে চাবুক জেল দ্বীপান্তর ফাঁসি দিয়ে কি তাদের চোখে ঘুম থাকত, না মুখে ভাত রুচত ?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "যখনই ফুরসত পাই রাধারানীর কাছ থেকে তোমার বই পড়িয়ে শুনি। কবে তোমার নিজের মুখ থেকে ভালো ভালো সব কথা শুনতে পাব মনে এই প্রত্যাশা করে এতদিন ছিলুম। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ আর বড়ো দুঃখিনী, সব কথা বুঝিও নে, আবার সব কথায় মনও দিতে পারি নে। কিন্তু বাবা, তোমার কাছ থেকে কিছু জ্ঞান পাব, এ আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে।"

গোরা বিনয়সহকারে এ কথার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হরিমোহিনী কহিলেন, "বাবা, তোমাকে কিছু খেয়ে যেতে হবে। তোমার মতো ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমি অনেক দিন খাওয়াই নি। আজকের যা আছে তাই দিয়ে মিষ্টিমুখ করে যাও, কিন্তু আর-একদিন আমার ঘরে তোমার নিমন্ত্রণ রইল।"

এই বলিয়া হরিমোহিনী যখন আহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন তখন সুচরিতার বুকের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।

গোরা একেবারে আরম্ভ করিয়া দিল, "বিনয় আজ আপনার এখানে এসেছিল ?"

সুচরিতা কহিল, "হাঁ।"

গোরা কহিল, "তার পরে বিনয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কিন্তু আমি জানি কেন সে এসেছিল।"

গোরা একটু থামিল, সুচরিতাও চুপ করিয়া রহিল।

গোরা কহিল, "আপনারা ব্রাহ্মমতে বিনয়ের বিবাহ্ দেবার চেষ্টা করছেন। এটা কি ভালো করছেন ?"

এই খোঁচাটুকু খাইয়া সুচরিতার মন হইতে লজ্জা-সংকোচের জড়তা একেবারে দূর হইয়া গেল। সে গোরার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া কহিল, "ব্রাহ্মমতে বিবাহকে ভালো কাজ বলে মনে করব না, এই কি আপনি আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন ?"

গোরা কহিল, "আপনার কাছে আমি কোনোরকম ছোটো প্রত্যাশা করি নে, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন। সম্প্রদায়ের লোকের কাছ থেকে মানুষ যেটুকু প্রত্যাশা করতে পারে আমি আপনার কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি করি। কোনো-একটা দলকে সংখ্যায় বড়ো করে তোলাই যে-সমস্ত কুলির সর্দারের কাজ আপনি সে শ্রেণীর নন, এ আমি খুব জোর করে বলতে পারি। আপনি নিজেও যাতে নিজেকে ঠিকমত বুঝতে পারেন এইটে আমার ইচ্ছা। অন্য পাঁচজনের কথায় ভুলে আপনি নিজেকে ছোটো বলে জানবেন না। আপনি কোনো-একটি দলের লোকমাত্র নন, এ কথাটা আপনাকে নিজের মনের মধ্যে থেকে নিজে স্পষ্ট বুঝতে হবে।"

সুচরিতা মনের সমস্ত শক্তিকে জাগাইয়া সতর্ক হইয়া শক্ত হইয়া বসিল। কহিল, "আপনিও কি কোনো দলের লোক নন ?"

গোরা কহিল, "আমি হিন্দু। হিন্দু তো কোনো দল নয়। হিন্দু একটা জাতি। এ জাতি এত বৃহৎ যে কিসে এই জাতির জাতিত্ব তা কোনো সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে বলাই যায় না। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয়, হিন্দু তেমনি দল নয়।"

সুচরিতা কহিল, "হিন্দু যদি দল নয় তবে দলাদলি করে কেন ?"

গোরা কহিল, "মানুষকে মারতে গেলে সে ঠেকাতে যায় কেন ? তার প্রাণ আছে বলে। পাথরই সকলরকম আঘাতে চুপ করে পড়ে থাকে।"

সুচরিতা কহিল, "আমি যাকে ধর্ম বলে জ্ঞান করছি হিন্দু যদি তাকে

আঘাত বলে গণ্য করে, তবে সে স্থলে আমাকে আপনি কী করতে বলেন ?"

গোরা কহিল, "তখন আমি আপনাকে বলব যে, যেটাকে আপনি কর্তব্য মনে করছেন সেটা যখন হিন্দুজাতি বলে এতবড়ো একটি বিরাট সত্তার পক্ষে বেদনাকর আঘাত তখন আপনাকে খুব চিন্তা করে দেখতে হবে, আপনার মধ্যে কোনো ভ্রম কোনো অন্ধতা আছে কি না, আপনি সব দিক সকল রকম করে চিন্তা করে দেখেছেন কি না। দলের লোকের সংস্কারকে কেবলমাত্র অভ্যাস বা আলস্য -বশত সত্য বলে ধরে নিয়ে এতবড়ো একটা উৎপাত করতে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয়। ইঁদুর যখন জাহাজের খোল কাটতে থাকে তখন ইঁদুরের সুবিধা ও প্রবৃত্তির হিসাব থেকেই সে কাজ করে ; দেখে না এতবড়ো একটা আশ্রয়ে ছিদ্র করলে তার যেটুকু সুবিধা তার চেয়ে সকলের কতবড়ো ক্ষতি। আপনাকেও তেমনি ভেবে দেখতে হবে, আপনি কি কেবল আপনার দলটির কথা ভাবছেন, না সমস্ত মানুষের কথা ভাবছেন। সমস্ত মানুষ বললে কতটা বোঝায় তা জানেন ? তার কত রকমের প্রকৃতি, কত রকমের প্রবৃত্তি, কত রকমের প্রয়োজন ? সব মানুষ এক পথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই— কারও সামনে পাহাড়, কারও সামনে সমুদ্র, কারও সামনে প্রান্তর। অথচ কারও বসে থাকবার জো নেই, সকলকেই চলতে হবে। আপনি কেবল আপনার দলের শাসনটিকেই সকলের উপর খাটাতে চান ? চোখ বুজে মনে করতে চান, মানুষের মধ্যে কোনো বৈচিত্র্যই নেই, কেবল ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লেখাবার জন্যেই সকলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ? যে-সকল দস্যুজাতি পৃথিবীর সমস্ত জাতিকেই যুদ্ধে জয় করে নিজের একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করাকেই পৃথিবীর একমাত্র কল্যাণ বলে কল্পনা করে, অন্যান্য জাতির বিশেষত্ব যে বিশ্বহিতের পক্ষে বহুমূল্য বিধান নিজের বলগর্বে তা যারা স্বীকার করে না এবং পৃথিবীতে কেবল দাসত্ব বিস্তার করে, তাদের সঙ্গে আপনাদের প্রভেদ কোন্‌খানে !"

সুচরিতা ক্ষণকালের জন্য তর্কযুক্তি সমস্তই ভুলিয়া গেল। গোরার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর একটি আশ্চর্য প্রবলতা -দ্বারা তাহার সমস্ত অন্তঃকরণকে

আন্দোলিত করিয়া তুলিল। গোরা যে কোনো-একটা বিষয় লইয়া তর্ক করিতেছে তাহা সুচরিতার মনে রহিল না, তাহার কাছে কেবল এই সত্যটুকুই জাগিতে লাগিল যে গোরা বলিতেছে।

গোরা কহিল, "আপনাদের সমাজই ভারতের বিশ কোটি লোককে সৃষ্টি করে নি ; কোন্ পন্থা এই বিশ কোটি লোকের পক্ষে উপযোগী— কোন্ বিশ্বাস কোন্ আচার এদের সকলকে খাদ্য দেবে, শক্তি দেবে, তা বেঁধে দেবার ভার জোর করে নিজের উপর নিয়ে এতবড়ো ভারতবর্ষকে একেবারে একাকার সমতল করে দিতে চান কী ব'লে ! এই অসাধ্য-সাধনে যতই বাধা পাচ্ছেন ততই দেশের উপর আপনাদের রাগ হচ্ছে, অশ্রদ্ধা হচ্ছে, ততই যাদের হিত করতে চান তাদের ঘৃণা করে পর করে তুলছেন। অথচ যে ঈশ্বর মানুষকে বিচিত্র করে সৃষ্টি করেছেন এবং বিচিত্রই রাখতে চান, তাঁকেই আপনারা পূজা করেন, এই কথা কল্পনা করেন। যদি সত্যই আপনারা তাঁকে মানেন তবে তাঁর বিধানকে আপনারা স্পষ্ট করে দেখতে পান না কেন, নিজের বুদ্ধির এবং দলের অহংকারে কেন এর তাৎপর্যটি গ্রহণ করছেন না !"

সুচরিতা কিছুমাত্র উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া গোরার কথা শুনিয়া যাইতেছে দেখিয়া গোরার মনে করুণার সঞ্চার হইল। সে একটুখানি থামিয়া গলা নামাইয়া কহিল, "আমার কথাগুলো আপনার কাছে হয়তো কঠোর শোনাচ্ছে— কিন্তু আমাকে একটা বিরুদ্ধপক্ষের মানুষ বলে মনে কোনো বিদ্রোহ রাখবেন না। আমি যদি আপনাকে বিরুদ্ধপক্ষ বলে মনে করতুম তা হলে কোনো কথাই বলতুম না। আপনার মনে যে একটি স্বাভাবিক উদার শক্তি আছে সেটা দলের মধ্যে সংকুচিত হচ্ছে বলে আমি কষ্ট বোধ করছি।"

সুচরিতার মুখ আরক্তিম হইল ; সে কহিল, "না না, আমার কথা আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি বলে যান, আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।"

গোরা কহিল, "আমার আর-কিছুই বলবার নেই— ভারতবর্ষকে আপনি আপনার সহজ বুদ্ধি সহজ হৃদয় দিয়ে দেখুন, একে আপনি ভালোবাসুন।

ভারতবর্ষের লোককে যদি আপনি অব্রাহ্ম বলে দেখেন, তা হলে তাদের বিকৃত করে দেখবেন এবং তাদের অবজ্ঞা করবেন ; তা হলে তাদের কেবলই ভুল বুঝতে থাকবেন। যেখান থেকে দেখলে তাদের সম্পূর্ণ দেখা যায় সেখান থেকে তাদের দেখাই হবে না। ঈশ্বর এদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন, এরা নানারকম করে ভাবে, নানারকম করে চলে, এদের বিশ্বাস এদের সংস্কার নানারকম— কিন্তু সমস্তেরই ভিত্তিতে একটি মনুষ্যত্ব আছে ; সমস্তেরই ভিতরে এমন একটি জিনিস আছে যা আমার জিনিস, যা আমার এই ভারতবর্ষের জিনিস, যার প্রতি ঠিক সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা-অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করে একটি আশ্চর্য মহৎসত্তা চোখের উপরে পড়ে ; অনেক দিনের অনেক সাধনা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়, দেখতে পাই অনেক কালের হোমের অগ্নি ভস্মের মধ্যে এখনো জ্বলছে এবং সেই অগ্নি একদিন আপনার ক্ষুদ্র দেশকালকে ছাড়িয়ে উঠে পৃথিবীর মাঝখানে তার শিখাকে জাগিয়ে তুলবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না ; এই ভারতবর্ষের মানুষ অনেক দিন থেকে অনেক বড়ো কথা বলেছে, অনেক বড়ো কাজ করেছে, সে-সমস্তই একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে এ কথা কল্পনা করাও সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা, সেই তো নাস্তিকতা।”

সুচরিতা মুখ নিচু করিয়া শুনিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া কহিল, “আপনি আমাকে কী করতে বলেন ?”

গোরা কহিল, “আর কিছু বলি নে— আমি কেবল বলি আপনাকে এই কথাটা বুঝে দেখতে হবে যে, হিন্দুধর্ম মায়ের মতো নানা ভাবের নানা মতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা করেছে ; অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্মই জগতে মানুষকে মানুষ বলেই স্বীকার করেছে, দলের লোক বলে গণ্য করে নি। হিন্দুধর্ম মূঢ়কেও মানে, জ্ঞানীকেও মানে— এবং কেবলমাত্র জ্ঞানের এক মূর্তিকেই মানে না, জ্ঞানের বহুপ্রকার বিকাশকে মানে। খৃস্টানরা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে চায় না ; তারা বলে, এক পারে খৃস্টানধর্ম আর-এক পারে অনন্ত বিনাশ, এর মাঝখানে কোনো বিচিত্রতা নেই। আমরা

সেই খৃস্টানের কাছ থেকেই পাঠ নিয়েছি, তাই হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের জন্যে লজ্জা পাই। এই বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই হিন্দুধর্ম যে এককে দেখবার জন্যে সাধনা করছে সেটা আমরা দেখতে পাই নে। এই খৃস্টানি শিক্ষার পাক মনের চারি দিক থেকে খুলে ফেলে মুক্তিলাভ না করলে আমরা হিন্দুধর্মের সত্যপরিচয় পেয়ে গৌরবের অধিকারী হব না।"

কেবল গোরার কথা শোনা নহে, সুচরিতা যেন গোরার কথা সম্মুখে দেখিতেছিল, গোরার চোখের মধ্যে দূর-ভবিষ্যৎ-নিবদ্ধ যে-একটি ধ্যানদৃষ্টি ছিল সেই দৃষ্টি এবং বাক্য সুচরিতার কাছে এক হইয়া দেখা দিল। লজ্জা ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, ভাবের উৎসাহে উদ্দীপ্ত গোরার মুখের দিকে সুচরিতা চোখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল। এই মুখের মধ্যে সুচরিতা এমন একটি শক্তি দেখিল যে শক্তি পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সংকল্পকে যেন যোগবলে সত্য করিয়া তোলে। সুচরিতা তাহার সমাজের অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকের কাছে অনেক তত্ত্বালোচনা শুনিয়াছে, কিন্তু গোরার এ তো আলোচনা নহে, এ যেন সৃষ্টি। ইহা এমন একটা প্রত্যক্ষ ব্যাপার যাহা এককালে সমস্ত শরীর-মনকে অধিকার করিয়া বসে। সুচরিতা আজ বজ্রপাণি ইন্দ্রকে দেখিতেছিল— বাক্য যখন প্রবলমন্দ্রে কর্ণে আঘাত করিয়া তাহার বক্ষঃকপাটকে স্পন্দিত করিতেছিল সেই সঙ্গে বিদ্যুতের তীব্রচ্ছটা তাহার রক্তের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য করিয়া উঠিতেছিল। গোরার মতের সঙ্গে তাহার মতের কোথায় কী পরিমাণ মিল আছে বা মিল নাই, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিবার শক্তি সুচরিতার রহিল না।

এমন সময় সতীশ ঘরে প্রবেশ করিল। গোরাকে সে ভয় করিত, তাই তাহাকে এড়াইয়া সে তাহার দিদির পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল এবং আস্তে আস্তে বলিল, "পানুবাবু এসেছেন।"

সুচরিতা চমকিয়া উঠিল— তাহাকে কে যেন মারিল। পানুবাবুর আসাটাকে সে কোনোপ্রকারে ঠেলিয়া সরাইয়া, চাপা দিয়া, একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারিলে বাঁচে এমনি তাহার অবস্থা হইল। সতীশের

মৃদু কণ্ঠস্বর গোরা শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া সুচরিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সে একেবারে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া হারানবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই কহিল, "আমাকে মাপ করবেন, আজ আপনার সঙ্গে কথাবার্তার সুবিধা হবে না।"

হারানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন সুবিধা হবে না?"

সুচরিতা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, "কাল সকালে আপনি যদি বাবার ওখানে আসেন তা হলে আমার সঙ্গে দেখা হবে।"

হারানবাবু কহিলেন, "আজ বুঝি তোমার ঘরে লোক আছে?"

এ প্রশ্নও এড়াইয়া সুচরিতা কহিল, "আজ আমার অবসর হবে না, আজ আপনি দয়া করে মাপ করবেন।"

হারানবাবু কহিলেন, "কিন্তু, রাস্তা থেকে গৌরমোহনবাবুর গলার স্বর শুনলুম যে, তিনি আছেন বুঝি?"

এ প্রশ্নকে সুচরিতা আর চাপা দিতে পারিল না, মুখ লাল করিয়া বলিল, "হাঁ, আছেন।"

হারানবাবু কহিলেন, "ভালোই হয়েছে, তাঁর সঙ্গেও আমার কথা ছিল। তোমার হাতে যদি বিশেষ কোনো কাজ থাকে তা হলে আমি তত ক্ষণ গৌরমোহনবাবুর সঙ্গে আলাপ করব।"

বলিয়া সুচরিতার কাছ হইতে কোনো সম্মতির প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন। সুচরিতা পার্শ্ববর্তী হারানবাবুর প্রতি কোনো লক্ষ না করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া গোরাকে কহিল, "মাসি আপনার জন্যে খাবার তৈরি করতে গেছেন, আমি তাঁকে একবার দেখে আসি।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং হারানবাবু গম্ভীর মুখে একটা চৌকি অধিকার করিয়া বসিলেন।

হারানবাবু কহিলেন, "কিছু রোগা দেখছি যেন।"

গোরা কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, কিছুদিন রোগা হবার চিকিৎসাই চলছিল।"

হারানবাবু কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করিয়া কহিলেন, "তাই তো, আপনাকে খুব

কষ্ট পেতে হয়েছে।”

গোরা কহিল, “যেরকম আশা করা যায় তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়।”

হারানবাবু কহিলেন, “বিনয়বাবুর সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আগামী রবিবারে ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নেবার জন্যে তিনি আয়োজন করেছেন।”

গোরা কহিল, “না, আমি শুনি নি।”

হারানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার এতে সম্মতি আছে?”

গোরা কহিল, “বিনয় তো আমার সম্মতি চায় নি।”

হারানবাবু কহিলেন, “আপনি কি মনে করেন বিনয়বাবু যথার্থ বিশ্বাসের সঙ্গে এই দীক্ষা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন?”

গোরা কহিল, “যখন তিনি দীক্ষা নিতে রাজি হয়েছেন তখন আপনার এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।”

হারানবাবু কহিলেন, “প্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন আমরা কী বিশ্বাস করি আর কী করি নে তা চিন্তা করে দেখবার অবসর পাই নে। আপনি তো মানবচরিত্র জানেন।”

গোরা কহিল, “না। মানবচরিত্র নিয়ে আমি অনাবশ্যক আলোচনা করি নে।”

হারানবাবু কহিলেন, “আপনার সঙ্গে আমার মতের এবং সমাজের মিল নেই, কিন্তু আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি নিশ্চয় জানি, আপনার যা বিশ্বাস, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, কোনো প্রলোভনে তার থেকে আপনাকে টলাতে পারবে না। কিন্তু—”

গোরা বাধা দিয়া কহিল, “আমার প্রতি আপনার ওই-যে একটুখানি শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে রেখেছেন তার এমনি কী মূল্য যে তার থেকে বঞ্চিত হওয়া বিনয়ের পক্ষে ভারী একটা ক্ষতি! সংসারে ভালো মন্দ বলে জিনিস অবশ্যই আছে, কিন্তু আপনার শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার দ্বারা যদি তার মূল্য নিরূপণ করেন তো করুন, তবে কিনা পৃথিবীর লোককে সেটা গ্রহণ করতে বলবেন না।”

হারানবাবু কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, ও কথাটার মীমাংসা এখন না হলেও চলবে। কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, বিনয় যে পরেশবাবুর ঘরে বিবাহ করবার চেষ্টা করছেন আপনি কি তাতে বাধা দেবেন না?"

গোরা লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, "হারানবাবু, বিনয়ের সম্বন্ধে এ-সমস্ত আলোচনা কি আমি আপনার সঙ্গে করতে পারি? আপনি সর্বদাই যখন মানবচরিত্র নিয়ে আছেন তখন এটাও আপনার বোঝা উচিত ছিল যে, বিনয় আমার বন্ধু এবং সে আপনার বন্ধু নয়।"

হারানাবাবু কহিলেন, "এই ব্যাপারের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যোগ আছে বলেই আমি এ কথা তুলেছি, নইলে—"

গোরা কহিল, "কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মসমাজের কেউ নই, আমার কাছে আপনার এই দুশ্চিন্তার মূল্য কী আছে।"

এমন সময় সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিল। হারানবাবু তাহাকে কহিলেন, "সুচরিতা, তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে।"

এটুকু বলিবার যে কোনো আবশ্যক ছিল তাহা নহে। গোরার কাছে সুচরিতার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করিবার জন্যই হারানবাবু গায়ে পড়িয়া কথাটা বলিলেন। সুচরিতা তাহার কোনো উত্তরই করিল না; গোরা নিজের আসনে অটল হইয়া বসিয়া রহিল, হারানবাবুকে বিশ্রম্ভালাপের অবকাশ দিবার জন্য সে উঠিবার কোনোপ্রকার লক্ষণ দেখাইল না।

হারানবাবু কহিলেন, "সুচরিতা, একবার ও ঘরে চলো তো, একটা কথা বলে নিই।"

সুচরিতা তাহার উত্তর না দিয়া গোরার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মা ভালো আছেন?"

গোরা কহিল, "মা ভালো নেই এমন তো কখনো দেখি নি।"

সুচরিতা কহিল, "ভালো থাকবার শক্তি যে তাঁর পক্ষে কত সহজ তা আমি দেখেছি।"

গোরা যখন জেলে ছিল তখন আনন্দময়ীকে সুচরিতা দেখিয়াছিল সেই

কথা স্মরণ করিল।

এমন সময় হারানবাবু হঠাৎ টেবিলের উপর হইতে একটা বই তুলিয়া লইলেন, এবং সেটা খুলিয়া প্রথমে লেখকের নাম দেখিয়া লইলেন, তাহার পরে বইখানা যেখানে-সেখানে খুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিলেন।

সুচরিতা লাল হইয়া উঠিল। বইখানি কী তাহা গোরা জানিত, তাই গোরা মনে মনে একটু হাসিল।

হারানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরমোহনবাবু, আপনার এ বুঝি ছেলেবেলাকার লেখা?"

গোরা হাসিয়া কহিল, "সে ছেলেবেলা এখনো চলছে। কোনো কোনো প্রাণীর ছেলেবেলা অতি অল্পদিনেই ফুরিয়ে যায়, কারও কারও ছেলেবেলা কিছু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।"

সুচরিতা চৌকি হইতে উঠিয়া কহিল, "গৌরমোহনবাবু, আপনার খাবার এত ক্ষণে তৈরি হয়েছে। আপনি তা হলে ও ঘরে একবার চলুন। মাসি আবার পানুবাবুর কাছে বের হবেন না, তিনি হয়তো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

এই শেষ কথাটা সুচরিতা হারানবাবুকে বিশেষ করিয়া আঘাত করিবার জন্যই বলিল। সে আজ অনেক সহিয়াছে, কিছু ফিরাইয়া না দিয়া থাকিতে পারিল না।

গোরা উঠিল। অপরাজিত হারানবাবু কহিলেন, "আমি তবে অপেক্ষা করি?"

সুচরিতা কহিল, "কেন মিথ্যা অপেক্ষা করবেন, আজ আর সময় হয়ে উঠবে না।"

কিন্তু হারানবাবু উঠিলেন না। সুচরিতা ও গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোরাকে এ বাড়িতে দেখিয়া ও তাহার প্রতি সুচরিতার ব্যবহার লক্ষ করিয়া হারানবাবুর মন সশস্ত্র জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজ হইতে সুচরিতা

কি এমনি করিয়া স্খলিত হইয়া যাইবে! তাহাকে রক্ষা করিবার কেহই নাই! যেমন করিয়া হোক ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

হারানবাবু একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া সুচরিতাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। হারানবাবুর কতকগুলি বাঁধা বিশ্বাস ছিল। তাহার মধ্যে এও একটি যে, সত্যের দোহাই দিয়া যখন তিনি ভর্ৎসনা প্রয়োগ করেন তখন তাঁহার তেজস্বী বাক্য নিষ্ফল হইতে পারে না। শুধু বাক্যই একমাত্র জিনিস নহে, মানুষের মন বলিয়া একটা পদার্থ আছে সে কথা তিনি চিন্তাই করেন না।

আহারান্তে হরিমোহিনীর সঙ্গে অনেক ক্ষণ আলাপ করিয়া গোরা তাহার লাঠি লইবার জন্য যখন সুচরিতার ঘরে আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সুচরিতার ডেস্কের উপরে বাতি জ্বলিতেছে। হারানবাবু চলিয়া গেছেন। সুচরিতার নাম-লেখা একখানি চিঠি টেবিলের উপর শয়ান রহিয়াছে, সেখানি ঘরে প্রবেশ করিলে চোখে পড়ে।

সেই চিঠি দেখিয়াই গোরার বুকের ভিতরটা অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠিল। চিঠি যে হারানবাবুর লেখা তাহাতে সন্দেহ ছিল না। সুচরিতার প্রতি হারানবাবুর যে একটা বিশেষ অধিকার আছে তাহা গোরা জানিত; সেই অধিকারের যে কোনো ব্যত্যয় ঘটিয়াছে তাহা সে জানিত না। আজ যখন সতীশ সুচরিতার কানে কানে হারানবাবুর আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিল এবং সুচরিতা সচকিত হইয়া দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল ও অল্পকাল পরেই নিজে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসিল তখন গোরার মনে খুব একটা বেসুর বাজিয়াছিল। তাহার পরে হারানবাবুকে যখন ঘরে একলা ফেলিয়া সুচরিতা গোরাকে খাইতে লইয়া গেল তখন সে ব্যবহারটা কড়া ঠেকিয়াছিল বটে, কিন্তু ঘনিষ্ঠতার স্থলে এরূপ রূঢ় ব্যবহার চলিতে পারে মনে করিয়া গোরা সেটাকে আত্মীয়তার লক্ষণ বলিয়াই স্থির করিয়াছিল। তাহার পরে টেবিলের উপর এই চিঠিখানা দেখিয়া গোরা খুব একটা ধাক্কা পাইল। চিঠি বড়ো একটা রহস্যময় পদার্থ। বাহিরে কেবল নামটুকু দেখাইয়া সব কথাই

সে ভিতরে রাখিয়া দেয় বলিয়া সে মানুষকে নিতান্ত অকারণে নাকাল করিতে পারে।

গোরা সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি কাল আসব।"

সুচরিতা আনতনেত্রে কহিল, "আচ্ছা।"

গোরা বিদায় লইতে উন্মুখ হইয়া হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "ভারতবর্ষের সৌরমণ্ডলের মধ্যেই তোমার স্থান— তুমি আমার আপন দেশের— কোনো ধূমকেতু এসে তোমাকে যে তার পুচ্ছ দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে শূন্যের মধ্যে চলে যাবে সে কোনোমতেই হতে পারবে না। যেখানে তোমার প্রতিষ্ঠা সেইখানেই তোমাকে দৃঢ় করে প্রতিষ্ঠিত করব, তবে আমি ছাড়ব। সে জায়গায় তোমার সত্য, তোমার ধর্ম, তোমাকে পরিত্যাগ করবে এই কথা এরা তোমাকে বুঝিয়েছে; আমি তোমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেব, তোমার সত্য, তোমার ধর্ম, কেবল তোমার কিম্বা আর দু-চার জনের মত বা বাক্য নয়; সে চারি দিকের সঙ্গে অসংখ্য প্রাণের সূত্রে জড়িত, তাকে ইচ্ছা করলেই বন থেকে উপড়ে নিয়ে টবের মধ্যে পোঁতা যায় না— যদি তাকে উজ্জ্বল ক'রে সজীব ক'রে রাখতে চাও, যদি তাকে সর্বাঙ্গীণরূপে সার্থক করে তুলতে চাও, তবে তোমার জন্মের বহু পূর্বে যে লোকসমাজের হৃদয়ের মধ্যে তোমার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে সেইখানে তোমাকে আসন নিতেই হবে— কোনোমতেই বলতে পারবে না, 'আমি ওর পর, ও আমার কেউ নয়।' এ কথা যদি বল তবে তোমার সত্য, তোমার ধর্ম, তোমার শক্তি একেবারে ছায়ার মতো ম্লান হয়ে যাবে। ভগবান তোমাকে যে জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন সে জায়গা যেমনি হোক, তোমার মত যদি সেখান থেকে তোমাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়, তবে তাতে করে কখনোই তোমার মতের জয় হবে না এই কথাটা আমি তোমাকে নিশ্চয় বুঝিয়ে দেব। আমি কাল আসব।"

এই বলিয়া গোরা চলিয়া গেল। ঘরের ভিতরকার বাতাস যেন অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁপিতে লাগিল। সুচরিতা মূর্তির মতো নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় আনন্দময়ীকে কহিল, "দেখো মা, আমি তোমাকে সত্য বলছি, যতবার আমি ঠাকুরকে প্রণাম করেছি আমার মনের ভিতরে কেমন লজ্জা বোধ হয়েছে। সে লজ্জা আমি চেপে দিয়েছি— উল্‌টে আরও ঠাকুরপূজার পক্ষ নিয়ে ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্তু সত্য তোমাকে বলছি, আমি যখন প্রণাম করেছি আমার মনের ভিতরটা তখন সায় দেয় নি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোর মন কি সহজ মন! তুই তো মোটামুটি করে কিছুই দেখতে পারিস নে। সব তাতেই একটা-কিছু সূক্ষ্ম কথা ভাবিস। সেই জন্যেই তোর মন থেকে খুঁৎখুঁৎ আর ঘোচে না।"

বিনয় কহিল, "ওই কথাই তো ঠিক। অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি বলেই আমি যা বিশ্বাস না করি তাও চুল-চেরা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে পারি। সুবিধামত নিজেকে এবং অন্যকে ভোলাই। এতদিন আমি ধর্ম সম্বন্ধে যে-সমস্ত তর্ক করেছি সে ধর্মের দিক থেকে করি নি, দলের দিক থেকে করেছি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "ধর্মের দিকে যখন সত্যকার টান না থাকে তখন ওইরকমই ঘটে। তখন ধর্মটাও বংশ মান টাকাকড়ির মতোই অহংকার করবার সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।"

বিনয়। হাঁ, তখন এটা যে ধর্ম সে কথা ভাবি নে, এটা আমাদের ধর্ম এই কথা মনে নিয়েই যুদ্ধ করে বেড়াই। আমিও এতকাল তাই করেছি। তবুও আমি নিজেকে যে নিঃশেষে ভোলাতে পেরেছি তা নয়; যেখানে আমার বিশ্বাস পৌঁচচ্ছে না সেখানে আমি ভক্তির ভাণ করেছি ব'লে বরাবর আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়েছি।

আনন্দময়ী কহিলেন, "সে কি আর আমি বুঝি নে। তোরা যে সাধারণ লোকের চেয়ে ঢের বেশি বাড়াবাড়ি করিস তার থেকে "স্পষ্ট বোঝা যায়, মনের ভিতরটাতে ফাঁক আছে বলে সেইটে বোজাতে তোদের অনেক মসলা

খরচ করতে হয়। ভক্তি সহজ হলে অত দরকার করে না।"

বিনয় কহিল, "তাই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, যা আমি বিশ্বাস করি নে তাকে বিশ্বাস করবার ভাণ করা কি ভালো?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "শোনো একবার! এমন কথাও জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি!"

বিনয় কহিল, "মা, আমি পরশু দিন ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নেব।"

আনন্দময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি কথা বিনয়! দীক্ষা নেবার কী এমন দরকার হয়েছে!"

বিনয় কহিল, "কী দরকার হয়েছে সেই কথাই তো এতক্ষণ বলছিলুম মা।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোর যা বিশ্বাস তা নিয়ে কি তুই আমাদের সমাজে থাকতে পারিস নে?"

বিনয় কহিল, "থাকতে গেলে কপটতা করতে হয়।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কপটতা না করে থাকবার সাহস নেই? সমাজের লোকে কষ্ট দেবে— তা, কষ্ট সহ্য করে থাকতে পারবি নে?"

বিনয় কহিল, "মা, আমি যদি হিন্দুসমাজের মতে না চলি তা হলে—"

আনন্দময়ী কহিলেন, "হিন্দুসমাজে যদি তিন-শো তেত্রিশ কোটি মত চলতে পারে তবে তোমার মতই বা চলবে না কেন?"

বিনয় কহিল, "কিন্তু মা, আমাদের সমাজের লোক যদি বলে 'তুমি হিন্দু নও' তা হলে আমি কি জোর করে বললেই হল 'আমি হিন্দু'?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "আমাকে তো আমাদের সমাজের লোকে বলে খৃস্টান— আমি তো কাজ-কর্মে তাদের সঙ্গে একত্রে বসে খাই নে। তবুও তারা আমাকে খৃস্টান বললেই সে কথা আমাকে মেনে নিতে হবে, এমন তো আমি বুঝি নে। যেটাকে উচিত বলে জানি সেটার জন্যে কোথাও পালিয়ে বসে থাকা আমি অন্যায় মনে করি।"

বিনয় ইহার উত্তর দিতে যাইতেছিল। আনন্দময়ী তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়াই কহিলেন, "বিনয়, তোকে আমি তর্ক করতে দেব না, এ তর্কের

কথা নয়। তুই আমার কাছে কি কিছু ঢাকতে পারিস? আমি যে দেখতে পাচ্ছি, তুই আমার সঙ্গে তর্ক করবার ছুতো ধরে জোর করে আপনাকে ভোলাবার চেষ্টা করছিস। কিন্তু এতবড়ো গুরুতর ব্যাপারে ওরকম ফাঁকি চালাবার মৎলব করিস নে।"

বিনয় মাথা নিচু করিয়া কহিল, "কিন্তু মা, আমি তো চিঠি লিখে কথা দিয়ে এসেছি, কাল আমি দীক্ষা নেব।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "সে হতে পারবে না। পরেশবাবুকে যদি বুঝিয়ে বলিস তিনি কখনোই পীড়াপীড়ি করবেন না।"

বিনয় কহিল, "পরেশবাবুর এ দীক্ষায় কোনো উৎসাহ নেই, তিনি এ অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন না।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তবে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।"

বিনয় কহিল, "না মা, কথা ঠিক হয়ে গেছে, এখন আর ফেরানো যাবে না। কোনোমতেই না।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "গোরাকে বলেছিস?"

বিনয় কহিল, "গোরার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কেন— গোরা এখন বাড়িতে নেই?"

বিনয় কহিল, "না, খবর পেলুম সে সুচরিতার বাড়িতে গেছে।"

আনন্দময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সেখানে তো সে কাল গিয়েছিল।"

বিনয় কহিল, "আজও গেছে।"

এমন সময় প্রাঙ্গণে পালকির বেহারার আওয়াজ পাওয়া গেল। আনন্দময়ীর কোনো কুটুম্ব স্ত্রীলোকের আগমন কল্পনা করিয়া বিনয় বাহিরে চলিয়া গেল।

ললিতা আসিয়া আনন্দময়ীকে প্রণাম করিল। আজ আনন্দময়ী কোনো-মতেই ললিতার আগমন প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া ললিতার মুখের দিকে চাহিতেই বুঝিলেন, বিনয়ের দীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া ললিতার একটা কোথাও সংকট উপস্থিত হইয়াছে, তাই সে তাঁহার কাছে আসিয়াছে।

তিনি কথা পাড়িবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কহিলেন, "মা, তুমি এসেছ বড়ো খুশি হলুম। এইমাত্র বিনয় এখানে ছিলেন; কাল তিনি তোমাদের সমাজে দীক্ষা নেবেন আমার সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল।"

ললিতা কহিল, "কেন তিনি দীক্ষা নিতে যাচ্ছেন? তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?"

আনন্দময়ী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "প্রয়োজন নেই মা?"

ললিতা কহিল, "আমি তো কিছু ভেবে পাই নে।"

আনন্দময়ী ললিতার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ললিতা মুখ নিচু করিয়া কহিল, "হঠাৎ এরকম ভাবে দীক্ষা নিতে আসা তাঁর পক্ষে অপমানকর। এ অপমান তিনি কিসের জন্যে স্বীকার করতে যাচ্ছেন?"

কিসের জন্যে! সে কথা কি ললিতা জানে না? ইহার মধ্যে ললিতার পক্ষে কি আনন্দের কথা কিছুই নাই?

আনন্দময়ী কহিলেন, "কাল দীক্ষার দিন, সে পাকা কথা দিয়েছে— এখন আর পরিবর্তন করবার জো নেই, বিনয় তো এই রকমই বলছিল।"

ললিতা আনন্দময়ীর মুখের দিকে তাহার দীপ্ত দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "এ-সব বিষয়ে পাকা কথার কোনো মানে নেই, যদি পরিবর্তন আবশ্যক হয় তা হলে করতেই হবে।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "মা, তুমি আমার কাছে লজ্জা কোরো না, সব কথা তোমাকে খুলে বলি। এই এতক্ষণ আমি বিনয়কে বোঝাচ্ছিলুম, তার ধর্ম-বিশ্বাস যেমনই থাক্ সমাজকে ত্যাগ করা তার উচিতও না, দরকারও না। মুখে যাই বলুক সেও যে সে কথা বোঝে না তাও বলতে পারি নে। কিন্তু মা, তার মনের ভাব তোমার কাছে তো অগোচর নেই। সে নিশ্চয় জানে, সমাজ পরিত্যাগ না করলে তোমাদের সঙ্গে তার যোগ হতে পারবে না। লজ্জা কোরো না মা, ঠিক করে বলো দেখি এ কথাটা কি সত্য না?"

ললিতা আনন্দময়ীর মুখের দিকে মুখ তুলিয়াই কহিল, "মা, তোমার কাছে আমি কিছুই লজ্জা করব না— আমি তোমাকে বলছি আমি এ-সব মানি নে। আমি খুব ভালো করেই ভেবে দেখেছি, মানুষের ধর্ম বিশ্বাস সমাজ যাই থাক্-না, সে-সমস্ত লোপ করে দিয়েই তবে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগ হবে এ কখনো হতেই পারে না। তা হলে তো হিন্দুতে খৃস্টানে বন্ধুত্বও হতে পারে না। তা হলে তো বড়ো বড়ো পাঁচিল তুলে দিয়ে এক-এক সম্প্রদায়কে এক-এক বেড়ার মধ্যেই রেখে দেওয়া উচিত।"

আনন্দময়ী মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, "আহা, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। আমি তো ওই কথাই বলি। এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের রূপ গুণ স্বভাব কিছুই মেলে না; তবু তো সেজন্য দুই মানুষের মিলনে বাধে না— আর, মত বিশ্বাস নিয়েই বা বাধবে কেন? মা, তুমি আমাকে বাঁচালে, আমি বিনয়ের জন্যে বড়ো ভাবছিলুম। ওর মন ও সমস্তই তোমাদের দিয়েছে সে আমি জানি; তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধে যদি ওর কোথাও কিছু ঘা লাগে সে তো বিনয় কোনোমতেই সইতে পারবে না। তাই ওকে বাধা দিতে আমার মনে যে কী রকম বাজছিল সে অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু ওর কী সৌভাগ্য! ওর এমন সংকট এমন সহজে কাটিয়ে দিলে, এ কি কম কথা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পরেশবাবুর সঙ্গে কি এ কথা কিছু হয়েছে?"

ললিতা লজ্জা চাপিয়া কহিল, "না, হয় নি। কিন্তু আমি জানি, তিনি সব কথা ঠিক বুঝবেন।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তাই যদি না বুঝবেন তবে এমন বুদ্ধি এমন মনের জোর তুমি পেলে কোথা থেকে। মা, আমি বিনয়কে ডেকে আনি, তার সঙ্গে নিজের মুখে তোমার বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত। এইবেলা আমি একটা কথা তোমাকে বলে নিই মা, বিনয়কে আমি এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি— ও ছেলে এমন ছেলে যে ওর জন্যে যত দুঃখই তোমরা স্বীকার করে নাও সে-সমস্ত দুঃখকেই ও সার্থক্ করবে এ আমি জোর করে

বলছি। আমি কতদিন ভেবেছি, বিনয়কে যে লাভ করবে এমন ভাগ্যবতী কে আছে। মাঝে মাঝে সম্বন্ধ এসেছে, কাউকে আমার পছন্দ হয় নি। আজ দেখতে পাচ্ছি, ওরও ভাগ্য বড়ো কম নয়।"

এই বলিয়া আনন্দময়ী ললিতার চিবুক হইতে চুম্বন গ্রহণ করিয়া লইলেন ও বিনয়কে ডাকিয়া আনিলেন। কৌশলে লছমিয়াকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া তিনি ললিতার আহারের আয়োজন উপলক্ষ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

আজ আর ললিতা ও বিনয়ের মধ্যে সংকোচের অবকাশ ছিল না। তাহাদের উভয়ের জীবনে যে-একটি কঠিন সংকটের আবির্ভাব হইয়াছে তাহারই আহ্বানে তাহারা পরস্পরের সম্বন্ধকে সহজ করিয়া ও বড়ো করিয়া দেখিল— তাহাদের মাঝখানে কোনো আবেশের বাষ্প আসিয়া রঙিন আবরণ ফেলিয়া দিল না। তাহাদের দুই জনের হৃদয় যে মিলিয়াছে এবং তাহাদের দুই জীবনের ধারা গঙ্গাযমুনার মতো একটি পুণ্যতীর্থে এক হইবার জন্য আসন্ন হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনামাত্র না করিয়া এ কথাটি তাহারা বিনীত গম্ভীর ভাবে নীরবে অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইল। সমাজ তাহাদের দুই জনকে ডাকে নাই, কোনো মত তাহাদের দুই জনকে মেলায় নাই, তাহাদের বন্ধন কোনো কৃত্রিম বন্ধন নহে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহারা নিজেদের মিলনকে এমন একটি ধর্মের মিলন বলিয়া অনুভব করিল যে ধর্ম অত্যন্ত বৃহৎ ভাবে সরল, যাহা কোনো ছোটো কথা লইয়া বিবাদ করে না, যাহাকে কোনো পঞ্চায়েতের পণ্ডিত বাধা দিতে পারে না। ললিতা তাহার মুখচক্ষু দীপ্তিমান করিয়া কহিল, 'আপনি যে হেঁট হইয়া নিজেকে খাটো করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন, এ অগৌরব আমি সহ্য করিতে পারিব না। আপনি যেখানে আছেন সেইখানেই অবিচলিত হইয়া থাকিবেন, এই আমি চাই।'

বিনয় কহিল, 'আপনার যেখানে প্রতিষ্ঠা আপনিও সেখানে স্থির থাকিবেন, কিছুমাত্র আপনাকে নড়িতে হইবে না। প্রীতি যদি প্রভেদকে স্বীকার করিতে না পারে, তবে জগতে কোনো প্রভেদ কোথাও আছে কেন।'

উভয়ে প্রায় বিশ মিনিট ধরিয়া যে কথাবার্তা কহিয়াছিল তাহার সারমর্মটুকু এই দাঁড়ায়। তাহারা হিন্দু কি ব্রাহ্ম এ কথা তাহারা ভুলিল, তাহারা যে দুই মানবাত্মা এই কথাই তাহাদের মনের মধ্যে নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।

৫৯

পরেশবাবু উপাসনার পর তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। সূর্য সদ্য অস্ত গিয়াছে।

এমন সময় ললিতাকে সঙ্গে লইয়া বিনয় সেখানে প্রবেশ করিল ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পরেশের পদধূলি লইল।

পরেশ উভয়কে এভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। কাছে বসিতে দিবার চৌকি ছিল না; তাই বলিলেন, "চলো, ঘরে চলো।" বিনয় কহিল, "না, আপনি উঠবেন না।" বলিয়া সেইখানে ভূমিতলেই বসিল। ললিতাও একটু সরিয়া পরেশের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

বিনয় কহিল, "আমরা দুজনে একত্রে আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। সেই আমাদের জীবনের সত্যদীক্ষা হবে।"

পরেশবাবু বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিনয় কহিল, "বাঁধা নিয়মে বাঁধা কথায় সমাজে প্রতিজ্ঞাগ্রহণ আমি করব না। যে দীক্ষায় আমাদের দুজনের জীবন নত হয়ে সত্যবন্ধনে বদ্ধ হবে সেই দীক্ষা আপনার আশীর্বাদ। আমাদের দুজনেরই হৃদয় ভক্তিতে আপনারই পায়ের কাছে প্রণত হয়েছে, আমাদের যা মঙ্গল তা ঈশ্বর আপনার হাত দিয়েই দেবেন।"

পরেশবাবু কিছু ক্ষণ কোনো কথা না বলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "বিনয়, তুমি তা হলে ব্রাহ্ম হবে না?"

বিনয় কহিল, "না।"

পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হিন্দুসমাজেই থাকতে চাও ?"

বিনয় কহিল, "হাঁ।"

পরেশবাবু ললিতার মুখের দিকে চাহিলেন। ললিতা তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল, "বাবা, আমার যা ধর্ম তা আমার আছে এবং বরাবর থাকবে। আমার অসুবিধা হতে পারে, কষ্টও হতে পারে ; কিন্তু যাদের সঙ্গে আমার মতের এমন-কি আচরণের অমিল আছে তাদের পর করে দিয়ে তফাতে না সরিয়ে রাখলে আমার ধর্মে বাধবে, এ কথা আমি কোনোমতেই মনে করতে পারি নে।"

পরেশবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। ললিতা কহিল, "আগে আমার মনে হত ব্রাহ্মসমাজই যেন একমাত্র জগৎ, এর বাইরে যেন সব ছায়া। ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছেদ যেন সমস্ত সত্য থেকে বিচ্ছেদ। কিন্তু এই কয়দিনে সে ভাব আমার একেবারে চলে গেছে।"

পরেশবাবু ম্লানভাবে একটু হাসিলেন।

ললিতা কহিল, "বাবা, আমি তোমাকে জানাতে পারি নে আমার কতবড়ো একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আমি যে-সব লোক দেখছি তাদের অনেকের সঙ্গে আমার ধর্মমত এক হলেও তাদের সঙ্গে তো আমি কোনোমতেই এক নই— তবু ব্রাহ্মসমাজ ব'লে একটা নামের আশ্রয় নিয়ে তাদেরই আমি বিশেষ করে আপন বলব, আর পৃথিবীর অন্য সব লোককেই দূরে রেখে দেব, আজকাল আমি এর কোনো মানে বুঝতে পারি নে।"

পরেশবাবু তাঁহার বিদ্রোহী কন্যার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ব্যক্তিগত কারণে মন যখন উত্তেজিত থাকে তখন কি বিচার ঠিক হয়? পূর্বপুরুষ থেকে সন্তানসন্ততি পর্যন্ত মানুষের যে একটা পূর্বাপরতা আছে তার মঙ্গল দেখতে গেলে সমাজের প্রয়োজন হয়— সে প্রয়োজন তো কৃত্রিম প্রয়োজন নয়। তোমাদের ভাবী বংশের মধ্যে যে দূরব্যাপী ভবিষ্যৎ রয়েছে তার ভার যার উপরে স্থাপিত সেই তোমাদের সমাজ, তার কথা কি

ভাববে না ?"

বিনয় কহিল, "হিন্দুসমাজ তো আছে।"

পরেশবাবু কহিলেন, "হিন্দুসমাজ তোমাদের ভার যদি না নেয়, যদি না স্বীকার করে ?"

বিনয় আনন্দময়ীর কথা স্মরণ করিয়া কহিল, "তাকে স্বীকার করাবার ভার আমাদের নিতে হবে। হিন্দুসমাজ তো বরাবরই নূতন নূতন সম্প্রদায়কে আশ্রয় দিয়েছে, হিন্দুসমাজ সকল ধর্মসম্প্রদায়েরই সমাজ হতে পারে।"

পরেশবাবু কহিলেন, "মুখের তর্কে একটা জিনিসকে একরকম করে দেখানো যেতে পারে কিন্তু কাজে সেরকমটি পাওয়া যায় না। নইলে কেউ ইচ্ছা করে কি পুরাতন সমাজকে ছাড়তে পারে ? যে সমাজ মানুষের ধর্মবোধকে বাহ্য আচারের বেড়ি দিয়ে একই জায়গায় বন্দী করে বসিয়ে রাখতে চায়, তাকে মানতে গেলে নিজেদের চিরদিনের মতো কাঠের পুতুল করে রাখতে হয়।"

বিনয় কহিল, "হিন্দুসমাজের যদি সেই সংকীর্ণ অবস্থাই হয়ে থাকে তবে সেটা থেকে মুক্তি দেবার ভার আমাদের নিতে হবে ; যেখানে ঘরের জানলা-দরজা বাড়িয়ে দিলেই ঘরে আলো-বাতাস আসে সেখানে কেউ রাগ করে পাকা বাড়ি ভূমিসাৎ করতে চায় না।"

ললিতা বলিয়া উঠিল, "বাবা, আমি এ-সমস্ত কথা বুঝতে পারি নে। কোনো সমাজের উন্নতির ভার নেবার জন্যে আমার কোনো সংকল্প নেই। কিন্তু, চারি দিক থেকে এমন একটা অন্যায় আমাকে ঠেলা দিচ্ছে যে আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে। কোনো কারণেই এ-সমস্ত সহ্য করে মাথা নিচু করে থাকা আমার উচিত নয়। উচিত-অনুচিতও আমি ভালো বুঝি নে—কিন্তু বাবা, আমি পারব না।"

পরেশবাবু স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "আরও কিছু সময় নিলে ভালো হয় না ? এখন তোমার মন চঞ্চল আছে।"

ললিতা কহিল, "সময় নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, অসত্য কথা ও অন্যায় অত্যাচার বেড়ে উঠতেই থাকবে।

তাই আমার ভারী ভয় হয়, অসহ্য হয়ে পাছে হঠাৎ এমন কিছু করে ফেলি যাতে তুমিও কষ্ট পাও। তুমি এ কথা মনে কোরো না বাবা, আমি কিছুই ভাবি নি। আমি বেশ করে চিন্তা করে দেখেছি যে, আমার যেরকম সংস্কার ও শিক্ষা তাতে ব্রাহ্মসমাজের বাইরে হয়তো আমাকে অনেক সংকোচ ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে— কিন্তু আমার মন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হচ্ছে না, বরঞ্চ মনের ভিতরে একটা জোর উঠছে, একটা আনন্দ হচ্ছে। আমার একটিমাত্র ভাবনা, বাবা, পাছে আমার কোনো কাজে তোমাকে কিছুমাত্র কষ্ট দেয়।"

এই বলিয়া ললিতা আস্তে আস্তে পরেশবাবুর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পরেশবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মা, নিজের বুদ্ধির উপরেই যদি আমি একমাত্র নির্ভর করতুম তা হলে আমার ইচ্ছা ও মতের বিরোধে কোনো কাজ হলে দুঃখ পেতুম। তোমাদের মনে যে আবেগ উপস্থিত হয়েছে সেটা যে সম্পূর্ণ অমঙ্গল সে আমি জোর করে বলতে পারি নে। আমিও একদিন বিদ্রোহ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলুম, কোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করি নি। সমাজের উপর আজকাল এই-যে ক্রমাগত ঘাতপ্রতিঘাত চলছে এতে বোঝা যাচ্ছে, তাঁরই শক্তির কাজ চলছে। তিনি যে নানা দিক থেকে ভেঙে গড়ে শোধন করে কোন্ জিনিসটাকে কী ভাবে দাঁড় করিয়ে তুলবেন আমি তার কী জানি। ব্রাহ্মসমাজই কি আর হিন্দুসমাজই কি, তিনি দেখছেন মানুষকে।"

এই বলিয়া পরেশবাবু মুহূর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তঃকরণের নিভৃতের মধ্যে নিজেকে যেন স্থির করিয়া লইলেন।

কিছু ক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পরেশবাবু কহিলেন, "দেখো বিনয়, ধর্মমতের সঙ্গে আমাদের দেশে সমাজ সম্পূর্ণ জড়িত হয়ে আছে, এই জন্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের যোগ আছে। ধর্মমতের গণ্ডির বাইরের লোককে সমাজের গণ্ডির মধ্যে কোনোমতে নেওয়া হবে না ব'লেই তার দ্বার রাখা হয় নি, সেটা তোমরা কেমন করে এড়াবে আমি তো ভেবে পাচ্ছি নে।"

ললিতা কথাটা ভালো বুঝিতে পারিল না, কারণ অন্য সমাজের প্রথার সহিত তাহাদের সমাজের প্রভেদ সে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করে নাই। তাহার ধারণা ছিল, মোটের উপর আচার-অনুষ্ঠানে পরস্পরে খুব বেশি পার্থক্য নাই। বিনয়ের সঙ্গে তাহাদের অনৈক্য যেমন অনুভবগোচর নয়, সমাজে সমাজেও যেন সেইরূপ। বস্তুত হিন্দু বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহার পক্ষে যে বিশেষ কোনো বাধা আছে তাহা সে জানিতই না।

বিনয় কহিল, "শালগ্রাম রেখে আমাদের বিবাহ হয়, আপনি সেই কথা বলছেন ?"

পরেশবাবু ললিতার দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "হাঁ। ললিতা কি সেটা স্বীকার করতে পারবে ?"

বিনয় ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বুঝিতে পারিল, ললিতার সমস্ত অন্তঃকরণ সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে।

ললিতা হৃদয়ের আবেগে এমন একটি স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও সংকটময়। ইহাতে বিনয়ের মনে অত্যন্ত একটি করুণা উপস্থিত হইল। সমস্ত আঘাত নিজের উপর লইয়া ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। এত বড়ো তেজ পরাভূত হইয়া ফিরিয়া যাইবে সেও যেমন অসহ্য, জয়ী হইবার দুর্দম উৎসাহে এ যে মৃত্যুবাণ বুক পাতিয়া লইবে সেও তেমনি নিদারুণ। ইহাকে জয়ীও করিতে হইবে, ইহাকে রক্ষাও করিতে হইবে।

ললিতা মাথা নিচু করিয়া কিছু ক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পর একবার মুখ তুলিয়া করুণচক্ষে বিনয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি সত্য-সত্য মনের সঙ্গে শালগ্রাম মানেন ?"

বিনয় তৎক্ষণাৎ কহিল, "না, মানি নে। শালগ্রাম আমার পক্ষে দেবতা নয়, আমার পক্ষে একটা সামাজিক চিহ্নমাত্র।"

ললিতা কহিল, "মনে মনে যাকে চিহ্ন বলে জানেন, বাইরে তাকে তো দেবতা বলে স্বীকার করতে হয় ?"

বিনয় পরেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "শালগ্রাম আমি রাখব না।"

পরেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, "বিনয়, তোমরা সব কথা পরিষ্কার করে চিন্তা করে দেখছ না। তোমার একলার বা আর-কারও মতামত নিয়ে কথা হচ্ছে না। বিবাহ তো কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটা একটা সামাজিক কার্য, সে কথা ভুললে চলবে কেন? তোমরা কিছুদিন সময় নিয়ে ভেবে দেখো, এখনই মত স্থির করে ফেলো না।"

এই বলিয়া পরেশ ঘর ছাড়িয়া বাগানে বাহির হইয়া গেলেন এবং সেখানে একলা পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ললিতাও ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিয়া একটু থামিল এবং বিনয়ের দিকে পশ্চাৎ করিয়া কহিল, "আমাদের ইচ্ছা যদি অন্যায় ইচ্ছা না হয় এবং সে ইচ্ছা যদি কোনো একটা সমাজের বিধানের সঙ্গে আগাগোড়া না মিলে যায় তা হলেই আমাদের মাথা হেঁট করে ফিরে যেতে হবে, এ আমি কোনোমতেই বুঝতে পারি নে। সমাজে মিথ্যা ব্যবহারের স্থান আছে আর স্থান নেই ন্যায়সঙ্গত আচরণের?"

বিনয় ধীরে ধীরে ললিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি কোনো সমাজকেই ভয় করি নে, আমরা দুজনে মিলে যদি সত্যকে আশ্রয় করি তা হলে আমাদের সমাজের তুল্য এতবড়ো সমাজ আর কোথায় পাওয়া যাবে!"

বরদাসুন্দরী ঝড়ের মতো তাহাদের দুইজনার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "বিনয়, শুনলুম নাকি তুমি দীক্ষা নেবে না?"

বিনয় কহিল, "দীক্ষা আমি উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে নেব, কোনো সমাজের কাছ থেকে নেব না।"

বরদাসুন্দরী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমাদের এ-সব ষড়যন্ত্র এ-সব প্রবঞ্চনার মানে কী! দীক্ষা নেব ভাণ করে এই দুদিন আমাকে আর ব্রাহ্মসমাজ-সুদ্ধ লোককে ভুলিয়ে কাণ্ডটা কী করলে বলো দেখি! ললিতার তুমি কী সর্বনাশ করতে বসেছ সে কথা একবার ভেবে দেখলে না?"

ললিতা কহিল, "বিনয়বাবুর দীক্ষায় তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের সকলের তো

সম্মতি নেই। কাগজে তো পড়ে দেখেছ! এমন দীক্ষা নেবার দরকার কী!"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "দীক্ষা না নিলে বিবাহ হবে কী করে?"

ললিতা কহিল, "কেন হবে না?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "হিন্দুমতে হবে নাকি?"

বিনয় কহিল, "তা হতে পারে। যেটুকু বাধা আছে সে আমি দূর করে দেব।"

বরদাসুন্দরীর মুখ দিয়া কিছু ক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পরে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বিনয়, যাও, তুমি যাও। এ বাড়িতে তুমি এসো না।"

৬০

গোরা যে আজ আসিবে সুচরিতা তাহা নিশ্চয় জানিত। ভোরবেলা হইতে তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সুচরিতার মনে গোরার আগমন-প্রত্যাশার আনন্দের সঙ্গে যেন একটা ভয় জড়িত ছিল। কেননা, গোরা তাহাকে যে দিকে টানিতেছিল এবং আশৈশব তাহার জীবন আপনার শিকড় ও সমস্ত ডালপালা লইয়া যে দিকে বাড়িয়া উঠিয়াছে, দুয়ের মধ্যে পদে পদে সংগ্রাম তাহাকে অস্থির করিয়াছিল।

তাই, কাল যখন মাসির ঘরে গোরা ঠাকুরকে প্রণাম করিল তখন সুচরিতার মনে যেন ছুরি বিঁধিল। নাহয় গোরা প্রণামই করিল, নাহয় গোরার এইরূপই বিশ্বাস, এ কথা বলিয়া সে কোনোমতেই নিজের মনকে শান্ত করিতে পারিল না।

গোরার আচরণে যখন সে এমন কিছু দেখে যাহার সঙ্গে তাহার ধর্ম-বিশ্বাসের মূলগত বিরোধ তখন সুচরিতার মন ভয়ে কাঁপিতে থাকে। ঈশ্বর এ কী লড়াইয়ের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়াছেন!

হরিমোহিনী নব্যমতাভিমানী সুচরিতাকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য আজও গোরাকে তাঁহার ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন এবং আজও গোরা

ঠাকুরকে প্রণাম করিল।

সুচরিতার বসিবার ঘরে গোরা নামিয়া আসিবা মাত্রই সুচরিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই ঠাকুরকে ভক্তি করেন?"

গোরা একটু যেন অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কহিল, "হাঁ, ভক্তি করি বৈকি।"

শুনিয়া সুচরিতা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুচরিতার সেই নম্র নীরব বেদনায় গোরা মনের মধ্যে একটা আঘাত পাইল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "দেখো, আমি তোমাকে সত্য কথা বলব। আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি কি না ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমি আমার দেশের ভক্তিকে ভক্তি করি। এতকাল ধরে সমস্ত দেশের পূজা যেখানে পৌঁচেছে আমার কাছে সে পূজনীয়। আমি কোনোমতেই খৃস্টান মিশনারির মতো সেখানে বিষদৃষ্টিপাত করতে পারি নে।"

সুচরিতা মনে মনে কী চিন্তা করিতে করিতে গোরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরা কহিল, "আমার কথা ঠিকমত বোঝা তোমার পক্ষে খুব কঠিন, সে আমি জানি। কেননা, সম্প্রদায়ের ভিতরে মানুষ হয়ে এ-সব জিনিসের প্রতি সহজ দৃষ্টিপাত করবার শক্তি তোমাদের চলে গিয়েছে। তুমি যখন তোমার মাসির ঘরে ঠাকুরকে দেখ তুমি কেবল পাথরকেই দেখ, আমি তোমার মাসির ভক্তিপূর্ণ করুণ হৃদয়কেই দেখি। সে দেখে আমি কি আর রাগ করতে পারি, অবজ্ঞা করতে পারি? তুমি কি মনে কর ওই হৃদয়ের দেবতা পাথরের দেবতা?"

সুচরিতা কহিল, "ভক্তি কি করলেই হল? কাকে ভক্তি করছি কিছুই বিচার করতে হবে না?"

গোরা মনের মধ্যে একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "অর্থাৎ, তুমি মনে করছ একটা সীমাবদ্ধ পদার্থকে ঈশ্বর বলে পূজা করা ভ্রম। কিন্তু কেবল দেশকালের দিক থেকেই কি সীমা নির্ণয় করতে হবে? মনে করো ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনো একটি শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ করলে তোমার খুব ভক্তি হয়; সেই

বাক্যটি যে পাতায় লেখা আছে সেই পাতাটা মেপে তার অক্ষর কয়টা গুনেই কি তুমি সেই বাক্যের মহত্ত্ব স্থির করবে? ভাবের অসীমতা বিস্তৃতির অসীমতার চেয়ে যে ঢের বড়ো জিনিস। চন্দ্রসূর্যতারাখচিত অনন্ত আকাশের চেয়ে ওই এতটুকু ঠাকুরটি যে তোমার মাসির কাছে যথার্থ অসীম। পরিমাণগত অসীমকে তুমি অসীম বল, সেই জন্যেই চোখ বুজে তোমাকে অসীমের কথা ভাবতে হয়, জানি নে তাতে কোনো ফল পাও কি না। কিন্তু হৃদয়ের অসীমকে চোখ মেলে এতটুকু পদার্থের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাই যদি না পাওয়া যেত তবে তোমার মাসির যখন সংসারের সমস্ত সুখ নষ্ট হয়ে গেল তখন তিনি ওই ঠাকুরটিকে এমন করে আঁকড়ে ধরতে পারতেন কি? হৃদয়ের অত বড়ো শূন্যতা কি খেলাচ্ছলে এক টুকরো পাথর দিয়ে ভরানো যায়? ভাবের অসীমতা না হলে মানুষের হৃদয়ের ফাঁকা ভরে না।"

এমন সকল সূক্ষ্ম তর্কের উত্তর দেওয়া সুচরিতার অসাধ্য, অথচ ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এইজন্য কেবল ভাষাহীন প্রতিকারহীন বেদনা তাহার মনে বাজিতে থাকে।

বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত তর্ক করিবার সময় গোরার মনে কোনোদিন এতটুকু দয়ার সঞ্চার হয় নাই। বরঞ্চ এ সম্বন্ধে শিকারি জন্তুর মতো তাহার মনে একটা কঠোর হিংস্রতা ছিল। কিন্তু সুচরিতার নিরুত্তর পরাভবে আজ তাহার মন কেমন ব্যথিত হইতে লাগিল। সে কণ্ঠস্বরকে কোমল করিয়া কহিল, "তোমাদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে আমি কোনো কথা বলতে চাই নে। আমার কথাটুকু কেবল এই, তুমি যাকে ঠাকুর বলে নিন্দা করছ সেই ঠাকুরটি যে কী তা শুধু চোখে দেখে জানাই যায় না; তাতে যার মন স্থির হয়েছে, হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে, যার চরিত্র আশ্রয় পেয়েছে, সেই জানে সে ঠাকুর মৃণ্ময় কি চিন্ময়, সসীম কি অসীম। আমি তোমাকে বলছি, আমাদের দেশের কোনো ভক্তই সসীমের পূজা করে না; সীমার মধ্যে সীমাকে হারিয়ে ফেলা, ওই তো তাদের ভক্তির আনন্দ।"

সুচরিতা কহিল, "কিন্তু সবাই তো ভক্ত নয়।"

গোরা কহিল, "যে ভক্ত নয় সে কিসের পূজা করে তাতে কার কী আসে যায়। ব্রাহ্মসমাজে যে লোক ভক্তিহীন সে কী করে? তার সমস্ত পূজা অতলস্পর্শ শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পড়ে। না, শূন্যতার চেয়ে ভয়ানক— দলাদলিই তার দেবতা, অহংকারই তার পুরোহিত। এই রক্তপিপাসু দেবতার পূজা তোমাদের সমাজে কি কখনো দেখ নি?"

এই কথার কোনো উত্তর না দিয়া সুচরিতা গোরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধর্ম সম্বন্ধে আপনি এই যা-সব বলছেন এ কি আপনি নিজের অভিজ্ঞতার থেকে বলছেন?"

গোরা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "অর্থাৎ, তুমি জানতে চাও, আমি কোনো-দিনই ঈশ্বরকে চেয়েছি কি না। না, আমার মন ও দিকেই যায় নি।"

সুচরিতার পক্ষে এ কথা খুশি হইবার কথা নহে, কিন্তু তবু তাহার মন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এইখানে জোর করিয়া কোনো কথা বলিবার অধিকার যে গোরার নাই, ইহাতে সে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইল।

গোরা কহিল, "কাউকে ধর্মশিক্ষা দিতে পারি এমন দাবি আমার নেই। কিন্তু আমার দেশের লোকের ভক্তিকে তোমরা যে উপহাস করবে এও আমি কোনোদিন সহ্য করতে পারব না। তুমি তোমার দেশের লোককে ডেকে বলছ 'তোমরা মূঢ়, তোমরা পৌত্তলিক'; আমি তাদের সবাইকে আহ্বান করে জানাতে চাই, 'না, তোমরা মূঢ় নও, তোমরা পৌত্তলিক নও, তোমরা জ্ঞানী, তোমরা ভক্ত।' আমাদের ধর্মতত্ত্বে যে মহত্ত্ব আছে, ভক্তিতত্ত্বে যে গভীরতা আছে, শ্রদ্ধাপ্রকাশের দ্বারা সেইখানেই আমার দেশের হৃদয়কে আমি জাগ্রত করতে চাই; যেখানে তার সম্পদ আছে সেইখানে তার অভিমানকে আমি উদ্যত করে তুলতে চাই। আমি তার মাথা হেঁট করে দেব না, নিজের প্রতি তার ধিক্কার জন্মিয়ে নিজের সত্যের প্রতি তাকে অন্ধ করে তুলব না। এই আমার পণ। তোমার কাছেও আজ আমি এই জন্যেই এসেছি। তোমাকে দেখে অবধি একটি নূতন কথা দিনরাত্রি আমার মাথায় ঘুরছে। এতদিন সে কথা আমি ভাবি নি। কেবলই আমার মনে হচ্ছে,

কেবল পুরুষের দৃষ্টিতেই তো ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ হবেন না। আমাদের মেয়েদের চোখের সামনে যেদিন আবির্ভূত হবেন সেইদিনই তাঁর প্রকাশ পূর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে একসঙ্গে এক দৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব, এই একটি আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে। আমার ভারতবর্ষের জন্য আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি, কিন্তু তুমি না হলে প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে বরণ করবে কে? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক।"

হায়, কোথায় ছিল ভারতবর্ষ! কোন্ সুদূরে ছিল সুচরিতা! কোথা হইতে আসিল ভারতবর্ষের এই সাধক, এই ভাবে-ভোলা তাপস! সকলকে ঠেলিয়া কেন সে তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল! সকলকে ছাড়িয়া কেন সে তাহাকেই আহ্বান করিল! কোনো সংশয় করিল না, বাধা মানিল না। বলিল, 'তোমাকে নহিলে চলিবে না, তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি, তুমি নির্বাসিত হইয়া থাকিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না।' সুচরিতার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, কেন তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

গোরা সুচরিতার মুখের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টির সম্মুখে সুচরিতা তাহার অশ্রুবিগলিত দুই চক্ষু নত করিল না। চিন্তাবিহীন শিশিরমণ্ডিত ফুলের মতো তাহা নিতান্ত আত্মবিস্মৃতভাবে গোরার মুখের দিকে ফুটিয়া রহিল।

সুচরিতার সেই সংকোচবিহীন সংশয়বিহীন অশ্রুধারাপ্লাবিত দুই চক্ষুর সম্মুখে, ভূমিকম্পে পাথরের রাজপ্রাসাদ যেমন টলে তেমনি করিয়া গোরার সমস্ত প্রকৃতি যেন টলিতে লাগিল। গোরা প্রাণপণ বলে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার জন্য মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গলির রেখা সংকীর্ণ হইয়া যেখানে বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে সেখানে খোলা আকাশে কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর তারা দেখা যাইতেছে। সেই আকাশখণ্ড, সেই ক'টি তারা গোরার মনকে আজ কোথায় বহন করিয়া লইয়া গেল— সংসারের সমস্ত দাবি হইতে, এই

অভ্যস্ত পৃথিবীর প্রতিদিনের সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হইতে কত দূরে! রাজ্য-সাম্রাজ্যের কত উত্থানপতন, যুগযুগান্তরের কত প্রয়াস ও প্রার্থনাকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া ওইটুকু আকাশ এবং ওই ক'টি তারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে; অথচ অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্য হইতে এক হৃদয় যখন আর-এক হৃদয়কে আহ্বান করে তখন নিভৃত জগৎ-প্রান্তের সেই বাক্য-হীন ব্যাকুলতা যেন ওই দূর আকাশ এবং দূর তারাকে স্পন্দিত করিতে থাকে। কর্মরত কলিকাতার পথে গাড়ি-ঘোড়া ও পথিকের চলাচল এই মুহূর্তে গোরার চক্ষে ছায়াছবির মতো বস্তুহীন হইয়া গেল; নগরের কোলাহল কিছুই তাহার কাছে আর পৌঁছিল না; নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল— সেও ওই আকাশের মতো নিস্তব্ধ, নিভৃত, অন্ধকার, এবং সেখানে জলে-ভরা দুইটি সরল সকরুণ চক্ষু নিমেষ হারাইয়া যেন অনাদি কাল হইতে অনন্ত কালের দিকে তাকাইয়া আছে।

হরিমোহিনীর কণ্ঠ শুনিয়া গোরা চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইল।

"বাবা, কিছু মিষ্টিমুখ করে যাও।"

গোরা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আজ কিন্তু নয়। আজ আমাকে মাপ করতে হবে— আমি এখনি যাচ্ছি।"

বলিয়া গোরা আর-কোনো কথার অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

হরিমোহিনী বিস্মিত হইয়া সুচরিতার মুখের দিকে চাহিলেন। সুচরিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিমোহিনী মাথা নাড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন— এ আবার কী কাণ্ড!

অনতিকাল পরেই পরেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুচরিতার ঘরে সুচরিতাকে দেখিতে না পাইয়া হরিমোহিনীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধারানী কোথায়?"

হরিমোহিনী বিরক্তির কণ্ঠে কহিলেন, "কী জানি, এতক্ষণ তো গৌর-মোহনের সঙ্গে বসবার ঘরে আলাপ চলছিল, তার পরে এখন বোধ হয় ছাতে

একলা পায়চারি হচ্ছে।”

পরেশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ঠাণ্ডায় এত রাত্রে ছাতে!”

হরিমোহিনী কহিলেন, “একটু ঠাণ্ডা হয়েই নিক। এখনকার মেয়েদের ঠাণ্ডায় অপকার হবে না।”

হরিমোহিনীর মন আজ খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি রাগ করিয়া সুচরিতাকে খাইতে ডাকেন নাই। সুচরিতারও আজ সময়ের জ্ঞান ছিল না।

হঠাৎ স্বয়ং পরেশবাবুকে ছাতে আসিতে দেখিয়া সুচরিতা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। কহিল, “বাবা, চলো, নীচে চলো— তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।”

ঘরে আসিয়া প্রদীপের আলোকে পরেশের উদ্‌বিগ্ন মুখ দেখিয়া সুচরিতার মনে খুব একটা ঘা লাগিল। এতদিন যিনি পিতৃহীনার পিতা এবং গুরু ছিলেন, আশৈশবের সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার কাছ হইতে কে আজ সুচরিতাকে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে! সুচরিতা কিছুতেই যেন নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিল না। পরেশ ক্লান্তভাবে চৌকিতে বসিলে পর দুর্নিবার অশ্রুকে গোপন করিবার জন্য সুচরিতা তাঁহার চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পক্ক কেশের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিয়া দিতে লাগিল।

পরেশ কহিলেন, “বিনয় দীক্ষা গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছেন।”

সুচরিতা কোনো উত্তর করিল না। পরেশ কহিলেন, “বিনয়ের দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাবে আমার মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, সেই জন্যে আমি এতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই নি— কিন্তু ললিতার কথার ভাবে বুঝতে পারছি, দীক্ষা না হলেও বিনয়ের সঙ্গে বিবাহে সে কোনো বাধা অনুভব করছে না।”

সুচরিতা হঠাৎ খুব জোরের সহিত বলিয়া উঠিল, “না বাবা, সে কখনোই হতে পারবে না। কিছুতেই না।”

সুচরিতা সচরাচর এমন অনাবশ্যক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া কথা কয় না, সেই জন্য তাহার কণ্ঠস্বরে এই আকস্মিক আবেগের প্রবলতায় পরেশ মনে মনে একটু আশ্চর্য হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হতে পারবে না?”

সুচরিতা কহিল, "বিনয় ব্রাহ্ম না হলে কোন্ মতে বিয়ে হবে ?"

পরেশ কহিলেন, "হিন্দুমতে।"

সুচরিতা সবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, আজকাল এ-সব কী কথা হচ্ছে! এমন কথা মনেও আনা উচিত নয়। শেষকালে ঠাকুরপুজো করে ললিতার বিয়ে হবে! এ কিছুতেই হতে দিতে পারব না।"

গোরা নাকি সুচরিতার মন টানিয়া লইয়াছে, তাই সে আজ হিন্দুমতে বিবাহের কথায় এমন একটা অস্বাভাবিক আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে। এই আক্ষেপের ভিতরকার আসল কথাটা এই যে, পরেশকে সুচরিতা এক জায়গায় দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বলিতেছে, 'তোমাকে ছাড়িব না— আমি এখনো তোমার সমাজের, তোমার মতের, তোমার শিক্ষার বন্ধন কোনোমতেই ছিঁড়িতে দিব না।'

পরেশ কহিলেন, "বিবাহ-অনুষ্ঠানে শালগ্রামের সংস্রব বাদ দিতে বিনয় রাজি হয়েছে।"

সুচরিতা চৌকির পিছন হইতে আসিয়া পরেশের সম্মুখে চৌকি লইয়া বসিল। পরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতে তুমি কী বল ?"

সুচরিতা একটু চুপ করিয়া কহিল, "আমাদের সমাজ থেকে ললিতাকে তা হলে বেরিয়ে যেতে হবে।"

পরেশ কহিলেন, "এই কথা নিয়ে আমাকে অনেক চিন্তা করতে হয়েছে। কোনো মানুষের সঙ্গে সমাজের যখন বিরোধ বাধে তখন দুটো কথা ভেবে দেখবার আছে, দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায় কোন্ দিকে এবং প্রবল কে। সমাজ প্রবল তাতে সন্দেহ নেই; অতএব বিদ্রোহীকে দুঃখ পেতে হবে। ললিতা বারম্বার আমাকে বলছে, দুঃখ স্বীকার করতে সে যে শুধু প্রস্তুত তা নয়, এতে সে আনন্দ বোধ করছে। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে অন্যায় না দেখলে আমি তাকে বাধা দেব কী করে!"

সুচরিতা কহিল, "কিন্তু, বাবা, এ কিরকম হবে!"

পরেশ কহিলেন, "জানি এতে একটা সংকট উপস্থিত হবে। কিন্তু

ললিতার সঙ্গে বিনয়ের বিবাহে যখন দোষ কিছু নেই, এমন-কি সেটা উচিত, তখন সমাজে যদি বাধে তবে সে বাধা মানা কর্তব্য নয় বলে আমার মন বলছে। মানুষকেই সমাজের খাতিরে সংকুচিত হয়ে থাকতে হবে এ কথা কখনোই ঠিক নয়; সমাজকেই মানুষের খাতিরে নিজেকে কেবলই প্রশস্ত করে তুলতে হবে। সেজন্যে যারা দুঃখ স্বীকার করতে রাজি আছে আমি তো তাদের নিন্দা করতে পারব না।"

সুচরিতা কহিল, "বাবা, এতে তোমাকেই সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেতে হবে।"

পরেশ কহিলেন, "সে কথা ভাববার কথাই নয়।"

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কি সম্মতি দিয়েছ?"

পরেশ কহিলেন, "না, এখনো দিই নি। কিন্তু দিতেই হবে। ললিতা যে পথে যাচ্ছে সে পথে আমি ছাড়া কে তাকে আশীর্বাদ করবে, আর ঈশ্বর ছাড়া কে তার সহায় আছেন?"

পরেশবাবু যখন চলিয়া গেলেন তখন সুচরিতা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। সে জানিত পরেশ ললিতাকে মনে মনে কত ভালোবাসেন, সেই ললিতা বাঁধা পথ ছাড়িয়া দিয়া এতবড়ো একটা অনির্দেশ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে, ইহাতে তাঁহার মন যে কত উদ্‌বিগ্ন তাহা তাহার বুঝিতে বাকি ছিল না— তৎসত্ত্বে এই বয়সে তিনি এমন একটা বিপ্লবে সহায়তা করিতে চলিয়াছেন, অথচ ইহার মধ্যে বিক্ষোভ কতই অল্প! নিজের জোর তিনি কোথাও কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কতবড়ো জোর অনায়াসেই আত্মগোপন করিয়া আছে!

পূর্বে হইলে পরেশের প্রকৃতির এই পরিচয় তাহার কাছে বিচিত্র বলিয়া ঠেকিত না, কেননা পরেশকে শিশুকাল হইতেই তো সে দেখিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজই, কিছু ক্ষণ পূর্বেই নাকি সুচরিতার সমস্ত অন্তঃকরণ গোরার অভিঘাত সহ্য করিয়াছে, সেই জন্য এই দুই শ্রেণীর স্বভাবের সম্পূর্ণ পার্থক্য সে মনে মনে সুস্পষ্ট অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। গোরার কাছে

তাহার নিজের ইচ্ছা কী প্রচণ্ড! এবং সেই ইচ্ছাকে সবেগে প্রয়োগ করিয়া সে অন্যকে কেমন করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে! গোরার সহিত যে-কেহ যে-কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করিবে গোরার ইচ্ছার কাছে তাহাকে নত হইতে হইবে। সুচরিতা আজ নত হইয়াছে এবং নত হইয়া আনন্দও পাইয়াছে, আপনাকে বিসর্জন করিয়া একটা বড়ো জিনিস পাইয়াছে বলিয়া অনুভব করিয়াছে, কিন্তু তবু আজ পরেশ যখন তাহার ঘরের দীপালোক হইতে ধীরপদে চিন্তানত মস্তকে বাহিরের অন্ধকারে চলিয়া গেলেন তখন যৌবন-তেজোদীপ্ত গোরার সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াই সুচরিতা অন্তরের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি বিশেষ করিয়া পরেশের চরণে সমর্পণ করিল এবং কোলের উপর দুই করতল জুড়িয়া অনেক ক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হইয়া চিত্রার্পিতের মতো বসিয়া রহিল।

৬১

আজ সকাল হইতে গোরার ঘরে খুব একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। প্রথমে মহিম তাঁহার হুঁকা টানিতে টানিতে আসিয়া গোরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হলে, এতদিন পরে বিনয় শিক্‌লি কাটল বুঝি!"

গোরা কথাটা বুঝিতে পারিল না, মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিম কহিলেন, "আমাদের কাছে আর ভাঁড়িয়ে কী হবে বলো। তোমার বন্ধুর খবর তো আর চাপা রইল না— ঢাক বেজে উঠেছে। এই দেখো-না।"

বলিয়া মহিম গোরার হাতে একখানা বাংলা খবরের কাগজ দিলেন। তাহাতে অদ্য রবিবারে বিনয়ের ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষাগ্রহণের সংবাদ উপলক্ষ করিয়া এক তীব্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। গোরা যখন জেলে ছিল সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কন্যাদায়গ্রস্ত কোনো বিশিষ্ট সভ্য এই দুর্বলচিত্ত যুবককে গোপন প্রলোভনে বশ করিয়া সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে বলিয়া লেখক তাঁহার রচনায় বিস্তর কটু ভাষা বিস্তার করিয়াছেন।

গোরা যখন বলিল সে এ সংবাদ জানে না তখন মহিম প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না, তার পরে বিনয়ের এই গভীর ছদ্মব্যবহারে বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং বলিয়া গেলেন, স্পষ্ট বাক্যে শশিমুখীকে বিবাহে সম্মতি দিয়া তাহার পরেও যখন বিনয় কথা নড়চড় করিতে লাগিল তখনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল তাহার সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে।

অবিনাশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিল, "গৌরমোহনবাবু, এ কী কাণ্ড! এ যে আমাদের স্বপ্নের অগোচর। বিনয়বাবুর শেষকালে—"

অবিনাশ কথা শেষ করিতেই পারিল না। বিনয়ের এই লাঞ্ছনায় তাহার মনে এত আনন্দ বোধ হইতেছিল যে, দুশ্চিন্তার ভাণ করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে গোরার দলের প্রধান প্রধান সকল লোকই আসিয়া জুটিল। বিনয়কে লইয়া তাহাদের মধ্যে খুব একটা উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকই একবাক্যে বলিল— বর্তমান ঘটনায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, কারণ বিনয়ের ব্যবহারে তাহারা বরাবরই একটা দ্বিধা এবং দুর্বলতার লক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছে, বস্তুত তাহাদের দলের মধ্যে বিনয় কোনোদিনই কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করে নাই। অনেকেই কহিল— বিনয় গোড়া হইতেই নিজেকে কোনোক্রমে গৌরমোহনের সমকক্ষ বলিয়া চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিত, ইহা তাহাদের অসহ্য বোধ হইত। অন্য সকলে যেখানে ভক্তির সংকোচে গৌরমোহনের সহিত যথোচিত দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিত সেখানে বিনয় গায়ে পড়িয়া গোরার সঙ্গে এমন একটা মাথামাখি করিত যেন সে আর-সকলের সঙ্গে পৃথক এবং গোরার ঠিক সম-শ্রেণীর লোক ; গোরা তাহাকে স্নেহ করিত বলিয়াই তাহার এই অদ্ভুত স্পর্ধা সকলে সহ্য করিয়া যাইত— সেইপ্রকার অবাধ অহংকারেরই এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়া থাকে।

তাহারা কহিল, 'আমরা বিনয়বাবুর মতো বিদ্বান নই, আমাদের অত অত্যন্ত বেশি বুদ্ধিও নাই, কিন্তু বাপু, আমরা বরাবর যা-হয় একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌

ধরিয়া চলিয়াছি ; আমাদের মনে এক মুখে আর নাই ; আমাদের দ্বারা আজ এক-রকম কাল অন্য-রকম অসম্ভব— ইহাতে আমাদিগকে মূর্খই বলো, নির্বোধই বলো, আর যাই বলো।'

গোরা এ-সব কথায় একটি কথাও যোগ করিল না, স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা হইয়া গেলে যখন একে একে সকলে চলিয়া গেল তখন গোরা দেখিল, বিনয় তাহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিয়া যাইতেছে। গোরা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ; ডাকিল, "বিনয়!"

বিনয় সিঁড়ি হইতে নামিয়া গোরার ঘরে প্রবেশ করিতেই গোরা কহিল, "বিনয়, আমি কি না-জেনে তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে যেন ত্যাগ করেছ বলে মনে হচ্ছে।"

আজ গোরার সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধিবে, এ কথা বিনয় আগেভাগেই স্থির করিয়া মনটাকে কঠিন করিয়াই আসিয়াছিল। এমন সময় বিনয় আসিয়া গোরার মুখ যখন বিমর্ষ দেখিল এবং তাহার কণ্ঠস্বরে একটা স্নেহের বেদনা যখন অনুভব করিল, তখন সে জোর করিয়া মনকে যে বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহা এক মুহূর্তেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

সে বলিয়া উঠিল, "ভাই গোরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে, অনেক জিনিস ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু তাই বলে বন্ধুত্ব কেন ত্যাগ করব!"

গোরা কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বিনয়, তুমি কি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করেছ?"

বিনয় কহিল, "না গোরা, করি নি, এবং করবও না। কিন্তু সেটার উপর আমি কোনো জোর দিতে চাই নে।"

গোরা কহিল, "তার মানে কী?"

বিনয় কহিল, "তার মানে এই যে, আমি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলুম কি

না-নিলুম, সেই কথাটাকে অত্যন্ত তুমুল করে তোলবার মতো মনের ভাব আমার এখন আর নেই।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "পূর্বেই বা মনের ভাব কিরকম ছিল, আর এখনই বা কিরকম হয়েছে জিজ্ঞাসা করি।"

গোরার কথার সুরে বিনয়ের মন আবার একবার যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিতে বসিল। সে কহিল, "আগে যখন শুনতুম কেউ ব্রাহ্ম হতে যাচ্ছে মনের মধ্যে খুব একটা রাগ হত, সে যেন বিশেষরূপ শাস্তি পায় এই আমার ইচ্ছা হত। কিন্তু এখন আমার তা হয় না। আমার মনে হয়, মতকে মত দিয়ে, যুক্তিকে যুক্তি দিয়েই বাধা দেওয়া চলে, কিন্তু বুদ্ধির বিষয়কে ক্রোধ দিয়ে দণ্ড দেওয়া বর্বরতা।"

গোরা কহিল, "হিন্দু ব্রাহ্ম হচ্ছে দেখলে এখন আর রাগ হবে না, কিন্তু ব্রাহ্ম প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হতে যাচ্ছে দেখলে রাগে তোমার অঙ্গ জ্বলতে থাকবে— পূর্বের সঙ্গে তোমার এই প্রভেদটা ঘটেছে।"

বিনয় কহিল, "এটা তুমি আমার উপর রাগ করে বলছ, বিচার করে বলছ না।"

গোরা কহিল, "আমি তোমার 'পরে শ্রদ্ধা করেই বলছি, এইরকম হওয়াই উচিত ছিল, আমি হলেও এইরকম হত। বহুরূপী যেরকম রঙ বদলায় ধর্মমত গ্রহণ ও ত্যাগ যদি সেইরকম আমাদের চামড়ার উপরকার জিনিস হত, তা হলে কোনো কথাই ছিল না; কিন্তু সেটা মর্মের জিনিস বলেই সেটাকে হালকা করতে পারি নি। যদি কোনোরকম বাধা না থাকে, যদি দণ্ডের মাশুল না দিতে হয়, তা হলে গুরুতর বিষয়ে একটা মত গ্রহণ বা পরিবর্তনের সময় মানুষ নিজের সমস্ত বুদ্ধিকে জাগাবে কেন? সত্যকে যথার্থ সত্য বলেই গ্রহণ করছি কি না মানুষকে তার পরীক্ষা দেওয়া চাই। দণ্ড স্বীকার করতেই হবে। মূল্যটা এড়িয়ে রত্নটুকু পাবে, সত্যের কারবার এমন শৌখিন কারবার নয়।"

তর্কের মুখে আর-কোনো বল্‌গা রহিল না। কথার উপরে কথা বাণের

উপরে বাণের মতো আসিয়া পড়িয়া পরস্পর সংঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিল।

অবশেষে অনেক ক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধের পর বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "গোরা, তোমার এবং আমার প্রকৃতির মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। সেটা এতদিন কোনোমতে চাপা ছিল, যখনই মাথা তুলতে চেয়েছে আমিই তাকে নত করেছি, কেননা আমি জানতুম যেখানে তুমি কোনো পার্থক্য দেখ সেখানে তুমি সন্ধি করতে জান না, একেবারে তলোয়ার হাতে ছুটতে থাক। তাই তোমার বন্ধুত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি চিরদিনই নিজের প্রকৃতিকে খর্ব করে এসেছি। আজ বুঝতে পারছি এতে মঙ্গল হয় নি এবং মঙ্গল হতে পারে না।"

গোরা কহিল, "এখন তোমার অভিপ্রায় কী আমাকে খুলে বলো।"

বিনয় কহিল, "আজ আমি একলা দাঁড়ালুম। সমাজ ব'লে রাক্ষসের কাছে প্রতিদিন মানুষ-বলি দিয়ে কোনোমতে তাকে ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে এবং যেমন করে হোক তারই শাসনপাশ গলায় বেঁধে বেড়াতে হবে, তাতে প্রাণ থাক্ আর না থাক্, এ আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারব না।"

গোরা কহিল, "মহাভারতের সেই ব্রাহ্মণশিশুটির মতো খড়কে নিয়ে বকাসুর বধ করতে বেরবে না কি!"

বিনয় কহিল, "আমার খড়কেতে বকাসুর মরবে কি না তা জানি নে, কিন্তু আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবার অধিকার যে তার আছে এ কথা আমি কোনোমতেই মানব না— যখন সে চিবিয়ে খাচ্ছে তখনো না।"

গোরা কহিল, "এ-সমস্ত তুমি রূপক দিয়ে কথা বলছ, বোঝা কঠিন হয়ে উঠছে।"

• বিনয় কহিল, "বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন নয়, মানাই তোমার পক্ষে কঠিন। মানুষ যেখানে স্বভাবত স্বাধীন, ধর্মত স্বাধীন, আমাদের সমাজ সেখানে তার খাওয়া শোওয়া বসাকেও নিতান্ত অর্থহীন বন্ধনে বেঁধেছে, এ কথা তুমি আমার চেয়ে কম জান তা নয়; কিন্তু এই জবর্দস্তিকে তুমি

জবর্দস্তির দ্বারাই মানতে চাও। আমি আজ বলছি, এখানে আমি কারও জোর মানব না। সমাজের দাবিকে আমি তত ক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার করব যত ক্ষণ সে আমার উচিত দাবিকে রক্ষা করবে। সে যদি আমাকে মানুষ বলে গণ্য না করে, আমাকে কলের পুতুল করে বানাতে চায়, আমিও তাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করব না, লোহার কল বলেই গণ্য করব।"

গোরা কহিল, "অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তুমি ব্রাহ্ম হবে?"

বিনয় কহিল, "না।"

গোরা কহিল, "ললিতাকে তুমি বিয়ে করবে?"

বিনয় কহিল, "হাঁ।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "হিন্দুবিবাহ?"

বিনয় কহিল, "হাঁ।"

গোরা। পরেশবাবু তাতে সম্মত আছেন?

বিনয়। এই তাঁর চিঠি।

গোরা পরেশের চিঠি দুইবার করিয়া পড়িল। তাহার শেষ অংশে ছিল— 'আমার ভালো মন্দ লাগার কোনো কথা তুলিব না, তোমাদের সুবিধা-অসুবিধার কোনো কথাও পাড়িতে চাই না। আমার মত-বিশ্বাস কী, আমার সমাজ কী, সে তোমরা জান; ললিতা ছেলেবেলা হইতে কী শিক্ষা পাইয়াছে এবং কী সংস্কারের মধ্যে মানুষ হইয়াছে তাহাও তোমাদের অবিদিত নাই। এ-সমস্তই জানিয়া শুনিয়া তোমাদের পথ তোমরা নির্বাচন করিয়া লইয়াছ। আমার আর-কিছুই বলিবার নাই। মনে করিয়ো না, আমি কিছুই না ভাবিয়া অথবা ভাবিয়া না পাইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার যতদূর শক্তি আমি চিন্তা করিয়াছি। ইহা বুঝিয়াছি, তোমাদের মিলনকে বাধা দিবার কোনো ধর্মসংগত কারণ নাই, কেননা তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। এ স্থলে সমাজে যদি কোনো বাধা থাকে তবে তাহাকে স্বীকার করিতে তোমরা বাধ্য নও। আমার কেবল এইটুকুমাত্র বলিবার আছে, সমাজকে যদি তোমরা লঙ্ঘন করিতে চাও তবে সমাজের

চেয়ে তোমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে। তোমাদের প্রেম, তোমাদের সম্মিলিত জীবন, কেবল যেন প্রলয়শক্তির সূচনা না করে, তাহাতে সৃষ্টি ও স্থিতির তত্ত্ব থাকে যেন। কেবল এই একটা কাজের মধ্যে হঠাৎ একটা দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিলে চলিবে না; ইহার পরে তোমাদের জীবনের সমস্ত কাজকে বীরত্বের সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে, নহিলে তোমরা অত্যন্ত নামিয়া পড়িবে। কেননা বাহির হইতে সমাজ তোমাদিগকে সর্বসাধারণের সমান ক্ষেত্রে আর বহন করিয়া রাখিবে না— তোমরা নিজের শক্তিতে এই সাধারণের চেয়ে বড়ো যদি না হও তবে সাধারণের চেয়ে তোমাদিগকে নামিয়া যাইতে হইবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের জন্য আমার মনে যথেষ্ট আশঙ্কা রহিল। কিন্তু এই আশঙ্কার দ্বারা তোমাদিগকে বাধা দিবার কোনো অধিকার আমার নাই; কারণ, পৃথিবীতে যাহারা সাহস করিয়া নিজের জীবনের দ্বারা নব নব সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয় তাহারাই সমাজকে বড়ো করিয়া তুলে। যাহারা কেবলই বিধি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না। অতএব আমার ভীরুতা আমার দুশ্চিন্তা লইয়া তোমাদের পথ আমি রোধ করিব না। তোমরা যাহা ভালো বুঝিয়াছ সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাহা পালন করো, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। ঈশ্বর কোনো-এক অবস্থার মধ্যে তাঁহার সৃষ্টিকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখেন না, তাহাকে নব নব পরিণতির মধ্যে চিরনবীন করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন; তোমরা তাঁহার সেই উদ্‌বোধনের দূতরূপে নিজের জীবনকে মশালের মতো জ্বালাইয়া দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছ, যিনি বিশ্বের পথচালক তিনি তোমাদিগকে পথ দেখান— আমার পথেই তোমাদিগকে চিরদিন চলিতে হইবে এমন অনুশাসন আমি প্রয়োগ করিতে পারিব না। তোমাদের বয়সে আমরাও একদিন ঘাট হইতে রশি খুলিয়া ঝড়ের মুখে নৌকা ভাসাইয়াছিলাম, কাহারও নিষেধ শুনি নাই। আজও তাহার জন্য অনুতাপ করি না। যদিই অনুতাপ করিবার কারণ ঘটিত তাহাতেই বা কী। মানুষ ভুল করিবে, ব্যর্থও হইবে,

দুঃখও পাইবে, কিন্তু বসিয়া থাকিবে না— যাহা উচিত বলিয়া জানিবে তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করিবে— এমনি করিয়াই পবিত্রসলিলা সংসারনদীর স্রোত চিরদিন প্রবহমাণ হইয়া বিশুদ্ধ থাকিবে। ইহাতে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য তীর ভাঙিয়া ক্ষতি করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া চিরদিনের জন্য স্রোত বাঁধিয়া দিলে মারীকে আহ্বান করিয়া আনা হইবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। অতএব যে শক্তি তোমাদিগকে দুর্নিবার বেগে সুখস্বচ্ছন্দতা ও সমাজবিধির বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহারই হস্তে তোমাদের দুই জনকে সমর্পণ করিলাম, তিনিই তোমাদের জীবনে সমস্ত নিন্দাগ্লানি ও আত্মীয়বিচ্ছেদকে সার্থক করিয়া তুলুন। তিনিই তোমাদিগকে দুর্গম পথে আহ্বান করিয়াছেন, তিনিই তোমাদিগকে গম্যস্থানে লইয়া যাইবেন।'

গোরা এই চিঠি পড়িয়া কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে পর বিনয় কহিল, "পরেশবাবু তাঁর দিক থেকে যেমন সম্মতি দিয়েছেন, তেমনি তোমার দিক থেকেও, গোরা, তোমাকে সম্মতি দিতে হবে।"

গোরা কহিল, "পরেশবাবু সম্মতি দিতে পারেন, কেননা নদীর যে ধারা কূল ভাঙছে সেই ধারাই তাঁদের। আমি সম্মতি দিতে পারি নে, কেননা আমাদের ধারা কূলকে রক্ষা করে। আমাদের এই কূলে কত শতসহস্র বৎসরের অভ্রভেদী কীর্তি রয়েছে, আমরা কোনোমতেই বলতে পারব না, এখানে প্রকৃতির নিয়মই কাজ করতে থাক্‌। আমাদের কূলকে আমরা পাথর দিয়েই বাঁধিয়ে রাখব— তাতে আমাদের নিন্দাই কর আর যাই কর। এ আমাদের পবিত্র প্রাচীন পুরী— এর উপরে বৎসরে বৎসরে নূতন মাটির পলি পড়বে, আর চাষার দলে লাঙল নিয়ে এর জমি চষবে, এটা আমাদের অভিপ্রেত নয়— তাতে আমাদের যা লোকসান হয় হোক। এ আমাদের বাস করবার, এ চাষ করবার নয়। অতএব তোমাদের কৃষিবিভাগ থেকে আমাদের এই পাথরগুলোকে যখন কঠিন বলে নিন্দা কর তখন তাতে আমরা মর্মান্তিক লজ্জা বোধ করি নে।"

বিনয় কহিল, "অর্থাৎ, সংক্ষেপে, তুমি আমাদের এই বিবাহকে স্বীকার করবে না?"

গোরা কহিল, "নিশ্চয় করব না।"

বিনয় কহিল, "এবং—"

গোরা কহিল, "এবং তোমাদের ত্যাগ করব।"

বিনয় কহিল, "আমি যদি তোমার মুসলমান বন্ধু হতুম।"

গোরা কহিল, "তা হলে অন্য কথা হত। গাছের আপন ডাল ভেঙে প'ড়ে যদি পর হয়ে যায় তবে গাছ তাকে কোনোমতেই পূর্বের মতো আপন করে ফিরে নিতে পারে না— কিন্তু বাইরে থেকে যে লতা এগিয়ে আসে তাকে সে আশ্রয় দিতে পারে, এমন-কি ঝড়ে ভেঙে পড়লে আবার তাকে তুলে নিতে কোনো বাধা থাকে না। আপন যখন পর হয় তখন তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। সেই জন্যেই তো এত বিধিনিষেধ, এত প্রাণপণ টানাটানি।"

বিনয় কহিল, "সেই জন্যেই তো ত্যাগের কারণ অত হালকা এবং ত্যাগের বিধান অত সুলভ হওয়া উচিত ছিল না। হাত ভাঙলে আর জোড়া লাগে না বটে, সেই জন্যেই কথায় কথায় হাত ভাঙেও না। তার হাড় খুব মজবুত। যে সমাজে অতি সামান্য ঘা লাগলেই বিচ্ছেদ ঘটে এবং সে বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ হয়ে দাঁড়ায়, সে সমাজে মানুষের পক্ষে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা কাজকর্ম করার পক্ষে বাধা কত সে কথা কি চিন্তা করে দেখবে না?"

গোরা কহিল, "সে চিন্তার ভার আমার উপর নেই। সমাজ এমন সমগ্রভাবে এমন বড়োরকম করে চিন্তা করছে যে আমি টেরও পাচ্ছি নে সে ভাবছে। হাজার-হাজার বৎসর ধরে সে ভেবেওছে এবং আপনাকে রক্ষাও করে এসেছে, এই আমার ভরসা। পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে বেঁকে চলছে কি সোজা চলছে, ভুল করছে কি করছে না, সে যেমন আমি ভাবি নে এবং না ভেবে আজ পর্যন্ত আমি ঠকি নি— আমার সমাজ সম্বন্ধেও আমার সেই ভাব।"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "ভাই গোরা, ঠিক এই-সব কথা আমিও এতদিন এমনি করেই বলে এসেছি— আজ আবার আমাকেও সে কথা শুনতে হবে তা কে জানত। কথা বানিয়ে বলবার শাস্তি আজ আমাকে ভোগ করতে হবে, সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তর্ক করে কোনো লাভ নেই। কেননা, একটা কথা আমি আজ খুব নিকটের থেকে দেখতে পেয়েছি, সেটি পূর্বে দেখি নি; আজ বুঝেছি, মানুষের জীবনের গতি মহানদীর মতো, সে আপনার বেগে অভাবনীয় রূপে এমন নূতন নূতন দিকে পথ করে নেয় যে দিকে পূর্বে তার স্রোত ছিল না— এই তার গতির বৈচিত্র্য, তার অভাবনীয় পরিণতিই বিধাতার অভিপ্রায়— সে কাটা খাল নয়, তাকে বাঁধা পথে রাখা চলবে না। নিজের মধ্যেই যখন এ কথাটা একেবারে প্রত্যক্ষ হয়েছে তখন কোনো সাজানো কথায় আর আমাকে কোনোদিন ভোলাতে পারবে না।"

গোরা কহিল, "পতঙ্গ যখন বহ্নির মুখে পড়তে চলে সেও তখন তোমার মতো ঠিক ওইরকম তর্কই করে, অতএব তোমাকে আমিও আজ বোঝাবার কোনো বৃথা চেষ্টা করব না।"

বিনয় চৌকি হইতে উঠিয়া কহিল, "সেই ভালো— তবে চললুম— একবার মার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

বিনয় চলিয়া গেল, মহিম ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পান চিবাইতে চিবাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুবিধা হল না বুঝি? হবেও না। কতদিন থেকে বলে আসছি, সাবধান হও, বিগড়াবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে— কথাটা কানেই আনলে না। সেই সময়ে জোরজার করে কোনোমতে শশিমুখীর সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে কোনো কথাই থাকত না। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! বলি বা কাকে! নিজে যেটি বুঝবে না সে তো মাথা খুঁড়েও বুঝানো যাবে না। এখন বিনয়ের মতো ছেলে তোমার দল ভেঙে গেল, এ কি কম আপশোষের কথা।"

গোরা কোনো উত্তর করিল না। মহিম কহিলেন, "তা হলে বিনয়কে

ফেরাতে পারলে না? তা যাক, কিন্তু শশিমুখীর সঙ্গে ওর বিবাহের কথাটা নিয়ে কিছু বেশি গোলমাল হয়ে গেছে। এখন শশীর বিয়ে দিতে আর দেরি করলে চলবে না। জানই তো আমাদের সমাজের গতিক, যদি একটা মানুষকে কায়দায় পেলে তবে তাকে নাকের জলে চোখের জলে ক'রে ছাড়ে। তাই একটি পাত্র— না, তোমার ভয় নেই, তোমাকে ঘটকালি করতে হবে না। সে আমি নিজেই ঠিকঠাক করে নিয়েছি।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "পাত্রটি কে?"

মহিম কহিলেন, "তোমাদের অবিনাশ।"

গোরা কহিল, "সে রাজি হয়েছে?"

মহিম কহিল, "রাজি হবে না! এ কি তোমার বিনয় পেয়েছ! না, যাই বলো, দেখা গেল তোমার দলের মধ্যে ওই অবিনাশ ছেলেটি তোমার ভক্ত বটে। তোমার পরিবারের সঙ্গে তার যোগ হবে এ কথা শুনে সে তো আহ্লাদে নেচে উঠল। বললে, 'এ আমার ভাগ্য, এ আমার গৌরব।' টাকাকড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলুম; সে অমনি কানে হাত দিয়ে বললে, 'মাপ করবেন, ও-সব কথা আমাকে কিছুই বলবেন না।' আমি বললুম, 'আচ্ছা, সে-সব কথা তোমার বাবার সঙ্গে হবে।' তার বাপের কাছেও গিয়েছিলুম। ছেলের সঙ্গে বাপের অনেক তফাত দেখা গেল। টাকার কথায় বাপ মোটেই কানে হাত দিলে না, বরঞ্চ এমনি আরম্ভ করলে যে আমারই কানে হাত ওঠবার জো হল। ছেলেটিও দেখলুম, এ-সকল বিষয়ে অত্যন্ত পিতৃভক্ত, একবারে 'পিতা হি পরমং তপঃ'— তাকে মধ্যস্থ রেখে কোনো ফল হবে না। এবারে কোম্পানির কাগজটা না ভাঙিয়ে কাজ সারা হল না। তা যাই হোক, তুমিও অবিনাশকে দুই-এক কথা বলে দিয়ো। তোমার মুখ থেকে উৎসাহ পেলে—"

গোরা কহিল, "টাকার অঙ্ক তাতে কিছু কমবে না।"

মহিম কহিলেন, "তা জানি— পিতৃভক্তিটা যখন কাজে লাগবার মতো হয় তখন সামলানো শক্ত।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা পাকা হয়ে গেছে?"

মহিম কহিলেন, "হাঁ।"

গোরা। দিনক্ষণ একেবারে স্থির?

মহিম। স্থির বৈকি, মাঘের পূর্ণমাতিথিতে। সে আর বেশি দেরি নেই। বাপ বলেছেন হীরেমানিকে কাজ নেই, কিন্তু খুব ভারী সোনার গয়না চাই। এখন, কী করলে সোনার দর না বাড়িয়ে সোনার ভার বাড়াতে পারি সেকরার সঙ্গে কিছুদিন তারই পরামর্শ করতে হবে।"

গোরা কহিল, "কিন্তু এত বেশি তাড়াতাড়ি করবার কী দরকার আছে? অবিনাশ যে অল্প দিনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে ঢুকবে এমন আশঙ্কা নেই।"

মহিম কহিলেন, "তা নেই বটে, কিন্তু বাবার শরীর ইদানীং বড়ো খারাপ হয়ে উঠেছে সেটা তোমরা লক্ষ্য করে দেখছ না। ডাক্তারেরা যতই আপত্তি করছে ওঁর নিয়মের মাত্রা আরও ততই বাড়িয়ে তুলছেন। আজকাল যে সন্ন্যাসী ওঁর সঙ্গে জুটেছে সে ওঁকে তিন বেলা স্নান করায়, তার উপরে আবার এমনি হঠযোগ লাগিয়েছে যে চোখের তারা ভুরু নিশ্বাসপ্রশ্বাস নাড়িটাড়ি সমস্ত একেবারে উল্‌টোপাল্‌টা হবার জো হয়েছে। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে শশীর বিয়েটা হয়ে গেলেই সুবিধা হয়; ওঁর পেন্‌শনের জমা টাকাটা ওঙ্কারানন্দ স্বামীর হাতে পড়বার পূর্বেই কাজটা সারতে পারলে আমাকে বেশি ভাবতে হয় না। বাবার কাছে কথাটা কাল পেড়েওছিলুম— দেখলুম বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। ভেবেছি ওই সন্ন্যাসী বেটাকে কিছুদিন খুব কষে গাঁজা খাইয়ে বশ করে নিয়ে ওরই দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে হবে। যারা গৃহস্থ, যাদের টাকার দরকার সব চেয়ে বেশি, বাবার টাকা তাদের ভোগে আসবে না এটা তুমি নিশ্চয় জেনো। আমার মুশকিল হয়েছে এই যে, অন্যের বাবা কষে টাকা তলব করে আর নিজের বাবা টাকা দেবার কথা শুনলেই প্রাণায়াম করতে বসে যায়। আমি এখন ওই এগারো বছরের মেয়েটাকে গলায় বেঁধে কি জলে ডুব দিয়ে মরব!"

৬২

হরিমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাধারানী, কাল রাত্রে তুমি কিছু খেলে না কেন?”

সুচরিতা বিস্মিত হইয়া কহিল, “কেন, খেয়েছি বৈকি।”

হরিমোহিনী তাহার ঢাকা খাবার দেখাইয়া কহিলেন, “কোথায় খেয়েছ? ওই-যে পড়ে রয়েছে।”

তখন সুচরিতা বুঝিল, কাল খাবার কথা তাহার মনেই ছিল না।

হরিমোহিনী রুক্ষ স্বরে কহিলেন, “এ-সব তো ভালো কথা নয়। আমি তোমাদের পরেশবাবুকে যতদূর জানি, তিনি যে এতদূর সব বাড়াবাড়ি ভালোবাসেন তা তো আমার মনে হয় না; তাঁকে দেখলে মানুষের মন শান্ত হয়। তোমার আজকালকার ভাবগতিক তিনি যদি সব জানতে পারেন তা হলে কী বলবেন বলো দেখি।”

হরিমোহিনীর কথার লক্ষ্যটা কী তাহা সুচরিতার বুঝিতে বাকি রহিল না। প্রথমটা মুহূর্তকালের জন্য তাহার মনের মধ্যে সংকোচ আসিয়াছিল। গোরার সহিত তাহার সম্বন্ধকে নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের সহিত সমান করিয়া এমনতরো একটা অপবাদের কটাক্ষ যে তাহাদের উপরে পড়িতে পারে, এ কথা সে কখনো চিন্তাই করে নাই। সেই জন্য হরিমোহিনীর বক্রোক্তিতে সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কিন্তু পর ক্ষণেই হাতের কাজ ফেলিয়া সে খাড়া হইয়া বসিল এবং হরিমোহিনীর মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। গোরার কথা লইয়া সে মনের মধ্যে কাহারও কাছে কোনো লজ্জা রাখিবে না, ইহা মুহূর্তের মধ্যে সে স্থির করিল এবং কহিল, “মাসি, তুমি তো জানো, কাল গৌরমোহনবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের বিষয়টি আমার মনকে খুব অধিকার করে বসেছিল, সেই জন্যে আমি খাবারের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। তুমি থাকলে কাল অনেক কথা শুনতে পেতে।”

হরিমোহিনী যেমন কথা শুনিতে চান গোরার কথা ঠিক তেমনটি নহে। ভক্তির কথা শুনিতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। গোরার মুখে ভক্তির কথা তেমন সরল ও সরস হইয়া বাজিয়া ওঠে না। গোরার সম্মুখে বরাবর যেন একজন প্রতিপক্ষ আছে; তাহার বিরুদ্ধে গোরা কেবলই লড়াই করিতেছে। যাহারা মানে না তাহাদিগকে সে মানাইতে চায়, কিন্তু যে মানে তাহাকে সে কী বলিবে। যাহা লইয়া গোরার উত্তেজনা হরিমোহিনী তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্রাহ্মসমাজের লোক যদি হিন্দুসমাজের সহিত না মিলিয়া নিজের মত লইয়া থাকে তাহাতে তাঁহার আন্তরিক ক্ষোভ কিছুই নাই, তাঁহার নিজের প্রিয়জনগুলির সহিত তাঁহার বিচ্ছেদের কোনো কারণ না ঘটিলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। এই জন্য গোরার সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার হৃদয় লেশমাত্র রস পায় নাই। ইহার পরে হরিমোহিনী যখনই অনুভব করিলেন গোরাই সুচরিতার মনকে অধিকার করিয়াছে, তখনই গোরার কথাবার্তা তাঁহার কাছে আরও বেশি অরুচিকর ঠেকিতে লাগিল। সুচরিতা আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মতে বিশ্বাসে আচরণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এই জন্য সুচরিতাকে কোনো দিক দিয়া হরিমোহিনী সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই— অথচ সুচরিতাই শেষবয়সে হরিমোহিনীর একটিমাত্র অবলম্বন— এই কারণেই সুচরিতার প্রতি পরেশবাবুর ছাড়া আর-কাহারও কোনোপ্রকার অধিকার হরিমোহিনীকে নিতান্ত বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। হরিমোহিনীর কেবলই মনে হইতে লাগিল, গোরার আগাগোড়া সমস্তই কৃত্রিমতা, তাহার আসল মনের লক্ষ্য কোনোরকম ছলে সুচরিতার চিত্ত আকর্ষণ করা। এমন-কি সুচরিতার নিজের যে বিষয়সম্পত্তি আছে তাহার প্রতিও মুখ্যভাবে গোরার লুব্ধতা আছে বলিয়া হরিমোহিনী কল্পনা করিতে লাগিলেন। গোরাকেই হরিমোহিনী তাঁহার প্রধান শত্রু স্থির করিয়া তাহাকে বাধা দিবার জন্য মনে মনে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন।

সুচরিতার বাড়িতে আজ গোরার যাইবার কোনো কথা ছিল না, কোনো কারণও ছিল না। কিন্তু গোরার স্বভাবে দ্বিধা জিনিসটা অত্যন্ত

কম। সে যখন কিছুতে প্রবৃত্ত হয় তখন সে সম্বন্ধে সে চিন্তাই করে না। একেবারে তীরের মতো সোজা চলিয়া যায়।

আজ প্রাতঃকালে সুচরিতার ঘরে গিয়া গোরা যখন উঠিল তখন হরিমোহিনী পূজায় প্রবৃত্ত ছিলেন। সুচরিতা তাহার বসিবার ঘরে টেবিলের উপরকার বই খাতা কাগজ প্রভৃতি পরিপাটি করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, এমন সময় সতীশ আসিয়া যখন খবর দিল গৌরবাবু আসিয়াছেন তখন সুচরিতা বিশেষ বিস্ময় অনুভব করিল না। সে যেন মনে করিয়াছিল আজ গোরা আসিবে।

গোরা চৌকিতে বসিয়া কহিল, "শেষকালে বিনয় আমাদের ত্যাগ করলে।"

সুচরিতা কহিল, "কেন, ত্যাগ করবেন কেন— তিনি তো ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নি।"

গোরা কহিল, "ব্রাহ্মসমাজে বেরিয়ে গেলে তিনি এর চেয়ে আমাদের বেশি কাছে থাকতেন। তিনি হিন্দুসমাজকে আঁকড়ে ধরে আছেন বলেই একে সব চেয়ে বেশি পীড়ন করছেন। এর চেয়ে আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিলেই তিনি ভালো করতেন।"

সুচরিতা মনের মধ্যে একটা কঠিন বেদনা পাইয়া কহিল, "আপনি সমাজকে এমন অতিশয় একান্ত করে দেখেন কেন! সমাজের উপর আপনি এত বেশি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, এ কি আপনার পক্ষে স্বাভাবিক? না অনেকটা নিজের উপর জোর প্রয়োগ করেন?"

গোরা কহিল, "এখনকার অবস্থায় এই জোর প্রয়োগ করাটাই যে স্বাভাবিক। পায়ের নীচে যখন মাটি টলতে থাকে তখন প্রত্যেক পদেই পায়ের উপর বেশি করে জোর দিতে হয়। এখন যে চারি দিকেই বিরুদ্ধতা, সেই জন্য আমাদের বাক্যে এবং ব্যবহারে একটা বাড়াবাড়ি প্রকাশ পায়। সেটা অস্বাভাবিক নয়।"

সুচরিতা কহিল, "চারি দিকে যে বিরুদ্ধতা দেখছেন সেটাকে আপনি

আগাগোড়া অন্যায় এবং অনাবশ্যক কেন মনে করছেন! সমাজ যদি কালের গতিকে বাধা দেয় তা হলে সমাজকে যে আঘাত পেতেই হবে।"

গোরা কহিল, "কালের গতি হচ্ছে জলের ঢেউয়ের মতো, তাতে ডাঙাকে ভাঙতে থাকে। কিন্তু সেই ভাঙনকে স্বীকার করে নেওয়াই যে ডাঙার কর্তব্য আমি তা মনে করি নে। তুমি মনে কোরো না, সমাজের ভালোমন্দ আমি কিছুই বিচার করি নে। সেরকম বিচার করা এতই সহজ যে এখনকার কালের ষোলো বছরের বালকও বিচারক হয়ে উঠেছে। কিন্তু শক্ত হচ্ছে সমগ্র জিনিসকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া।"

সুচরিতা কহিল, "শ্রদ্ধার দ্বারা আমরা কি কেবল সত্যকেই পাই? তাতে করে মিথ্যাকেও তো আমরা অবিচারে গ্রহণ করি। আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— আমরা কি পৌত্তলিকতাকেও শ্রদ্ধা করতে পারি? আপনি কি এ-সমস্ত সত্য বলেই বিশ্বাস করেন?"

গোরা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি তোমাকে ঠিক সত্য কথাটা বলবার চেষ্টা করব। আমি গোড়াতেই এগুলিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছি। য়ুরোপীয় সংস্কারের সঙ্গে এদের বিরোধ আছে ব'লেই এবং এদের বিরুদ্ধে কতকগুলি অত্যন্ত সস্তা যুক্তি প্রয়োগ করা যায় ব'লেই আমি তাড়াতাড়ি এদের জবাব দিয়ে বসি নি। ধর্ম সম্বন্ধে আমার নিজের কোনো বিশেষ সাধনা নেই; কিন্তু সাকার পূজা এবং পৌত্তলিকতা যে একই, মূর্তিপূজাতেই যে ভক্তিতত্ত্বের একটি চরম পরিণতি নেই, এ কথা আমি নিতান্ত অভ্যস্ত বচনের মতো চোখ বুজে আওড়াতে পারব না। শিল্পে সাহিত্যে, এমন-কি বিজ্ঞানে ইতিহাসেও মানুষের কল্পনাবৃত্তির স্থান আছে, একমাত্র ধর্মের মধ্যে তার কোনো কাজ নেই এ কথা আমি স্বীকার করব না। ধর্মের মধ্যেই মানুষের সকল বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ। আমাদের দেশের মূর্তিপূজায় জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে কল্পনার সম্মিলন হবার যে চেষ্টা হয়েছে সেটাতে করেই আমাদের দেশের ধর্ম কি মানুষের কাছে অন্য দেশের চেয়ে সম্পূর্ণতর সত্য হয়ে ওঠে নি?"

সুচরিতা কহিল, "গ্রীসে রোমেও তো মূর্তিপূজা ছিল।"

গোরা কহিল, "সেখানকার মূর্তিতে মানুষের কল্পনা সৌন্দর্যবোধকে যতটা আশ্রয় করেছিল জ্ঞানভক্তিকে ততটা নয়। আমাদের দেশে কল্পনা— জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে গভীররূপে জড়িত। আমাদের কৃষ্ণরাধাই বলো, হর-পার্বতীই বলো, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক পূজার বিষয় নয়; তার মধ্যে মানুষের চিরন্তন তত্ত্বজ্ঞানের রূপ রয়েছে। সেই জন্যেই রামপ্রসাদের চৈতন্যদেবের ভক্তি এই-সমস্ত মূর্তিকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। ভক্তির এমন একান্ত প্রকাশ গ্রীস-রোমের ইতিহাসে কবে দেখা দিয়েছে?"

সুচরিতা কহিল, "কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও সমাজের কোনো পরিবর্তন আপনি একেবারে স্বীকার করতে চান না?"

গোরা কহিল, "কেন চাইব না! কিন্তু পরিবর্তন তো পাগলামি হলে চলবে না। মানুষের পরিবর্তন মনুষ্যত্বের পথেই ঘটে— ছেলেমানুষ ক্রমে বুড়োমানুষ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষ তো হঠাৎ কুকুর-বিড়াল হয় না। ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই, হঠাৎ ইংরাজি ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে। দেশের শক্তি দেশের ঐশ্বর্য দেশের মধ্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে, সেইটে আমি তোমাদের জানাবার জন্যই আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমার কথা বুঝতে পারছ?"

সুচরিতা কহিল, "হাঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু এ-সব কথা আমি কখনো পূর্বে শুনি নি এবং ভাবি নি। নতুন জায়গায় গিয়ে পড়লে খুব স্পষ্ট জিনিসেরও পরিচয় হতে যেমন বিলম্ব ঘটে আমার তেমনি হচ্ছে। বোধ হয় আমি স্ত্রীলোক ব'লেই আমার উপলব্ধিতে জোর পৌঁচচ্ছে না।"

গোরা বলিয়া উঠিল, "কখনোই না। আমি তো অনেক পুরুষকে জানি, এই-সব আলাপ-আলোচনা আমি তাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে করে আসছি— তারা নিঃসংশয়ে ঠিক করে বসে আছে তারা খুব বুঝেছে— কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় বলছি, তোমার মনের সামনে তুমি আজ যেটি

দেখতে পাচ্ছ তারা একটি লোকও তার একটুও দেখে নি। তোমার মধ্যে সেই গভীর দৃষ্টিশক্তি আছে সে আমি তোমাকে দেখেই অনুভব করেছিলুম; সেই জন্যেই আমি আমার এতকালের হৃদয়ের সমস্ত কথা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমার সমস্ত জীবনকে তোমার সামনে মেলে দিয়েছি, কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি নি।"

সুচরিতা কহিল, "আপনি অমন করে যখন বলেন আমার মনের মধ্যে ভারী একটা ব্যাকুলতা বোধ হয়। আমার কাছ থেকে আপনি কী আশা করছেন, আমি তার কী দিতে পারি, আমাকে কী কাজ করতে হবে, আমার মধ্যে যে-একটা ভাবের আবেগ আসছে তার প্রকাশ যে কিরকম, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে। আমার কেবলই ভয় হতে থাকে, আমার উপরে আপনি যে বিশ্বাস রেখেছেন সে পাছে সমস্তই ভুল বলে একদিন আপনার কাছে ধরা পড়ে।"

গোরা মেঘগম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "সেখানে ভুল কোথাও নেই। তোমার ভিতরে যে কত বড়ো শক্তি আছে সে আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব। তুমি কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা মনে রেখো না— তোমার যে যোগ্যতা সে প্রকাশ করে তোলবার ভার আমার উপরে রয়েছে, আমার উপরে তুমি নির্ভর কোরো।"

সুচরিতা কোনো কথা কহিল না, কিন্তু নির্ভর করিতে তাহার যে কিছুই বাকি নাই এই কথাটি নিঃশব্দে ব্যক্ত হইল। গোরাও চুপ করিয়া রহিল; ঘরে অনেক ক্ষণ কোনো শব্দই রহিল না, বাহিরে গলিতে পুরানো-বাসন-ওয়ালা পিতলের পাত্রে ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া দ্বারের সম্মুখ দিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া গেল।

৩

হরিমোহিনী তাঁহার পূজাহ্নিক শেষ করিয়া পাকশালায় যাইতেছিলেন। সুচরিতার নিঃশব্দ ঘরে যে কোনো লোক আছে তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই— কিন্তু ঘরের দিকে হঠাৎ চাহিয়া হরিমোহিনী যখন দেখিলেন সুচরিতা ও গোরা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, উভয়ে কোনোপ্রকার শিষ্টালাপ-

মাত্রও করিতেছে না, তখন এক মুহূর্তে তাঁহার ক্রোধের শিখা ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যেন বিদ্যুদ্‌বেগে জ্বলিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "রাধারানী!"

সুচরিতা উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিলে তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আজ একাদশী, আমার শরীর ভালো নেই, যাও তুমি রান্নাঘরে গিয়ে উনানটা ধরাও গে— আমি তত ক্ষণ গৌরবাবুর কাছে একটু বসি।"

সুচরিতা মাসির ভাব দেখিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। হরিমোহিনী ঘরে প্রবেশ করিতে গোরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি কোনো কথা না কহিয়া চৌকিতে বসিলেন। কিছু ক্ষণ ঠোঁট চাপিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি তো, বাবা, ব্রাহ্ম নও?"

গোরা কহিল, "না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "আমাদের হিন্দুসমাজকে তুমি তো মানো?"

গোরা কহিল, "মানি বৈকি।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তবে তোমার এ কী রকম ব্যবহার!"

গোরা হরিমোহিনীর অভিযোগ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হরিমোহিনী কহিলেন, "রাধারানীর বয়স হয়েছে, তোমরা তো ওর আত্মীয় নও— ওর সঙ্গে তোমাদের এত কী কথা! ও মেয়েমানুষ, ঘরের কাজকর্ম করবে, ওরই-বা এ-সব কথায় থাকবার দরকার কী? ওতে যে ওর মন অন্য দিকে নিয়ে যায়। তুমি তো জ্ঞানী লোক— দেশসুদ্ধ সকলেই তোমার প্রশংসা করে— কিন্তু এ-সব আমাদের দেশে কবেই-বা ছিল আর কোন্‌ শাস্ত্রেই-বা লেখে!"

গোরা হঠাৎ একটা মস্ত ধাক্কা পাইল। সুচরিতার সম্বন্ধে এমন কথা যে কোনো পক্ষ হইতে উঠিতে পারে তাহা সে চিন্তাও করে নাই। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ইনি ব্রাহ্মসমাজে আছেন, বরাবর এঁকে এইরকম সকলের সঙ্গে মিশতে দেখেছি, সেইজন্যে আমার কিছু মনে হয় নি।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "আচ্ছা, ওই নাহয় ব্রাহ্মসমাজে আছে, কিন্তু তুমি তো এ-সব কখনো ভালো বলো না। তোমার কথা শুনে আজকালকার কত লোকের চৈতন্য হচ্ছে, আর তোমার ব্যবহার এরকম হলে লোকে তোমাকে মানবে কেন! এই-যে কাল রাত্রি পর্যন্ত ওর সঙ্গে তুমি কথা কয়ে গেলে, তাতেও তোমার কথা শেষ হল না, আবার আজ সকালেই এসেছ! সকাল থেকে ও আজ না গেল ভাঁড়ারে, না গেল রান্নাঘরে— আজ একাদশীর দিনে আমাকে যে একটু সাহায্য করবে তাও ওর মনে হল না, এ ওর কী রকম শিক্ষা হচ্ছে! তোমাদের নিজের ঘরেও তো মেয়ে আছে— তাদের নিয়ে কি সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে তুমি এইরকম শিক্ষা দিচ্ছ, না আর-কেউ দিলে তুমি ভালো বোধ কর?"

গোরার তরফে এ-সব কথার কোনো উত্তর ছিল না। সে কেবল কহিল, "ইনি এইরকম শিক্ষাতেই মানুষ হয়েছেন ব'লে আমি এঁর সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করি নি।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "ও যে-শিক্ষাই পেয়ে থাক্, যতদিন আমার কাছে আছে আর আমি বেঁচে আছি এ-সব চলবে না। ওকে আমি অনেকটা ফিরিয়ে এনেছি। ও যখন পরেশবাবুর বাড়িতে ছিল তখনই তো আমার সঙ্গে মিশে ও হিঁদু হয়ে গেছে রব উঠেছিল। তার পরে এ বাড়িতে এসে তোমাদের বিনয়ের সঙ্গে কী জানি কী সব কথাবার্তা হতে লাগল, আবার সব উল্‌টে গেল। তিনি তো আজ ব্রাহ্মঘরে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। যাক, অনেক কষ্টে বিনয়কে তো বিদায় করেছি। তার পরে হারানবাবু বলে একটি লোক আসত; সে এলেই আমি রাধারানীকে নিয়ে আমার উপরের ঘরে বসতুম, সে আর আমল পেল না। এমনি করে অনেক দুঃখে ওর আজকাল আবার যেন একটু মতি ফিরেছে বলে বোধ হচ্ছে। এ বাড়িতে এসে ও আবার সকলের ছোঁওয়া খেতে আরম্ভ করেছিল, কাল দেখলুম সেটা বন্ধ করেছে। কাল রান্নাঘর থেকে নিজের ভাত নিজেই নিয়ে গেল, বেহারাকে জল আনতে বারণ করে দিলে। এখন, বাপু, তোমার কাছে

জোড়-হাতে আমার এই মিনতি, তোমরা ওকে আর মাটি কোরো না। সংসারে আমার যে-কেউ ছিল সব ম'রে ঝ'রে কেবল ওই একটিতে এসে ঠেকেছে, ওরও ঠিক আপন বলতে আমি ছাড়া আর-কেউ নেই। ওকে তোমরা ছেড়ে দাও। ওদের ঘরে আরও তো ঢের বড়ো বড়ো মেয়ে আছে— ওই লাবণ্য আছে, লীলা আছে, তারাও বুদ্ধিমতী, পড়াশুনা করেছে; যদি তোমার কিছু বলবার থাকে ওদের কাছে গিয়ে বলো গে, কেউ তোমাকে মানা করবে না।"

গোরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। হরিমোহিনী কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভেবে দেখো, ওকে তো বিয়েথাওয়া করতে হবে, বয়স তো যথেষ্ট হয়েছে। তুমি কি বলো ও চিরদিন এইরকম আইবুড়ো হয়েই থাকবে? গৃহধর্ম করাটা তো মেয়েমানুষের দরকার।"

সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে গোরার কোনো সংশয় ছিল না, তাহারও এই মত বটে, কিন্তু সুচরিতা সম্বন্ধে নিজের মতকে সে মনে মনেও কখনো প্রয়োগ করিয়া দেখে নাই। সুচরিতা গৃহিণী হইয়া কোনো এক গৃহস্থ-ঘরের অন্তঃপুরে ঘরকন্নায় নিযুক্ত আছে এ কল্পনা তাহার মনেও উঠে না। যেন সুচরিতা আজও যেমন আছে বরাবর ঠিক এমনিই থাকিবে।

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বোনঝির বিবাহের কথা কিছু ভেবেছেন নাকি?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "ভাবতে হয় বৈকি, আমি না হলে আর ভাববে কে!"

গোরা প্রশ্ন করিল, "হিন্দু সমাজে কি ওঁর বিবাহ হতে পারবে?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "সে চেষ্টা তো করতে হবে। ও যদি আর গোল না করে, বেশ ঠিকমত চলে, তা হলে ওকে বেশ চালিয়ে দিতে পারব। সে আমি মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছি, এতদিন ওর যেরকম গতিক ছিল সাহস ক'রে কিছু করে উঠতে পারি নি। এখন আবার দু দিন থেকে দেখছি ওর মনটা নরম হয়ে আসছে, তাই ভরসা হচ্ছে।"

গোরা ভাবিল, এ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, কিন্তু কিছুতেই থাকিতে পারিল না; প্রশ্ন করিল, "পাত্র কি কাউকে মনে মনে ঠিক করেছেন?"

হরিমোহিনী কহিলেন; "তা করেছি। পাত্রটি বেশ ভালোই— কৈলাস, আমার ছোটো দেবর। কিছুদিন হল তার বউটি মারা গেছে; মনের মতো বড়ো মেয়ে পায় নি বলেই এতদিন বসে আছে, নইলে সে ছেলে কি পড়তে পায়? রাধারানীর সঙ্গে ঠিক মানাবে।"

মনের মধ্যে গোরার যতই ছুঁচ ফুটিতে লাগিল ততই সে কৈলাসের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

হরিমোহিনীর দেবরদের মধ্যে কৈলাসই নিজের বিশেষ যত্নে কিছুদূর লেখাপড়া করিয়াছিল— কত দূর তাহা হরিমোহিনী বলিতে পারেন না। পরিবারের মধ্যে তাহারই বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি আছে। গ্রামের পোস্ট্‌-মাস্টারের বিরুদ্ধে সদরে দরখাস্ত করিবার সময় কৈলাসই এমন আশ্চর্য ইংরাজি ভাষায় সমস্তটা লিখিয়া দিয়াছিল যে, পোস্ট্‌-আপিসের কোন্‌-এক বড়োবাবু স্বয়ং আসিয়া তদন্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে গ্রামবাসী সকলেই কৈলাসের ক্ষমতায় বিস্ময় অনুভব করিয়াছে। এত শিক্ষা সত্ত্বেও আচারে ধর্মে কৈলাসের নিষ্ঠা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

কৈলাসের ইতিবৃত্ত সমস্ত বলা হইলে গোরা উঠিয়া দাঁড়াইল, হরিমোহিনীকে প্রণাম করিল এবং কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া গোরা যখন প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিতেছে তখন প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে পাকশালায় সুচরিতা কর্মে ব্যাপৃত ছিল। গোরার পদশব্দ শুনিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গোরা কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সুচরিতা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় পাকশালার কাজে আসিয়া নিযুক্ত হইল।

গোরা গলির মোড়ের কাছে আসিতেই হারানবাবুর সঙ্গে তাহার দেখা

হইল। হারানবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "আজ সকালেই যে!"

গোরা তাহার কোনো উত্তর করিল না। হারানবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে গিয়েছিলেন বুঝি! সুচরিতা বাড়ি আছে তো!"

গোরা কহিল, "হাঁ।" বলিয়াই সে হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

হারানবাবু একেবারেই সুচরিতার বাড়িতে ঢুকিয়া রান্নাঘরের মুক্ত দ্বার দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন; সুচরিতার পালাইবার পথ ছিল না, মাসিও নিকটে ছিলেন না।

হারানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরমোহনবাবুর সঙ্গে এইমাত্র দেখা হল। তিনি এখানেই এত ক্ষণ ছিলেন বুঝি?"

সুচরিতা তাহার কোনো জবাব না করিয়া হঠাৎ হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল; যেন এখন তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই এইরকম ভাবটা জানাইল। কিন্তু হারানবাবু তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি ঘরের বাহিরে সেই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন। হরিমোহিনী সিঁড়ির কাছে আসিয়া দুই-তিনবার কাশিলেন, তাহাতেও কিছুমাত্র ফল হইল না। হরিমোহিনী হারানবাবুর সম্মুখেই আসিতে পারিতেন কিন্তু তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, একবার যদি তিনি হারানবাবুর সম্মুখে বাহির হন তবে এ বাড়িতে এই উদ্যমশীল যুবকের অদম্য উৎসাহ হইতে তিনি এবং সুচরিতা কোথাও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। এই জন্য হারানবাবুর ছায়া দেখিলেও তিনি এতটা পরিমাণে ঘোমটা টানিয়া দেন যে তাহা তাঁহার বধূবয়সেও তাঁহার পক্ষে অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিত।

হারানবাবু কহিলেন, "সুচরিতা, তোমরা কোন্‌ দিকে চলেছ বলো দেখি। কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? বোধ হয় শুনেছ ললিতার সঙ্গে বিনয়বাবুর হিন্দুমতে বিয়ে হবে। তুমি জান এ জন্যে কে দায়ী?"

সুচরিতার নিকট কোনো উত্তর না পাইয়া হারানবাবু স্বর নত করিয়া

গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "দায়ী তুমি।"

হারানবাবু মনে করিয়াছিলেন, এতবড়ো একটা সাংঘাতিক অভিযোগের আঘাত সুচরিতা সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু সে বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করিতে লাগিল; দেখিয়া তিনি স্বর আরও গম্ভীর করিয়া সুচরিতার প্রতি তাঁহার তর্জনী প্রসারিত ও কম্পিত করিয়া কহিলেন, "সুচরিতা, আমি আবার বলছি, দায়ী তুমি। বুকের উপরে ডান হাত রেখে কি বলতে পার যে এ জন্যে ব্রাহ্মসমাজের কাছে তোমাকে অপরাধী হতে হবে না?"

সুচরিতা উনানের উপরে নীরবে তেলের কড়া চাপাইয়া দিল এবং তেল চড়্‌বড়্‌ শব্দ করিতে লাগিল।

হারান বলিতে লাগিলেন, "তুমিই বিনয়বাবুকে এবং গৌরমোহনবাবুকে তোমাদের ঘরে এনেছ এবং তাদের এত দূর পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছ যে, আজ তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত মান্য বন্ধুদের চেয়ে এরা দুজনেই তোমাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। তার ফল কী হয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আমি কি প্রথম থেকেই বার বার সাবধান করে দিই নি? আজ কী হল? আজ ললিতাকে কে নিবৃত্ত করবে! তুমি ভাবছ ললিতার উপর দিয়েই বিপদের অবসান হয়ে গেল! তা নয়। আমি আজ তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। এবার তোমার পালা। আজ ললিতার দুর্ঘটনায় তুমি নিশ্চয়ই মনে মনে অনুতাপ করছ, কিন্তু এমন দিন অনতিদূরে এসেছে যেদিন নিজের অধঃপতনে তুমি অনুতাপমাত্রও করবে না। কিন্তু, সুচরিতা, এখনো ফেরবার সময় আছে। একবার ভেবে দেখো, একদিন কত বড়ো মহৎ আশার মধ্যে আমরা দুজনে মিলেছিলুম, আমাদের সামনে জীবনের কর্তব্য কী উজ্জ্বল ছিল, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কী উদারভাবেই প্রসারিত হয়েছিল— আমাদের কত সংকল্প ছিল এবং কত পাথেয় আমরা প্রতিদিনই সংগ্রহ করেছি। সে-সমস্তই কি নষ্ট হয়েছে মনে কর? কখনোই না। আমাদের সেই আশার ক্ষেত্র আজও তেমনি প্রস্তুত হয়ে আছে। একবার মুখ ফিরিয়ে কেবল চাও। একবার ফিরে এসো।"

তখন ফুটন্ত তেলের মধ্যে অনেকখানি শাক তরকারি ছ্যাঁক্‌ ছ্যাঁক্‌ করিতেছিল এবং খোন্তা দিয়া সুচরিতা তাহাকে বিধিমতে নাড়া দিতেছিল ; যখন হারানবাবু তাঁহার আহ্বানের ফল জানিবার জন্য চুপ করিলেন তখন সুচরিতা আগুনের উপর হইতে কড়া নীচে নামাইয়া মুখ ফিরাইল এবং দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি হিন্দু।"

হারানবাবু একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, "তুমি হিন্দু!"

সুচরিতা কহিল, "হাঁ, আমি হিন্দু।"

বলিয়া কড়া আবার উনানে চড়াইয়া সবেগে খোন্তা-চালনায় প্রবৃত্ত হইল।

হারানবাবু ক্ষণকাল ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া তীব্রস্বরে কহিলেন, "গৌরমোহনবাবু তাই বুঝি সকাল নেই সন্ধ্যা নেই তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছিলেন?"

সুচরিতা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, "হাঁ, আমি তাঁর কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছি, তিনিই আমার গুরু।"

হারানবাবু এক কালে নিজেকেই সুচরিতার গুরু বলিয়া জানিতেন। আজ যদি সুচরিতার কাছে তিনি শুনিতেন যে, সে গোরাকে ভালোবাসে তাহাতে তাঁহার তেমন কষ্ট হইত না— কিন্তু তাঁহার গুরুর অধিকার আজ গোরা কাড়িয়া লইয়াছে, সুচরিতার মুখে এ কথা তাঁহাকে শেলের মতো বাজিল।

তিনি কহিলেন, "তোমার গুরু যত বড়ো লোকই হোন-না কেন, তুমি কি মনে কর হিন্দুসমাজ তোমাকে গ্রহণ করবে?"

সুচরিতা কহিল, "সে কথা আমি বুঝি নে, আমি সমাজও জানি নে, আমি জানি আমি হিন্দু।"

হারানবাবু কহিলেন, "তুমি জান এত দিন তুমি অবিবাহিত রয়েছ কেবলমাত্র এতেই হিন্দুসমাজে তোমার জাত গিয়েছে?"

সুচরিতা কহিল, "সে কথা নিয়ে আপনি বৃথা চিন্তা করবেন না, কিন্তু আমি আপনাকে বলছি আমি হিন্দু।"

হারানবাবু কহিলেন, "পরেশবাবুর কাছে যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলে

তাও তোমার নতুন গুরুর পায়ের তলায় বিসর্জন দিলে।"

সুচরিতা কহিল, "আমার ধর্ম আমার অন্তর্যামী জানেন, সে কথা নিয়ে আমি কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে চাই নে। কিন্তু, আপনি জানবেন আমি হিন্দু।"

হারানবাবু তখন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যত বড়ো হিন্দুই হও-না কেন তাতে কোনো ফল পাবে না— এও আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি। তোমার গৌরমোহনবাবুকে বিনয়বাবু পাও নি। তুমি নিজেকে 'হিন্দু হিন্দু' বলে গলা ফাটিয়ে ম'লেও গৌরবাবু যে তোমাকে গ্রহণ করবেন এমন আশাও কোরো না। শিষ্যকে নিয়ে গুরুগিরি করা সহজ, কিন্তু তাই বলে তোমাকে ঘরে নিয়ে ঘরকন্না করবেন এ কথা স্বপ্নেও মনে কোরো না।"

সুচরিতা রান্নাবান্না সমস্ত ভুলিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এ-সব আপনি কী বলছেন!"

হারানবাবু কহিলেন, "আমি বলছি, গৌরমোহনবাবু কোনোদিন তোমাকে বিবাহ করবেন না।"

সুচরিতা দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া কহিল, "বিবাহ? আমি কি আপনাকে বলি নি তিনি আমার গুরু?"

হারানবাবু কহিলেন, "তা তো বলেছ। কিন্তু যে কথাটা বল নি সেটাও তো আমরা বুঝতে পারি।"

সুচরিতা কহিল, "আপনি যান এখান থেকে। আমাকে অপমান করবেন না। আমি আজ এই আপনাকে বলে রাখছি, আজ থেকে আপনার সামনে আমি আর বার হব না।"

হারানবাবু কহিলেন, "বার হবে কী করে বলো, এখন যে তুমি জেনেনা! হিন্দুরমণী! অসূর্যম্পশ্যরূপা! পরেশবাবুর পাপের ভরা এইবার পূর্ণ হল। এই বুড়ো বয়সে তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে থাকুন, আমরা বিদায় হলুম।"

সুচরিতা সশব্দে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল এবং মুখের মধ্যে আঁচলের কাপড় গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের শব্দকে প্রাণপণে নিরুদ্ধ করিল। হারানবাবু মুখ কালী করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরিমোহিনী উভয়ের কথোপকথন সমস্ত শুনিয়াছিলেন। আজ তিনি সুচরিতার মুখে যাহা শুনিলেন তাহা তাঁহার আশার অতীত। তাঁহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, 'হবে না! আমি যে একমনে আমার গোপীবল্লভের পূজা করিয়া আসিলাম, সে কি সমস্তই বৃথা যাইবে?'

হরিমোহিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূজাগৃহে গিয়া মেঝের উপরে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া তাঁহার ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং আজ হইতে ভোগ আরও বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এতদিন তাঁহার পূজা শোকের সান্ত্বনারূপে শান্তভাবে ছিল— আজ তাহা স্বার্থের সাধনরূপ ধরিতেই অত্যন্ত উগ্র, উত্তপ্ত, ক্ষুধাতুর হইয়া উঠিল।

৬৩

সুচরিতার সম্মুখে গোরা যেমন করিয়া কথা কহিয়াছে এমন আর-কাহারও কাছে কহে নাই। এতদিন সে তাহার শ্রোতাদের কাছে নিজের মধ্য হইতে কেবল বাক্যকে, মতকে, উপদেশকে বাহির করিয়া আসিয়াছে— আজ সুচরিতার সম্মুখে সে নিজের মধ্য হইতে নিজেকেই বাহির করিল। এই আত্মপ্রকাশের আনন্দে, শুধু শক্তিতে নহে, একটা রসে তাহার সমস্ত মত ও সংকল্প পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি সৌন্দর্যশ্রী তাহার জীবনকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। তাহার তপস্যার উপর যেন সহসা দেবতারা অমৃত বর্ষণ করিলেন।

এই আনন্দের আবেগেই গোরা কিছুই না ভাবিয়া কয়দিন প্রত্যহই সুচরিতার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু আজ হরিমোহিনীর কথা শুনিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল— অনুরূপ মুগ্ধতায় বিনয়কে সে একদিন যথেষ্ট তিরস্কার ও পরিহাস করিয়াছে। আজ যেন নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেকে

সেই অবস্থার মধ্যে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। অস্থানে অসম্বৃত নিদ্রিত ব্যক্তি ধাক্কা খাইলে যেমন ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া পড়ে, গোরা সেইরূপ নিজের সমস্ত শক্তিতে নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিল। গোরা বরাবর এই কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছে যে, পৃথিবীতে অনেক প্রবল জাতির একেবারে ধ্বংস হইয়াছে— ভারত কেবলমাত্র সংযমেই, কেবল দৃঢ়ভাবে নিয়ম পালন করিয়াই, এত শতাব্দীর প্রতিকূল সংঘাতেও আজ পর্যন্ত আপনাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছে। সেই নিয়মে কুত্রাপি গোরা শৈথিল্য স্বীকার করিতে চায় না। গোরা বলে, ভারতবর্ষের আর-সমস্তই লুটপাট হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার যে প্রাণপুরুষকে সে এই-সমস্ত কঠিন নিয়মসংযমের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার গায়ে কোনো অত্যাচারী রাজপুরুষের হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্যই নাই। যতদিন আমরা পরজাতির অধীন হইয়া আছি ততদিন নিজেদের নিয়মকে দৃঢ় করিয়া মানিতে হইবে। এখন ভালোমন্দ বিচারের সময় নয়। যে ব্যক্তি স্রোতের টানে পড়িয়া মৃত্যুর মুখে ভাসিয়া যাইতেছে সে যাহার দ্বারাই নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারে তাহাকেই আঁকড়াইয়া থাকে, সে জিনিসটা সুন্দর কি কুশ্রী বিচার করে না। গোরা বরাবর এই কথা বলিয়া আসিয়াছে, আজও ইহাই তাহার বলিবার কথা। হরিমোহিনী সেই গোরার যখন আচরণের নিন্দা করিলেন তখন গজরাজকে অঙ্কুশে বিদ্ধ করিল।

গোরা যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল তখন দ্বারের সম্মুখে রাস্তার উপরে বেঞ্চি পাতিয়া খোলা গায়ে মহিম তামাক খাইতেছিলেন। আজ তাঁহার আপিসের ছুটি। গোরাকে ভিতরে ঢুকিতে দেখিয়া তিনিও তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "গোরা, শুনে যাও, একটি কথা আছে।"

গোরাকে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া মহিম কহিলেন, "রাগ কোরো না ভাই, আগে জিজ্ঞাসা করছি— তোমাকেও বিনয়ের ছোঁয়াচ লেগেছে না কি? ও অঞ্চলে যে বড়ো ঘন ঘন যাওয়া-আসা চলছে!"

গোরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ভয় নেই।"

মহিম কহিলেন, "যেরকম গতিক দেখছি, কিছু তো বলা যায় না। তুমি

ভাবছ, ওটা একটা খাদ্যদ্রব্য, দিব্যি গিলে ফেলে তার পরে আবার ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু বঁড়শিটি ভিতরে আছে, সে তোমার বন্ধুর দশা দেখলেই বুঝতে পারবে। আরে, যাও কোথায়! আসল কথাটাই এখনো হয় নি। ও দিকে ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে তো একেবারে পাকা হয়ে গেছে শুনতে পাচ্ছি। তার পর কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনো-রকম ব্যবহার চলবে না, সে আমি তোমাকে আগে থাকতেই বলে রাখছি।"

গোরা কহিল, "সে তো চলবেই না।"

মহিম কহিলেন, "কিন্তু মা যদি গোলমাল করেন তা হলে সুবিধা হবে না। আমরা গৃহস্থ মানুষ, অমনিতেই মেয়েছেলের বিয়ে দিতে জিব বেরিয়ে পড়ে, তার পরে যদি ঘরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ বসাও তা হলে আমাকে কিন্তু এখান থেকে বাস ওঠাতে হবে।"

গোরা কহিল, "না, সে কিছুতেই হবে না।"

মহিম কহিলেন, "শশীর বিবাহের প্রস্তাবটা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের বেহাই যতটুকু পরিমাণ মেয়ে ঘরে নেবেন সোনা তার চেয়ে বেশি না নিয়ে ছাড়বেন না, কারণ তিনি জানেন মানুষ নশ্বর পদার্থ, সোনা তার চেয়ে বেশি দিন টেঁকে। ওষুধের চেয়ে অনুপানটার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। বেহাই বললে তাঁকে খাটো করা হয়, একেবারে বেহায়া। কিছু খরচ হবে বটে, কিন্তু লোকটার কাছে আমার অনেক শিক্ষা হল— ছেলের বিয়ের সময় কাজে লাগবে। ভারী লোভ হচ্ছিল, আর-একবার একালে জন্মগ্রহণ করে বাবাকে মাঝখানে বসিয়ে রেখে নিজের বিয়েটা একবার বিধিমত পাকিয়ে তুলি, পুরুষজন্ম যে গ্রহণ করেছি সেটাকে একেবারে ষোলো-আনা সার্থক করে নিই। একেই তো বলে পৌরুষ। মেয়ের বাপকে একেবারে ধরাশায়ী করে দেওয়া। কম কথা! যাই বল, তোমার সঙ্গে যোগ দিয়ে যে নিশিদিন হিন্দুসমাজের জয়ধ্বনি করব, কিছুতেই তাতে জোর পাচ্ছি নে ভাই— গলা উঠতে চায় না— একেবারে কাহিল করে ফেলেছে। আমার তিনকড়েটার বয়স এখন সবে চৌদ্দ মাস— গোড়ায় কন্যা জন্ম দিয়ে শেষে

তার ভ্রম সংশোধন করতে সহধর্মিণী দীর্ঘকাল সময় নিয়েছেন। যা হোক, ওরই বিবাহের সময়টা পর্যন্ত, গোরা, তোমরা সকলে মিলে হিন্দুসমাজটাকে তাজা রেখো ; তার পর দেশের লোক মুসলমান হোক, খৃস্টান হোক, আমি কোনো কথা কব না।"

গোরা উঠিয়া দাঁড়াইতেই মহিম কহিলেন, "তাই আমি বলছিলুম, শশীর বিবাহের সভায় তোমাদের বিনয়কে নিমন্ত্রণ করা চলবে না। তখন যে এই কথা নিয়ে আবার একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে সে হবে না। মাকে তুমি এখন থেকে সাবধান করে রেখে দিয়ো।"

মাতার ঘরে আসিয়া গোরা দেখিল, আনন্দময়ী মেঝের উপর বসিয়া চশমা চোখে আঁটিয়া একটা খাতা লইয়া কিসের ফর্দ করিতেছেন। গোরাকে দেখিয়া তিনি চশমা খুলিয়া খাতা বন্ধ করিয়া কহিলেন, "বোস্।"

গোরা বসিলে আনন্দময়ী কহিলেন, "তোর সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে। বিনয়ের বিয়ের খবর তো পেয়েছিস ?"

গোরা চুপ করিয়া রহিল। আনন্দময়ী কহিলেন, "বিনয়ের কাকা রাগ করেছেন, তাঁরা কেউ আসবেন না। আবার পরেশবাবুর বাড়িতেও এ বিয়ে হয় কি না সন্দেহ। বিনয়কেই সমস্ত বন্দোবস্ত করতে হবে। তাই আমি বলছিলুম, আমাদের বাড়ির উত্তর-ভাগটার একতলা তো ভাড়া দেওয়া হয়েছে— ওর দোতলার ভাড়াটেও উঠে গেছে। ওই দোতলাতেই যদি বিনয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করা যায় তা হলে সুবিধা হয়।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "কী সুবিধা হয় ?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "আমি না থাকলে ওর বিয়েতে দেখাশুনা করবে কে ? ও যে মহা বিপদে পড়ে যাবে। ওখানে যদি বিয়ের ঠিক হয় তা হলে আমি এই বাড়ি থেকেই সমস্ত জোগাড়যন্ত্র করে দিতে পারি, কোনো হাঙ্গাম করতে হয় না।"

গোরা কহিল, "সে হবে না মা।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কেন হবে না ? কর্তাকে আমি রাজি করেছি।"

গোরা কহিল, "না মা, এ বিয়ে এখানে হতে পারবে না— আমি বলছি, আমার কথা শোনো।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "কেন, বিনয় তো ওদের মতে বিয়ে করছে না।"

গোরা কহিল, "ও-সমস্ত তর্কের কথা। সমাজের সঙ্গে ওকালতি চলবে না। বিনয় যা খুশি করুক, এ বিয়ে আমরা মানতে পারি নে। কোলকাতা শহরে বাড়ির অভাব নেই। তার নিজেরই তো বাসা আছে।"

বাড়ি অনেক মেলে, আনন্দময়ী তাহা জানিতেন। কিন্তু বিনয় যে আত্মীয়বন্ধু সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো কোনো গতিকে বাসায় বসিয়া বিবাহকর্ম সারিয়া লইবে, ইহা তাঁহার মনে বাজিতেছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহাদের বাড়ির যে অংশ ভাড়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র রহিয়াছে সেইখানে বিনয়ের বিবাহ দিবার কথা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। ইহাতে সমাজের সঙ্গে কোনো বিরোধ না বাধাইয়া তাঁহাদের আপন বাড়িতে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন।

গোরার দৃঢ় আপত্তি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তোমাদের যদি এতে এতই অমত তা হলে অন্য জায়গাতেই বাড়ি ভাড়া করতে হবে। কিন্তু তাতে আমার উপরে ভারী টানাটানি পড়বে। তা হোক, যখন এটা হতেই পারবে না তখন এ নিয়ে আর ভেবে কী হবে।"

গোরা কহিল, "মা, এ বিবাহে তুমি যোগ দিলে চলবে না।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "সে কী কথা গোরা, তুই বলিস কী! আমাদের বিনয়ের বিয়েতে আমি যোগ দেব না তো কে দেবে!"

গোরা কহিল, "সে কিছুতেই হবে না মা।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "গোরা, বিনয়ের সঙ্গে তোর মতের মিল না হতে পারে, তাই বলে কী তার সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে?"

গোরা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "মা, এ কথা তুমি অন্যায় বলছ। আজ বিনয়ের বিয়েতে আমি যে আমোদ করে যোগ দিতে পারছি

নে, এ কথা আমাদের পক্ষে সুখের কথা নয়। বিনয়কে আমি যে কতখানি ভালোবাসি সে আর-কেউ না জানে তো তুমি জান। কিন্তু মা, এ ভালোবাসার কথা নয়, এর মধ্যে শত্রুতা মিত্রতা কিছুমাত্র নেই। বিনয় এর ফলাফল সমস্ত জেনেশুনেই এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে। আমরা তাকে পরিত্যাগ করি নি, সে'ই আমাদের পরিত্যাগ করেছে, সুতরাং এখন যে বিচ্ছেদ ঘটেছে সে জন্যে সে এমন কোনো আঘাত পাবে না যা তার প্রত্যাশার অতীত।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "গোরা, বিনয় জানে, এই বিয়েতে তোমার সঙ্গে তার কোনোরকম যোগ থাকবে না সে কথা ঠিক। কিন্তু এও সে নিশ্চয় জানে, শুভকর্মে আমি তাকে কোনোমতেই পরিত্যাগ করতে পারব না। বিনয়ের বউকে আমি আশীর্বাদ করে গ্রহণ করব না এ কথা বিনয় যদি মনে করত তা হলে আমি বলছি, সে প্রাণ গেলেও এ বিয়ে করতে পারত না। আমি কি বিনয়ের মন জানি নে!"

বলিয়া আনন্দময়ী চোখের কোণ হইতে এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। বিনয়ের জন্য গোরার মনের মধ্যে যে গভীর বেদনা ছিল তাহা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তবু সে বলিল, "মা, তুমি সমাজে আছ এবং সমাজের কাছে তুমি ঋণী, এ কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "গোরা, আমি তো তোমাকে বার বার বলেছি, সমাজের সঙ্গে আমার যোগ অনেক দিন থেকেই কেটে গেছে। সে জন্যে সমাজ আমাকে ঘৃণা করে, আমিও তার থেকে দূরে থাকি।"

গোরা কহিল, "মা, তোমার এই কথায় আমি সব চেয়ে আঘাত পাই।"

আনন্দময়ী তাঁহার অশ্রুছলছল স্নিগ্ধদৃষ্টি-দ্বারা গোরার সর্বাঙ্গ যেন স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "বাছা, ঈশ্বর জানেন. তোকে এ আঘাত থেকে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই।"

গোরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তা হলে আমাকে কী করতে হবে তোমাকে বলি। আমি বিনয়ের কাছে চললুম, তাকে আমি বলব তোমাকে

তার বিবাহ-ব্যাপারে জড়িত করে সমাজের সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদকে সে যেন আর বাড়িয়ে না তোলে— কেননা এ তার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় এবং স্বার্থপরতার কাজ হবে।"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তুই যা করতে পারিস করিস— তাকে বল্ গে যা, তার পরে আমি দেখব এখন।"

গোরা চলিয়া গেলে আনন্দময়ী অনেক ক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া তাঁহার স্বামীর মহলে চলিয়া গেলেন।

আজ একাদশী, সুতরাং আজ কৃষ্ণদয়ালের স্বপাকের কোনো আয়োজন নাই। তিনি ঘেরণ্ডসংহিতার একটি নূতন বাংলা অনুবাদ পাইয়াছিলেন; সেইটি হাতে লইয়া একখানি মৃগচর্মের উপর বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন।

আনন্দময়ীকে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আনন্দময়ী তাঁহার সহিত যথেষ্ট দূরত্ব রাখিয়া ঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া কহিলেন, "দেখো, বড়ো অন্যায় হচ্ছে।"

কৃষ্ণদয়াল সাংসারিক ন্যায়-অন্যায়ের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; এই জন্য উদাসীনভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী অন্যায়?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "গোরাকে কিন্তু আর এক দিনও ভুলিয়ে রাখা উচিত হচ্ছে না, ক্রমেই বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ছে।"

গোরা যেদিন প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলিয়াছিল সেদিন কৃষ্ণদয়ালের মনে এ কথা উঠিয়াছিল; তাহার পরে যোগসাধনার নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়িয়া সে কথা চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই।

আনন্দময়ী কহিলেন, "শশিমুখীর বিয়ের কথা হচ্ছে; বোধ হয় এই ফাল্গুন মাসেই হবে। এর আগে বাড়িতে যতবার সামাজিক ক্রিয়াকর্ম হয়েছে আমি কোনো-না-কোনো ছুতায় গোরাকে সঙ্গে করে অন্য জায়গায় গেছি। তেমন বড়ো কোনো কাজও তো এর মধ্যে হয় নি। কিন্তু এবার শশীর বিবাহে ওকে নিয়ে কী করবে বলো। অন্যায় রোজই বাড়ছে, আমি

ভগবানের কাছে দুবেলা হাত জোড় করে মাপ চাচ্ছি, তিনি শাস্তি যা দিতে চান সব আমাকেই যেন দেন, কিন্তু আমার কেবল ভয় হচ্ছে— আর বুঝি ঠেকিয়ে রাখতে পারা যাবে না, গোরাকে নিয়ে বিপদ হবে। এইবার আমাকে অনুমতি দাও, আমার কপালে যা থাকে ওকে আমি সব কথা খুলে বলি।"

কৃষ্ণদয়ালের তপস্যা ভাঙিবার জন্য ইন্দ্রদেব এ কী বিঘ্ন পাঠাইতেছেন! তপস্যাও সম্প্রতি খুব ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে— নিশ্বাস লইয়া অসাধ্য-সাধন হইতেছে, আহারের মাত্রাও ক্রমে এতটা কমিয়াছে যে পেটকে পিঠের সহিত এক করিবার পণ রক্ষা হইতে আর বড়ো বিলম্ব নাই। এমন সময় এ কী উৎপাত!

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "তুমি কি পাগল হয়েছ! এ কথা আজ প্রকাশ হলে আমাকে যে বিষম জবাবদিহিতে পড়তে হবে— পেন্‌শন তো বন্ধ হবেই, হয়তো পুলিসে টানাটানি করবে। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, যতটা সামলে চলতে পার চলো— না পার তাতেও বিশেষ কোনো দোষ হবে না।"

কৃষ্ণদয়াল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর যা হয় তা হোক, ইতিমধ্যে তিনি নিজে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবেন। তার পরে অজ্ঞাতসারে অন্যের কী ঘটিতেছে সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিলেই এক-রকম চলিয়া যাইবে।

কী করা কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিমর্ষমুখে আনন্দময়ী উঠিলেন। ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তোমার শরীর কিরকম হয়ে যাচ্ছে দেখছ না?"

আনন্দময়ীর এই মূঢ়তায় কৃষ্ণদয়াল অত্যন্ত উচ্চভাবে একটুখানি হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, "শরীর!"

এ সম্বন্ধে আলোচনা কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিল না, এবং কৃষ্ণদয়াল পুনশ্চ ঘেরণ্ডসংহিতায় মনোনিবেশ করিলেন। এ দিকে তাঁহার সন্ন্যাসীটিকে লইয়া মহিম তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত উচ্চ অঙ্গের পরমার্থতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। গৃহীদের মুক্তি আছে কি না

অতিশয় বিনীত ব্যাকুলস্বরে এই প্রশ্ন তুলিয়া তিনি করজোড়ে অবহিত হইয়া এমনি একান্ত ভক্তি ও আগ্রহের ভাবে তাহার উত্তর শুনিতে বসিয়াছিলেন, যেন মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার যাহা-কিছু আছে সমস্তই তিনি নিঃশেষে পণ করিয়া বসিয়াছেন। গৃহীদের মুক্তি নাই কিন্তু স্বর্গ আছে, এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী মহিমকে কোনোপ্রকারে শান্ত করার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মহিম কিছুতেই সান্ত্বনা মানিতেছেন না। মুক্তি তাঁহার নিতান্তই চাই, স্বর্গে তাঁহার কোনো প্রয়োজন নাই। কোনোমতে কন্যাটার বিবাহ দিতে পারিলেই সন্ন্যাসীর পদসেবা করিয়া তিনি মুক্তির সাধনায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিবেন— কাহার সাধ্য আছে ইহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করে। কিন্তু কন্যার বিবাহ তো সহজ ব্যাপার নয়— এক, যদি বাবা দয়া করেন।

৬৪

মাঝখানে নিজের একটুখানি আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল এই কথা স্মরণ করিয়া গোরা পূর্বের চেয়ে আরও বেশি কড়া হইয়া উঠিল। সে যে সমাজকে ভুলিয়া প্রবল একটা মোহে অভিভূত হইয়াছিল, নিয়মপালনের শৈথিল্যকেই সে তাহার কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

সকালবেলায় সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া গোরা ঘরের মধ্যে আসিতেই দেখিল, পরেশবাবু বসিয়া আছেন। তাহার বুকের ভিতরে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল ; পরেশের সঙ্গে কোনো-এক সূত্রে তাহার জীবনের যে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার যোগ আছে তাহা গোরার শিরাস্নায়ুগুলা পর্যন্ত না মানিয়া থাকিতে পারিল না। গোরা পরেশকে প্রণাম করিয়া বসিল।

পরেশ কহিলেন, "বিনয়ের বিবাহের কথা তুমি অবশ্য শুনেছ ?"

গোরা কহিল, "হাঁ।"

পরেশ কহিলেন, "সে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করতে প্রস্তুত নয়।"

গোরা কহিল, "তা হলে তার এ বিবাহ করাই উচিত নয়।"

পরেশ একটু হাসিলেন, এ কথা লইয়া কোনো তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "আমাদের সমাজে এ বিবাহে কেউ যোগ দেবে না; বিনয়ের আত্মীয়েরাও কেউ আসবেন না শুনছি। আমার কন্যার দিকে একমাত্র কেবল আমি আছি— বিনয়ের দিকে বোধ হয় তুমি ছাড়া আর-কেউ নেই, এই জন্য এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।"

গোরা মাথা নাড়িয়া কহিল, "এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ কী করে হবে? আমি তো এর মধ্যে নেই।"

পরেশ বিস্মিত হইয়া গোরার মুখের দিকে ক্ষণকাল দৃষ্টি রাখিয়া কহিলেন, "তুমি নেই!"

পরেশের এই বিস্ময়ে গোরা মুহূর্তকালের জন্য একটা সংকোচ অনুভব করিল। সংকোচ অনুভব করিল বলিয়াই পরক্ষণে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত কহিল, "আমি এর মধ্যে কেমন করে থাকব!"

পরেশবাবু কহিলেন, "আমি জানি তুমি তার বন্ধু— বন্ধুর প্রয়োজন এখনই কি সব চেয়ে বেশি নয়?"

গোরা কহিল, "আমি তার বন্ধু, কিন্তু সেইটেই তো সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন এবং সকলের চেয়ে বড়ো বন্ধন নয়।"

পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌর, তুমি কি মনে কর বিনয়ের আচরণে কোনো অন্যায় অধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে?"

গোরা কহিল, "ধর্মের দুটো দিক আছে যে। একটা নিত্য দিক, আর-একটা লৌকিক দিক। ধর্ম যেখানে সমাজের নিয়মে প্রকাশ পাচ্ছেন সেখানেও তাঁকে অবহেলা করতে পারা যায় না; তা করলে সংসার ছারখার হয়ে যায়।"

পরেশবাবু কহিলেন, "নিয়ম তো অসংখ্য আছে, কিন্তু সকল নিয়মেই যে ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছেন এটা কি নিশ্চিত ধরে নিতে হবে?"

পরেশবাবু গোরার এমন একটা জায়গায় ঘা দিলেন যেখানে তাহার মনে আপনিই একটা মন্থন চলিতেছিল এবং সেই মন্থন হইতে সে একটি সিদ্ধান্তও লাভ করিয়াছিল— এই জন্যই তাহার অন্তরে-সঞ্চিত বাক্যের বেগে পরেশবাবুর

কাছেও তাহার কোনো কুণ্ঠা রহিল না। তাহার মোট কথাটা এই যে, নিয়মের দ্বারা আমরা নিজেকে যদি সমাজের সম্পূর্ণ বাধ্য না করি তবে সমাজের ভিতরকার গভীরতম উদ্দেশ্যকে বাধা দিই; কারণ, সেই উদ্দেশ্য নিগূঢ়, তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সাধ্য প্রত্যেক লোকের নাই। এই জন্য বিচার না করিয়াও সমাজকে মানিয়া যাইবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

পরেশবাবু স্থির হইয়া শেষ পর্যন্ত গোরার সমস্ত কথাই শুনিলেন; সে যখন থামিয়া গিয়া নিজের প্রগল্‌ভতায় মনের মধ্যে একটু লজ্জা বোধ করিল তখন পরেশ কহিলেন, "তোমার গোড়ার কথাটা আমি মানি; এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই বিধাতার একটি বিশেষ অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায় যে সকলের কাছে সুস্পষ্ট তাও নয়। কিন্তু তাকেই স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করাই তো মানুষের কাজ, গাছপালার মতো অচেতন ভাবে নিয়ম মেনে যাওয়া তার সার্থকতা নয়।"

গোরা কহিল, "আমার কথাটা এই যে, আগে সমাজকে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ মেনে চললে তবেই সমাজের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে। তার সঙ্গে বিরোধ করলে তাকে যে কেবল বাধা দিই তা নয়, তাকে ভুল বুঝি।"

পরেশবাবু কহিলেন, "বিরোধ ও বাধা ছাড়া সত্যের পরীক্ষা হতেই পারে না। সত্যের পরীক্ষা যে কোনো-এক প্রাচীন কালে এক দল মনীষীর কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের মতো চুকেবুকে যায় তা নয়; প্রত্যেক কালের লোকের কাছেই বাধার ভিতর দিয়ে, আঘাতের ভিতর দিয়ে, সত্যকে নূতন করে আবিষ্কৃত হতে হবে। যাই হোক, এ-সব কথা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই নে, আমি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মানি। ব্যক্তির সেই স্বাধীনতার দ্বারা আঘাত করেই আমরা ঠিকমত জানতে পারি কোন্‌টা নিত্য সত্য, আর কোন্‌টা নশ্বর কল্পনা— সেইটে জানা এবং জানবার চেষ্টার উপরেই সমাজের হিত নির্ভর করছে।"

এই বলিয়া পরেশ উঠিলেন; গোরাও চৌকি ছাড়িয়া উঠিল। পরেশ

কহিলেন, "আমি ভেবেছিলুম ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে এই বিবাহ হতে আমাকে হয়তো একটুখানি সরে থাকতে হবে, তুমি বিনয়ের বন্ধু হয়ে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন করে দেবে। এইখানেই আত্মীয়ের চেয়ে বন্ধুর একটু সুবিধা আছে, সমাজের আঘাত তাকে সইতে হয় না। কিন্তু তুমিও যখন বিনয়কে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য মনে করছ তখন আমার উপরেই সমস্ত ভার পড়ল, এ কাজ আমাকেই একলা নির্বাহ করতে হবে।"

একলা বলিতে পরেশবাবু যে কতখানি একলা গোরা তখন তাহা জানিত না। বরদাসুন্দরী তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, বাড়ির মেয়েরা প্রসন্ন ছিল না, হরিমোহিনীর আপত্তি আশঙ্কা করিয়া পরেশ সুচরিতাকে এই বিবাহের পরামর্শে আহ্বানমাত্রও করেন নাই। ও দিকে ব্রাহ্মসমাজের সকলেই তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিনয়ের খুড়ার পক্ষ হইতে তিনি যে দুই-একখানি পত্র পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে কুটিল কুচক্রী ছেলে-ধরা বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল।

পরেশ বাহির হইয়া যাইতেই অবিনাশ এবং গোরার দলের আরও দুই-এক জন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যপরিহাস করিবার উপক্রম করিল। গোরা বলিয়া উঠিল, "যিনি ভক্তির পাত্র তাঁকে ভক্তি করবার মতো ক্ষমতা যদি না থাকে অন্তত তাঁকে উপহাস করবার ক্ষুদ্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা কোরো।"

•

গোরাকে আবার তাহার দলের লোকের মাঝখানে তাহার পূর্বাভ্যস্ত কাজের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইল। কিন্তু বিস্বাদ, সমস্তই বিস্বাদ। এ কিছুই নয়। ইহাকে কোনো কাজই বলা চলে না। ইহাতে কোথাও প্রাণ নাই। এমনি করিয়া কেবল লিখিয়া পড়িয়া, কথা কহিয়া, দল বাঁধিয়া যে কোনো কাজ হইতেছে না, বরং বিস্তর অকাজ সঞ্চিত হইতেছে, এ কথা গোরার মনে ইতিপূর্বে কোনোদিন এমন করিয়া আঘাত ক'রে নাই। নূতনলব্ধ শক্তি-দ্বারা বিস্ফারিত তাহার জীবন আপনাকে পূর্ণভাবে প্রবাহিত করিবার

অত্যন্ত একটি সত্য পথ চাহিতেছে, এ-সমস্ত কিছুই তাহার ভালো লাগিতেছে না।

এ দিকে প্রায়শ্চিত্তসভার আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজনে গোরা একটু বিশেষ উৎসাহ বোধ করিয়াছে। এই প্রায়শ্চিত্ত কেবল জেলখানার অশুচিতার প্রায়শ্চিত্ত নহে, এই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সকল দিকেই সম্পূর্ণ নির্মল হইয়া আবার একবার যেন নূতন দেহ লইয়া সে আপনার কর্মক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ করিতে চায়। প্রায়শ্চিত্তের বিধান লওয়া হইয়াছে, দিনস্থিরও হইয়া গেছে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বিখ্যাত অধ্যাপক-পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণপত্র দিবার উদ্‌যোগ চলিতেছে— গোরার দলে ধনী যাহারা ছিল তাহারা টাকাও সংগ্রহ করিয়া তুলিয়াছে। দলের লোকে সকলেই মনে করিতেছে দেশে অনেক দিন পরে একটা কাজের মতো কাজ হইতেছে। অবিনাশ গোপনে আপন সম্প্রদায়ের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছে, সেইদিন সভায় সমস্ত পণ্ডিতদিগকে দিয়া গোরাকে ধান্যদূর্বা ফুলচন্দন প্রভৃতি বিবিধ উপচারে 'হিন্দুধর্মপ্রদীপ' উপাধি দেওয়া হইবে। এই সম্বন্ধে সংস্কৃত কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া, তাহার নিম্নে সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নামস্বাক্ষর করাইয়া, সোনার জলের কালীতে ছাপাইয়া, চন্দনকাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া তাহাকে উপহার দিতে হইবে। সেই সঙ্গে ম্যাক্‌স্‌মূলরের দ্বারা প্রকাশিত একখণ্ড ঋগ্‌বেদগ্রন্থ বহুমূল্য মরক্কো চামড়ায় বাঁধাইয়া, সকলের চেয়ে প্রাচীন ও মান্য অধ্যাপকের হাত দিয়া তাহাকে ভারতবর্ষের আশীর্বাদীস্বরূপ দান করা হইবে— ইহাতে আধুনিক ধর্মভ্রষ্টতার দিনে গোরাই যে সনাতন বেদবিহিত ধর্মের যথার্থ রক্ষাকর্তা এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইবে।

এইরূপে সেদিনকার কর্মপ্রণালীকে অত্যন্ত হৃদ্য এবং ফলপ্রদ করিয়া তুলিবার জন্য গোরার অগোচরে তাহার দলের লোকের মধ্যে প্রত্যহই মন্ত্রণা চলিতে লাগিল।

হরিমোহিনী তাঁহার দেবর কৈলাসের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'শ্রীচরণাশীর্বাদে অত্রস্থ মঙ্গল, আপনকার কুশল-সমাচারে আমাদের চিন্তা দূর করিবেন।'

বলা বাহুল্য, হরিমোহিনী তাহাদের বাড়ি পরিত্যাগ করার পর হইতেই এই চিন্তা তাহারা বহন করিয়া আসিতেছে, তথাপি কুশল-সমাচারের অভাব দূর করিবার জন্য তাহারা কোনোপ্রকার চেষ্টা করে নাই। খুদি পটল ভজহরি প্রভৃতি সকলের সংবাদ নিঃশেষ করিয়া উপসংহারে কৈলাস লিখিতেছে—

'আপনি যে পাত্রীটির কথা লিখিয়াছেন তাহার সমস্ত খবর ভালো করিয়া জানাইবেন। আপনি বলিয়াছেন তাহার বয়স বারো-তেরো হইবে, কিন্তু বাড়ন্ত মেয়ে, দেখিতে কিছু ডাগর দেখায়— তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। তাহার যে সম্পত্তির কথা লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার জীবনস্বত্ব অথবা চিরস্বত্ব তাহা ভালো করিয়া খোঁজ করিয়া লিখিলে অগ্রজমহাশয়দিগকে জানাইয়া তাঁহাদের মত লইব। বোধ করি, তাঁহাদের অমত না হইতে পারে। পাত্রীটির হিন্দুধর্মে নিষ্ঠা আছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, কিন্তু এত-দিন সে ব্রাহ্মঘরে মানুষ হইয়াছে এ কথা যাহাতে প্রকাশ না হইতে পারে সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে— অতএব এ কথা আর-কাহাকেও জানাইবেন না। আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, যদি সুবিধা পাই সেই সময়ে গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিব।'

এতদিন কলিকাতায় কোনোপ্রকারে কাটিয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরঘরে ফিরিবার আশা যেমনি একটু অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল অমনি হরিমোহিনীর মন আর ধৈর্য মানিতে চাহিল না। নির্বাসনের প্রত্যেক দিন তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, 'এখনই সুচরিতাকে বলিয়া দিন স্থির করিয়া কাজ সারিয়া ফেলি।' তবু তাড়াতাড়ি

করিতে তাঁহার সাহস হইল না। সুচরিতাকে যতই তিনি নিকটে করিয়া দেখিতেছেন ততই তিনি ইহা বুঝিতেছেন যে, তাহাকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

হরিমোহিনী অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পূর্বের চেয়ে সুচরিতার প্রতি বেশি করিয়া সতর্কতা প্রয়োগ করিলেন। আগে পূজাহ্নিকে তাঁহার যত সময় লাগিত এখন তাহা কমিয়া আসিবার উপক্রম হইল— তিনি সুচরিতাকে আর চোখের আড়াল করিতে চান না।

সুচরিতা দেখিল গোরার আসা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। সে বুঝিল হরিমোহিনী তাঁহাকে কিছু বলিয়াছেন। সে কহিল, 'আচ্ছা বেশ, তিনি না'ই আসিলেন, কিন্তু তিনিই আমার গুরু, আমার গুরু।'

সম্মুখে যে গুরু থাকেন তাহার চেয়ে অপ্রত্যক্ষ গুরুর জোর অনেক বেশি। কেননা, নিজের মন তখন গুরুর বিদ্যমানতার অভাব আপনার ভিতর হইতে পুরাইয়া লয়। গোরা সামনে থাকিলে সুচরিতা যেখানে তর্ক করিত এখন সেখানে গোরার রচনা পড়িয়া তাহার বাক্যগুলিকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে। না বুঝিতে পারিলে বলে, তিনি থাকিলে নিশ্চয় বুঝাইয়া দিতেন।

কিন্তু গোরার সেই তেজস্বী মূর্তি দেখিবার এবং তাহার সেই বজ্রগর্ভ মেঘগর্জনের মতো বাক্য শুনিবার ক্ষুধা কিছুতেই কি মিটিতে চায়! এই তাহার নিবৃত্তিহীন আন্তরিক ঔৎসুক্য একেবারে নিরন্তর হইয়া তাহার শরীরকে যেন ক্ষয় করিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সুচরিতা অত্যন্ত ব্যথার সহিত মনে করে, কত লোক অতি অনায়াসেই রাত্রিদিন গোরার দর্শন পাইতেছে কিন্তু গোরার দর্শনের কোনো মূল্য তাহারা জানে না।

•

• ললিতা আসিয়া সুচরিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া একদিন অপরাহ্নে কহিল, "ভাই সুচিদিদি!"

সুচরিতা কহিল, "কী ভাই ললিতা!"

ললিতা কহিল, "সব ঠিক হয়ে গেছে।"

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কবে দিন ঠিক হল?"

ললিতা কহিল, "সোমবার।"

সুচরিতা প্রশ্ন করিল, "কোথায়?"

ললিতা মাথা নাড়া দিয়া কহিল, "সে-সব আমি জানি নে, বাবা জানেন।"

সুচরিতা বাহুর দ্বারা ললিতার কটি বেষ্টন করিয়া কহিল, "খুশি হয়েছিস ভাই?"

ললিতা কহিল, "খুশি কেন হব না।"

সুচরিতা কহিল, "যা চেয়েছিলি সবই পেলি, এখন কারও সঙ্গে কোনো ঝগড়া করবার কিছুই রইল না, সেই জন্যে মনে ভয় হয় পাছে তোর উৎসাহ কমে যায়।"

ললিতা হাসিয়া কহিল, "কেন, ঝগড়া করবার লোকের অভাব হবে কেন? এখন আর বাইরে খুঁজতে হবে না।"

সুচরিতা ললিতার কপোলে তর্জনীর আঘাত করিয়া কহিল, "এই বুঝি! এখন থেকে বুঝি এই-সমস্ত মৎলব আঁটা হচ্ছে! আমি বিনয়কে বলে দেব, এখনো সময় আছে, বেচারা সাবধান হতে পারে।"

ললিতা কহিল, "তোমার বেচারার আর সাবধান হবার সময় নেই গো। আর তার উদ্ধার নেই। কুষ্ঠিতে ফাঁড়া যা ছিল তা ফলে গেছে, এখন কপালে করাঘাত আর ক্রন্দন।"

সুচরিতা গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমি যে কত খুশি হয়েছি সে আর কী বলব ললিতা। বিনয়ের মতো স্বামীর যেন তুই যোগ্য হতে পারিস, এই আমি প্রার্থনা করি।"

ললিতা কহিল, "ইস! তাই বৈকি! আর, আমার যোগ্য বুঝি কাউকে হতে হবে না! এ সম্বন্ধে একবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েই দেখো-না। তাঁর মতটা একবার শুনে রাখো, তা হলে তোমারও মনে অনুতাপ হবে যে এতবড়ো আশ্চর্য লোকটার আদর এতদিন আমরা কিছুই বুঝি নি, কী অন্ধ হয়েই ছিলুম!"

সুচরিতা কহিল, "যা হোক, এতদিনে তো একটা জহরি জুটেছে। দাম যা দিতে চাচ্ছে তাতে আর দুঃখ করবার নেই, এখন আর আমাদের মতো আনাড়ির কাছ থেকে আদর যাচবার দরকারই হবে না।"

ললিতা কহিল, "হবে না বৈকি! খুব হবে।"

বলিয়া খুব জোরে সুচরিতার গাল টিপিয়া দিল, সে "উঃ" করিয়া উঠিল। "তোমার আদর আমার বরাবর চাই, সেটা ফাঁকি দিয়ে আর-কাউকে দিতে গেলে চলবে না।"

সুচরিতা ললিতার কপোলের উপর কপোল রাখিয়া কহিল, "কাউকে দেব না, কাউকে দেব না।"

ললিতা কহিল, "কাউকে না? একেবারে কাউকেই না?"

সুচরিতা শুধু মাথা নাড়িল। ললিতা তখন একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, "দেখো ভাই সুচিদিদি, তুমি তো ভাই জান, তুমি আর-কাউকে আদর করলে আমি কোনোদিন সইতে পারতুম না। এতদিন আমি তোমাকে বলি নি, আজ বলছি, যখন গৌরমোহনবাবু আমাদের বাড়ি আসতেন— না দিদি, অমন করলে চলবে না, আমার যা বলবার আছে আমি তা আজ বলবই— তোমার কাছে আমি কোনোদিন কিছুই লুকোই নি, কিন্তু কেন জানি নে ওই একটা কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি নি, বরাবর সে জন্যে আমি কষ্ট পেয়েছি। সেই কথাটি না বলে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় হয়ে যেতে পারব না। যখন গৌরমোহনবাবু আমাদের বাড়ি আসতেন আমার ভারী রাগ হত— কেন রাগতুম? তুমি মনে করেছিলে কিছু বুঝতে পারি নি? আমি দেখেছিলুম, তুমি আমার কাছে তাঁর নামও করতে না, তাতে আমার আরও মনে রাগ হত। তুমি যে আমার চেয়ে তাঁকে ভালোবাসবে এ আমার অসহ্য বোধ হত— না ভাই দিদি, আমাকে বলতে দিতে হবে— সে জন্যে যে আমি কত কষ্ট পেয়েছি সে আর তোমাকে কী বলব। আজও তুমি আমার কাছে সে কথা কিছু বলবে না সে আমি জানি, তা নাই বললে, আমার আর রাগ নেই— আমি যে কত খুশি হব ভাই, যদি তোমার—"

সুচরিতা তাড়াতাড়ি ললিতার মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "ললিতা, তোর পায়ে পড়ি ভাই, ও কথা মুখে আনিস নে! ও কথা শুনলে আমার মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করে।"

ললিতা কহিল, "কেন ভাই, তিনি কি—"

সুচরিতা ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, না। পাগলের মতো কথা বলিস নে ললিতা। যে কথা মনে করা যায় না সে কথা মুখে আনতে নেই।"

ললিতা সুচরিতার এই সংকোচে বিরক্ত হইয়া কহিল, "এ কিন্তু, ভাই, তোমার বাড়াবাড়ি। আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি আর আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি—"

সুচরিতা ললিতার হাত ছাড়াইয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ললিতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কহিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আর আমি বলব না।"

সুচরিতা কহিল, "কোনোদিন না!"

ললিতা কহিল, "অতবড়ো প্রতিজ্ঞা করতে পারব না। যদি আমার দিন আসে তো বলব, নইলে নয়, এইটুকু কথা দিলুম।"

এ-কয়দিন হরিমোহিনী ক্রমাগতই সুচরিতাকে চোখে চোখে রাখিতে-ছিলেন, তাহার কাছে কাছে ফিরিতেছিলেন, সুচরিতা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং হরিমোহিনীর এই সন্দেহপূর্ণ সতর্কতা তাহার মনের উপর একটা বোঝার মতো চাপিয়া ছিল। ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, অথচ কোনো কথা বলিতে পারিতেছিল না। আজ ললিতা চলিয়া গেলে অত্যন্ত ক্লান্ত মন লইয়া সুচরিতা টেবিলের উপরে দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিল। বেহারা ঘরে আলো দিতে আসিয়াছিল, তাহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তখন হরিমোহিনীর সায়ংসন্ধ্যার সময়। তিনি উপর হইতে ললিতাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া অসময়ে নামিয়া আসিলেন এবং সুচরিতার ঘরে প্রবেশ করিয়াই ডাকিলেন, "রাধারানী!"

সুচরিতা গোপনে চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরিমোহিনী কহিলেন, "কী হচ্ছে?"

সুচরিতা তাহার কোনো উত্তর করিল না। হরিমোহিনী কঠোর স্বরে কহিলেন, "এ-সমস্ত কী হচ্ছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে।"

সুচরিতা কহিল, "মাসি, কেন তুমি দিনরাত্রি আমার উপরে এমন করে দৃষ্টি রেখেছ!"

হরিমোহিনী কহিলেন, "কেন রেখেছি তা কি বুঝতে পার না? এই-যে খাওয়া-দাওয়া নেই, কান্নাকাটি চলছে, এ-সব কী লক্ষণ! আমি তো শিশু না, আমি কি এইটুকু বুঝতে পারি নে?"

সুচরিতা কহিল, "মাসি, আমি তোমাকে বলছি, তুমি কিছুই বোঝ নি। তুমি এমন ভয়ানক অন্যায় ভুল বুঝছ যে, সে প্রতি মুহূর্তে আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছে।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "বেশ তো, ভুল যদি বুঝে থাকি তুমি ভালো করে বুঝিয়েই বলো-না।"

সুচরিতা দৃঢ়বলে সমস্ত সংকোচ অধঃকৃত করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তবে বলি। আমি আমার গুরুর কাছ থেকে এমন একটি কথা পেয়েছি যা আমার কাছে নতুন, সেটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে খুব শক্তির দরকার, আমি তারই অভাব বোধ করছি— আপনার সঙ্গে কেবলই লড়াই করে পেরে উঠছি নে। কিন্তু মাসি, তুমি আমাদের সম্বন্ধকে বিকৃত করে দেখেছ। তুমি তাঁকে অপমানিত করে বিদায় করে দিয়েছ— তুমি তাঁকে যা বলেছ সমস্ত ভুল, তুমি আমাকে যা ভাবছ সমস্ত মিথ্যা। তুমি অন্যায় করেছ। তাঁর মতো লোককে নিচু করতে পার তোমার এমন সাধ্য নেই। কিন্তু কেন তুমি আমার উপরে এমন অত্যাচার করলে, আমি তোমার কী করেছি!"

বলিতে বলিতে সুচরিতার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

হরিমোহিনী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন, 'না

বাপু, এমন-সব কথা আমি সাত জন্মে শুনি নাই।'

সুচরিতাকে কিছু শান্ত হইতে সময় দিয়া কিছু ক্ষণ পরে তাহাকে আহারে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সে খাইতে বসিলে তাহাকে বলিলেন, "দেখো রাধারানী, আমার তো বয়স নিতান্ত কম হয় নি। হিন্দুধর্মে যা বলে তা তো শিশুকাল থেকে করে আসছি, আর শুনেওছি বিস্তর। তুমি এ-সব কিছুই জান না, সেই জন্যেই গৌরমোহন তোমার গুরু হয়ে তোমাকে কেবল ভোলাচ্ছে। আমি তো ওঁর কথা কিছু কিছু শুনেছি— ওর মধ্যে আদত কথা কিছুই নেই, ও শাস্ত্র ওঁর নিজের তৈরি। এ-সব আমাদের কাছে ধরা পড়ে, আমরা গুরু-উপদেশ পেয়েছি। আমি তোমাকে বলছি, রাধারানী, তোমাকে এ-সব কিছুই করতে হবে না— যখন সময় হবে, আমার যিনি গুরু আছেন তিনি তো এমন ফাঁকি নন, তিনিই তোমাকে মন্ত্র দেবেন। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে হিন্দুসমাজে ঢুকিয়ে দেব। ব্রাহ্মঘরে ছিলে, নাহয় ছিলে। কেই-বা সে খবর জানবে। তোমার বয়স কিছু বেশি হয়েছে বটে, তা এমন বাড়ন্ত মেয়ে ঢের আছে। কেই-বা তোমার কুষ্ঠি দেখছে। আর, টাকা যখন আছে তখন কিছুতেই কিছু বাধবে না, সবই চলে যাবে। কৈবর্তর ছেলে কায়স্থ বলে চলে গেল, সে তো আমি নিজের চক্ষে দেখেছি। আমি হিন্দুসমাজে এমন সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে তোমাকে চালিয়ে দেব, কারও সাধ্য থাকবে না কথা বলে— তারাই হল সমাজের কর্তা। এ জন্যে তোমাকে এত গুরুর সাধ্যসাধনা এত কান্নাকাটি করে মরতে হবে না।"

এই-সকল কথা হরিমোহিনী যখন বিস্তারিত করিয়া ফলাইয়া ফলাইয়া বলিতেছিলেন, সুচরিতার তখন আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তাহার গলা দিয়া যেন গ্রাস গলিতেছিল না। কিন্তু সে নীরবে অত্যন্ত জোর করিয়াই খাইল ; কারণ, সে জানিত, তাহার কম খাওয়া লইয়াই এমন আলোচনার সৃষ্টি হইবে যাহা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র উপাদেয় হইবে না।

হরিমোহিনী যখন সুচরিতার কাছে বিশেষ কোনো সাড়া পাইলেন না তখন তিনি মনে মনে কহিলেন, 'গড় করি, ইহাদিগকে গড় করি। এ দিকে

হিন্দু-হিন্দু করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির, ও দিকে এতবড়ো একটা সুযোগের কথায় কর্ণপাত নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, কোনো কৈফিয়তটি দিতে হইবে না, কেবল এ দিকে ও দিকে অল্পস্বল্প কিছু টাকা খরচ করিয়া অনায়াসেই সমাজে চলিয়া যাইবে— ইহাতেও যাহার উৎসাহ হয় না সে আপনাকে বলে কিনা হিন্দু!' গোরা যে কতবড়ো ফাঁকি হরিমোহিনীর তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। অথচ এমনতরো বিড়ম্বনার উদ্দেশ্য কী হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে গিয়া সুচরিতার অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল বলিয়া তাঁহার মনে হইল, এবং সুচরিতার রূপযৌবন। যত শীঘ্র কোম্পানির কাগজাদি-সহ কন্যাটিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শ্বাশুরিক দুর্গে আবদ্ধ করিতে পারেন ততই মঙ্গল। কিন্তু মন আর-একটু নরম না হইলে চলিবে না। সেই নরম হইবার প্রত্যাশায় তিনি দিনরাত্রি সুচরিতার কাছে তাঁহার শ্বশুরবাড়ির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহাদের ক্ষমতা কিরূপ অসামান্য, সমাজে তাহারা কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে পারে, নানা দৃষ্টান্ত -সহ তাহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রতিকূলতা করিতে গিয়া কত নিষ্কলঙ্ক লোক সমাজে নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে এবং তাহাদের শরণাপন্ন হইয়া কত লোক মুসলমানের-রান্না মুর্গি খাইয়াও হিন্দুসমাজের অতি দুর্গম পথ হাস্যমুখে উত্তীর্ণ হইয়াছে, নামধাম-বিবরণ-দ্বারা তিনি সে-সকল ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিলেন।

সুচরিতা তাঁহাদের বাড়িতে যাতায়াত না করে বরদাসুন্দরীর এ ইচ্ছা গোপন ছিল না, কারণ, নিজের স্পষ্ট ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার একটা অভিমান ছিল। অন্যের প্রতি অসংকোচে কঠোরাচরণ করিবার সময় তিনি নিজের এই গুণটি প্রায়ই ঘোষণা করিতেন। অতএব বরদাসুন্দরীর ঘরে সুচরিতা যে কোনোপ্রকার সমাদর প্রত্যাশা করিতে পারিবে না, ইহা সহজবোধ্য ভাষাতেই তাহার নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। সুচরিতা ইহাও জানিত যে, সে তাঁহাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করিলে পরেশকে ঘরের মধ্যে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে হইত। এই জন্য সে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে

ও বাড়িতে যাইত না এবং এই জন্যই পরেশ প্রত্যহ একবার বা দুইবার স্বয়ং সুচরিতার বাড়িতে আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেন।

কয়দিন পরেশবাবু নানা চিন্তা ও কাজের তাড়ায় সুচরিতার ওখানে আসিতে পারেন নাই। এই কয়দিন সুচরিতা প্রত্যহ ব্যগ্রতার সহিত পরেশের আগমন প্রত্যাশাও করিয়াছে, অথচ তাহার মনের মধ্যে একটা সংকোচ এবং কষ্টও হইয়াছে। পরেশের সঙ্গে তাহার গভীরতর মঙ্গলের সম্বন্ধ কোনোকালেই ছিন্ন হইতে পারে না তাহা সে নিশ্চয় জানে, কিন্তু বাহিরের দুই-একটা বড়ো বড়ো সূত্রে যে টান পড়িয়াছে ইহার বেদনাও তাহাকে বিশ্রাম দিতেছে না। এ দিকে হরিমোহিনী তাহার জীবনকে অহরহ অসহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্য সুচরিতা আজ বরদাসুন্দরীর অপ্রসন্নতাও স্বীকার করিয়া পরেশের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অপরাহ্ণশেষের সূর্য তখন পার্শ্ববর্তী পশ্চিম দিকের তেতালা বাড়ির আড়ালে পড়িয়া সুদীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়াছে; এবং সেই ছায়ায় পরেশ তখন শির নত করিয়া একলা তাঁহার বাগানের পথে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে-ছিলেন।

সুচরিতা তাঁহার পাশে আসিয়া যোগ দিল। কহিল, "বাবা, তুমি কেমন আছ?"

পরেশবাবু হঠাৎ তাঁহার চিন্তায় বাধা পাইয়া ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রাধারানীর মুখের দিকে চাহিলেন এবং কহিলেন, "ভালো আছি রাধে।"

দুই জনে বেড়াইতে লাগিলেন। পরেশবাবু কহিলেন, "সোমবারে ললিতার বিবাহ।"

সুচরিতা ভাবিতেছিল, এই বিবাহে তাহাকে কোনো পরামর্শে বা সহায়তায় ডাকা হয় নাই কেন এ কথা সে জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল, কেননা তাহার তরফেও এবার এক জায়গায় একটা কী বাধা আসিয়া পড়িয়াছিল। আগে হইলে সে তো ডাকিবার অপেক্ষা

রাখিত না।

সুচরিতার মনে এই-যে একটি চিন্তা চলিতেছিল পরেশ ঠিক সেই কথাটাই আপনি তুলিলেন ; কহিলেন, "তোমাকে এবার ডাকতে পারি নি রাধে।"

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা ?"

সুচরিতার এই প্রশ্নে পরেশ কোনো উত্তর না দিয়া তাহার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। সুচরিতা আর থাকিতে পারিল না। সে মুখ নত করিয়া কহিল, "তুমি ভাবছিলে, আমার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে।"

পরেশ কহিলেন, "হাঁ, তাই ভাবছিলুম, আমি তোমাকে কোনোরকম অনুরোধ করে সংকোচে ফেলব না।"

সুচরিতা কহিল, "বাবা, আমি তোমাকে সব কথা বলব মনে করেছিলুম, কিন্তু তোমার যে দেখা পাই নি। সেই জন্যেই আজ আমি এসেছি। আমি যে তোমাকে বেশ ভালো করে আমার মনের ভাব বলতে পারব, আমার সে ক্ষমতা নেই। আমার ভয় হয়, পাছে ঠিকটি তোমার কাছে বলা না হয়।"

পরেশ কহিলেন, "আমি জানি, এ-সব কথা স্পষ্ট করে বলা সহজ নয়। তুমি একটা জিনিস তোমার মনে কেবল ভাবের মধ্যে পেয়েছ, তাকে অনুভব করছ, কিন্তু তার আকারপ্রকার তোমার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে নি।"

সুচরিতা আরাম পাইয়া কহিল, "হাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু আমার অনুভব এমন প্রবল, সে আমি তোমাকে কী বলব। আমি ঠিক যেন একটা নূতন জীবন পেয়েছি, সে একটা নূতন চেতনা। আমি এমন দিক থেকে এমন করে নিজেকে কখনো দেখি নি। আমার সঙ্গে এতদিন আমার দেশের অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের কোনো সম্বন্ধই ছিল না— কিন্তু সেই মস্তবড়ো সম্বন্ধটা যে কতবড়ো সত্য জিনিস আজ সেই উপলব্ধি আমার হৃদয়ের মধ্যে এমনি আশ্চর্য করে পেয়েছি যে, সে আর কিছুতে ভুলতে পারছি নে। দেখো বাবা, আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি হিন্দু এ কথা আগে কোনোমতে

আমার মুখ দিয়ে বের হতে পারত না। কিন্তু এখন আমার মন খুব জোরের সঙ্গে অসংকোচে বলছে 'আমি হিন্দু'। এতে আমি খুব একটা আনন্দ বোধ করছি।"

পরেশবাবু কহিলেন, "এ কথাটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অংশ-প্রত্যংশ সমস্তই কি ভেবে দেখেছ?"

সুচরিতা কহিল, "সমস্ত ভেবে দেখবার শক্তি কি আমার নিজের আছে? কিন্তু এই কথা নিয়ে আমি অনেক পড়েছি, অনেক আলোচনাও করেছি। এই জিনিসটাকে যখন আমি এমন বড়ো করে দেখতে শিখি নি তখনই হিন্দু বলতে যা বোঝায় কেবল তার সমস্ত ছোটোখাটো খুঁটিনাটিকেই বড়ো করে দেখেছি— তাতে সমস্তটার প্রতি আমার মনের মধ্যে ভারী একটা ঘৃণা বোধ হত।"

পরেশবাবু তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময় অনুভব করিলেন; তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, সুচরিতার মনের মধ্যে একটা বোধসঞ্চার হইয়াছে, সে একটা-কিছু সত্যবস্তু লাভ করিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছে— সে যে মুগ্ধের মতো কিছুই না বুঝিয়া কেবল একটা অস্পষ্ট আবেগে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা নহে।

সুচরিতা কহিল, "বাবা, আমি যে আমার দেশ থেকে, জাত থেকে বিচ্ছিন্ন একজন ক্ষুদ্র মানুষ— এমন কথা আমি কেন বলব? আমি কেন বলতে পারব না 'আমি হিন্দু'?"

পরেশ হাসিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ, মা, তুমি আমাকেই জিজ্ঞাসা করছ, আমি কেন নিজেকে হিন্দু বলি নে। ভেবে দেখতে গেলে তার যে খুব গুরুতর কোনো কারণ আছে তা নয়। একটা কারণ হচ্ছে হিন্দুরা আমাকে হিন্দু ব'লে স্বীকার করে না; আর-একটা কারণ যাদের সঙ্গে আমার ধর্মমতে মেলে তারা নিজেকে হিন্দু ব'লে পরিচয় দেয় না।"

সুচরিতা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পরেশ কহিলেন, "আমি তো তোমাকে বলেইছি, এগুলি গুরুতর কারণ নয়, এগুলি বাহ্য কারণ মাত্র। এ

বাধাগুলোকে না মানলেও চলে। কিন্তু ভিতরের একটা গভীর কারণ আছে। হিন্দুসমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্তত সদর রাস্তা নেই, খিড়কির দরজা থাকতেও পারে। এ সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়— দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমাত্র তাদের।"

সুচরিতা কহিল, "সব সমাজই তো তাই।"

পরেশ কহিলেন, "না, কোনো বড়ো সমাজই তা নয়। মুসলমান-সমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্যে উদ্‌ঘাটিত, খৃস্টান-সমাজও সকলকেই আহ্বান করছে। যে-সকল সমাজ খৃস্টান-সমাজের অঙ্গ তাদের মধ্যেও সেই বিধি। যদি আমি ইংরেজ হতে চাই তবে সে একেবারে অসম্ভব নয়— ইংলণ্ডে বাস করে আমি নিয়ম পালন করে চললে ইংরেজসমাজভুক্ত হতে পারি, এমন-কি সে জন্যে আমার খৃস্টান হবারও দরকার নেই। অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত, বেরতে জানত না— হিন্দু ঠিক তার উল্‌টো। তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শতসহস্র।"

সুচরিতা কহিল, "তবু তো, বাবা, এত দিনেও হিন্দুর ক্ষয় হয় নি— সে তো টিঁকে আছে।"

পরেশ কহিলেন, "সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে। ইতিপূর্বে হিন্দু-সমাজের খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এ দেশের অনার্য জাতি হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এ দিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, এই জন্যে সমাজ থেকে কারও সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ-অধিকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে, সেরকম কৃত্রিম উপায়ে সমাজের দ্বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নেই— সেই জন্য কিছুকাল থেকে কেবল দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এরকম ভাবে চললে, ক্রমে এ দেশ মুসলমানপ্রধান হয়ে উঠবে; তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।"

সুচরিতা ব্যথিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা, এটা কি নিবারণ করাই

আমাদের সকলের উচিত হবে না? আমরাও কি হিন্দুকে পরিত্যাগ করে তার ক্ষয়কে বাড়িয়ে তুলব! এখনই তো তাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে থাকবার সময়।"

পরেশবাবু সস্নেহে সুচরিতার পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমরা ইচ্ছা করলেই কি কাউকে আঁকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখতে পারি? রক্ষা পাবার জন্য একটা জাগতিক নিয়ম আছে— সেই স্বভাবের নিয়মকে যে পরিত্যাগ করে সকলেই তাকে স্বভাবতই পরিত্যাগ করে। হিন্দুসমাজ মানুষকে অপমান করে, বর্জন করে; এই জন্যে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে। কেননা, এখন তো আর সে আড়ালে বসে থাকতে পারবে না— এখন পৃথিবীর চার দিকে রাস্তা খুলে গেছে, চার দিক থেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে— এখন শাস্ত্র-সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেঁধে প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্রব থেকে কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হিন্দুসমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না জাগায়, ক্ষয়রোগকেই প্রশ্রয় দেয়, তা হলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।"

সুচরিতা বেদনার সহিত বলিয়া উঠিল, "আমি এ-সব কিছু বুঝি নে— কিন্তু এই যদি সত্য হয় একে আজ সবাই ত্যাগ করতে বসেছে, তা হলে এমন দিনে একে আমি তো ত্যাগ করতে বসব না। আমরা এর দুর্দিনের সন্তান বলেই তো এর শিয়রের কাছে আমাদের আজ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

পরেশবাবু কহিলেন, "মা, তোমার মনে যে ভাব জেগে উঠেছে আমি তার বিরুদ্ধে কোনো কথা তুলব না। তুমি উপাসনা ক'রে, মন স্থির ক'রে তোমার মধ্যে যে সত্য আছে, যে শ্রেয়ের আদর্শ আছে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সব কথা বিচার করে দেখো; ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যিনি সকলের চেয়ে বড়ো তাঁকে দেশের কাছে কিম্বা কোনো মানুষের কাছে খাটো কোরো না— তাতে তোমারও মঙ্গল না, দেশেরও না। আমি এই মনে করে একান্তচিত্তে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ

করতে চাই; তা হলেই দেশের এবং প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধেই আমি সহজেই সত্য হতে পারব।"

এমন সময় একজন লোক পরেশবাবুর হাতে একখানি চিঠি আনিয়া দিল। পরেশবাবু কহিলেন, "চশমাটা নেই, আলোও কমে গেছে— চিঠিখানা পড়ে দেখো দেখি।"

সুচরিতা চিঠি পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইল। ব্রাহ্মসমাজের এক কমিটি হইতে তাঁহার কাছে পত্রটি আসিয়াছে, নীচে অনেকগুলি ব্রাহ্মের নাম সহি করা আছে। পত্রের মর্ম এই যে, পরেশ অব্রাহ্মমতে তাঁহার কন্যার বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন এবং সেই বিবাহে নিজেও যোগ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ কোনোমতেই তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে পারেন না। নিজের পক্ষে যদি তাঁহার কিছু বলিবার থাকে তবে আগামী রবিবারের পূর্বে সে সম্বন্ধে কমিটির হস্তে তাঁহার পত্র আসা চাই— সেইদিন আলোচনা হইয়া অধিকাংশের মতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে।

পরেশ চিঠিখানা লইয়া পকেটে রাখিলেন। সুচরিতা তাহার স্নিগ্ধ হস্তে তাঁহার ডান হাতখানি ধরিয়া নিঃশব্দে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বাগানের দক্ষিণ পার্শ্বের গলিতে রাস্তার একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল। সুচরিতা মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বাবা, তোমার উপাসনার সময় হয়েছে, আমি তোমার সঙ্গে আজ উপাসনা করব।"

এই বলিয়া সুচরিতা হাত ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহার উপাসনার নিভৃত ঘরটির মধ্যে লইয়া গেল— সেখানে যথানিয়মে আসন পাতা ছিল এবং একটি মোমবাতি জ্বলিতেছিল। পরেশ আজ অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নীরবে উপাসনা করিলেন। অবশেষে একটি ছোটো প্রার্থনা করিয়া তিনি উঠিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিতেই দেখিলেন, উপাসনা-ঘরের দ্বারের কাছে বাহিরে ললিতা ও বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা দুই জনে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। তিনি তাহাদের মাথায়

হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন। সুচরিতাকে কহিলেন, "মা, আমি কাল তোমাদের বাড়িতে যাব, আজ আমার কাজটা সেরে আসি গে।" বলিয়া তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

তখন সুচরিতার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। সে নিস্তব্ধ প্রতিমার মতো নীরবে বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল। ললিতা এবং বিনয়ও অনেক ক্ষণ কিছু কথা কহিল না।

সুচরিতা যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল বিনয় তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "দিদি, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করবে না?"

এই বলিয়া ললিতাকে লইয়া সুচরিতাকে প্রণাম করিল— সুচরিতা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে যাহা বলিল তাহা তাহার অন্তর্যামীই শুনিতে পাইলেন।

পরেশবাবু তাঁহার ঘরে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজ-কমিটির নিকট পত্র লিখিলেন; তাহাতে লিখিলেন—

'ললিতার বিবাহ আমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে আমাকে যদি ত্যাগ করেন তাহাতে আপনাদের অন্যায় বিচার হইবে না। এক্ষণে ঈশ্বরের কাছে আমার এই একটিমাত্র প্রার্থনা রহিল, তিনি আমাকে সমস্ত সমাজের আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে স্থান দান করুন।'

৬৬

সুচরিতা পরেশের কাছে যে কথা কয়টি শুনিল, তাহা গোরাকে বলিবার জন্য তাহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যে ভারতবর্ষের অভিমুখে গোরা তাহার দৃষ্টিকে প্রসারিত এবং চিত্তকে প্রবল প্রেমে আকৃষ্ট করিয়াছে, এতদিন পরে সেই ভারতবর্ষে কালের হস্ত পরিয়াছে, সেই ভারতবর্ষ ক্ষয়ের মুখে চলিয়াছে, সে কথা কি গোরা চিন্তা করেন নাই! এতদিন ভারতবর্ষ নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার বলে— সে জন্য

ভারতবাসীকে সতর্ক হইয়া চেষ্টা করিতে হয় নাই। আর কি তেমন নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিবার সময় আছে! আজ কি পূর্বের মতো কেবল পুরাতন ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে পারি!

সুচরিতা ভাবিতে লাগিল, 'ইহার মধ্যে আমারও তো একটা কাজ আছে— সে কাজ কী।' গোরার উচিত ছিল, এই সময়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আদেশ করা, তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া। সুচরিতা মনে মনে কহিল, 'আমাকে তিনি যদি আমার সমস্ত বাধা ও অজ্ঞতা হইতে উদ্ধার করিয়া আমার যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া দিতে পারিতেন তবে কি সমস্ত ক্ষুদ্র লোকলজ্জা ও নিন্দা-অপবাদকে ছাড়াইয়াও তাহার মূল্য ছাপাইয়া উঠিত না ?' সুচরিতার মন আত্মগৌরবে পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, গোরা কেন তাহাকে পরীক্ষা করিলেন না, কেন তাহাকে অসাধ্য সাধন করিতে বলিলেন না— গোরার দলের সমস্ত পুরুষের মধ্যে এমন একটি লোক কে আছে যে সুচরিতার মতো এমন অনায়াসে নিজের যাহা-কিছু আছে সমস্ত উৎসর্গ করিতে পারে ? এমন একটা আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির কি কোনো প্রয়োজন গোরা দেখিল না ? ইহাকে লোকলজ্জার-বেড়া-দেওয়া কর্মহীনতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গেলে তাহাতে দেশের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ? সুচরিতা এই অবজ্ঞাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া দূরে সরাইয়া দিল। সে কহিল, 'আমাকে এমন করিয়া ত্যাগ করিবেন এ কখনোই হইতে পারিবে না। আমার কাছে তাঁহাকে আসিতেই হইবে, আমাকে তাঁহার সন্ধান করিতেই হইবে, সমস্ত লজ্জা সংকোচ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে— তিনি যতবড়ো শক্তিমান পুরুষ হোন, আমাকে তাঁহার প্রয়োজন আছে, এ কথা তাঁহার নিজের মুখে একদিন আমাকে বলিয়াছেন— আজ অতি তুচ্ছ জল্পনায় এ কথা কেমন করিয়া ভুলিলেন!'

সতীশ ছুটিয়া আসিয়া সুচরিতার কোলের কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, "দিদি!"

সুচরিতা তাহার গলা জড়াইয়া কহিল, "কী ভাই বক্তিয়ার!"

সতীশ কহিল, "সোমবারে ললিতাদিদির বিয়ে— এ ক'দিন আমি বিনয়-বাবুর বাড়িতে গিয়ে থাকব। তিনি আমাকে ডেকেছেন।"

সুচরিতা কহিল, "মাসিকে বলেছিস ?"

সতীশ কহিল, "মাসিকে বলেছিলুম, তিনি রাগ করে বললেন, 'আমি ও-সব কিছু জানি নে, তোমার দিদিকে বলো, তিনি যা ভালো বোঝেন তাই হবে।' দিদি, তুমি বারণ কোরো না। সেখানে আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হবে না, আমি রোজ পড়ব, বিনয়বাবু আমার পড়া বলে দেবেন।"

সুচরিতা কহিল, "কাজকর্মের বাড়িতে তুই গিয়ে সকলকে অস্থির করে দিবি।"

সতীশ ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না দিদি, আমি কিছু অস্থির করব না।"

সুচরিতা কহিল, "তোর খুদে কুকুরটাকে সেখানে নিয়ে যাবি নাকি ?"

সতীশ কহিল, "হাঁ, তাকে নিয়ে যেতে হবে, বিনয়বাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। তার নামে লাল চিঠির কাগজে ছাপানো একটা আলাদা নিমন্ত্রণ-চিঠি এসেছে— তাতে লিখেছে, তাকে সপরিজনে গিয়ে জলযোগ করে আসতে হবে।"

সুচরিতা কহিল, "পরিজনটি কে ?"

সতীশ তাড়াতাড়ি কহিল, "কেন, বিনয়বাবু বলেছেন— আমি। তিনি আমাদের সেই আর্গিনটাও নিয়ে যেতে বলেছেন দিদি, সেটা আমাকে দিয়ো— আমি ভাঙব না।"

সুচরিতা কহিল, "ভাঙলেই যে আমি বাঁচি। এত ক্ষণে তা হলে বোঝা গেল— তাঁর বিয়েতে আর্গিন বাজাবার জন্যেই বুঝি তোর বন্ধু তোকে ডেকেছেন ? রোশনচৌকিওয়ালাকে বুঝি একেবারে ফাঁকি দেবার মৎলব ?"

সতীশ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "না, কক্‌খনো না। বিনয়বাবু বলেছেন, আমাকে তাঁর মিৎবর করবেন। মিৎবরকে কী করতে হয় দিদি ?"

সুচরিতা কহিল, "সমস্ত দিন উপোস করে থাকতে হয়।"

সতীশ এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল। তখন সুচরিতা সতীশকে কোলের কাছে দৃঢ় করিয়া টানিয়া কহিল, "আচ্ছা, ভাই বক্তিয়ার, তুই বড়ো হলে কী হবি বল্ দেখি।"

ইহার উত্তর সতীশের মনের মধ্যে প্রস্তুত ছিল। তাহার ক্লাসের শিক্ষকই তাহার কাছে অপ্রতিহত ক্ষমতা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের আদর্শস্থল ছিল— সে পূর্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, সে বড়ো হইলে মাস্টারমশায় হইবে।

সুচরিতা তাহাকে কহিল, "অনেক কাজ করবার আছে ভাই। আমাদের দুই ভাইবোনের কাজ আমরা দুজনে মিলে করব। কী বলিস সতীশ? আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে বড়ো করে তুলতে হবে। বড়ো করব কী! আমাদের দেশের মতো বড়ো আর কী আছে! আমাদের প্রাণকেই বড়ো করে তুলতে হবে। জানিস? বুঝতে পেরেছিস?"

বুঝিতে পারিল না এ কথা সতীশ সহজে স্বীকার করিবার পাত্র নয়। সে জোরের সহিত বলিল, "হাঁ।"

সুচরিতা কহিল, "আমাদের যে দেশ, আমাদের যে জাত, সে কত বড়ো তা জানিস? সে আমি তোকে বোঝাব কেমন করে। এ এক আশ্চর্য দেশ। এই দেশকে পৃথিবীর সকলের চূড়ার উপরে বসাবার জন্যে কত হাজার হাজার বৎসর ধরে বিধাতার আয়োজন হয়েছে, দেশ বিদেশ থেকে কত লোক এসে এই আয়োজনে যোগ দিয়েছে, এ দেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, কত মহাযুদ্ধ ঘটেছে, কত মহাবাক্য এইখান থেকে বলা হয়েছে, কত মহাতপস্যা এইখানে সাধন করা হয়েছে, ধর্মকে এ দেশ কত দিক থেকে দেখেছে এবং জীবনের সমস্যার কতরকম মীমাংসা এই দেশে হয়েছে। সেই আমাদের এই ভারতবর্ষ। একে খুব মহৎ বলেই জানিস ভাই— একে কোনোদিন ভুলেও অবজ্ঞা করিস নে। তোকে আজ আমি যা বলছি একদিন সে কথা তোকে বুঝতেই হবে— আজও তুই যে কিছু বুঝতে পারিস নি আমি তা মনে করি নে। এই কথাটি তোকে মনে রাখতে হবে, খুব একটা

বড়ো দেশে তুই জন্মেছিস, সমস্ত হৃদয় দিয়ে এই বড়ো দেশকে ভক্তি করবি আর সমস্ত জীবন দিয়ে এই বড়ো দেশের কাজ করবি।"

সতীশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দিদি, তুমি কী করবে?"

সুচরিতা কহিল, "আমিও এই কাজ করব। তুই আমাকে সাহায্য করবি তো?"

সতীশ তৎক্ষণাৎ বুক ফুলাইয়া কহিল, "হাঁ, করব।"

সুচরিতার হৃদয় পূর্ণ করিয়া যে কথা জমিয়া উঠিতেছিল তাহা বলিবার লোক বাড়িতে কেহই ছিল না। তাই আপনার এই ছোটো ভাইটিকে কাছে পাইয়া তাহার সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে যে ভাষায় যাহা বলিল তাহা বালকের কাছে বলিবার নহে, কিন্তু সুচরিতা তাহাতে সংকুচিত হইল না। তাহার মনের এইরূপ উৎসাহিত অবস্থায় এই জ্ঞানটি সে পাইয়াছিল যে, যাহা নিজে বুঝিয়াছি তাহাকে পূর্ণভাবে বলিলে তবেই ছেলেবুড়া সকলে আপন আপন শক্তি অনুসারে তাহাকে এক-রকম বুঝিতে পারে, তাহাকে অন্যের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া হাতে রাখিয়া বুঝাইতে গেলেই সত্য আপনি বিকৃত হইয়া যায়।

সতীশের কল্পনাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সে কহিল, "বড়ো হলে আমার যখন অনেক অনেক টাকা হবে তখন—"

সুচরিতা কহিল, "না, না, না, টাকার কথা মুখে আনিস নে, আমাদের দুজনের টাকার দরকার নেই বক্তিয়ার— আমরা যে কাজ করব তাতে ভক্তি চাই, প্রাণ চাই।"

এমন সময়ে ঘরের মধ্যে আনন্দময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সুচরিতার বুকের ভিতরে রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিল— সে আনন্দময়ীকে প্রণাম করিল। প্রণাম করা সতীশের ভালো আসে না; সে লজ্জিতভাবে কোনোমতে কাজটা সারিয়া লইল।

আনন্দময়ী সতীশকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন, এবং সুচরিতাকে কহিলেন, "তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে

এলুম মা— তুমি ছাড়া আর কাউকে দেখি নে। বিনয় বলছিল, 'বিয়ে আমার বাসাতেই হবে।' আমি বললুম, 'সে কিছুতেই হবে না— তুমি মস্ত নবাব হয়েছ কিনা, আমাদের মেয়ে অমনি সেধে গিয়ে তোমার ঘরে এসে বিয়ে করে যাবে!' সে হবে না। আমি একটা বাসা ঠিক করেছি, সে তোমাদের এ বাড়ি থেকে বেশি দূর হবে না। আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি। পরেশবাবুকে বলে তুমি রাজি করিয়ে নিয়ো।"

সুচরিতা কহিল, "বাবা রাজি হবেন।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তার পরে, তোমাকেও মা, সেখানে যেতে হচ্ছে। এই তো সোমবারে বিয়ে। এই ক'দিন সেখানে থেকে আমাদের তো সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে হবে। সময় তো বেশি নেই। আমি একলাই সমস্ত করে নিতে পারি, কিন্তু তুমি এতে না থাকলে বিনয়ের ভারী কষ্ট হবে। সে মুখ ফুটে তোমাকে অনুরোধ করতে পারছে না, এমন-কি আমার কাছেও সে তোমার নাম করে নি— তাতেই আমি বুঝতে পারছি, ওখানে তার খুব একটা ব্যথা আছে। তুমি কিন্তু সরে থাকলে চলবে না মা— ললিতাকেও সে বড়ো বাজবে।"

সুচরিতা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "মা, তুমি এই বিয়েতে যোগ দিতে পারবে?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "বল কী সুচরিতা! যোগ দেওয়া কী বলছ! আমি কি বাইরের লোক যে শুধু কেবল যোগ দেব। এ যে বিনয়ের বিয়ে। এ তো আমাকেই সমস্ত করতে হবে। আমি কিন্তু বিনয়কে বলে রেখেছি, 'এ বিয়েতে আমি তোমার কেউ নয়, আমি কন্যাপক্ষে'— আমার ঘরে সে ললিতাকে বিয়ে করতে আসছে।"

মা থাকিতেও শুভকর্মে ললিতাকে তাহার মা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে করুণায় আনন্দময়ীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে কারণেই এই বিবাহে যাহাতে কোনো অনাদর-অশ্রদ্ধার লক্ষণ না থাকে সেইজন্য তিনি একান্তমনে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ললিতার মায়ের স্থান লইয়া নিজের হাতে

ললিতাকে সাজাইয়া দিবেন, বরকে বরণ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন— যদি নিমন্ত্রিত দুই-চারি জন আসে তাহাদের আদর-অভ্যর্থনার লেশমাত্র ত্রুটি না হয় তাহা দেখিবেন, এবং এই নূতন বাসাবাড়িকে এমন করিয়া সাজাইয়া তুলিবেন যাহাতে ললিতা ইহাকে একটা বাসস্থান বলিয়া অনুভব করিতে পারে, ইহাই তাঁহার সংকল্প।

সুচরিতা কহিল, "এতে তোমাকে নিয়ে কোনো গোলমাল্ হবে না?"

বাড়িতে মহিম যে তোলপাড় বাধাইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দময়ী কহিলেন, "তা হতে পারে, তাতে কী হবে। গোলমাল কিছু হয়েই থাকে; চুপ করে সয়ে থাকলে আবার কিছুদিন পরে সমস্ত কেটেও যায়।"

সুচরিতা জানিত এই বিবাহে গোরা যোগ দেয় নাই। আনন্দময়ীকে বাধা দিবার জন্য গোরার কোনো চেষ্টা ছিল কি না ইহাই জানিবার জন্য সুচরিতার ঔৎসুক্য ছিল। সে কথা সে স্পষ্ট করিয়া পাড়িতে পারিল না, এবং আনন্দময়ী গোরার নামমাত্রও উচ্চারণ করিলেন না।

হরিমোহিনী খবর পাইয়াছিলেন। ধীরে সুস্থে হাতের কাজ সারিয়া তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন এবং কহিলেন, "দিদি, ভালো আছ তো? দেখাই নেই, খবরই নাও না!"

আনন্দময়ী সেই অভিযোগের উত্তর না করিয়া কহিলেন, "তোমার বোনঝিকে নিতে এসেছি।"

এই বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। হরিমোহিনী অপ্রসন্ন মুখে কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; পরে কহিলেন, "আমি তো এর মধ্যে যেতে পারব না।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "না বোন, তোমাকে আমি যেতে বলি নে। সুচরিতার জন্যে তুমি ভেবো না— আমি তো ওর সঙ্গেই থাকব।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তবে বলি। রাধারানী তো লোকের কাছে বলেছেন উনি হিন্দু। এখন ওঁর মতিগতি হিঁদুয়ানির দিকে ফিরেছে। তা উনি যদি হিন্দুসমাজে চলতে চান, তা হলে ওঁকে সাবধান হতে হবে।

অমনিতেই তো ঢের কথা উঠবে, তা সে আমি কাটিয়ে দিতে পারব, কিন্তু এখন থেকে কিছুদিন ওঁকে সামলে চলা চাই। লোকে তো প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে, এত বয়স হল ওঁর বিয়েথাওয়া হল না কেন— সে এক রকম করে চাপাচুপি দিয়ে রাখা চলে— ভালো পাত্রও যে চেষ্টা করলে জোটে না তা নয়— কিন্তু উনি যদি আবার ওঁর সাবেক চাল ধরেন তা হলে আমি কত দিকে সামলাব বলো। তুমি তো হিঁদুঘরের মেয়ে, তুমি তো সব বোঝ, তুমিই বা এমন কথা বল কোন্ মুখে। তোমার নিজের মেয়ে যদি থাকত তাকে কি এই বিয়েতে পাঠাতে পারতে? তোমাকে তো ভাবতে হত— মেয়ের বিয়ে দেবে কেমন করে।"

আনন্দময়ী বিস্মিত হইয়া সুচরিতার মুখের দিকে চাহিলেন— তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আনন্দময়ী কহিলেন, "আমি কোনো জোর করতে চাই নে। সুচরিতা যদি আপত্তি করেন তবে আমি—"

হরিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "আমি তো তোমাদের ভাব কিছুই বুঝে উঠতে পারি নে। তোমারই তো ছেলে ওঁকে হিন্দুমতে লইয়েছেন, তুমি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লে চলবে কেন।"

পরেশবাবুর বাড়িতে সর্বদাই অপরাধভীরুর মতো যে হরিমোহিনী ছিলেন, যিনি কোনো মানুষকে ঈষৎ-মাত্র অনুকূল বোধ করিলেই একান্ত আগ্রহের সহিত অবলম্বন করিয়া ধরিতেন, সে হরিমোহিনী কোথায়! নিজের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য ইনি আজ বাঘিনীর মতো দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহার সুচরিতাকে তাঁহার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইবার জন্য চারি দিকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি কাজ করিতেছে এই সন্দেহে তিনি সর্বদাই কণ্টকিত হইয়া আছেন; কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন না— এইজন্য তাঁহার মনে আজ আর স্বচ্ছন্দতা নাই। পূর্বে সমস্ত সংসারকে শূন্য দেখিয়া যে দেবতাকে ব্যাকুলচিত্তে আশ্রয় করিয়াছিলেন সেই দেবপূজাতেও তাঁহার চিত্ত স্থির হইতেছে না। একদিন তিনি ঘোরতরো সংসারী ছিলেন, নিদারুণ শোকে যখন তাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল তখন তিনি মনেও করিতে

পারেন নাই যে আবার কোনোদিন তাঁহার টাকাকড়ি ঘরবাড়ি আত্মীয়-পরিজনের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আজ হৃদয়ক্ষতের একটু আরোগ্য হইতেই সংসার পুনরায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার মনকে টানাটানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে— আবার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার অনেক-দিনের ক্ষুধা লইয়া পূর্বের মতোই জাগিয়া উঠিতেছে ; যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন সেই দিকে পুনর্বার ফিরিবার বেগ এমনি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, সংসারে যখন ছিলেন তখনো তাঁহাকে এত চঞ্চল করিতে পারে নাই। অল্প কয়দিনেই হরিমোহিনীর মুখে চক্ষে, ভাবে ভঙ্গীতে, কথায় ব্যবহারে এই অভাবনীয় পরিবর্তনের লক্ষণ দেখিয়া আনন্দময়ী একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং সুচরিতার জন্য তাঁহার স্নেহকোমল হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা বোধ করিতে লাগিলেন। এমন যে একটা সংকট প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা জানিলে তিনি কখনোই সুচরিতাকে ডাকিতে আসিতেন না। এখন কী করিলে সুচরিতাকে আঘাত হইতে বাঁচাইতে পারিবেন, সে তাঁহার পক্ষে একটা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল।

গোরার প্রতি লক্ষ করিয়া যখন হরিমোহিনী কথা কহিলেন তখন সুচরিতা মুখ নত করিয়া নীরবে ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

আনন্দময়ী কহিলেন, "তোমার ভয় নেই বোন। আমি তো আগে জানতুম না। তা, আর ওকে পীড়াপীড়ি করব না। তুমিও ওকে আর কিছু বোলো না। ও আগে এক রকম করে মানুষ হয়েছে, হঠাৎ ওকে যদি বেশি চাপ দাও সে আবার সইবে না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "সে কি আমি বুঝি নে, আমার এত বয়স হল! তোমার মুখের সামনেই বলুক-না, আমি কি ওকে কোনোদিন কিছু কষ্ট দিয়েছি। ওর যা খুশি তাই তো করছে, আমি কখনো একটি কথা কই নে— বলি, ভগবান ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, সেই আমার ঢের— যে আমার কপাল, কোন্‌দিন কী ঘটে সেই ভয়ে ঘুম হয় না।"

আনন্দময়ী যাইবার সময় সুচরিতা তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিল। আনন্দময়ী সকরুণ স্নেহে তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "আমি আসব মা, তোমাকে সব খবর দিয়ে যাব— কোনো বিঘ্ন হবে না, ঈশ্বরের আশীর্বাদে শুভকর্ম সম্পন্ন হয়ে যাবে।"

সুচরিতা কোনো কথা কহিল না।

পরদিন প্রাতে আনন্দময়ী লছমিয়াকে লইয়া যখন সেই বাসাবাড়ির বহুদিনসঞ্চিত ধূলি ক্ষয় করিবার জন্য একেবারে জলপ্লাবন বাধাইয়া দিয়াছেন এমন সময় সুচরিতা আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি ঝাঁটা ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

তার পরে ধোওয়ামোছা জিনিসপত্র-নাড়াচাড়া ও সাজানোর ধুম পড়িয়া গেল। পরেশবাবু খরচের জন্য সুচরিতার হাতে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা দিয়াছিলেন— সেই তহবিল লইয়া উভয়ে মিলিয়া বার বার করিয়া কত ফর্দ তৈরি এবং তাহার সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনতিকাল পরে পরেশ স্বয়ং ললিতাকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ললিতার পক্ষে তাহার বাড়ি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ তাহাকে কোনো কথা বলিতে সাহস করিত না, কিন্তু তাহাদের নীরবতা পদে পদে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। অবশেষে বরদাসুন্দরীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য যখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ দলে দলে বাড়িতে আসিতে লাগিল, তখন পরেশ ললিতাকে এ বাড়ি হইতে লইয়া যাওয়াই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। ললিতা বিদায় হইবার সময় বরদাসুন্দরীকে প্রণাম করিতে গেল; তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন এবং সে চলিয়া গেলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ললিতার বিবাহ-ব্যাপারে লাবণ্য ও লীলার মনে মনে যথেষ্ট ঔৎসুক্য ছিল— কোনো উপায়ে যদি তাহারা ছুটি পাইত তবে বিবাহ-আসরে ছুটিয়া যাইতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিত না। কিন্তু ললিতা যখন বিদায় হইয়া গেল তখন ব্রাহ্ম পরিবারের কঠোর কর্তব্য স্মরণ করিয়া তাহারা মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া রহিল। দরজার কাছে সুধীরের সঙ্গে চকিতের মতো ললিতার দেখা হইল; কিন্তু সুধীরের পশ্চাতেই তাহাদের

সমাজের আরও কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন, এই কারণে তাহার সঙ্গে কোনো কথা হইতেই পারিল না। গাড়িতে উঠিয়া ললিতা দেখিল, আসনের এক কোণে কাগজে মোড়া কী একটা রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিল, জর্মান রৌপ্যের একটি ফুলদানি, তাহার গায়ে ইংরেজি ভাষায় খোদা রহিয়াছে 'আনন্দিত দম্পতিকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন' এবং একটি কার্ডে ইংরাজিতে সুধীরের কেবল নামের আদ্যক্ষরটি ছিল। ললিতা আজ হৃদয়কে কঠিন করিয়া পণ করিয়াছিল, সে চোখের জল ফেলিবে না। কিন্তু পিতৃগৃহ হইতে বিদায়মুহূর্তে তাহাদের বাল্যবন্ধুর এই একটিমাত্র স্নেহোপহার হাতে লইয়া তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পরেশবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

আনন্দময়ী "এসো এসো, মা এসো" বলিয়া ললিতার দুই হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া আসিলেন, যেন এখনই তাহার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন।

পরেশবাবু সুচরিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, "ললিতা আমার ঘর থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে এসেছে।"

পরেশের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া গেল।

সুচরিতা পরেশের হাত ধরিয়া কহিল, "এখানে ওর স্নেহযত্নের কোনো অভাব হবে না বাবা।"

পরেশ যখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আনন্দময়ী মাথার উপর কাপড় টানিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। পরেশ ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন। আনন্দময়ী কহিলেন, "ললিতার জন্যে আপনি কোনো চিন্তা মনে রাখবেন না। আপনি যার হাতে ওকে সমর্পণ করেছেন তার দ্বারা ও কখনো কোনো দুঃখ পাবে না; আর ভগবান এতকাল পরে আমার এই একটি অভাব দূর করে দিলেন— আমার মেয়ে ছিল না, আমি মেয়ে পেলুম। বিনয়ের বউটিকে নিয়ে আমার কন্যার দুঃখ ঘুচবে, অনেক দিন ধরে এই আশাপথ চেয়ে বসে ছিলুম— তা,

অনেক দেরিতে যেমন ঈশ্বর আমার কামনা পূরণ করে দিলেন তেমনি এমন মেয়ে দিলেন আর এমন আশ্চর্য রকম করে দিলেন যে, আমি আমার এমন ভাগ্য কখনো মনে চিন্তাও করতে পারতুম না।”

ললিতার বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই প্রথম পরেশবাবুর চিত্ত সংসারের মধ্যে এক জায়গায় একটা কূল দেখিতে পাইল এবং যথার্থ সান্ত্বনা লাভ করিল।

৬৭

কারাগার হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে গোরার কাছে সমস্ত দিন এত লোকসমাগম হইতে লাগিল যে তাহাদের স্তবস্তুতি ও আলাপ-আলোচনার নিশ্বাসরোধকর অজস্র বাক্যরাশির মধ্যে বাড়িতে বাস করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

গোরা তাই পূর্বের মতো পুনর্বার পল্লিভ্রমণ আরম্ভ করিল।

সকালবেলায় কিছু খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইত, একেবারে রাত্রে ফিরিয়া আসিত। ট্রেনে করিয়া কলিকাতার কাছাকাছি কোনো-একটা স্টেশনে নামিয়া পল্লিগ্রামের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিত। সেখানে কলু কুমার কৈবর্ত প্রভৃতিদের পাড়ায় সে আতিথ্য লইত। এই গৌরবর্ণ প্রকাণ্ডকায় ব্রাহ্মণটি কেন যে তাহাদের বাড়িতে এমন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহাদের সুখদুঃখের খবর লইতেছে, তাহা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিত না, এমন-কি, তাহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মিত। কিন্তু গোরা তাহাদের সমস্ত সংকোচ-সন্দেহ ঠেলিয়া তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে অপ্রিয় কথাও শুনিয়াছে, তাহাতেও নিরস্ত হয় নাই।

যতই ইহাদের ভিতরে প্রবেশ করিল ততই একটা কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে দেখিল, এই-সকল পল্লীতে

সমাজের বন্ধন শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক বেশি। প্রত্যেক ঘরের খাওয়াদাওয়া শোওয়াবসা কাজকর্ম সমস্তই সমাজের নিমেষবিহীন চোখের উপর দিনরাত্রি রহিয়াছে। প্রত্যেক লোকেরই লোকাচারের প্রতি অত্যন্ত একটি সহজ বিশ্বাস, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনো তর্কমাত্র নাই। কিন্তু সমাজের বন্ধনে, আচারের নিষ্ঠায় ইহাদিগকে কর্মক্ষেত্রে কিছুমাত্র বল দিতেছে না। ইহাদের মতো এমন ভীত অসহায় আত্মহিতবিচারে-অক্ষম জীব জগতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। আচারকে পালন করিয়া চলা ছাড়া আর-কোনো মঙ্গলকে ইহারা সম্পূর্ণ মনের সঙ্গে চেনেও না, বুঝাইলেও বুঝে না। দণ্ডের দ্বারা, দলাদলি-দ্বারা নিষেধটাকেই তাহারা সব চেয়ে বড়ো করিয়া বুঝিয়াছে। কী করিতে নাই এই কথাটাই পদে পদে নানা শাসনের দ্বারা তাহাদের প্রকৃতিকে যেন আপাদমস্তক জালে বাঁধিয়াছে— কিন্তু এ জাল ঋণের জাল, এ বাঁধন মহাজনের বাঁধন, রাজার বাঁধন নহে। ইহার মধ্যে এমন কোনো বড়ো ঐক্য নাই যাহা সকলকে বিপদে সম্পদে পাশাপাশি দাঁড় করাইতে পারে। গোরা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না যে, এই আচারের অস্ত্রে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে। কতবার সে দেখিয়াছে, সমাজে ক্রিয়াকর্মে কেহ কাহাকেও দয়ামাত্রও করে না। একজনের বাপ দীর্ঘকাল রোগে ভুগিতেছিল, সেই বাপের চিকিৎসা পথ্য প্রভৃতিতে বেচারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারও নিকট হইতে তাহার কোনো সাহায্য নাই— এ দিকে গ্রামের লোকে ধরিয়া পড়িল তাহার পিতাকে অজ্ঞাত-পাতকজনিত চিররুগ্‌ণতার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সে হতভাগ্যের দারিদ্র্য অসামর্থ্য কাহারও অগোচর ছিল না, কিন্তু ক্ষমা নাই। সকলপ্রকার ক্রিয়াকর্মেই এইরূপ। যেমন ডাকাতির অপেক্ষা পুলিস-তদন্ত গ্রামের পক্ষে গুরুতর দুর্ঘটনা, তেমনি মা-বাপের মৃত্যুর অপেক্ষা মা-বাপের শ্রাদ্ধ সন্তানের পক্ষে গুরুতর দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া উঠে। অল্প আয় অল্প শক্তির দোহাই কেহই মানিবে না— যেমন করিয়া হউক সামাজিকতার হৃদয়হীন দাবি ষোলো-

আনা পূরণ করিতে হইবে। বিবাহ উপলক্ষে কন্যার পিতার বোঝা যাহাতে দুঃসহ হইয়া উঠে এইজন্য বরের পক্ষে সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করা হয়, হতভাগ্যের প্রতি লেশমাত্র করুণা নাই। গোরা দেখিল, এই সমাজ মানুষকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে না, বিপদের সময় ভরসা দেয় না, কেবল শাসনের দ্বারা নতি স্বীকার করাইয়া বিপন্ন করে।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে গোরা এ কথা ভুলিয়া ছিল— কারণ, সে সমাজে সাধারণের মঙ্গলের জন্য এক হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি বাহির হইতে কাজ করিতেছে। এই সমাজে একত্রে মিলিবার নানাপ্রকার উদ্‌যোগ দেখা দিতেছে। এই-সকল মিলিত চেষ্টা পাছে পরের অনুকরণরূপে আমাদিগকে নিষ্ফলতার দিকে লইয়া যায়, সেখানে ইহাই কেবল ভাবিবার বিষয়।

কিন্তু পল্লীর মধ্যে যেখানে বাহিরের শক্তিসংঘাত তেমন করিয়া কাজ করিতেছে না, সেখানকার নিশ্চেষ্টতার মধ্যে গোরা স্বদেশের গভীরতর দুর্বলতার যে মূর্তি তাহাই একেবারে অনাবৃত দেখিতে পাইল। যে ধর্ম সেবারূপে, প্রেমরূপে, করুণারূপে, আত্মত্যাগরূপে এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধারূপে সকলকে শক্তি দেয়, প্রাণ দেয়, কল্যাণ দেয়, কোথাও তাহাকে দেখা যায় না— যে আচার কেবল রেখা টানে, ভাগ করে, পীড়া দেয়, যাহা বুদ্ধিকেও কোথাও আমল দিতে চায় না, যাহা প্রীতিকেও দূরে খেদাইয়া রাখে, তাহাই সকলকে চলিতে-ফিরিতে উঠিতে-বসিতে সকল বিষয়েই কেবল বাধা দিতে থাকে— পল্লীর মধ্যে এই মূঢ় বাধ্যতার অনিষ্টকর কুফল এত স্পষ্ট করিয়া এত নানা রকমে গোরার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকে জ্ঞানকে ধর্মবুদ্ধিকে কর্মকে এত দিকে এত প্রকারে আক্রমণ করিয়াছে দেখিতে পাইল যে, নিজেকে ভাবুকতার ইন্দ্রজালে ভুলাইয়া রাখা গোরার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

গোরা প্রথমেই দেখিল, গ্রামের নীচজাতির মধ্যে স্ত্রীসংখ্যার অল্পতাবশত অথবা অন্য যে কারণ -বশত হউক অনেক পণ দিয়া তবে বিবাহের জন্য মেয়ে পাওয়া যায়। অনেক পুরুষকে চিরজীবন এবং অনেককে অধিক বয়স পর্যন্ত

অবিবাহিত থাকিতে হয়। এ দিকে বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে কঠিন নিষেধ। ইহাতে ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার অনিষ্ট ও অসুবিধা সমাজের প্রত্যেক লোকই অনুভব করিতেছে; এই অকল্যাণ চিরদিন বহন করিয়া চলিতে সকলেই বাধ্য, কিন্তু ইহার প্রতিকার করিবার উপায় কোথাও কাহারও হাতে নাই। শিক্ষিতসমাজে যে গোরা আচারকে কোথাও শিথিল হইতে দিতে চায় না সেই গোরা এখানে আচারকে আঘাত করিল। সে ইহাদের পুরোহিতদিগকে বশ করিল, কিন্তু সমাজের লোকদের সম্মতি কোনোমতেই পাইল না। তাহারা গোরার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; কহিল, 'বেশ তো, ব্রাহ্মণেরা যখন বিধবাবিবাহ দিবেন আমরাও তখন দিব।'

তাহাদের রাগ হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা মনে করিল গোরা তাহাদিগকে হীনজাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, তাহাদের মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত হীন আচার অবলম্বন করাই যে শ্রেয় ইহাই গোরা প্রচার করিতে আসিয়াছে।

পল্লীর মধ্যে বিচরণ করিয়া গোরা ইহাও দেখিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে সেই জিনিসটি আছে যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া দাঁড় করানো যায়। গোরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, গ্রামে কোনো আপদ বিপদ হইলে মুসলমানেরা যেমন নিবিড়ভাবে পরস্পরের পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হয় হিন্দুরা এমন হয় না। গোরা বার বার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে, এই দুই নিকটতম প্রতিবেশী সমাজের মধ্যে এতবড়ো প্রভেদ কেন হয়। যে উত্তরটি তাহার মনে উদিত হয় সে উত্তরটি কিছুতেই তাহার মানিতে ইচ্ছা হয় না। এ কথা স্বীকার করিতে তাহার সমস্ত হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নহে। এক দিকে যেমন আচারের বন্ধন তাহাদের সমস্ত কর্মকে অনর্থক বাঁধিয়া রাখে নাই, অন্য দিকে তেমনি ধর্মের বন্ধন তাহাদের মধ্যে একান্ত ঘনিষ্ঠ। তাহারা সকলে মিলিয়া এমন একটি জিনিসকে গ্রহণ করিয়াছে যাহা 'না'-মাত্র নহে, যাহা 'হাঁ'; যাহা

ঋণাত্মক নহে, যাহা ধনাত্মক ; যাহার জন্য মানুষ এক আহ্বানে এক মুহূর্তে একসঙ্গে দাঁড়াইয়া অনায়াসে প্রাণবিসর্জন করিতে পারে।

শিক্ষিতসমাজে গোরা যখন লিখিয়াছে, তর্ক করিয়াছে, বক্তৃতা দিয়াছে, তখন সে অন্যকে বুঝাইবার জন্য, অন্যকে নিজের পথে আনিবার জন্য, স্বভাবতই নিজের কথাগুলিকে কল্পনার দ্বারা মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে ; যাহা স্থূল তাহাকে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আবৃত করিয়াছে ; যাহা অনাবশ্যক ভগ্নাবশেষমাত্র তাহাকেও ভাবের চন্দ্রালোকে মোহময় ছবির মতো করিয়া দেখাইয়াছে। দেশের একদল লোক দেশের প্রতি বিমুখ বলিয়াই, দেশের সমস্তই তাহারা মন্দ দেখে বলিয়াই, স্বদেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ -বশত গোরা এই মমত্ববিহীন দৃষ্টিপাতের অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য স্বদেশের সমস্তকেই অত্যুজ্জ্বল ভাবের আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে অহোরাত্র চেষ্টা করিয়াছে। ইহাই গোরার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সবই ভালো, যাহাকে দোষ বলিতেছ তাহা কোনো একভাবে, গুণ, ইহা যে গোরা কেবল উকিলের মতো প্রমাণ করিত তাহা নহে, ইহাই সে সমস্ত মন দিয়া বিশ্বাস করিত। নিতান্ত অসম্ভব স্থানেও এই বিশ্বাসকে স্পর্ধার সহিত জয়পতাকার মতো দৃঢ় মুষ্টিতে সমস্ত পরিহাসপরায়ণ শত্রুপক্ষের সম্মুখে সে একা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কেবল একটিমাত্র কথা ছিল, স্বদেশের প্রতি স্বদেশ-বাসীর শ্রদ্ধা সে ফিরাইয়া আনিবে, তাহার পরে অন্য কাজ।

কিন্তু যখন সে পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করে তখন তো তাহার সম্মুখে কোনো শ্রোতা থাকে না, তখন তো তাহার প্রমাণ করিবার কিছুই নাই, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষকে নত করিয়া দিবার জন্য তাহার সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার কোনো প্রয়োজন থাকে না— এইজন্য সেখানে সত্যকে সে কোনোপ্রকার আবরণের ভিতর দিয়া দেখে না। দেশের প্রতি তাহার অনুরাগের প্রবলতাই তাহার সত্যদৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়।

৬৮

গায়ে তসরের চায়না কোট, কোমরে একটা চাদর জড়ানো, হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ— স্বয়ং কৈলাস আসিয়া হরিমোহিনীকে প্রণাম করিল। তাহার বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হইবে, বেঁটেখাটো আঁটসাঁট মজবুত গোছের চেহারা, কামানো গোঁফ দাড়ি কিছুদিন ক্ষৌরকর্মের অভাবে কুশাগ্রের ন্যায় অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

অনেক দিন পরে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়কে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া হরিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "একি, ঠাকুরপো যে! বোসো, বোসো।"

বলিয়া তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাত-পা ধোবে?"

কৈলাস কহিল, "না, দরকার নেই। তা, শরীর তো বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।"

শরীর ভালো থাকাটাকে একটা অপবাদ জ্ঞান করিয়া হরিমোহিনী কহিলেন, "ভালো আর কই আছে!"

বলিয়া নানাপ্রকার ব্যাধির তালিকা দিলেন, ও কহিলেন, "তা, পোড়া শরীর গেলেই যে বাঁচি, মরণ তো হয় না।"

জীবনের প্রতি এইরূপ উপেক্ষায় কৈলাস আপত্তি প্রকাশ করিল এবং যদিচ দাদা নাই তথাপি হরিমোহিনী থাকাতে তাহাদের যে একটা মস্ত ভরসা আছে তাহারই প্রমাণস্বরূপে কহিল, "এই দেখো-না কেন, তুমি আছ বলেই কলকাতায় আসা হল— তবু একটা দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া গেল।"

আত্মীয়স্বজনের ও গ্রামবাসীদের সমস্ত সংবাদ আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া কৈলাস হঠাৎ চারি দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়িটা বুঝি তারই?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "হাঁ।"

কৈলাস কহিল, "পাকা বাড়ি দেখছি।"

হরিমোহিনী তাহার উৎসাহকে উদ্দীপিত করিয়া কহিলেন, "পাকা বৈকি। সমস্তই পাকা।"

ঘরের কড়িগুলা বেশ মজবুত শালের এবং দরজা-জানলাগুলো আম-কাঠের নয়, ইহাও সে লক্ষ করিয়া দেখিল। বাড়ির দেয়াল দেড়খানা ইঁটের গাঁথনি কি দুইখানা ইঁটের তাহাও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। উপরে নীচে সর্বসমেত কয়টি ঘর তাহাও সে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল। মোটের উপর জিনিসটা তাহার কাছে বেশ সন্তোষজনক বলিয়াই বোধ হইল। বাড়ি তৈরি করিতে কত খরচ পড়িয়াছে তাহা আন্দাজ করা তাহার পক্ষে শক্ত; কারণ, এ-সকল মাল-মশলার দর তাহার ঠিক জানা ছিল না। চিন্তা করিয়া, পায়ের উপর পা নাড়িতে নাড়িতে মনে মনে কহিল, 'কিছু না হোক দশ-পনেরো হাজার টাকা তো হবেই।' মুখে একটু কম করিয়া বলিল, "কী বল বউঠাকরুন, সাত-আট হাজার টাকা হতে পারে।"

হরিমোহিনী কৈলাসের গ্রাম্যতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বল কী ঠাকুরপো, সাত-আট হাজার টাকা কী! বিশ হাজার টাকার এক পয়সা কম হবে না।"

কৈলাস অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চারি দিকের জিনিসপত্র নীরবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এখনই সম্মতিসূচক একটা মাথা নাড়িলেই এই শাল কাঠের কড়িবরগা ও সেগুন কাঠের জানলা দরজা-সমেত পাকা ইমারতটির একেশ্বর প্রভু সে হইতে পারে, এই কথা চিন্তা করিয়া সে খুব একটা পরিতৃপ্তি বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সব তো হল, কিন্তু মেয়েটি?"

হরিমোহিনী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তার পিসির বাড়িতে হঠাৎ তার নিমন্ত্রণ হয়েছে তাই গেছে, দু-চার দিন দেরি হতে পারে।"

কৈলাস কহিল, "তা হলে দেখার কী হবে? আমার যে আবার একটা মকদ্দমা আছে, কালই যেতে হবে।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "মকদ্দমা তোমার এখন থাক্। এখানকার কাজ সারা না হলে তুমি যেতে পারছ না।"

কৈলাস কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষকালে স্থির করিল, 'নাহয় মকদ্দমাটা এক-তরফা ডিগ্রি হয়ে ফেঁসে যাবে। তা যাক গে।' এখানে যে তাহার ক্ষতিপূরণের আয়োজন আছে তাহা আর-একবার চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া বিচার করিয়া লইল। হঠাৎ চোখে পড়িল, হরিমোহিনীর পূজার ঘরের কোণে কিছু জল জমিয়া আছে। এ ঘরে জল-নিকাশের কোনো প্রণালী ছিল না— অথচ হরিমোহিনী সর্বদাই জল দিয়া এ ঘর ধোওয়ামোছা করেন, সেইজন্য কিছু জল একটা কোণে বাধিয়াই থাকে; কৈলাস ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বউঠাকরুন, ওটা তো ভালো হচ্ছে না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "কেন, কী হয়েছে?"

কৈলাস কহিল, "ওই-যে ওখানে জল বসছে, ও তো কোনোমতে চলবে না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "কী করব ঠাকুরপো।"

কৈলাস কহিল, "না, না, সে হচ্ছে না। ছাত যে একেবারে জখম হয়ে যাবে। তা বলছি বউঠাকরুন, এ ঘরে তোমার জল-ঢালাঢালি চলবে না।"

হরিমোহিনীকে চুপ করিয়া যাইতে হইল। কৈলাস তখন কন্যাটির রূপ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিল।

হরিমোহিনী কহিলেন, "সে তো দেখলেই টের পাবে, এ-পর্যন্ত বলতে পারি তোমাদের ঘরে এমন বউ কখনো হয় নি।"

কৈলাস কহিল, "বল কী! আমাদের মেজবউ—"

হরিমোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "কিসে আর কিসে! তোমাদের মেজবউ তার কাছে দাঁড়াতে পারে!"

মেজবউকেই তাহাদের বাড়ির স্বরূপের আদর্শ বলাতে হরিমোহিনী বিশেষ সন্তোষ বোধ করেন না— "তোমরা যে যাই বলো বাপু, মেজবউয়ের চেয়ে আমার কিন্তু ন-বউকে ঢের বেশি পছন্দ হয়।"

মেজবউ ও ন-বউয়ের সৌন্দর্যের তুলনায় কৈলাস কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিল না। সে মনে মনে কোনো একটি অদৃষ্টপূর্ব মূর্তিতে পটল-চেরা চোখের

সঙ্গে বাঁশির মতো নাসিকা যোজনা করিয়া আগুল্‌ফবিলম্বিত কেশরাশির মধ্যে নিজের কল্পনাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল।

হরিমোহিনী দেখিলেন, এ পক্ষের অবস্থাটি সম্পূর্ণ আশাজনক। এমন-কি তাঁহার বোধ হইল, কন্যাপক্ষে যে-সকল গুরুতর সামাজিক ত্রুটি আছে তাহাও দুস্তর বিঘ্ন বলিয়া গণ্য না হইতে পারে।

৬৯

গোরা আজকাল সকালেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, বিনয় তাহা জানিত, এইজন্য অন্ধকার থাকিতেই সোমবার দিন প্রত্যূষে সে তাহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল; একেবারে উপরে উঠিয়া তাহার শয়নগৃহে গেল। সেখানে গোরাকে দেখিতে না পাইয়া চাকরের কাছে সন্ধান লইয়া জানিল, সে ঠাকুরঘরে আছে। ইহাতে সে মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইল। ঠাকুরঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল, গোরা পূজার ভাবে বসিয়া আছে; একটি গরদের ধুতি পরা, গায়ে একটি গরদের চাদর, কিন্তু তাহার বিপুল শুভ্রদেহের অধিকাংশই অনাবৃত। বিনয় গোরাকে পূজা করিতে দেখিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া গেল।

জুতার শব্দ পাইয়া গোরা পিছন ফিরিয়া দেখিল; বিনয়কে দেখিয়া গোরা উঠিয়া পড়িল এবং ব্যস্ত হইয়া কহিল, "এ ঘরে এসো না।"

বিনয় কহিল, "ভয় নেই, আমি যাব না। তোমার কাছেই আমি এসেছিলুম।"

গোরা তখন বাহির হইয়া কাপড় ছাড়িয়া তেতলার ঘরে বিনয়কে লইয়া বসিল।

বিনয় কহিল, "ভাই গোরা, আজ সোমবার।"

গোরা কহিল, "নিশ্চয়ই সোমবার— পাঁজির ভুল হতেও পারে, কিন্তু আজকের দিন সম্বন্ধে তোমার ভুল হবে না। অন্তত আজ মঙ্গলবার নয়,

সেটা ঠিক।"

বিনয় কহিল, "তুমি হয়তো যাবে না, জানি— কিন্তু আজকের দিনে তোমাকে একবার না বলে এ কাজে আমি প্রবৃত্ত হতে পারব না। তাই আজ ভোরে উঠেই প্রথম তোমার কাছে এসেছি।"

গোরা কোনো কথা না বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

বিনয় কহিল, "তা হলে আমার বিবাহের সভায় যেতে পারবে না, এ কথা নিশ্চয় স্থির ?"

গোরা কহিল, "না বিনয়, আমি যেতে পারব না।"

বিনয় চুপ করিয়া রহিল। গোরা হৃদয়ের বেদনা সম্পূর্ণ গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি নাইবা গেলুম, তাতে কী ? তোমারই তো জিত হয়েছে। তুমি তো মাকে টেনে নিয়ে গেছ। এত চেষ্টা করলুম, তাঁকে তো কিছুতে ধরে রাখতে পারলুম না। শেষে আমার মাকে নিয়েও তোমার কাছে আমার হার মানতে হল! বিনয়, একে একে 'সব লাল হো যায়গা' নাকি! আমার মানচিত্রটাতে কেবল আমিই একলা এসে ঠেকব!"

বিনয় কহিল, "ভাই, আমাকে দোষ দিয়ো না কিন্তু। আমি তাঁকে খুব জোর করেই বলেছিলুম— মা, আমার বিয়েতে তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না। মা বললেন, 'দেখ্ বিনু, তোর বিয়েতে যারা যাবে না তারা তোর নিমন্ত্রণ পেলেও যাবে না, আর যারা যাবে তাদের তুই মানা করলেও যাবে— সেইজন্যেই তোকে বলি, তুই কাউকে নিমন্ত্রণ করিস নে, মানাও করিস নে, চুপ করে থাক্।' গোরা, তুমি কি আমার কাছে হার মেনেছ ? তোমার মার কাছে তোমার হার, সহস্রবার হার। অমন মা কি আর আছে!"

গোরা যদিচ আনন্দময়ীকে বদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তিনি যে তাহার কোনো বাধা না মানিয়া, তাহার ক্রোধ ও কষ্টকে গণ্য না করিয়া, বিনয়ের বিবাহে চলিয়া গেলেন, ইহাতে গোরা তাহার অন্তরতর হৃদয়ের মধ্যে বেদনা বোধ করে নাই, বরঞ্চ একটা আনন্দ লাভ করিয়াছিল। বিনয় তাহার মাতার অপরিমেয় স্নেহের যে অংশ পাইয়াছিল,

গোরার সহিত বিনয়ের যত বড়ো বিচ্ছেদই হউক, সেই গভীর স্নেহসুধার অংশ হইতে তাহাকে কিছুতেই বঞ্চিত করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া গোরার মনের ভিতরে একটা যেন তৃপ্তি ও শান্তি জন্মিল। আর-সব দিকেই বিনয়ের কাছ হইতে সে বহু দূরে যাইতে পারে, কিন্তু এই অক্ষয় মাতৃস্নেহের এক বন্ধনে অতি নিগূঢ়রূপে এই দুই চিরবন্ধু চিরদিনই পরস্পরের নিকটতম হইয়া থাকিবে।

বিনয় কহিল, "ভাই, আমি তবে উঠি। নিতান্ত না যেতে পার যেয়ো না, কিন্তু মনের মধ্যে অপ্রসন্নতা রেখো না গোরা। এই মিলনে আমার জীবন যে কত বড়ো একটা সার্থকতা লাভ করেছে, তা যদি মনের মধ্যে অনুভব করতে পারো তা হলে কখনো তুমি আমাদের এই বিবাহকে তোমার সৌহৃত্য থেকে নির্বাসিত করতে পারবে না— সে আমি তোমাকে জোর করেই বলছি।"

এই বলিয়া বিনয় আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। গোরা কহিল, "বিনয়, বোসো। তোমাদের লগ্ন তো সেই রাত্রে, এখন থেকেই এত তাড়া কিসের!"

বিনয় গোরার এই অপ্রত্যাশিত সস্নেহ অনুরোধে বিগলিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল।

তার পর অনেক দিন পরে আজ এই ভোরবেলায় দুই জনে পূর্বকালের মতো বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইল। বিনয়ের হৃদয়বীণায় আজকাল যে তারটি পঞ্চম সুরে বাঁধা ছিল, গোরা সেই তারেই আঘাত করিল। বিনয়ের কথা আর ফুরাইতে চাহিল না। কত নিতান্ত ছোটো ছোটো ঘটনা, যাহাকে সাদা কথায় লিখিতে গেলে অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি হাস্যকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই ইতিহাস বিনয়ের মুখে যেন গানের তানের মতো বারম্বার নব নব মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বিনয়ের হৃদয়ক্ষেত্রে আজকাল যে-একটি আশ্চর্য লীলা চলিতেছে তাহারই সমস্ত অপরূপ রসবৈচিত্র্য বিনয় আপনার নিপুণ ভাষায় অতি সূক্ষ্ম অথচ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল। জীবনের এ কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা! বিনয় যে অনির্বচনীয়

পদার্থটিকে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে এ কি সকলে পায়! ইহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি কি সকলের আছে! সংসারে সাধারণত স্ত্রীপুরুষের যে মিলন দেখা যায়, বিনয় কহিল, তাহার মধ্যে এই উচ্চতম সুরটি তো বাজিতে শুনা যায় না। বিনয় গোরাকে বার বার করিয়া কহিল, অন্য-সকলের সঙ্গে সে যেন তাহাদের তুলনা না করে। বিনয়ের মনে হইতেছে, ঠিক এমনটি আর-কখনো ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। এমন যদি সচরাচর ঘটিতে পারিত তবে বসন্তের এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নব নব পুষ্পপল্লবে পুলকিত হইয়া উঠে, সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারি দিকে চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহা হইলে লোকে এমন করিয়া খাইয়া-দাইয়া, ঘুমাইয়া, দিব্য তৈলচিক্কণ হইয়া কাটাইতে পারিত না। তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য যত শক্তি আছে স্বভাবতই নানা বর্ণে নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত হইয়া উঠিত। এ যে সোনার কাঠি— ইহার স্পর্শকে উপেক্ষা করিয়া অসাড় হইয়া কে পড়িয়া থাকিতে পারে! ইহাতে সামান্য লোককেও যে অসামান্য করিয়া তোলে। সেই প্রবল অসামান্যতার স্বাদ মানুষ জীবনে যদি একবারও পায় তবে জীবনের সত্য পরিচয় সে লাভ করে!

বিনয় কহিল, 'গোরা, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম— যে কারণেই হউক আমাদের মধ্যে এই প্রেমের আবির্ভাব দুর্বল, সেইজন্যই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত, আমাদের কী আছে তাহা আমরা জানি না, যাহা গোপনে আছে তাহাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, যাহা সঞ্চিত আছে তাহাকে ব্যয় করা আমাদের অসাধ্য— সেইজন্যই চারি দিকে এমন নিরানন্দ, এমন নিরানন্দ। সেইজন্যই আমাদের নিজের মধ্যে যে কোনো মাহাত্ম্য আছে তাহা কেবল তোমাদের মতো দুই-এক জনেই বোঝে; সাধারণের চিত্তে তাহার কোনো চেতনা নাই।'

মহিম সশব্দে হাই তুলিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া যখন মুখ ধুইতে গেলেন

অপরূপ রসবৈচিত্র্য বিনয় আশ্চর্য নিপুণ ভাষায়
অতি সূক্ষ্ম অথচ গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল।
জীবনের এ কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা! বিনয় যে অনির্বচনীয় পদার্থটিকে
হৃদয় পূর্ণ করিয়া পাইয়াছে এ কি সকলে পায়! ইহাকে গ্রহণ করিবার
শক্তি কি সকলের আছে? সংসারে সাধারণত স্ত্রীপুরুষের
যে মিলন দেখা যায়, বিনয় কহিল, তাহার মধ্যে এই উচ্চতম সুরটি তো বাজিতে
শুনা যায় না। বিনয় গোরাকে বারবার করিয়া কহিল, অন্য
সকলের সঙ্গে সে যেন তাহাদের তুলনা না করে। বিনয়ের
মনে হইতেছে ঠিক এমনটি আর কখনো ঘটিয়াছে কি না
সন্দেহ। এমন যদি সবারই ঘটিতে পারিত, তবে বসন্তের
এক হাওয়াতেই যেমন সমস্ত বন নবনব পুষ্পপল্লবে পুল-
কিত হইয়া উঠে সমস্ত সমাজ তেমনি প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে
চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাহা হইলে লোকে এমন করিয়া খাইয়া
দাইয়া ঘুমাইয়া দিব্য তৈলচিক্কণ হইয়া কাটাইতে পারিত
না। তাহা হইলে যাহার মধ্যে যত সৌন্দর্য যত শক্তি আছে
স্বভাবতই নানা বর্ণে নানা আকারে দিকে দিকে উন্মীলিত
হইয়া উঠিত। এ যে সোনার কাঠি — ইহার স্পর্শকে উপেক্ষা
করিয়া অসাড় হইয়া কে পড়িয়া থাকিতে পারে! ইহাতে
সামান্য লোককেও যে অসামান্য করিয়া তোলে! সেই

তাঁহার পদশব্দে বিনয়ের উৎসাহপ্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল ; সে গোরার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

গোরা ছাতের উপর দাঁড়াইয়া পূর্বদিকের রক্তিম আকাশে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ছাতে বেড়াইল, আজ তাহার আর গ্রামে যাওয়া হইল না।

আজকাল গোরা নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে-একটি আকাঙ্ক্ষা, যে-একটি পূর্ণতার অভাব অনুভব করিতেছে, কোনোমতেই কোনো কাজ দিয়াই তাহা সে পূরণ করিতে পারিতেছে না। শুধু সে নিজে নহে, তাহার সমস্ত কাজও যেন উর্ধ্বের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেছে, 'একটা আলো চাই, উজ্জ্বল আলো, সুন্দর আলো!' যেন আর-সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত আছে, যেন হীরামানিক সোনারূপা দুর্মূল্য নয়, যেন লৌহ বজ্র বর্ম চর্ম দুর্লভ নয়, কেবল আশা ও সান্ত্বনায় উদ্‌ভাসিত স্নিগ্ধসুন্দর অরুণরাগমণ্ডিত আলো কোথায়! যাহা আছে তাহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার জন্য কোনো প্রয়াসের প্রয়োজন নাই— কিন্তু তাহাকে সমুজ্জ্বল করিয়া, লাবণ্যময় করিয়া, প্রকাশিত করিয়া তুলিবার যে অপেক্ষা আছে।

বিনয় যখন বলিল, কোনো কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একটি অনির্বচনীয় অসামান্যতা উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে, তখন গোরা পূর্বের ন্যায় সে কথাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না। গোরা মনে মনে স্বীকার করিল, তাহা সামান্য মিলন নহে, তাহা পরিপূর্ণতা, তাহার সংস্রবে সকল জিনিসেরই মূল্য বাড়িয়া যায় ; তাহা কল্পনাকে দেহ দান করে ও দেহকে প্রাণে পূর্ণ করিয়া তোলে ; তাহা প্রাণের মধ্যে প্রাণন ও মনের মধ্যে মননকে কেবল যে দ্বিগুণিত করে তাহা নহে, তাহাকে একটি নূতন রসে অভিষিক্ত করিয়া দেয়।

বিনয়ের সঙ্গে আজ সামাজিক বিচ্ছেদের দিনে বিনয়ের হৃদয় গোরার হৃদয়ের 'পরে একটি অখণ্ড একতান সংগীত বাজাইয়া দিয়া গেল। বিনয় চলিয়া গেল, বেলা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সে সংগীত কোনোমতেই থামিতে

চাহিল না। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয় তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল। গোরা যাহাকে কোনোপ্রকারে বাধা দিয়া, আড়াল দিয়া, ক্ষীণ করিয়া, নিজের অগোচরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল তাহাই আজ কূল ছাপাইয়া আপনাকে সুস্পষ্ট ও প্রবল মূর্তিতে ব্যক্ত করিয়া দিল। তাহাকে অবৈধ বলিয়া নিন্দা করিবে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে, এমন শক্তি আজ গোরার রহিল না।

সমস্ত দিন এমন করিয়া কাটিল ; অবশেষে অপরাহ্ণ যখন সায়াহ্নে বিলীন হইতে চলিয়াছে তখন গোরা একখানা চাদর পাড়িয়া লইয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। গোরা কহিল, 'যে আমারই তাহাকে আমি লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি অসম্পূর্ণ, আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব।'

সমস্ত পৃথিবীর মাঝখানে সুচরিতা তাহারই আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, ইহাতে গোরার মনে লেশমাত্র সংশয় রহিল না। আজই, এই সন্ধ্যাতেই এই অপেক্ষাকে সে পূর্ণ করিবে।

জনাকীর্ণ কলিকাতার রাস্তা দিয়া গোরা বেগে চলিয়া গেল ; কেহই যেন, কিছুতেই যেন তাহাকে স্পর্শ করিল না। তাহার মন তাহার শরীরকে অতিক্রম করিয়া একাগ্র হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সুচরিতার বাড়ির সম্মুখে আসিয়া গোরা যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া থামিয়া দাঁড়াইল। এতদিন আসিয়াছে কখনো দ্বার বন্ধ দেখে নাই, আজ দেখিল দরজা খোলা নহে। ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর হইতে বন্ধ। দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিল ; তাহার পরে দ্বারে আঘাত করিয়া দুই-চারিবার শব্দ করিল।

বেহারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে গোরাকে দেখিতেই কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই কহিল, দিদিঠাকরুন বাড়িতে নাই।

কোথায় ?

তিনি ললিতাদিদির বিবাহের আয়োজনে কয়দিন হইতে অন্যত্র ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

ক্ষণকালের জন্য গোরা মনে করিল, সে বিনয়ের বিবাহসভাতেই যাইবে। এমন সময় বাড়ির ভিতর হইতে একটি অপরিচিত বাবু বাহির হইয়া কহিল, "কী মহাশয়, কী চান ?"

গোরা তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "না, কিছু চাই নে।"

কৈলাস কহিল, "আসুন-না একটু বসবেন, একটু তামাক ইচ্ছা করুন।"

সঙ্গীর অভাবে কৈলাসের প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। যে হোক একজন কাহাকেও ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গল্প জমাইতে পারিলে সে বাঁচে। দিনের বেলায় হুঁকা হাতে গলির মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক-চলাচল দেখিয়া তাহার সময় এক-রকম কাটিয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। হরিমোহিনীর সঙ্গে তাহার যাহা-কিছু আলোচনা করিবার ছিল তাহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেছে— হরিমোহিনীর আলাপ করিবার শক্তিও অত্যন্ত সংকীর্ণ। এইজন্য কৈলাস নীচের তলায় বাহির-দরজার পাশে একটি ছোটো ঘরে তক্তপোশে হুঁকা লইয়া বসিয়া মাঝে মাঝে বেহারাটাকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিয়া সময় যাপন করিতেছে।

গোরা কহিল, "না, আমি এখন বসতে পারছি নে।"

কৈলাসের পুনশ্চ অনুরোধের সূত্রপাতেই, চোখের পলক না ফেলিতেই, সে একেবারে গলি পার হইয়া গেল।

গোরার একটি সংস্কার তাহার মনের মধ্যে দৃঢ় হইয়া ছিল যে, তাহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই আকস্মিক নহে, অথবা কেবলমাত্র তাহার নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয় না। সে তাহার স্বদেশবিধাতার একটি-কোনো অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এইজন্য গোরা নিজের জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনারও একটা বিশেষ অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিত। আজ যখন সে আপনার মনের এত বড়ো একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষাবেগের মুখে হঠাৎ আসিয়া সুচরিতার দরজা বন্ধ দেখিল এবং দরজা খুলিয়া যখন শুনিল সুচরিতা নাই, তখন সে ইহাকে একটি অভিপ্রায়-পূর্ণ ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ করিল। তাহাকে যিনি চালনা করিতেছেন তিনি গোরাকে আজ এমনি করিয়া নিষেধ জানাইলেন। এ জীবনে সুচরিতার দ্বার তাহার পক্ষে রুদ্ধ, সুচরিতা তাহার পক্ষে নাই। গোরার মতো মানুষকে নিজের ইচ্ছা লইয়া মুগ্ধ হইলে চলিবে না, তাহার নিজের সুখদুঃখ নাই। সে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, ভারতবর্ষের হইয়া দেবতার আরাধনা তাহাকে করিতে হইবে, ভারতবর্ষের হইয়া তপস্যা তাহারই কাজ। আসক্তি-অনুরক্তি তাহার নহে। গোরা মনে মনে কহিল, 'বিধাতা আসক্তির রূপটা আমার কাছে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিলেন; দেখাইলেন তাহা শুভ্র নহে, শান্ত নহে, তাহা মদের মতো রক্তবর্ণ ও মদের মতো তীব্র; তাহা বুদ্ধিকে স্থির থাকিতে দেয় না, তাহা একেকে আর করিয়া দেখায়— আমি সন্ন্যাসী, আমার সাধনার মধ্যে তাহার স্থান নাই।'

৭০

অনেক দিন পীড়নের পর এ কয়েক দিন আনন্দময়ীর কাছে সুচরিতা যেমন আরাম পাইল এমন সে কোনোদিন পায় নাই। আনন্দময়ী এমনি সহজে তাহাকে এত কাছে টানিয়া লইয়াছেন যে, কোনোদিন যে তিনি তাহার অপরিচিতা বা দূর ছিলেন তাহা সুচরিতা মনেও করিতে পারে না। তিনি কেমন এক রকম করিয়া সুচরিতার সমস্ত মনটা যেন বুঝিয়া লইয়াছেন, এবং কোনো কথা না কহিয়াও তিনি সুচরিতাকে যেন একটা গভীর সান্ত্বনা দান করিতেছেন। 'মা' শব্দটাকে সুচরিতা তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া এমন করিয়া আর কখনো উচ্চারণ করে নাই। কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও

সে আনন্দময়ীকে কেবলমাত্র 'মা' বলিয়া ডাকিয়া লইবার জন্য নানা উপলক্ষ সৃজন করিয়া তাঁহাকে ডাকিত। ললিতার বিবাহের সমস্ত কর্ম যখন সম্পন্ন হইয়া গেল তখন ক্লান্তদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া তাহার কেবল এই কথাই মনে আসিতে লাগিল, এইবার আনন্দময়ীকে ছাড়িয়া সে কেমন করিয়া চলিয়া যাইবে! সে আপনা-আপনি বলিতে লাগিল, 'মা, মা, মা!' বলিতে বলিতে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ দেখিল, আনন্দময়ী তাহার মশারি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমাকে ডাকছিলে কি?"

তখন সুচরিতার চেতনা হইল, সে 'মা মা' বলিতেছিল। সুচরিতা কোনো উত্তর করিতে পারিল না, আনন্দময়ীর কোলে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। আনন্দময়ী কোনো কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। সে রাত্রে তিনি তাহার কাছেই শয়ন করিলেন।

বিনয়ের বিবাহ হইয়া যাইতেই তখনই আনন্দময়ী বিদায় লইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, 'ইহারা দুই জনেই আনাড়ি— ইহাদের ঘরকন্না একটুখানি গুছাইয়া না দিয়া আমি যাই কেমন করিয়া।'

সুচরিতা কহিল, "মা, তবে এ ক'দিন আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।"

ললিতাও উৎসাহিত হইয়া কহিল, "হাঁ মা, সুচিদিদিও আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাক্।"

সতীশ এই পরামর্শ শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া সুচরিতার গলা ধরিয়া লাফাইতে লাফাইতে কহিল, "হাঁ দিদি, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব।"

সুচরিতা কহিল, "তোর যে পড়া আছে বক্তিয়ার।"

সতীশ কহিল, "বিনয়বাবু আমাকে পড়াবেন।"

সুচরিতা কহিল, "বিনয়বাবু এখন তোর মাস্টারি করতে পারবেন না।"

বিনয় পাশের ঘর হইতে বলিয়া উঠিল, "খুব পারব। এক দিনে এমনি কি অশক্ত হয়ে পড়েছি তা তো বুঝতে পারছি নে। অনেক রাত জেগে

লেখাপড়া যেটুকু শিখেছিলুম তাও যে এক রাত্রে সমস্ত ভুলে বসে আছি এমন তো বোধ হয় না।"

আনন্দময়ী সুচরিতাকে কহিলেন, "তোমার মাসি কি রাজি হবেন?"

সুচরিতা কহিল, "আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখছি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তুমি লিখো না। আমিই লিখব।"

আনন্দময়ী জানিতেন, সুচরিতা যদি থাকিতে ইচ্ছা করে তবে হরিমোহিনীর তাহাতে অভিমান হইবে। কিন্তু তিনি অনুরোধ জানাইলে রাগ যদি করেন তবে তাঁহার উপরেই করিবেন— তাহাতে ক্ষতি নাই।

আনন্দময়ী পত্রে জানাইলেন, ললিতার নূতন ঘরকন্না ঠিকঠাক করিয়া দিবার জন্য কিছুকাল তাঁহাকে বিনয়ের বাড়িতে থাকিতে হইবে। সুচরিতাও যদি এ-কয়দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি পায় তবে তাঁহার বিশেষ সহায়তা হয়।

আনন্দময়ীর পত্রে হরিমোহিনী কেবল যে ক্রুদ্ধ হইলেন তাহা নহে, তাঁহার মনে বিশেষ একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, ছেলেকে তিনি বাড়ি আসিতে বাধা দিয়াছেন, এবার সুচরিতাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য মা কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, ইহাতে মাতাপুত্রের পরামর্শ আছে। আনন্দময়ীর ভাবগতিক দেখিয়া গোড়াতেই যে তাঁহার ভালো লাগে নাই সে কথাও তিনি স্মরণ করিলেন।

আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব সুচরিতাকে একবার বিখ্যাত রায়গোষ্ঠীর অন্তর্গত করিয়া নিরাপদ করিয়া তুলিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। কৈলাসকেই বা এমন করিয়া কতদিন বসাইয়া রাখা যায়। সে বেচারা যে অহোরাত্র তামাক টানিয়া টানিয়া বাড়ির দেয়ালগুলা কালী করিবার জো করিল।

যেদিন চিঠি পাইলেন হরিমোহিনী তাহার পরদিন সকালেই পাল্‌কিতে করিয়া বেহারাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নীচের ঘরে সুচরিতা ললিতা ও আনন্দময়ী রান্নাবান্নার আয়োজনে

বসিয়া গেছেন। উপরের ঘরে বানান সমেত ইংরাজি শব্দ ও তাহার বাংলা প্রতিশব্দ মুখস্থ করার উপলক্ষে সতীশের কণ্ঠস্বরে সমস্ত পাড়া সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। বাড়িতে তাহার গলার এত জোর অনুভব করা যাইত না— কিন্তু এখানে সে যে তাহার পড়াশুনায় কিছুমাত্র অবহেলা করিতেছে না ইহাই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিবার জন্য তাহাকে অনেকটা উদ্যম তাহার কণ্ঠস্বরে অনাবশ্যক প্রয়োগ করিতে হইতেছে।

হরিমোহিনীকে আনন্দময়ী বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। সে-সমস্ত শিষ্টাচারের প্রতি মনোযোগ না করিয়া তিনি একেবারেই কহিলেন, "আমি রাধারানীকে নিতে এসেছি।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তা, বেশ তো, নিয়ে যাবে— একটু বোসো।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "না, আমার পূজা-আর্চা সমস্তই পড়ে রয়েছে, আমার আহ্নিক সারা হয় নি, আমি এখন এখানে বসতে পারব না।"

সুচরিতা কোনো কথা না কহিয়া অলাবুচ্ছেদনে নিযুক্ত ছিল। হরিমোহিনী তাহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শুনছ? বেলা হয়ে গেল।"

ললিতা এবং আনন্দময়ী নীরবে বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা তাহার কাজ রাখিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কহিল, "মাসি, এসো।"

হরিমোহিনী পাল্‌কির অভিমুখে যাইবার উপক্রম করিলে সুচরিতা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, "এসো, একবার এ ঘরে এসো।"

ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া সুচরিতা দৃঢ়স্বরে কহিল, "তুমি যখন আমাকে নিতে এসেছ তখন সকল লোকের সামনেই তোমাকে অমনি ফিরিয়ে দেব না; আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি, কিন্তু আজ দুপুরবেলাই আমি এখানে আবার ফিরে আসব।"

হরিমোহিনী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এ আবার কেমন কথা! তা হলে বলো-না কেন, এইখানেই চিরকাল থাকবে।"

সুচরিতা কহিল, "চিরকাল তো থাকতে পাব না। সেইজন্যই যতদিন ওঁর কাছে থাকতে পাই, আমি ওঁকে ছাড়ব না।"

এই কথায় হরিমোহিনীর গা জ্বলিয়া গেল, কিন্তু এখন কোনো কথা বলা তিনি সুযুক্তি বলিয়া বোধ করিলেন না।

সুচরিতা আনন্দময়ীর কাছে আসিয়া হাস্যমুখে কহিল, "মা, আমি তবে একবার বাড়ি হয়ে আসি।"

আনন্দময়ী কোনো প্রশ্ন না করিয়া কহিলেন, "তা, এসো মা।"

সুচরিতা ললিতার কানে কানে কহিল, "আজ আবার দুপুরবেলা আমি আসব।"

পাল্‌কির সামনে দাঁড়াইয়া সুচরিতা কহিল, "সতীশ?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "সতীশ থাক্-না।"

সতীশ বাড়ি গেলে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে, এই মনে করিয়া সতীশের দূরে অবস্থানই তিনি সুযোগ বলিয়া গণ্য করিলেন।

দুই জনে পাল্‌কিতে চড়িলে পর হরিমোহিনী ভূমিকা ফাঁদিবার চেষ্টা করিলেন। কহিলেন, "ললিতার তো বিয়ে হয়ে গেল। তা বেশ হল, একটি মেয়ের জন্যে তো পরেশবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।"

এই বলিয়া ঘরের মধ্যে অবিবাহিত মেয়ে যে কত বড়ো একটা দায়, অভিভাবকগণের পক্ষে যে কিরূপ দুঃসহ উৎকণ্ঠার কারণ তাহা প্রকাশ করিলেন।

"কী বলব তোমাকে, আমার আর অন্য ভাবনা নেই। ভগবানের নাম করতে করতে ওই চিন্তাই মনে এসে পড়ে। সত্য বলছি, ঠাকুর-সেবায় আমি আগেকার মতো তেমন মন দিতেই পারি নে। আমি বলি, গোপীবল্লভ, সব কেড়েকুড়ে নিয়ে এ আবার আমাকে কী নূতন ফাঁদে জড়ালে!"

হরিমোহিনীর এ যে কেবলমাত্র সাংসারিক উৎকণ্ঠা তাহা নহে, ইহাতে তাঁহার মুক্তিপথের বিঘ্ন হইতেছে। তবু এত বড়ো গুরুতর সংকটের কথা শুনিয়াও সুচরিতা চুপ করিয়া রহিল; তাহার ঠিক মনের ভাবটি কী হরিমোহিনী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মৌন সম্মতিলক্ষণ বলিয়া যে একটি বাঁধা কথা আছে সেইটেকেই তিনি নিজের অনুকূলে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার মনে হইল, সুচরিতার মন যেন একটু নরম হইয়াছে।

সুচরিতার মতো মেয়ের পক্ষে হিন্দুসমাজে প্রবেশের ন্যায় এত বড়ো দুরূহ ব্যাপারকে হরিমোহিনী নিতান্তই সহজ করিয়া আনিয়াছেন, এরূপ তিনি আভাস দিলেন। এমন একটি সুযোগ একেবারে আসন্ন হইয়াছে যে, বড়ো বড়ো কুলীনের ঘরে নিমন্ত্রণে এক পঙ্‌ক্তিতে আহারের উপলক্ষে কেহ তাহাকে টুঁ শব্দ করিতে সাহস করিবে না।

ভূমিকা এই পর্যন্ত অগ্রসর হইতেই পাল্‌কি বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল। উভয়ে দ্বারের কাছে নামিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়া উপরে যাইবার সময় সুচরিতা দেখিতে পাইল, দ্বারের পাশের ঘরে একটি অপরিচিত লোক বেহারাকে দিয়া প্রবল করতাড়ন-শব্দ-সহযোগে তৈল মর্দন করিতেছে। সে তাহাকে দেখিয়া কোনো সংকোচ মানিল না, বিশেষ কৌতূহলের সহিত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

উপরে গিয়া হরিমোহিনী তাঁহার দেবরের আগমন-সংবাদ সুচরিতাকে জানাইলেন। পূর্বের ভূমিকার সহিত মিলাইয়া লইয়া সুচরিতা এই ঘটনাটির অর্থ ঠিকমতই বুঝিল। হরিমোহিনী তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন— বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে, এমন অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া আজই মধ্যাহ্নে চলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে ভদ্রাচার হইবে না।

সুচরিতা খুব জোরের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না মাসি, আমাকে যেতেই হবে।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তা বেশ তো, আজকের দিনটা থেকে তুমি কাল যেয়ো।"

সুচরিতা কহিল, "আমি এখনই স্নান করেই বাবার ওখানে খেতে যাব, সেখান থেকে ললিতার বাড়ি যাব।"

তখন হরিমোহিনী স্পষ্ট করিয়াই কহিলেন, "তোমাকেই যে দেখতে এসেছে।"

সুচরিতা মুখ রক্তিম করিয়া কহিল, "আমাকে দেখে লাভ কী!"

হরিমোহিনী কহিলেন, "শোনো একবার! এখনকার দিনে না দেখে কি এ-সব কাজ হবার জো আছে! সে বরঞ্চ সেকালে চলত। তোমার মেসো শুভদৃষ্টির পূর্বে আমাকে দেখেন নি।"

এই বলিয়াই এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের উপরে তাড়াতাড়ি আরও কতকগুলা কথা চাপাইয়া দিলেন। বিবাহের পূর্বে কন্যা দেখিবার সময় তাঁহার পিতৃগৃহে সুবিখ্যাত রায়-পরিবার হইতে অনাথবন্ধু-নামধারী তাঁহাদের বংশের পুরাতন কর্মচারী ও ঠাকুরদাসী-নাম্নী প্রবীণা ঝি, দুই জন পাগড়ি-পরা দণ্ডধারী দারোয়ানকে লইয়া কিরূপে কন্যা দেখিতে আসিয়াছিল এবং সেদিন তাঁহার অভিভাবকদের মন কিরূপ উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল এবং রায়-বংশের এই-সকল অনুচরকে আহারে ও আদরে পরিতুষ্ট করিবার জন্য সেদিন তাঁহাদের বাড়িতে কিরূপ ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং কহিলেন, এখন দিনক্ষণ অন্যরকম পড়িয়াছে।

হরিমোহিনী কহিলেন, "বিশেষ কিছুই উৎপাত নেই, একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে দেখে যাবে।"

সুচরিতা কহিল, "না।"

সে 'না' এতই প্রবল এবং স্পষ্ট যে হরিমোহিনীকে একটু হটিতে হইল। তিনি কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, তা নাই হল। দেখার তো কোনো দরকার নেই, তবে কৈলাস আজকালকার ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে, তোমাদেরই মতো ও তো কিছুই মানে না, বলে 'পাত্রী নিজের চক্ষে দেখব'। তা, তোমরা সবার সামনেই বেরোও তাই বললুম, 'দেখবে সে আর বেশি কথা কী, একদিন দেখা করিয়ে দেব।' তা, তোমার লজ্জা হয় তো দেখা নাই হল।"

এই বলিয়া কৈলাস যে কিরূপ আশ্চর্য লেখাপড়া করিয়াছে, সে যে তাহার কলমের এক আঁচড় মাত্রে তাহার গ্রামের পোস্ট্‌মাস্টারকে কিরূপ বিপন্ন করিয়াছিল— নিকটবর্তী চারি দিকের গ্রামের যে-কাহারোই মামলা-মকদ্দমা করিতে হয়, দরখাস্ত লিখিতে হয়, কৈলাসের পরামর্শ ব্যতীত যে কাহারও এক পা চলিবার জো নাই, ইহা তিনি বিবৃত করিয়া বলিলেন।

আর উহার স্বভাবচরিত্রের কথা বেশি করিয়া বলাই বাহুল্য। ওর স্ত্রী মরার পর ও তো কিছুতেই বিবাহ করিতে চায় নাই; আত্মীয়স্বজন সকলে মিলিয়া অত্যন্ত বল প্রয়োগ করাতে ও কেবল গুরুজনের আদেশ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত করিতে হরিমোহিনীকেই কি কম কষ্ট পাইতে হইয়াছে। ও কি কর্ণপাত করিতে চায়। ওরা যে মস্ত বংশ। সমাজে ওদের যে ভারী মান।

সুচরিতা এই মান খর্ব করিতে কিছুতেই স্বীকার করিল না। কোনো-মতেই না। সে নিজের গৌরব ও স্বার্থের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। এমন-কি, হিন্দুসমাজে তাহার স্থান যদি নাও হয় তথাপি সে লেশমাত্র বিচলিত হইবে না, এইরূপ তাহার ভাব দেখা গেল। কৈলাসকে বহু চেষ্টায় বিবাহে রাজি করানোতে সুচরিতার পক্ষে অল্প সম্মানের কারণ হয় নাই, এ কথা সে মূঢ় কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না; উলটিয়া সে ইহাকে অপমানের কারণ বলিয়া গণ্য করিয়া বসিল। আধুনিক কালের এই-সমস্ত বিপরীত ব্যাপারে হরিমোহিনী সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তখন তিনি মনের আক্রোশে বার বার গোরার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া খোঁচা দিতে লাগিলেন। গোরা যতই নিজেকে হিন্দু বলিয়া বড়াই করুক-না কেন, সমাজের মধ্যে উহার স্থান কী। উহাকে কে মানে। ও যদি লোভে পড়িয়া ব্রাহ্মঘরের কোনো টাকাওয়ালা মেয়েকে বিবাহ করে, তবে সমাজের শাসন হইতে ও পরিত্রাণ লাভ করিবে কিসের জোরে। তখন দশের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য টাকা যে সমস্ত ফুঁকিয়া দিতে হইবে। ইত্যাদি।

সুচরিতা কহিল, "মাসি, এ-সব কথা তুমি কেন বলছ! তুমি জানো এ-সব কথার কোনো মূল নেই।"

হরিমোহিনী তখন বলিলেন, তাঁহার যে বয়স হইয়াছে সে বয়সে কথা দিয়া তাঁহাকে ভোলানো কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। তিনি চোখ-কান খুলিয়াই আছেন; দেখেন শোনেন বুঝেন সমস্তই, কেবল নিঃশব্দে অবাক হইয়া রহিয়াছেন। গোরা যে তাহার মাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সুচরিতাকে

বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে বিবাহের গূঢ় উদ্দেশ্যও যে মহৎ নহে, এবং রায়গোষ্ঠীর সহযোগে যদি তিনি সুচরিতাকে রক্ষা করিতে না পারেন তবে কালে যে তাহাই ঘটিবে, সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহার নিঃসংশয় বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন।

সহিষ্ণুস্বভাব সুচরিতার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল; সে কহিল, "তুমি যাঁদের কথা বলছ আমি তাঁদের ভক্তি করি। তাঁদের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সে যখন তুমি কোনোমতেই ঠিকভাবে বুঝবে না, তখন আমার আর-কোনো উপায় নেই— আমি এখনই এখান থেকে চললুম, যখন তুমি শান্ত হবে এবং বাড়িতে তোমার সঙ্গে একলা এসে বাস করতে পারব, তখন আমি ফিরে আসব।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "গৌরমোহনের প্রতিই যদি তোর মন নেই, যদি তার সঙ্গে তোর বিয়ে হবেই না এমন কথা থাকে, তবে এই পাত্রটি দোষ করেছে কী? তুমি তো আইবুড়ো থাকবে না।"

সুচরিতা কহিল, "কেন থাকব না? আমি বিবাহ করব না।"

হরিমোহিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "বুড়োবয়স পর্যন্ত এমনি—"

সুচরিতা কহিল, "হাঁ, মৃত্যু পর্যন্ত।"

৭১

এই আঘাতে গোরার মনে একটা পরিবর্তন আসিল। সুচরিতার দ্বারা গোরার মন যে আক্রান্ত হইয়াছে তাহার কারণ সে ভাবিয়া দেখিল— সে ইহাদের সঙ্গে মিশিয়াছে, কখন নিজের অগোচরে সে ইহাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। যেখানে নিষেধের সীমা টানা ছিল সেই সীমা গোরা দম্ভভরে লঙ্ঘন করিয়াছে। ইহা আমাদের দেশের পদ্ধতি নহে। প্রত্যেকে নিজের সীমা রক্ষা করিতে না পারিলে সে যে কেবল জানিয়া এবং না জানিয়া নিজেরই অনিষ্ট করিয়া ফেলে তাহা নহে, অন্যেরও হিত করিবার

বিশুদ্ধ শক্তি তাহার চলিয়া যায়। সংসর্গের দ্বারা নানাপ্রকার হৃদয়বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়া জ্ঞানকে নিষ্ঠাকে শক্তিকে আবিল করিয়া তুলিতে থাকে।

কেবল ব্রাহ্মঘরের মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে গিয়াই সে এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছে তাহা নহে। গোরা জনসাধারণের সঙ্গে যে মিলিতে গিয়াছিল সেখানেও একটা যেন আবর্তের মধ্যে পড়িয়া নিজেকে নিজে হারাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কেননা, তাহার পদে পদে দয়া জন্মিতেছিল, এই দয়ার বশে সে কেবলই ভাবিতেছিল— এটা মন্দ, এটা অন্যায়, এটাকে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এই দয়াবৃত্তিই কি ভালোমন্দ-সুবিচারের ক্ষমতাকে বিকৃত করিয়া দেয় না? দয়া করিবার ঝোঁকটা আমাদের যতই বাড়িয়া উঠে নির্বিকারভাবে সত্যকে দেখিবার শক্তি আমাদের ততই চলিয়া যায়— প্রধূমিত করুণার কালিমা মাখাইয়া যাহা নিতান্ত ফিকা তাহাকে অত্যন্ত গাঢ় করিয়া দেখি।

গোরা কহিল, এইজন্যই, যাহার প্রতি সমগ্রের হিতের ভার তাহার নির্লিপ্ত থাকিবার বিধি আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে। প্রজার সঙ্গে একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে তবেই যে প্রজাপালন করা রাজার পক্ষে সম্ভব হয়, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রজাদের সম্বন্ধে রাজার যেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন সংস্রবের দ্বারা তাহা কলুষিত হয়। এই কারণে, প্রজারা নিজেই ইচ্ছা করিয়া তাহাদের রাজাকে দূরত্বের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। রাজা তাহাদের সহচর হইলেই রাজার প্রয়োজন চলিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণও সেইরূপ সুদূরস্থ, সেইরূপ নির্লিপ্ত। ব্রাহ্মণকে অনেকের মঙ্গল করিতে হইবে, এইজন্যই অনেকের সংসর্গ হইতে ব্রাহ্মণ বঞ্চিত।

গোরা কহিল, 'আমি ভারতবর্ষের সেই ব্রাহ্মণ।' দশ জনের সঙ্গে জড়িত হইয়া, ব্যবসায়ের পঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া, অর্থের প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া যে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্বের ফাঁস গলায় বাঁধিয়া উদ্‌বন্ধনে মরিতেছে, গোরা তাহাদিগকে তাহার স্বদেশের সজীব পদার্থের মধ্যে গণ্য করিল না; তাহাদিগকে শূদ্রের অধম করিয়া দেখিল, কারণ শূদ্র আপন শূদ্রত্বের দ্বারাই বাঁচিয়া আছে, কিন্তু

ইহারা ব্রাহ্মণত্বের অভাবে মৃত, সুতরাং ইহারা অপবিত্র। ভারতবর্ষ ইহাদের জন্য আজ এমন দীনভাবে অশৌচ-যাপন করিতেছে।

গোরা নিজের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের সঞ্জীবন-মন্ত্র সাধনা করিবে বলিয়া মনকে আজ প্রস্তুত করিল। কহিল, 'আমাকে নিরতিশয় শুচি হইতে হইবে। আমি সকলের সঙ্গে সমান ভূমিতে দাঁড়াইয়া নাই। বন্ধুত্ব আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নহে ; নারীর সঙ্গ যাহাদের পক্ষে একান্ত উপাদেয় আমি সেই সামান্য শ্রেণীর মানুষ নই ; এবং দেশের ইতর সাধারণের ঘনিষ্ঠ সহবাস আমার পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জনীয়। পৃথিবী সুদূর আকাশের দিকে বৃষ্টির জন্য যেমন তাকাইয়া আছে, ব্রাহ্মণের দিকে ইহারা তেমনি করিয়া তাকাইয়া আছে— আমি কাছে আসিয়া পড়িলে ইহাদিগকে বাঁচাইবে কে?'

ইতিপূর্বে দেবপূজায় গোরা কোনোদিন মন দেয় নাই। যখন হইতে তাহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, কিছুতেই সে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, কাজ তাহার কাছে শূন্য বোধ হইতেছে, এবং জীবনটা যেন আধখানা হইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে, তখন হইতে গোরা পূজায় মন দিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রতিমার সম্মুখে স্থির হইয়া বসিয়া সেই মূর্তির মধ্যে গোরা নিজের মনকে একেবারে নিবিষ্ট করিয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো উপায়েই সে আপনার ভক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে না। দেবতাকে সে বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করে, তাহাকে রূপক করিয়া না তুলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু রূপককে হৃদয়ের ভক্তি দেওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে পূজা করা যায় না। বরঞ্চ মন্দিরে বসিয়া পূজার চেষ্টা না করিয়া ঘরে বসিয়া নিজের মনে অথবা কাহারও সঙ্গে তর্কোপলক্ষে যখন ভাবের স্রোতে মনকে ও বাক্যকে ভাসাইয়া দিত, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দ ও ভক্তিরসের সঞ্চার হইত। তবু গোরা ছাড়িল না ; সে যথানিয়মে প্রতিদিন পূজায় বসিতে লাগিল, ইহাকে সে নিয়মস্বরূপেই গ্রহণ করিল। মনকে এই বলিয়া বুঝাইল, যেখানে ভাবের সূত্রে সকলের সঙ্গে মিলিবার শক্তি না থাকে, সেখানে নিয়ম-

সূত্রেই সর্বত্র মিলন রক্ষা করে। গোরা যখনই গ্রামে গেছে সেখানকার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মনে মনে গভীরভাবে ধ্যান করিয়া বলিয়াছে, 'এইখানেই আমার বিশেষ স্থান; এক দিকে দেবতা ও এক দিকে ভক্ত, তাহারই মাঝখানে ব্রাহ্মণ সেতুস্বরূপ উভয়ের যোগ রক্ষা করিয়া আছে।' ক্রমে গোরার মনে হইল, ব্রাহ্মণের পক্ষে ভক্তির প্রয়োজন নাই। ভক্তি জনসাধারণেরই বিশেষ সামগ্রী। এই ভক্ত ও ভক্তির বিষয়ের মাঝখানে যে সেতু তাহা জ্ঞানেরই সেতু। এই সেতু যেমন উভয়ের যোগ রক্ষা করে তেমনি উভয়ের সীমাও রক্ষা করে। ভক্ত এবং দেবতার মাঝখানে যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যবধানের মতো না থাকে তবে সমস্তই বিকৃত হইয়া যায়। এইজন্য ভক্তিবিহ্বলতা ব্রাহ্মণের সম্ভোগের সামগ্রী নহে, ব্রাহ্মণ জ্ঞানের চূড়ায় বসিয়া এই ভক্তির রসকে সর্বসাধারণের ভোগার্থে বিশুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তপস্যারত। সংসারে যেমন ব্রাহ্মণের জন্য আরামের ভোগ নাই, দেবার্চনাতেও তেমনি ব্রাহ্মণের জন্য ভক্তির ভোগ নাই। ইহাই ব্রাহ্মণের গৌরব। সংসারে ব্রাহ্মণের জন্য নিয়মসংযম, এবং ধর্মসাধনায় ব্রাহ্মণের জন্য জ্ঞান।

হৃদয় গোরাকে হার মানাইয়াছিল, হৃদয়ের প্রতি সেই অপরাধে গোরা নির্বাসনদণ্ড বিধান করিল। কিন্তু নির্বাসনে তাহাকে লইয়া যাইবে কে! সে সৈন্য আছে কোথায়!

৭২

গঙ্গার ধারের বাগানে প্রায়শ্চিত্তসভার আয়োজন হইতে লাগিল।

অবিনাশের মনে একটা আক্ষেপ বোধ হইতেছিল যে, কলিকাতার বাইরে অনুষ্ঠানটা ঘটিতেছে, ইহাতে লোকের চক্ষু তেমন করিয়া আকৃষ্ট হইবে না। অবিনাশ জানিত, গোরার নিজের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন দেশের লোকের জন্য। মরাল এফেক্ট্। এইজন্য ভিড়ের মধ্যেই

এ কাজ দরকার।

কিন্তু গোরা রাজি হইল না। সে যেরূপ বৃহৎ হোম করিয়া বেদমন্ত্র পড়িয়া এ কাজ করিতে চায়, কলিকাতা শহরের মধ্যে তেমনটা মানায় না। ইহার জন্য তপোবনের প্রয়োজন। স্বাধ্যায়মুখরিত হোমাগ্নিদীপ্ত নিভৃত গঙ্গাতীরে, যে প্রাচীন ভারতবর্ষ জগতের গুরু তাঁহাকেই গোরা আবাহন করিবে, এবং স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সে নবজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করিবে। গোরা মরাল এফেক্টের জন্য ব্যস্ত নহে।

অবিনাশ তখন অনন্যগতি হইয়া খবরের কাগজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে গোরাকে না জানাইয়াই এই প্রায়শ্চিত্তের সংবাদ সমস্ত খবরের কাগজে রটনা করিয়া দিল। শুধু তাই নহে— সম্পাদকীয় কোঠায় সে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখিয়া দিল। তাহাতে সে এই কথাই বিশেষ করিয়া জানাইল যে, গোরার মতো তেজস্বী পবিত্র ব্রাহ্মণকে কোনো দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, তথাপি গোরা বর্তমান পতিত ভারতবর্ষের সমস্ত পাতক নিজের স্কন্ধে লইয়া সমস্ত দেশের হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। সে লিখিল, 'আমাদের দেশ যেমন নিজের দুষ্কৃতির ফলে বিদেশীর বন্দীশালায় আজ দুঃখ পাইতেছে, গোরাও তেমনি নিজের জীবনে সেই বন্দীশালায় বাসদুঃখ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এইরূপে দেশের দুঃখ সে যেমন নিজে বহন করিয়াছে, এমনি করিয়া দেশের অনাচারের প্রায়শ্চিত্তও সে নিজে অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব ভাই বাঙালি, ভাই ভারতের পঞ্চবিংশতিকোটি দুঃখী সন্তান, তোমরা'— ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোরা এই-সমস্ত লেখা পড়িয়া বিরক্তিতে অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু অবিনাশকে পারিবার জো নাই। গোরা তাহাকে গালি দিলেও সে গায়ে লয় না, বরঞ্চ খুশি হয়। 'আমার গুরু অত্যুচ্চ ভাবলোকেই বিহার করেন, এ-সমস্ত পৃথিবীর কথা কিছুই বোঝেন না। তিনি বৈকুণ্ঠবাসী নারদের মতো বীণা বাজাইয়া বিষ্ণুকে বিগলিত করিয়া গঙ্গার সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু সেই গঙ্গাকে মর্তে প্রবাহিত করিয়া সগরসন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত করিবার

কাজ পৃথিবীর ভগীরথের— সে স্বর্গের লোকের কর্ম নয়। এই দুই কাজ একেবারে স্বতন্ত্র।' অতএব অবিনাশের উৎপাতে গোরা যখন আগুন হইয়া উঠে তখন অবিনাশ মনে মনে হাসে, গোরার প্রতি তাহার ভক্তি বাড়িয়া উঠে। সে মনে মনে বলে, 'আমাদের গুরুর চেহারাও যেমন শিবের মতো তেমনি ভাবেও তিনি ঠিক ভোলানাথ। কিছুই বোঝেন না, কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই, কথায় কথায় রাগিয়া আগুন হন. আবার রাগ জুড়াইতেও বেশিক্ষণ লাগে না।'

অবিনাশের চেষ্টায় গোরার প্রায়শ্চিত্তের কথাটা লইয়া চারি দিকে ভারী একটা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। গোরাকে তাহার বাড়িতে আসিয়া দেখিবার জন্য, তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য লোকের জনতা আরও বাড়িয়া উঠিল। প্রত্যহ চারি দিক হইতে তাহার এত চিঠি আসিতে লাগিল যে চিঠি পড়া সে বন্ধ করিয়াই দিল। গোরার মনে হইতে লাগিল, এই দেশব্যাপ্ত আলোচনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্তের সাত্ত্বিকতা যেন ক্ষয় হইয়া গেল, ইহা একটা রাজসিক ব্যাপার হইয়া উঠিল। ইহা কালেরই দোষ।

কৃষ্ণদয়াল আজকাল খবরের কাগজ স্পর্শও করেন না, কিন্তু জনশ্রুতি তাঁহার সাধনাশ্রমের মধ্যেও গিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র গোরা মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছে, এবং সে যে তাহার পিতারই পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এক কালে তাঁহার মতোই সিদ্ধপুরুষ হইয়া দাঁড়াইবে, এই সংবাদ ও এই আশা কৃষ্ণদয়ালের প্রসাদজীবীরা তাঁহার কাছে বিশেষ গৌরবের সহিত ব্যক্ত করিল।

গোরার ঘরে কৃষ্ণদয়াল কতদিন যে পদার্পণ করেন নাই তাহার ঠিক নাই। তাঁহার পট্টবস্ত্র ছাড়িয়া, সুতার কাপড় পরিয়া, আজ একেবারে তাহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে গোরাকে দেখিতে পাইলেন না।

চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। চাকর জানাইল, গোরা ঠাকুরঘরে আছে।

অ্যাঁ! ঠাকুরঘরে তাহার কী প্রয়োজন!

তিনি পূজা করেন।

কৃষ্ণদয়াল শশব্যস্ত হইয়া ঠাকুরঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যই গোরা পূজায় বসিয়া গেছে।

কৃষ্ণদয়াল বাহির হইতে ডাকিলেন, "গোরা!"

গোরা তাহার পিতার আগমনে আশ্চর্য হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণদয়াল তাঁহার সাধনাশ্রমে বিশেষভাবে নিজের ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহাদের পরিবার বৈষ্ণব, কিন্তু তিনি শক্তিমন্ত্র লইয়াছেন, গৃহদেবতার সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগ অনেক দিন হইতেই নাই।

তিনি গোরাকে কহিলেন, "এসো এসো, বাইরে এসো।"

গোরা বাহির হইয়া আসিল। কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "এ কী কাণ্ড! এখানে তোমার কী কাজ!"

গোরা কোনো উত্তর করিল না। কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "পূজারি ব্রাহ্মণ আছে, সে তো প্রত্যহ পূজা করে, তাতেই বাড়ির সকলেরই পূজা হচ্ছে—তুমি কেন এর মধ্যে এসেছ!"

গোরা কহিল, "তাতে কোনো দোষ নেই।"

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "দোষ নেই! বল কী! বিলক্ষণ দোষ আছে। যার যাতে অধিকার নেই তার সে কাজে যাবার দরকার কী। ওতে যে অপরাধ হচ্ছে। শুধু তোমার নয়, বাড়িসুদ্ধ আমাদের সকলের।"

গোরা কহিল, "যদি অন্তরের ভক্তির দিক দিয়ে দেখেন তা হলে দেবতার সামনে বসবার অধিকার অতি অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু আপনি কি বলেন, আমাদের ওই রামহরি ঠাকুরের এখানে পূজা করবার যে অধিকার আছে আমার সে অধিকারও নেই?"

কৃষ্ণদয়াল গোরাকে কী জবাব দিবেন, হঠাৎ ভাবিয়া পাইলেন না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "দেখো, পূজা করাই রামহরির জাত-ব্যাবসা। ব্যাবসাতে যে অপরাধ হয় দেবতা সেটা নেন না। ও জায়গায় ত্রুটি ধরতে গেলে ব্যাবসা বন্ধই করতে হয়, তা হলে সমাজের কাজ চলে না। কিন্তু তোমার তো সে ওজর নেই। তোমার এ ঘরে ঢোকবার

দরকার কী ?”

গোরার মতো আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলে অপরাধ হয়, এ কথা কৃষ্ণদয়ালের মতো লোকের মুখে নিতান্ত অসংগত শুনাইল না। সুতরাং গোরা ইহা সহ্য করিয়া গেল, কিছুই বলিল না।

তখন কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, “আর-একটা কথা শুনছি গোরা। তুমি নাকি প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে সব পণ্ডিতদের ডেকেছ ?”

গোরা কহিল, “হাঁ।”

কৃষ্ণদয়াল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “আমি বেঁচে থাকতে এ কোনোমতেই হতে দেব না।”

গোরার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল ; সে কহিল, “কেন ?”

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, “কেন কী ! আমি তোমাকে আর-একদিন বলেছি, প্রায়শ্চিত্ত হতে পারবে না।”

গোরা কহিল, “বলে তো ছিলেন, কিন্তু কারণ তো কিছু দেখান নি।”

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, “কারণ দেখাবার আমি কোনো দরকার দেখি নে। আমরা তো তোমার গুরুজন, মান্যব্যক্তি ; এ-সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম আমাদের অনুমতি ব্যতীত করবার বিধিই নেই। ওতে যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে হয়, তা জানো ?”

গোরা বিস্মিত হইয়া কহিল, “তাতে বাধা কী ?”

কৃষ্ণদয়াল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “সম্পূর্ণ বাধা আছে। সে আমি হতে দিতে পারব না।”

গোরা হৃদয়ে আঘাত পাইয়া কহিল, “দেখুন, এ আমার নিজের কাজ। আমি নিজের শুচিতার জন্যই এই আয়োজন করছি— এ নিয়ে বৃথা আলোচনা করে আপনি কেন কষ্ট পাচ্ছেন !”

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, “দেখো গোরা, তুমি সকল কথায় কেবল তর্ক করতে যেয়ো না। এ-সমস্ত তর্কের বিষয়ই নয়। এমন ঢের জিনিস আছে যা এখনো তোমার বোঝবার সাধ্য নেই। আমি তোমাকে ফের বলে যাচ্ছি—

হিন্দুধর্মে তুমি প্রবেশ করতে পেরেছ এইটে তুমি মনে করছ, কিন্তু সে তোমার সম্পূর্ণই ভুল। সে তোমার সাধ্যই নেই। তোমার প্রত্যেক রক্তের কণা, তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার প্রতিকূল। হিন্দু হঠাৎ হবার জো নেই, ইচ্ছা করলেও জো নেই। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি চাই।"

গোরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কহিল, "জন্মান্তরের কথা জানি নে, কিন্তু আপনাদের বংশের রক্তধারায় যে অধিকার প্রবাহিত হয়ে আসছে আমি কি তারও দাবি করতে পারব না?"

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "আবার তর্ক! আমার মুখের উপর প্রতিবাদ করতে তোমার সংকোচ হয় না! এ দিকে বল হিন্দু! বিলাতি ঝাঁজ যাবে কোথায়! আমি যা বলি তাই শোনো। ও-সমস্ত বন্ধ করে দাও।"

গোরা নতশিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে কহিল, "যদি প্রায়শ্চিত্ত না করি তা হলে কিন্তু শশিমুখীর বিবাহে আমি সকলের সঙ্গে বসে খেতে পারব না।"

কৃষ্ণদয়াল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেশ তো। তাতেই বা দোষ কী? তোমার জন্যে নাহয় আলাদা আসন করে দেবে।"

গোরা কহিল, "সমাজে তা হলে আমাকে স্বতন্ত্র হয়েই থাকতে হবে।"

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "সে তো ভালোই।"

তাঁহার এই উৎসাহে গোরাকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া কহিলেন, "এই দেখো-না, আমি কারও সঙ্গে খাই নে, নিমন্ত্রণ হলেও না। সমাজের সঙ্গে আমার যোগ কী বা আছে? তুমি যে-রকম সাত্ত্বিকভাবে জীবন কাটাতে চাও তোমারও তো এইরকম পন্থাই অবলম্বন করা শ্রেয়। আমি তো দেখছি, এতেই তোমার মঙ্গল।"

মধ্যাহ্নে অবিনাশকে ডাকাইয়া কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "তোমরাই বুঝি সকলে মিলে গোরাকে নাচিয়ে তুলেছ?"

অবিনাশ কহিলেন, "বলেন কী! আপনার গোরাই তো আমাদের সকলকে নাচায়। বরঞ্চ সে নিজেই নাচে কম।"

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "কিন্তু বাবা, আমি বলছি, তোমাদের ও-সব প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত হবে না। আমার ওতে একেবারেই মত নেই। এখনই সব বন্ধ করে দাও।"

অবিনাশ ভাবিল, বুড়ার এ কী রকম জেদ। ইতিহাসে বড়ো বড়ো লোকের বাপরা নিজের ছেলের মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে, কৃষ্ণদয়ালও সেই জাতেরই বাপ। কতকগুলা বাজে সন্ন্যাসীর কাছে দিনরাত না থাকিয়া কৃষ্ণদয়াল যদি তাঁহার ছেলের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঢের উপকার হইত।

অবিনাশ কৌশলী লোক; যেখানে বাদপ্রতিবাদ করিয়া ফল নাই, এমন-কি মরাল এফেক্টেরও সম্ভাবনা অল্প, সেখানে সে বৃথা বাক্যব্যয় করিবার লোক নয়। সে কহিল, "বেশ তো মশায়, আপনার যদি মত না থাকে তো হবে না। তবে কিনা, উদ্‌যোগ-আয়োজন সমস্ত হয়েছে, নিমন্ত্রণপত্রও বেরিয়ে গেছে, এ দিকে আর বিলম্বও নেই, তা নয় এক কাজ করা যাবে— গোরা থাকুন, সেদিন আমরাই প্রায়শ্চিত্ত করব— দেশের লোকের পাপের তো অভাব নেই।"

অবিনাশের এই আশ্বাসবাক্যে কৃষ্ণদয়াল নিশ্চিন্ত হইলেন।

কৃষ্ণদয়ালের কোনো কথায় কোনোদিন গোরার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। আজও সে তাঁহার আদেশ পালন করিবে বলিয়া মনের মধ্যে স্বীকার করিল না। সাংসারিক জীবনের চেয়ে বড়ো যে জীবন সেখানে গোরা পিতামাতার নিষেধকে মান্য করিতে নিজেকে বাধ্য মনে করে না। কিন্তু তবু আজ সমস্ত দিন তাহার মনের মধ্যে ভারী একটা কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণদয়ালের সমস্ত কথার মধ্যে যেন কী-একটা সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার মনের ভিতরে এই রকমের একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিতেছিল। একটা যেন আকারহীন দুঃস্বপ্ন তাহাকে পীড়ন করিতেছিল, তাহাকে কোনোমতেই তাড়াইতে পারিতেছিল না। তাহার কেমন এক-রকম মনে হইল, কে যেন সকল দিক

হইতেই তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। নিজের একাকিত্ব তাহাকে আজ অত্যন্ত একটা বৃহৎ কলেবর ধরিয়া দেখা দিল। তাহার সম্মুখে কর্মক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ, কাজও অতি প্রকাণ্ড, কিন্তু তাহার পাশে কেহই দাঁড়াইয়া নাই।

৭৩

কাল প্রায়শ্চিত্তসভা বসিবে, আজ রাত্রি হইতেই গোরা বাগানে গিয়া বাস করিবে এইরূপ স্থির আছে। যখন সে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় হরিমোহিনী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া গোরা প্রসন্নতা অনুভব করিল না। গোরা কহিল, "আপনি এসেছেন— আমাকে যে এখনই বেরতে হবে— মাও তো কয়েক দিন বাড়িতে নেই। যদি তাঁর সঙ্গে প্রয়োজন থাকে তা হলে—"

হরিমোহিনী কহিলেন, "না বাবা, আমি তোমার কাছেই এসেছি। একটু তোমাকে বসতেই হবে, বেশিক্ষণ না।"

গোরা বসিল। হরিমোহিনী সুচরিতার কথা পাড়িলেন। কহিলেন, গোরার শিক্ষাগুণে তাহার বিস্তর উপকার হইয়াছে। এমন-কি সে আজকাল যার-তার হাতের ছোঁওয়া জল খায় না, এবং সকল দিকেই তাহার সুমতি জন্মিয়াছে।— "বাবা, ওর জন্যে কি আমার কম ভাবনা ছিল। ওকে তুমি পথে এনে আমার কী উপকার করেছ সে আমি তোমাকে এক মুখে বলতে পারি নে। ভগবান তোমাকে রাজরাজেশ্বর করুন। তোমার কুলমানের যোগ্য একটি লক্ষ্মী মেয়ে ভালো ঘর থেকে বিয়ে করে আনো, তোমার ঘর উজ্জ্বল হোক, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।"

তাহার পরে কথা পাড়িলেন, সুচরিতার বয়স হইয়াছে, বিবাহ করিতে তাহার এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত নয়, হিন্দুঘরে থাকিলে এতদিনে সন্তানের দ্বারা তাহার কোল ভরিয়া উঠিত। বিবাহে বিলম্ব করায় যে কতবড়ো অবৈধ

কাজ হইয়াছে সে সম্বন্ধে গোরা নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে একমত হইবেন। হরিমোহিনী দীর্ঘকাল ধরিয়া সুচরিতার বিবাহসমস্যা সম্বন্ধে অসহ্য উদ্‌বেগ ভোগ করিয়া অবশেষে বহু সাধ্যসাধনা-অনুনয়বিনয়ে তাঁহার দেবর কৈলাসকে রাজি করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন। যে-সমস্ত গুরুতর বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছায় কাটিয়া গিয়াছে। সমস্তই স্থির, বর-পক্ষে এক পয়সা পণ পর্যন্ত লইবে না এবং সুচরিতার পূর্ব-ইতিহাস লইয়াও কোনো আপত্তি প্রকাশ করিবে না—হরিমোহিনী বিশেষ কৌশলে এই-সমস্ত সমাধান করিয়া দিয়াছেন— এমন সময়, শুনিলে লোকে আশ্চর্য হইবে, সুচরিতা একেবারে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। কী তাহার মনের ভাব তিনি জানেন না; কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইয়াছেন কি না, আর-কারও দিকে তাহার মন পড়িয়াছে কি না, তাহা ভগবান জানেন।—

"কিন্তু বাপু, তোমাকে আমি খুলেই বলি, ও মেয়ে তোমার যোগ্য নয়। পাড়াগাঁয়ে ওর বিয়ে হলে ওর কথা কেউ জানতেই পারবে না, সে এক-রকম করে চলে যাবে। কিন্তু তোমরা শহরে থাক, ওকে যদি বিয়ে কর তা হলে শহরের লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।"

গোরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া কহিল, "আপনি এ-সব কথা কী বলছেন! কে আপনাকে বলেছে যে, আমি তাঁকে বিবাহ করবার জন্যে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেছি!"

হরিমোহিনী কহিলেন, "আমি কী করে জানব বাবা! কাগজে বেরিয়ে গেছে, সেই শুনেই তো লজ্জায় মরছি।"

গোরা বুঝিল, হারানবাবু অথবা তাঁহার দলের কেহ এই কথা লইয়া কাগজে আলোচনা করিয়াছে। গোরা মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল, "মিথ্যা কথা!"

হরিমোহিনী তাহার গর্জন-শব্দে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমিও তো তাই জানি। এখন আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। একবার তুমি রাধারানীর কাছে চলো।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "তুমি তাকে একবার বুঝিয়ে বলবে।"

গোরার মন এই উপলক্ষটি অবলম্বন করিয়া তখনই সুচরিতার কাছে যাইবার জন্য উদ্যত হইল। তাহার হৃদয় বলিল, 'আজ একবার শেষ দেখা দেখিয়া আসিবে চলো। কাল তোমার প্রায়শ্চিত্ত— তাহার পর হইতে তুমি তপস্বী। আজ কেবল এই রাত্রিটুকুমাত্র সময় আছে— ইহারই মধ্যে কেবল অতি অল্পক্ষণের জন্য। তাহাতে কোনো অপরাধ হইবে না। যদি হয় তো কাল সমস্ত ভস্ম হইয়া যাইবে।'

গোরা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁকে কী বোঝাতে হবে বলুন।"

আর-কিছু নয়— হিন্দু আদর্শ-অনুসারে সুচরিতার মতো বয়স্থা কন্যার অবিলম্বে বিবাহ করা কর্তব্য এবং হিন্দুসমাজে কৈলাসের মতো সৎপাত্রলাভ সুচরিতার অবস্থার মেয়ের পক্ষে অভাবনীয় সৌভাগ্য।

গোরার বুকের মধ্যে শেলের মতো বিঁধিতে লাগিল। যে লোকটিকে গোরা সুচরিতার বাড়ির দ্বারের কাছে দেখিয়াছিল তাহাকে স্মরণ করিয়া গোরা বৃশ্চিকদংশনে পীড়িত হইল। সুচরিতাকে সে লাভ করিবে, এমন কথা কল্পনা করাও গোরার পক্ষে অসহ্য। তাহার মন বজ্রনাদে বলিয়া উঠিল, না, এ কখনোই হইতে পারে না।

আর-কাহারও সঙ্গে সুচরিতার মিলন হওয়া অসম্ভব; বুদ্ধি ও ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ সুচরিতার নিস্তব্ধ গভীর হৃদয়টি পৃথিবীতে গোরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষের সামনে এমন করিয়া প্রকাশিত হয় নাই এবং আর-কাহারও কাছে কোনোদিনই এমন করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। সে কী আশ্চর্য! সে কী অপরূপ! রহস্যনিকেতনের অন্তরতম কক্ষে সে কোন্ অনির্বচনীর সত্তাকে দেখা গেছে! মানুষকে এমন করিয়া কয়বার দেখা যায় এবং কয়জনকে দেখা যায়! দৈবের যোগেই সুচরিতাকে যে ব্যক্তি এমন প্রগাঢ় সত্যরূপে দেখিয়াছে, নিজের সমস্ত প্রকৃতি দিয়া তাহাকে অনুভব করিয়াছে, সে তো সুচরিতাকে পাইয়াছে। আর-কেহ আর-কখনো তাহাকে

পাইবে কেমন করিয়া!

হরিমোহিনী কহিলেন, "রাধারানী কি চিরদিন এমনি আইবুড়ো থেকেই যাবে! এও কি কখনো হয়!"

সেও তো বটে। কাল যে গোরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছে। তাহার পরে সে যে সম্পূর্ণ শুচি হইয়া ব্রাহ্মণ হইবে। তবে সুচরিতা কি চিরদিন অবিবাহিতই থাকিবে! তাহার উপরে চিরজীবনব্যাপী এই ভার চাপাইবার অধিকার কাহার আছে! স্ত্রীলোকের পক্ষে এতবড়ো ভার আর কী হইতে পারে!

হরিমোহিনী কত কী বকিয়া যাইতে লাগিলেন। গোরার কানে তাহা পৌঁছিল না। গোরা ভাবিতে লাগিল, 'বাবা যে এত করিয়া আমাকে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন, তাঁহার সে নিষেধের কি কোনো মূল্য নাই? আমি আমার যে জীবন কল্পনা করিতেছি সে হয়তো আমার কল্পনামাত্র, সে আমার স্বাভাবিক নয়। সেই কৃত্রিম বোঝা বহন করিতে গিয়া আমি পঙ্গু হইয়া যাইব। সেই বোঝার নিরন্তর ভারে আমি জীবনের কোনো কাজ সহজে সম্পন্ন করিতে পারিব না। এই-যে দেখিতেছি, আকাঙ্ক্ষা হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে। এ পাথর নড়াইয়া রাখিব কোন্‌খানে! বাবা কেমন করিয়া জানিয়াছেন, অন্তরের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি তপস্বী নই, সেইজন্যই তিনি এমন জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।'

গোরা মনে করিল, 'যাই তাঁর কাছে। আজ এখনই এই সন্ধ্যাবেলাতেই আমি তাঁহাকে জোর করিয়া জিজ্ঞাসা করিব তিনি আমার মধ্যে কী দেখিতে পাইয়াছেন। প্রায়শ্চিত্তের পথও আমার কাছে রুদ্ধ, এমন কথা তিনি কেন বলিলেন। যদি আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন তবে সে দিক হইতে ছুটি পাইব। ছুটি!'

হরিমোহিনীকে গোরা কহিল, "আপনি একটুখানি অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি।"

তাড়াতাড়ি গোরা তাহার পিতার মহলের দিকে গেল। তাহার মনে

হইল, কৃষ্ণদয়াল এখনই তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন এমন একটা কথা তাঁহার জানা আছে।

সাধনাশ্রমের দ্বার বন্ধ। দুই-একবার ধাক্কা দিল ; খুলিল না, কেহ সাড়াও দিল না। ভিতর হইতে ধূপধুনার গন্ধ আসিতেছে। কৃষ্ণদয়াল আজ সন্ন্যাসীকে লইয়া অত্যন্ত গূঢ় এবং অত্যন্ত দুরূহ একটি যোগের প্রণালী সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া অভ্যাস করিতেছেন ; আজ সমস্ত রাত্রি সে দিকে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

৭৪

গোরা কহিল,— 'না। প্রায়শ্চিত্ত কাল না। আজই আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। কালকের চেয়ে ঢের বড়ো আগুন আজ জ্বলেছে। আমার নব-জীবনের আরম্ভে খুব একটা বড়ো আহুতি আমাকে দিতে হবে বলেই বিধাতা আমার মনে এতবড়ো একটা প্রবল বাসনাকে জাগিয়ে তুলেছেন। নইলে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটল কেন! আমি ছিলুম কোন্ ক্ষেত্রে! এদের সঙ্গে আমার মেলবার কোনো লৌকিক সম্ভাবনা ছিল না। আর, এমন বিরুদ্ধ ভাবের মিলনও পৃথিবীতে সচরাচর ঘটে না। আবার সেই মিলনে আমার মতো উদাসীন লোকের চিত্তেও যে এতবড়ো দুর্জয় একটা বাসনা জাগতে পারে সে কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। ঠিক আজই আমার এই বাসনার প্রয়োজন ছিল। আজ পর্যন্ত আমি দেশকে যা দিয়ে এসেছি তা অতি সহজেই দিয়েছি, এমন দান কিছু করতে হয় নি যাতে আমাকে কষ্টবোধ করতে হয়েছে। আমি ভেবেই পেতুম না, লোকে দেশের জন্যে কোনো জিনিস ত্যাগ করতে কিছুমাত্র কৃপণতা বোধ করে কেন। কিন্তু বড়ো যজ্ঞ এমন সহজ দান চায় না। দুঃখই চাই। নাড়ী ছেদন করে তবে আমার নবজীবন জন্মগ্রহণ করবে। কাল প্রাতে জনসমাজের কাছে আমার লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত হবে। ঠিক তার পূর্বরাত্রেই আমার জীবনবিধাতা

এসে আমার দ্বারে আঘাত করেছেন। অন্তরের মধ্যে আমার অন্তরতম প্রায়শ্চিত্ত না হলে কাল আমি শুদ্ধি গ্রহণ করব কেমন করে? যে দান আমার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন দান, সেই দান আমার দেবতাকে আজ সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়ে তবেই আমি সম্পূর্ণ পবিত্ররূপে নিঃস্ব হতে পারব, তবেই আমি ব্রাহ্মণ হব।'

গোরা হরিমোহিনীর সম্মুখে আসিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, একবার তুমি আমার সঙ্গে চলো। তুমি গেলে, তুমি মুখের একটি কথা বললেই সব হয়ে যাবে।"

গোরা কহিল, "আমি কেন যাব! তাঁর সঙ্গে আমার কী যোগ? কিছুই না।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "সে যে তোমাকে দেবতার মতো ভক্তি করে, তোমাকে গুরু বলে মানে।"

গোরার হৃৎপিণ্ডের এক দিক হইতে আর-এক দিকে বিদ্যুত্তপ্ত বজ্রসূচী বিঁধিয়া গেল।

গোরা কহিল, "আমার যাবার প্রয়োজন দেখি নে। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবার আর-কোনো সম্ভাবনা নেই।"

হরিমোহিনী খুশি হইয়া কহিলেন, "সে তো বটেই। অতবড়ো মেয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হওয়াটা তো ভালো নয়। কিন্তু বাবা, আজকের আমার এই কাজটি না করে দিয়ে তো তুমি ছাড়া পাবে না। তার পরে আর কখনো যদি তোমাকে ডাকি তখন বোলো।"

গোরা বার বার করিয়া মাথা নাড়িল। আর না, কিছুতে না। শেষ হইয়া গেছে। তাহার বিধাতাকে নিবেদন করা হইয়া গেছে। তাহার শুচিতায় এখন সে আর-কোনো চিহ্ন ফেলিতে পারিবে না। সে দেখা করিতে যাইবে না।

হরিমোহিনী যখন গোরার ভাবে বুঝিলেন তাহাকে টলানো সম্ভব হইবে না তখন তিনি কহিলেন, "নিতান্তই যদি না যেতে পার তবে এক কাজ

করো বাবা। একটা চিঠি তাকে লিখে দাও।"

গোরা মাথা নাড়িল। সে হইতেই পারে না। চিঠিপত্র নয়।

হরিমোহিনী কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি আমাকেই দু লাইন লিখে দাও। তুমি সব শাস্ত্রই জান, আমি তোমার বিধান নিতে এসেছি।"

গোরা জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের বিধান ?"

হরিমোহিনী কহিলেন, "হিন্দুঘরের মেয়ের উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করে গৃহধর্ম পালন করাই সকলের চেয়ে বড়ো ধর্ম কি না।"

গোরা কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দেখুন, আপনি এ-সমস্ত ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না। বিধান দেবার পণ্ডিত আমি নই।"

হরিমোহিনী তখন একটু তীব্রভাবে কহিলেন, "তোমার মনের ভিতরকার ইচ্ছাটা তা হলে খুলেই বলো-না। গোড়াতে ফাঁস জড়িয়েছ তুমিই, এখন খোলবার বেলায় বল 'আমাকে জড়াবেন না'। এর মানেটা কী! আসল কথা, ইচ্ছেটা তোমার নয় যে ওর মন পরিষ্কার হয়ে যায়।"

অন্য কোনো সময় হইলে গোরা আগুন হইয়া উঠিত। এমনতরো সত্য অপবাদও সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, সে রাগ করিল না। সে মনের মধ্যে তলাইয়া দেখিল, হরিমোহিনী সত্য কথাই বলিতেছেন। সে সুচরিতার সঙ্গে বড়ো বাঁধনটা কাটিয়া ফেলিবার জন্য নির্মম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একটি সূক্ষ্ম সূত্র, যেন দেখিতে পাই নাই এমনি ছল করিয়া, সে রাখিতে চায়। সে সুচরিতার সহিত সম্বন্ধকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া দিতে এখনো পারে নাই।

কিন্তু কৃপণতা ঘুচাইতে হইবে। এক হাত দিয়া দান করিয়া আর-এক হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলে চলিবে না।

সে তখন কাগজ বাহির করিয়া জোরের সঙ্গে বড়ো অক্ষরে লিখিল— 'বিবাহই নারীর জীবনে সাধনার পথ, গৃহধর্মই তাহার প্রধান ধর্ম। এই বিবাহ ইচ্ছাপূরণের জন্য নহে, কল্যাণসাধনের জন্য। সংসার সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক, একমনে সেই সংসারকেই বরণ করিয়া, সতী সাধ্বী

পবিত্র হইয়া, ধর্মকেই রমণী গৃহের মধ্যে মূর্তিমান করিয়া রাখিবেন— এই তাঁহাদের ব্রত।'

হরিমোহিনী কহিলেন, "অমনি আমাদের কৈলাসের কথাটা একটুখানি লিখে দিলে ভালো করতে বাবা।"

গোরা কহিল, "না, আমি তাঁকে জানি নে। তাঁর কথা লিখতে পারব না।"

হরিমোহিনী কাগজখানি যত্ন করিয়া মুড়িয়া, আঁচলে বাঁধিয়া, বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। সুচরিতা তখনো আনন্দময়ীর নিকট ললিতার বাড়িতে ছিল। সেখানে আলোচনার সুবিধা হইবে না এবং ললিতা ও আনন্দময়ীর নিকট হইতে বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া তাহার মনে দ্বিধা জন্মিতে পারে আশঙ্কা করিয়া সুচরিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, পরদিন মধ্যাহ্নে সে যেন তাঁহার নিকটে আসিয়া আহার করে। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে— আবার অপরাহ্ণেই সে চলিয়া যাইতে পারে।

পরদিন মধ্যাহ্নে সুচরিতা মনকে কঠিন করিয়াই আসিল। সে জানিত তাহার মাসি তাহাকে এই বিবাহের কথাই আবার আর-কোনোরকম করিয়া বলিবেন। সে আজ তাঁহাকে অত্যন্ত শক্ত জবাব দিয়া কথাটা একেবারেই শেষ করিয়া দিবে, এই তাহার সংকল্প ছিল।

সুচরিতার আহার শেষ হইলে হরিমোহিনী কহিলেন, "কাল সন্ধ্যার সময় আমি তোমার গুরুর ওখানে গিয়েছিলুম।"

সুচরিতার অন্তঃকরণ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মাসি আবার কি তাহার কোনো কথা তুলিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া আসিয়াছেন!

হরিমোহিনী কহিলেন, "ভয় নেই রাধারানী, আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাই নি। একলা ছিলুম, ভাবলুম যাই তাঁর কাছে দুটো ভালো কথা শুনে আসি গে। কথায় কথায় তোমার কথাই উঠল। তা দেখলুম, তাঁরও ওই মত। মেয়েমানুষ যে বেশিদিন আইবুড়ো হয়ে থাকে, এটা তো তিনি ভালো বলেন না। তিনি বলেন, শাস্ত্রমতে ওটা অধর্ম। ওটা সাহেবদের

ঘরে চলে, হিন্দুর ঘরে না। আমি তাঁকে আমাদের কৈলাসের কথাও খুলে বলেছি। দেখলুম লোকটি জ্ঞানী বটে।"

লজ্জায় কষ্টে সুচরিতা মর্মে মরিতে লাগিল। হরিমোহিনী কহিলেন, "তুমি তো তাঁকে গুরু বলে মানো। তাঁর কথাটা তো পালন করতে হবে?"

সুচরিতা চুপ করিয়া রহিল। হরিমোহিনী কহিলেন, "আমি তাঁকে বললুম, 'বাবা, তুমি নিজে এসে তাকে বুঝিয়ে যাও, সে আমাদের কথা মানে না।' তিনি বললেন, 'না, তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া উচিত হবে না; ওটা আমাদের হিন্দুসমাজে বাধে।' আমি বললুম, 'তবে উপায় কী!' তখন তিনি আমাকে নিজের হাতে লিখে দিলেন। এই দেখো-না।"

এই বলিয়া হরিমোহিনী ধীরে ধীরে আঁচল হইতে কাগজটি খুলিয়া লইয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া সুচরিতার সম্মুখে মেলিয়া দিলেন।

সুচরিতা পড়িল। তাহার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

লেখাটির মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যাহা নূতন বা অসংগত। কথা-গুলির সহিত সুচরিতার মতের যে অনৈক্য আছে তাহাও নহে। কিন্তু হরিমোহিনীর হাত দিয়া বিশেষ করিয়া এই লিখনটি তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়ার যে অর্থ তাহাই সুচরিতাকে নানা প্রকারে কষ্ট দিল। গোরার কাছ হইতে এ আদেশ আজ কেন! অবশ্য, সুচরিতারও সময় উপস্থিত হইবে, তাহাকেও একদিন বিবাহ করিতে হইবে— সেজন্য গোরার পক্ষে এত ত্বরান্বিত হইবার কি কারণ ঘটিয়াছে? তাহার সম্বন্ধে গোরার কাজ একেবারে শেষ হইয়া গেছে? সে কি গোরার কর্তব্যে কোনো হানি করিয়াছে? তাহার জীবনের পথে কোনো বাধা ঘটাইয়াছে? তাহাকে গোরার দান করিবার এবং তাহার নিকট প্রত্যাশা করিবার আর-কিছুই নাই? সে কিন্তু এমন করিয়া ভাবে নাই, সে কিন্তু এখনো পথ চাহিয়া ছিল। সুচরিতা নিজের ভিতরকার এই অসহ্য কষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে মনের মধ্যে কোথাও কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাইল না।

হরিমোহিনী সুচরিতাকে অনেক ক্ষণ ভাবিবার সময় দিলেন। তিনি তাঁহার নিত্যনিয়ম-মত একটুখানি ঘুমাইয়াও লইলেন। ঘুম ভাঙিয়া সুচরিতার ঘরে আসিয়া দেখিলেন, সে যেমন বসিয়া ছিল তেমনিই চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

তিনি কহিলেন, "রাধু, অত ভাবছিস কেন বল্ দেখি। এর মধ্যে ভাববার অত কী কথা আছে? কেন, গৌরমোহনবাবু অন্যায় কিছু লিখেছেন?"

সুচরিতা শান্তস্বরে কহিল, "না, তিনি ঠিকই লিখেছেন।"

হরিমোহিনী অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আর দেরি করে কী হবে বাছা?"

সুচরিতা কহিল, "না, দেরি করতে চাই নে। আমি একবার বাবার ওখানে যাব।"

হরিমোহিনী কহিলেন, "দেখো রাধু, তোমার যে হিন্দুসমাজে বিবাহ হবে এ তোমার বাবা কখনো ইচ্ছা করবেন না। কিন্তু তোমার গুরু যিনি তিনি—"

সুচরিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "মাসি, কেন তুমি বার বার ওই এক কথা নিয়ে পড়েছ। বিবাহ নিয়ে বাবার সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে যাচ্ছি নে। আমি তাঁর কাছে অমনি একবার যাব।"

পরেশের সান্নিধ্যই যে সুচরিতার সান্ত্বনার স্থল ছিল। পরেশের বাড়ি গিয়া সুচরিতা দেখিল, তিনি একটা কাঠের তোরঙ্গে কাপড়চোপড় গোছাইতে ব্যস্ত।

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, এ কী!"

পরেশ একটু হাসিয়া কহিলেন, "মা, আমি সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছি, কাল সকালের গাড়িতে রওনা হব।"

পরেশের এই হাসিটুকুর মধ্যে মস্ত একটা বিপ্লবের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা সুচরিতার অগোচর রহিল না। ঘরের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী কন্যা

ও বাহিরে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে একটুও শান্তির অবকাশ দিতেছিল না। কিছুদিনের জন্যও যদি তিনি দূরে গিয়া কাটাইয়া না আসেন, তবে ঘরে কেবলই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা আবর্ত ঘুরিতে থাকিবে। কাল তিনি বিদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, অথচ আজ তাঁহার আপনার লোক কেহই তাঁহার কাপড় গুছাইয়া দিতে আসিল না, তাঁহার নিজেকেই এ কাজ করিতে হইতেছে—এই দৃশ্য দেখিয়া সুচরিতার মনে খুব একটা আঘাত লাগিল। সে পরেশবাবুকে নিরস্ত করিয়া প্রথমে তাঁহার তোরঙ্গ সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া ফেলিল। তাহার পরে বিশেষ যত্নে ভাঁজ করিয়া কাপড়-গুলিকে নিপুণ হস্তে তোরঙ্গের মধ্যে আবার সাজাইতে লাগিল, এবং তাঁহার সর্বদাপাঠ্য বইগুলিকে এমন করিয়া রাখিল যাহাতে নাড়াচাড়াতেও তাহাদের আঘাত না লাগে। এইরূপে বাক্স গুছাইতে গুছাইতে সুচরিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি কি একলাই যাবে?"

পরেশ সুচরিতার এই প্রশ্নের মধ্যে বেদনার আভাস পাইয়া কহিলেন, "তাতে আমার তো কোনো কষ্ট নেই রাধে।"

সুচরিতা কহিল, "না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

পরেশ সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। সুচরিতা কহিল, "বাবা, আমি তোমাকে কিছু বিরক্ত করব না।"

পরেশ কহিলেন, "সে কথা কেন বলছ! আমাকে তুমি কবে বিরক্ত করেছ মা?"

সুচরিতা কহিল, "তোমার কাছে না থাকলে আমার ভালো হবে না বাবা। আমি অনেক কথাই বুঝতে পারি নে। তুমি আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমি কিনারা পাব না। বাবা, তুমি যে আমাকে আমার নিজের বুদ্ধির উপরে নির্ভর করতে বল, আমার সে বুদ্ধি নেই, আমি মনের মধ্যে সে জোরও পাচ্ছি নে। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো বাবা।"

এই বলিয়া সে পরেশের দিকে পিঠ করিয়া অত্যন্ত নতশিরে তোরঙ্গের

কাপড় লইয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

৭৫

গোরা লিখনটি লিখিয়া যখন হরিমোহিনীর হাতে দিল তখন তাহার মনে হইল, সুচরিতা সম্বন্ধে সে যেন ত্যাগপত্র লিখিয়া দিল। কিন্তু দলিল লিখিয়া দিলেই তো তখনই কাজ শেষ হয় না। তাহার হৃদয় যে সে দলিলকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিল। সে দলিলে কেবল গোরার ইচ্ছাশক্তি জোর কলমে নাম সই করিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের স্বাক্ষর তো তাহাতে ছিল না— হৃদয় তাই অবাধ্য হইয়াই রহিল। এমনি ঘোরতর অবাধ্যতা যে, সেই রাত্রেই গোরাকে একবার সুচরিতার বাড়ির দিকে দৌড় করাইয়াছিল আর-কি! কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই গির্জার ঘড়িতে দশটা বাজিল এবং গোরার চৈতন্য হইল, এখন কাহারও বাড়িতে গিয়া দেখা করিবার সময় নয়। তাহার পরে গির্জার প্রায় সকল ঘড়িই গোরা শুনিয়াছে। কারণ, বালির বাগানে সে রাত্রে তাহার যাওয়া ঘটিল না। পরদিন প্রত্যুষে যাইবে বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছে।

প্রত্যুষেই বাগানে গেল, কিন্তু যে-প্রকার নির্মল ও বলশালী মন লইয়া সে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে স্থির করিয়াছিল সেরকম মনের অবস্থা তাহার কোথায়!

অধ্যাপক-পণ্ডিতেরা অনেকে আসিয়াছেন। আরও অনেকের আসিবার কথা। গোরা সকলের সংবাদ লইয়া সকলকে শিষ্টসম্ভাষণ করিয়া আসিল। তাঁহারা গোরার সনাতন ধর্মের প্রতি অচল নিষ্ঠার কথা বলিয়া বার বার সাধুবাদ করিলেন।

বাগান ক্রমেই কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গোরা চারি দিক তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত কোলাহল এবং কাজের ব্যস্ততার

মধ্যে গোরার হৃদয়ের নিগূঢ়তলে একটা কথা কেবলই বাজিতেছিল কে যেন বলিতেছে, 'অন্যায় করেছ ! অন্যায় করেছ !' অন্যায়টা কোন্‌খানে তাহা তখন স্পষ্ট করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় ছিল না, কিন্তু কিছুতেই সে তাহার গভীর হৃদয়ের মুখ বন্ধ করিতে পারিল না। প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজনের মাঝখানে তাহার হৃদয়বাসী কোন্ গৃহশত্রু তাহার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য দিতেছিল, বলিতেছিল 'অন্যায় রহিয়া গেল'। এ অন্যায় নিয়মের ত্রুটি নহে, মন্ত্রের ভ্রম নহে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা নহে। এ অন্যায় প্রকৃতির ভিতরে ঘটিয়াছে— এই জন্য গোরার সমস্ত অন্তঃকরণ এই অনুষ্ঠানের উদ্‌যোগ হইতে মুখ ফিরাইয়া ছিল।

সময় নিকটবর্তী হইল, বাহিরে বাঁশের ঘের দিয়া পাল টাঙাইয়া সভাস্থান প্রস্তুত হইয়াছে। গোরা গঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিয়া কাপড় ছাড়িতেছে, এমন সময় জনতার মধ্যে একটা চঞ্চলতা অনুভব করিল। একটা যেন উদ্‌বেগ ক্রমশ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে অবিনাশ মুখ বিমর্ষ করিয়া কহিল, "আপনার বাড়ি থেকে খবর এসেছে ; কৃষ্ণদয়ালবাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। তিনি সত্বর আপনাকে আনবার জন্যে গাড়িতে করে লোক পাঠিয়েছেন।"

গোরা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। অবিনাশ তাহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইল। গোরা কহিল, "না, তুমি সকলের অভ্যর্থনায় থাকো— তুমি গেলে চলবে না।"

•

গোরা কৃষ্ণদয়ালের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন এবং আনন্দময়ী তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। গোরা উদ্‌বিগ্ন হইয়া উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। কৃষ্ণদয়াল ইঙ্গিত করিয়া পার্শ্ববর্তী চৌকিতে তাহাকে বসিতে বলিলেন। গোরা বসিল।

গোরা মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন ?"

আনন্দময়ী কহিলেন, “এখন একটু ভালোই আছেন। সাহেব-ডাক্তার ডাকতে গেছে।”

ঘরে শশিমুখী এবং একজন চাকর ছিল। কৃষ্ণদয়াল হাত নাড়িয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল তখন তিনি নীরবে আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিলেন এবং গোরাকে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, “আমার সময় হয়ে এসেছে। এতদিন তোমার কাছে যা গোপন ছিল, আজ তোমাকে তা না বলে গেলে আমার মুক্তি হবে না।”

গোরার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। অনেক ক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিল না।

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, “গোরা, তখন আমি কিছু মানতুম না, সেই জন্যই এতবড়ো ভুল করেছি। তার পরে আর ভ্রমসংশোধনের পথ ছিল না।”

এই বলিয়া আবার চুপ করিলেন। গোরাও কোনো প্রশ্ন না করিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, “মনে করেছিলুম, কোনোদিনই তোমাকে বলবার আবশ্যক হবে না, যেমন চলছে এমনিই চলে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি, সে হবার জো নেই; আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার শ্রাদ্ধ করবে কী করে!”

এরূপ প্রমাদের সম্ভাবনা মাত্রে কৃষ্ণদয়াল যেন শিহরিয়া উঠিলেন। আসল কথাটি কী তাহা জানিবার জন্য গোরা অধীর হইয়া উঠিল। সে আনন্দময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, “মা, তুমি বলো, কথাটা কী। শ্রাদ্ধ করবার অধিকার আমার নেই?”

আনন্দময়ী এতক্ষণ মুখ নত করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। গোরার প্রশ্ন শুনিয়া তিনি মাথা তুলিলেন, এবং গোরার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিলেন, “না, বাবা, নেই।”

গোরা চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, “আমি ওঁর পুত্র নই?”

আনন্দময়ী কহিলেন, “না।”

অগ্নিগিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাসের মতো তখন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইল, "মা, তুমি আমার মা নও ?"

আনন্দময়ীর বুক ফাটিয়া গেল ; তিনি অশ্রুহীন রোদনের কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, গোরা, তুই যে আমার পুত্রহীনার পুত্র, তুই যে গর্ভের ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বাবা।"

গোরা তখন কৃষ্ণদয়ালের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমাকে তবে তোমরা কোথায় পেলে ?"

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন, "তখন মিউটিনি। আমরা এটোয়াতে। তোমার মা সিপাহিদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাত্রে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তোমার বাপ তার আগের দিনেই লড়াইয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল—"

গোরা গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "দরকার নেই তাঁর নাম। আমি নাম জানতে চাই নে।"

কৃষ্ণদয়াল গোরার এই উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া থামিয়া গেলেন। তার পর বলিলেন, "তিনি আইরিশ্‌ম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব করে মারা গেলেন। তার পর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছ।"

এক মুহূর্তেই গোরার কাছে তাহার সমস্ত জীবন অত্যন্ত অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো হইয়া গেল। শৈশব হইতে এত বৎসর তাহার জীবনের যে ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একেবারেই বিলীন হইয়া গেল। সে যে কী, সে যে কোথায় আছে— তাহা যেন বুঝিতেই পারিল না। তাহার পশ্চাতে অতীতকাল বলিয়া যেন কোনো পদার্থই নাই এবং তাহার সম্মুখে তাহার এতকালের এমন একাগ্রলক্ষবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেছে। সে যেন কেবল এক-মুহূর্ত মাত্রের পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভাসিতেছে। তাহার মা নাই, বাপ নাই, দেশ নাই, জাতি নাই, নাম নাই, গোত্র নাই, দেবতা নাই। তাহার সমস্তই একটা কেবল 'না'। সে কী

ধরিবে, কী করিবে, আবার কোথা হইতে শুরু করিবে, আবার কোন্ দিকে লক্ষ স্থির করিবে, আবার দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে কর্মের উপকরণসকল কোথা হইতে কেমন করিয়া সংগ্রহ করিয়া তুলিবে। এই দিক্‌চিহ্নহীন অদ্ভুত শূন্যের মধ্যে গোরা নির্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া কেহ তাহাকে আর দ্বিতীয় কথাটি বলিতে সাহস করিল না।

এমন সময় পরিবারের বাঙালি চিকিৎসকের সঙ্গে সাহেব-ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার যেমন রোগীর দিকে তাকাইল তেমনি গোরার দিকেও না তাকাইয়া থাকিতে পারিল না; ভাবিল, 'এ মানুষটা কে!' তখনো গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ছিল এবং স্নানের পরে সে যে গরদ পরিয়াছিল তাহা পরিয়াই আসিয়াছে। গায়ে জামা নাই, উত্তরীয়ের অবকাশ দিয়া তাহার প্রকাণ্ড দেহ দেখা যাইতেছে।

পূর্বে হইলে ইংরাজ ডাক্তার দেখিবা মাত্র গোরার মনে আপনিই একটা বিদ্বেষ উৎপন্ন হইত। আজ যখন ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিতেছিল তখন গোরা তাহার প্রতি বিশেষ একটা ঔৎসুক্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিল। নিজের মনকে বার বার করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'এই লোকটাই কি এখানে আমার সকলের চেয়ে আত্মীয়?'

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া ও প্রশ্ন করিয়া কহিল, "কই, বিশেষ তো কোনো মন্দ লক্ষণ দেখি না। নাড়ীও শঙ্কাজনক নহে, এবং শরীরযন্ত্রেরও কোনো বিকৃতি ঘটে নাই। যে উপসর্গ ঘটিয়াছে সাবধান হইলেই তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে না।"

ডাক্তার বিদায় লইয়া গেলে কিছু না বলিয়া গোরা চৌকি হইতে উঠিবার উপক্রম করিল।

আনন্দময়ী ডাক্তারের আগমনে পাশের ঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দ্রুত আসিয়া গোরার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বাবা, গোরা, আমার উপর তুই রাগ করিস নে, তা হলে আমি আর বাঁচব না!"

গোরা কহিল, "তুমি এতদিন আমাকে বল নি কেন! বললে তোমার

কোনো ক্ষতি হত না।"

আনন্দময়ী নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ লইলেন, কহিলেন, "বাপ, তোকে পাছে হারাই এই ভয়েই আমি এত পাপ করেছি। শেষে যদি তাই ঘটে, তুই যদি আজ আমাকে ছেড়ে যাস, তা হলে কাউকে দোষ দিতে পারব না গোরা, কিন্তু সে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে যে বাপ!"

গোরা শুধু কেবল কহিল, "মা!"

গোরার মুখে সেই সম্বোধন শুনিয়া এতক্ষণ পরে আনন্দময়ীর রুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

গোরা কহিল, "মা, এখন আমি একবার পরেশবাবুর বাড়ি যাব।"

আনন্দময়ীর বুকের ভার লাঘব হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "যাও বাবা।"

তাঁহার আশু মরিবার আশঙ্কা নাই, অথচ গোরার কাছে কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল— ইহাতে কৃষ্ণদয়াল অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দেখো গোরা, কথাটা কারও কাছে প্রকাশ করবার তো দরকার দেখি নে। কেবল, তুমি একটু বুঝেসুঝে বাঁচিয়ে চললেই যেমন চলছিল তেমনি চলে যাবে, কেউ টেরও পাবে না।"

গোরা তাহার কোনো উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই, ইহা স্মরণ করিয়া সে আরাম পাইল।

মহিমের হঠাৎ আপিস কামাই করিবার কোনো উপায় ছিল না। তিনি ডাক্তার প্রভৃতির সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া একবার কেবল সাহেবকে বলিয়া ছুটি লইতে গিয়াছিলেন। গোরা যেই বাড়ির বাহির হইতেছে এমন সময়ে মহিম আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, "গোরা, যাচ্ছ কোথায়?"

গোরা কহিল, "ভালো খবর। ডাক্তার এসেছিল। বললে, কোনো ভয় নেই।"

মহিম অত্যন্ত আরাম পাইয়া কহিলেন, "বাঁচালে। পরশু একটা দিন

আছে, শশিমুখীর বিয়ে আমি সেই দিনই দিয়ে দেব। গোরা, তোমাকে কিন্তু একটু উদ্‌যোগী হতে হবে। আর দেখো, বিনয়কে কিন্তু আগে থাকতে সাবধান করে দিয়ো, সে যেন সেদিন না এসে পড়ে। অবিনাশ ভারি হিঁদু, সে বিশেষ করে বলে দিয়েছে। তার বিয়েতে যেন ওরকম লোক না আসতে পায়। আর-একটি কথা তোমাকে বলে রাখি ভাই, সেদিন আমার আপিসের বড়ো সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে আনব, তুমি যেন তাদের তেড়ে মারতে যেয়ো না। আর-কিছু নয়, কেবল একটুখানি ঘাড়টা নেড়ে 'গুড ঈভনিং স্যর' বললে তোমাদের হিঁদুশাস্ত্র অসিদ্ধ হয়ে যাবে না— বরঞ্চ পণ্ডিতদের কাছে বিধান নিয়ো। বুঝেছ ভাই? ওরা রাজার জাত, ওখানে তোমার অহংকার একটু খাটো করলে তাতে অপমান হবে না।"

মহিমের কথার কোনো উত্তর না করিয়া গোরা চলিয়া গেল।

৭৬

সুচরিতা যখন চোখের জল লুকাইবার জন্য তোরঙ্গের 'পরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাপড় সাজাইতে ব্যস্ত ছিল এমন সময় খবর আসিল, গৌরমোহনবাবু আসিয়াছেন।

সুচরিতা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া তাহার কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। এবং তখনই গোরা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গোরার কপালে তিলক তখনো রহিয়া গেছে, সে সম্বন্ধে তাহার খেয়ালই ছিল না। গায়েও তাহার তেমনি পট্টবস্ত্র পরা। এমন বেশে সচরাচর কেহ কাহারও বাড়িতে দেখা করিতে আসে না। সেই প্রথম গোরার সঙ্গে যেদিন দেখা হইয়াছিল সেই দিনের কথা সুচরিতার মনে পড়িয়া গেল। সুচরিতা জানিত, সেদিন গোরা বিশেষ করিয়া যুদ্ধের বেশে আসিয়াছিল— আজও কি এই যুদ্ধের সাজ!

গোরা আসিয়াই একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া পরেশকে প্রণাম

করিল এবং তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। পরেশ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "এসো, এসো বাবা, বোসো।"

গোরা বলিয়া উঠিল, "পরেশবাবু, আমার কোনো বন্ধন নেই।"

পরেশবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "কিসের বন্ধন ?"

গোরা কহিল, "আমি হিন্দু নই।"

পরেশবাবু কহিলেন, "হিন্দু নও!"

গোরা কহিল, "না, আমি হিন্দু নই। আজ খবর পেয়েছি, আমি মিউটিনির সময়কার কুড়োনো ছেলে, আমার বাপ আইরিশ্‌ম্যান। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে— আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পঙ্‌ক্তিতে কোনো জায়গায় আমার আহারের আসন নেই।"

পরেশ ও সুচরিতা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরেশ তাহাকে কী বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

গোরা কহিল, "আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু। আমি যে পতিত হব, ব্রাত্য হব, সে ভয় আর আমার নেই। আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।"

সুচরিতা গোরার প্রদীপ্ত মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গোরা কহিল, "পরেশবাবু, এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি; একটা না একটা জায়গায় বেধেছে; সেই-সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত জীবন দিনরাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি— এই শ্রদ্ধার ভিত্তিকেই খুব পাকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর-কোনো কাজই করতে পারি নি, সেই আমার একটিমাত্র সাধনা ছিল। সেই জন্যেই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রতি সত্যদৃষ্টি মেলে তার সেবা করতে গিয়ে আমি বার বার ভয়ে ফিরে এসেছি। আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে এতদিন আমার চারি

দিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি! আজ এক মুহূর্তেই আমার সেই ভাবের দুর্গ স্বপ্নের মতো উড়ে গেছে। আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে। আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি, সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে— সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়— সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।"

গোরার এই নবলব্ধ অনুভূতির প্রবল উৎসাহের বেগ পরেশকেও যেন আন্দোলিত করিতে লাগিল; তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গোরা কহিল, "আমার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। দেখুন, আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি— আমি কেবল শহরের সভায় বক্তৃতা করেছি তা মনে করবেন না— কিন্তু কোনো-মতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারি নি, এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি, কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারি নি। সেজন্যে আমার মনের ভিতরে খুব একটা শূন্যতা ছিল। এই শূন্যতাকে নানা উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি, এই শূন্যতার উপরে নানাপ্রকার কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরও বিশেষরূপ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি। কেননা ভারতবর্ষকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি— আমি তাকে যে অংশটিতে দেখতে পেতুম সে অংশের কোথাও যে আমি কিছুমাত্র অভিযোগের অবকাশ একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আজ সেই-সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি

পেয়ে আমি বেঁচে গেছি পরেশবাবু।”

পরেশ কহিলেন, “সত্যকে যখন পাই তখন সে তার সমস্ত অভাব-অপূর্ণতা নিয়েও আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করে; তাকে মিথ্যা উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলবার ইচ্ছামাত্রই হয় না।”

গোরা কহিল, “দেখুন পরেশবাবু, কাল রাত্রে আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যে, আজ প্রাতঃকালে আমি যেন নূতন জীবন লাভ করি, এতদিন শিশুকাল থেকে আমাকে যে-কিছু মিথ্যা যে-কিছু অশুচিতা আবৃত করে ছিল আজ যেন তা নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গিয়ে আমি নবজন্ম লাভ করি। আমি ঠিক যে কল্পনার সামগ্রীটি প্রার্থনা করেছিলুম ঈশ্বর সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি— তিনি তাঁর নিজের সত্য হঠাৎ একেবারে আমার হাতে এনে দিয়ে আমাকে চম্‌কিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেবারে সমূলে ঘুচিয়ে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না। পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি— মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে, এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।”

পরেশ কহিলেন, “গৌর, তোমার মাতৃক্রোড়ে তুমি যে অধিকার পেয়েছ সেই অধিকারের মধ্যে তুমি আমাদেরও আহ্বান করে নিয়ে যাও।”

গোরা কহিল, “আজ মুক্তিলাভ করে প্রথমেই আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?”

পরেশ কহিলেন, “কেন?”

গোরা কহিল, “আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে। সেই জন্যেই আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পান নি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো

ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না, যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন— যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”

পরেশবাবুর মুখের উপর দিয়া একটি ভক্তির গভীর মাধুর্য স্নিগ্ধ ছায়া বুলাইয়া গেল ; তিনি চক্ষু নত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এতক্ষণ পরে গোরা সুচরিতার দিকে ফিরিল। সুচরিতা তাহার চৌকির উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।

গোরা হাসিয়া কহিল, “সুচরিতা, আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমার ওই গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও।”

এই বলিয়া গোরা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সুচরিতা চৌকি হইতে উঠিয়া গিয়া নিজের হস্ত তাহার হাতে স্থাপন করিল। তখন গোরা সুচরিতাকে লইয়া পরেশকে প্রণাম করিল।

পরিশিষ্ট

গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আনন্দময়ী তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন। গোরা আসিয়াই তাঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপর মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন।

গোরা কহিল, "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই— শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমি আমার ভারতবর্ষ।...

"মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতে।"

তখন আনন্দময়ী অশ্রুব্যাকুলকণ্ঠে মৃদুস্বরে গোরার কানের কাছে কহিলেন, "গোরা, এইবার একবার বিনয়কে ডেকে পাঠাই।"

সচিত্র সংস্করণ ॥ রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি ॥ ১৯৬১

রবীন্দ্র প্রতিকৃতি-যুক্ত

সাড়ে আট টাকা